আরব কন্যার
আর্তনাদ
এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

আরব কন্যার আর্তনাদ

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

রূপান্তর

শহীদুল ইসলাম

সম্পাদক, গবেষক ও গ্রন্থকার

আকিক পাবলিকেশন্স ¦ এদারায়ে কুরআন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৪ ঈ. দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈ.

আরব কন্যার আর্তনাদ

প্রকাশক

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

কম্পোজ : আকিক কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ

সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা; ফোন : ৭১২৪৬৫৩

বিক্রয়কেন্দ্র

আকিক পাবলিকেশন্স

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : ৩৮০/= (তিনশত আশি টাকা মাত্র)

উৎসর্গ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজও যারা পৌত্তলিক শাসকদের শোষণ নিপীড়নের নাগপাশ থেকে মুসলমানদের মুক্তি দিতে অবিরাম জিহাদ করে যাচ্ছেন এবং দেশে দেশে আগ্রাসী বেঈমানদের উৎখাত করতে জীবনপণ লড়াই করছেন তাঁদের সাফল্য কামনায়।

অনুবাদকের কথা

সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর নাম জানেন না এমন শিক্ষিত লোক কমই রয়েছেন। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এই মহানায়কের সাথে কমবেশি পরিচিত।

পরিতাপের বিষয় হলো, সতের বছর বয়সী অনন্য এই মহানায়কের কীর্তি-কর্ম, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং তাঁর ভারত অভিযানের প্রেক্ষিত-প্রেক্ষাপটের প্রকৃত চিত্র না আছে একক কোনো ইতিহাস গ্রন্থে, না আছে উপন্যাসে। উপন্যাস ও গল্প লেখকগণ প্রধান কয়েকটি চরিত্র, বিশেষ স্থান, ক্ষেত্র ও ঘটনার উল্লেখ করে গল্পকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য যতটুকু নাট্যরূপ দেয়ার দরকার তাই করেছেন। ইতিহাস ও চরিত্রের বস্তুনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি মোটেও মনোযোগী হননি। যার ফলে বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রথম বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ তৎকালীন সিন্ধু রাজা দাহির ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির প্রকৃত চিত্র এসব রচনায় ফুটে ওঠেনি।

ইতিহাস গবেষক, শিকড় সন্ধানী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ পূর্বাপর সকল ঐতিহাসিকের বিশুদ্ধ রচনাবলী মন্থন করে মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর ওপর রচিত উপন্যাসগুলোর বিকৃতি দূর করার জন্য উর্দু ভাষায় মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর জীবনকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসভিত্তিক যে রচনাটি উপস্থাপন করেন এর নাম **'সিতাঁরা জো টোট গায়া'**।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠককুল বিশেষ করে উপন্যাস ও গল্পপ্রেমী নবীনদেরকে ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বস্তুনিষ্ঠতার বিচারে মানোত্তীর্ণ এ গ্রন্থটি পেয়েই অনুবাদের কাজ শুরু করি। বন্ধুবর আরিফ ভাই-এর আগ্রহ ও অনুরোধে শত ব্যস্ততার মাঝেও আগাগোড়া সবটুকু পাণ্ডুলিপি নতুন করে দেখে দিতে হয়েছে।

এ উপন্যাস আপনাকে নিয়ে যাবে প্রায় তেরশো বছর আগের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আরব সাগরের তীরবর্তী সিন্ধু অববাহিকায়, বসরা, বাগদাদ ও ইরাকে। আপনার চোখে ভেসে উঠবে সে সময়কার ইরাক, ভারতের হিন্দু রাজাদের শঠতা, পুরোহিতদের মুসলিম বিদ্বেষ আর মুসলিম মুজাহিদদের আত্মত্যাগের মূর্তিমান চিত্র। পৌত্তলিকতার নর্দমায় নিমজ্জমান বাঙালি মুসলিমদের ঘুণেধরা চেতনায় ক্ষণিকের জন্য হলেও ঝিলিক দেবে ঈমানের জ্যোতি। কুফরীর সাথে বাঙালি মুসলিমদের অনাহূত মিতালীর প্রশ্নে একটু হলেও সম্বিত ফেরাবে।

গ্রন্থটি উপভোগ্য ও পাঠ উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। এরপরও হয়তো অনেক ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করবেন।

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিস্মৃত নবীন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে পরিচয় ও ইতিহাস অনুসন্ধানে আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে আমরা উপমহাদেশের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ রচিত মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর ভারত অভিযান সম্পর্কিত উপন্যাস-এর বাংলা অনুবাদ **'আরব কন্যার আর্তনাদ'** নামে পাঠকমহলের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করছি।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ বর্তমান যুগের পাঠকদের মানসিকতা অনুধাবন করে গল্পকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যা থেকে পাঠকগণ উপন্যাসের স্বাদ যেমন অনুভব করবেন তেমনিভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত অভিযানের প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব ও তৎকালীন পৌত্তলিক ভারতের চিত্র এবং শাসকদের হাতে অগণিত বনি আদমের অমানবিক জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত জানতে পারবেন।

ঐতিহ্যের পথে **'আকিক পাবলিকেশন্স'**-এর প্রকাশনায় এটি আরেকটি নান্দনিক সংযোজন বলে আমরা মনে করি। **'আরব কন্যার আর্তনাদ'** পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম ও সাধনা সার্থক হবে।

অনূদিত গ্রন্থটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর, নির্ভুল ও সাবলীল করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

মেহেরবান মালিক এদেশের সকল মুসলমান এবং এই গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে খুনরাঙ্গা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে জমিনের বুকে আল্লাহর সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের গঠন করার সক্ষমতা দান করুন, **'আরব কন্যার আর্তনাদ'**-এর প্রকাশনা লগ্নে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা। আমীন।

প্রকাশক

॥ আরব কন্যার আর্তনাদ ॥

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

পর্ব এক

৬৩০ খৃস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি, ৮ হিজরী সনের ১৫ শাওয়াল। রাসূল সা. তায়েফ অবরোধ করলেন। হুনাইন ও আউতাসে তুমুল লড়াই করে তায়েফ পৌঁছে মুসলিম লস্কর। তায়েফ শহরকে অবরোধ করার প্রাক্কালে বেঈমানদের আতঙ্ক আল্লাহর তরবারী নামে খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদ মারাত্মকভাবে আহত হলেন। খালিদের আঘাত খুবই মারাত্মক। জীবনের আশা নেই। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখী খালিদ। বীর বাহাদুর খালিদ শত্রু পক্ষের আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। শত্রু বাহিনীর অসংখ্য ধাবমান ঘোড়া তাঁর ওপর দিয়ে চলে গেছে। এমতাবস্থায় খালিদ যে জীবিত রয়ে গেছেন সেটিই ভাগ্যের ব্যাপার।

রাসূলের জীবনে এটি ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে একটি যুগান্তকারী লড়াই। আবু বকর, ওমর ও আব্বাস রা.-এর মতো প্রথম সারির সকল সাহাবীই লড়াইয়ে লিপ্ত। রাসূল সা.-এর নেতৃত্বে তায়েফ এলাকার অধিবাসী বনী ছাকিফ ও হাওয়াযিন কবিলার মোকাবেলায় লিপ্ত। তায়েফ অঞ্চলে বনী ছাকিফ ও হাওয়াযিন কবিলা যুদ্ধবাজ হিসাবে খ্যাত। মালিক বিন আউফ নামে ত্রিশ বছরের এক যুবক মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে এমন কঠিন লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের কথা শুনতে অবাক লাগলেও মালিক বিন আউফ এতো অল্প বয়সেই যুদ্ধবাজ কবিলা দু'টির সেনাপতিত্ব করার সর্বময় যোগ্যতার অধিকারী। কবিলা দু'টির মধ্যে মালিক বিন আউফের কোন জুড়ি নেই। মালিক বিন আউফ কবিলা দু'টির জন্য বিস্ময়কর যুদ্ধ প্রতিভা, আশা ভরসা ও সকলের গর্ব। তরুণ মালিক বিন আউফ, তার কৌশলী চালে হুনাইন ও আউতাসে মুসলিম বাহিনীকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। তার কৌশলী চালে এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর দু'টি ইউনিট পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়।

খালিদ বিন ওয়ালিদ জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি। ক্ষতস্থান থেকে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর শরীর অসাড় হয়ে পড়ে। রাসূল সা. তাঁকে দেখে ক্ষতস্থানে ফুঁ দিলেন। এতে খালিদ চোখ মেলে তাকালেন। রাসূল সা.-এর বরকতময় স্পর্শে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন খালিদ। এরপর মারাত্মক আঘাত নিয়েই শেষ অবধি রণাঙ্গনে অবিচল থাকলেন তিনি।

তায়েফ অবরোধ ছিল এ যুদ্ধের শেষ ও চূড়ান্ত মহড়া। হুনাইনে রাসূলে কারীমের নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম চরম আঘাত হানলে ছাকিফ ও হাওয়াযিন গোত্র মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পশ্চাদপসারণ করে কবিলা দু'টি দুর্গসম তায়েফ শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চাদপসারণ করলেও তাদের মনোবল এতোটুকু দুর্বল হয়নি। বরঞ্চ তারা ছিল অপরাজিতের আত্মপ্রশংসায় উৎফুল্ল। দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে মালিক বিন আউফ ঘোষণা করল, "আমরা মুসলমানদের ভয়ে আশ্রয় নেইনি, বরং মুসলমানদেরকে আমাদের ইচ্ছে মতো যুদ্ধ করাতেই দুর্গে এসেছি।"

দীর্ঘ আঠারো দিন অবরোধ বহাল রাখা হলো। মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে দুর্গপ্রাচীর ডিঙ্গানোর জন্য আক্রমণ করতে গিয়ে শত্রুপক্ষের শরাঘাতে আহত ও নিহত হতে লাগল। অবরোধ শেষে রাসূল সা. শীর্ষস্থানীয় সাহাবী আবু বকর, ওমর ও আব্বাস প্রমুখের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম অবরোধ প্রত্যাহার করে মদিনায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অধিকাংশ সাহাবী দুর্গপ্রাচীর ডিঙিয়ে দুর্গ জয় করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রবল আগ্রহে রাসূল সা. আর একবার দুর্গপ্রাচীর ডিঙানোর অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম দুর্গপ্রাচীরে তীব্র আঘাত হানলেন। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলো। এতে বহু সংখ্যক সাহাবী আহত ও নিহত হলেন। তাঁদের পক্ষে আর প্রাচীর ডিঙানো সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে তাঁদের পিছু হটতে হলো।

অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করা হলো। মুসলমানদের অধিকাংশ যোদ্ধাই ছিলেন আহত। তাঁদের হতাহতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। অনেকেই শাহাদত বরণ করেন। আহতদের অনেকেই ছিলেন চলাচলে অক্ষম। পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন বহু সাহাবী। অধিকাংশ যোদ্ধা আহত থাকার কারণে দ্রুত তাঁবু গুটিয়ে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁবু

গোটাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া খুব বেশী আহতদের জন্য প্রয়োজন ছিল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। রাসূল সা. আহতদের বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য দুর্গ এলাকা থেকে তাঁবু গুটিয়ে জি'রানায় পৌছে তাঁবু ফেলেন।

মুসলমানরা ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁদের প্রত্যাবর্তন শুধু ব্যর্থতার গ্লানিই বহণ করছিল না, বিপুল সংখ্যক সহযোদ্ধাকে হারানো ও আহত হওয়ার যাতনাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল প্রচণ্ড মনোকষ্ট। তায়েফ নগরী নিত্যদিনের মতোই অপরিবর্তিত ছিল, অজেয় দুর্গপ্রাচীরে যেন মুসলমানদের ব্যর্থতায় উপহাস করছিল।

কিন্তু প্রচণ্ড যাতনা, ব্যর্থতার গ্লানিকে ছাপিয়ে গেল আকস্মিক এক ঘটনা। যেন অলৌকিক ঘটনার মতোই ঘটে গেল ব্যাপারটি। জি'রানা থেকে মুসলমানরা তখনও তাঁবু গুটিয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হননি, এমন সময় বনী ছাকিফ কবিলার শীর্ষস্থানীয় ক'জন লোক মুসলমানদের শিবিরের দিকে এগিয়ে এলো। তারা শিবিরের কাছে পৌছে প্রহরীদের কাছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তাদেরকে রাসূল সা.-এর কাছে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন শক্তিশালী সাহাবী নাঙ্গা তরবারী ও বর্শা নিয়ে সতর্ক প্রহরা দিতে লাগলেন। কারণ প্রবল শত্রু পক্ষের এই লোকগুলোকে কোন অবস্থাতেই মুসলমানরা নিরাপদ ভাবতে পারছিলেন না। কেননা, বেশ কয়েকটি অমুসলিম গোত্র নবীজী সা.-কে হত্যা করার অব্যাহত চক্রান্ত করছিল। হাওয়াযিন গোত্রের জন্য সমূহ বিপদ সৃষ্টি করেছিল মুসলমানদের হাতে বন্দি তাদের কিছু সংখ্যক নারী ও শিশু। দুর্গ অবরোধের আগে এক যুদ্ধে ওদের পরাজয় ঘটে। তাতে কিছু সংখ্যক হাওয়াযিন নারী ও শিশু মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। তখনকার নীতিতে এরা ছিল যুদ্ধ বন্দি। পরাজয় কিংবা বিজয় অথবা সামরিক চুক্তি ছাড়া তাদের পক্ষে মুসলমানদের হাতে বন্দি হওয়া নারী শিশুদের ফিরে পাওয়ার কোন পথ ছিল না। এদিকে রাসূল সা. ঘোষণা করে দিলেন যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও যদি শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সকল সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে।

হাওয়াযিন গোত্রের আগত লোকদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় এক লোক বলল "হে মুহাম্মদ! আমাদের কবিলার লোকসহ সবাই আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মেনে নিয়েছে। আমাদের কবিলার সবাই আপনার ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।"

আল্লাহর কসম! তোমরা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছ। এটাই "সীরাতে মুস্তাকীম" বললেন রাসূল সা.।

কবিলার সর্দার বলল, "হে মুহাম্মদ! আপনি তো আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের নারী শিশু ও সহায়-সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন?"

"আমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং আমাদের লোকজনকে হত্যা করে যে সব জিনিস তোমরা হারিয়েছ, সেগুলো ফিরে পাওয়ার কোন অধিকার তোমাদের নেই" বললেন রাসূল সা.। তবে যে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্কে তোমরা মহান প্রভু ও রব হিসাবে মেনে নিয়েছ, তাঁর সম্মানে-তোমাদের আমি হতাশ করবো না। তোমাদের কাছে নারী শিশু নাকি সহায়-সম্পদ বেশী প্রিয়?

"আপনি আমাদের নারী শিশুদের অন্তত ফিরিয়ে দিন।" বলল প্রতিনিধি দলের নেতা।

রাসূল সা. হাওয়াযিন কবিলার নারী শিশুদেরকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের নেতাদের কাছে রাসূল সা.-এর এই উদারতা ছিল আশাতীত। রাসূলের এই উদারতায় গোটা হাওয়াযিন গোত্রের লোক ইসলামে দীক্ষা নিলো।

এ ঘটনার দুই তিনদিন পর অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি মুসলমান শিবিরে অনুপ্রবেশ করতে চাইলো। লোকটির মাথা ও চেহারা ছিল কাপড়ে ঢাকা। চোখ দু'টো ছাড়া তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। নিরাপত্তারক্ষী সাহাবায়ে কেরাম যখন তার প্রবেশ পথ আগলে দাঁড়ালেন, তখন সে নিজের পরিচয় না বলেই রাসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করল।

"তুমি কি তায়েফ থেকে আসনি? জিজ্ঞেস করলেন একজন নিরাপত্তারক্ষী।

"হ্যাঁ, তায়েফের দিক থেকেই এসেছি আমি।" বলল আগন্তুক।

কিছু সংখ্যক মুসলমান যোদ্ধা ফকীর ও উট চারকের বেশে তায়েফ দুর্গের আশে পাশে বিচরণ করছিলেন, ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য। কারণ অবরোধ তুলে নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে ওরা কোন অতর্কিত হামলা করে কি-না এ বিষয়টি আগে ভাগেই জানার জন্য রাসূল সা. এ গোয়েন্দা ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব সাহাবীদের কয়েকজন দুর্গফটক পেরিয়ে এই লোকটিকে মুসলিম শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে ওর পিছু

নেন। শিবিরের নিকটবর্তী হলে তার পথ রোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে নিজের পরিচয় না বলেই নবীজীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করে।

"আমরা তোমাকে তায়েফ দুর্গ থেকে বের হতে দেখেছি বললেন এক সাহাবী। আল্লাহর কসম! তুমি সংকল্পে সফল হতে পারবে না।"

"যে সংকল্প নিয়ে এসেছি তা পূর্ণ করেই যাব।" বলল আগন্তুক। তোমরা কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে যেতে দেবে না?"

"কিভাবে দেবো? তুমি এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে তোমার চেহারাই দেখাচ্ছ না।"

একটানে চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলল আগন্তুক। আল্লাহর কসম! তুমি তো মালিক বিন আউফ। তোমার পথ রোধ করার শক্তি আমাদের নেই। দুই তিনজন সাহাবী মালিক বিন আউফকে নবীজীর সকাশে নিয়ে গেলেন।

"বিন আউফ! কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছ, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?" জিজ্ঞেস করলেন রাসূল সা.।

"আমি আপনার ধর্মে দীক্ষা নিতে এসেছি" বলল মালিক বিন আউফ। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছাকিফ গোত্রপতি মালিক বিন আউফ নবীজীর হাতে হাত রেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেন।

মালিক বিন আউফ কেন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব। মালিক বিন আউফ যখন রাসূল সা.-এর হাতে হাত রেখে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলামে দীক্ষা নিলেন, তখন তার ওপর কোন ধরনের চাপ ছিল না। দৃশ্যত সে তখন বিজয়ী গোত্রের সেনাপতি। বস্তুত মালিক বিন আউফের ইসলাম গ্রহণের কোন যৌক্তিক কারণ ছিল না। হতে পারে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের প্রতি সদয় হয়ে রাসূল সা. তাদের নারী ও শিশুদের মুক্ত করে দেয়া এবং হাওয়াযিন গোত্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি মালিক বিন আউফকে প্রভাবিত করেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর ছাকিফ গোত্রের এই বীরযোদ্ধা ইসলামের পক্ষে অনেকগুলো যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। আজো তায়েফ ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

আজ থেকে এক হাজার চারশ বছর আগে রাসূল সা. তায়েফ শহর অবরোধ করেছিলেন। তায়েফবাসীদের জীবনপণ মোকাবিলার কারণে শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসতে হয়েছিল।

আল্লাহ্ তাআলা সেই অবরোধের চৌষট্টি বছর পর তায়েফকে এমন এক সৌভাগ্যে উদ্ভাসিত করলেন যা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল মাইল ফলক হয়ে থাকবে। আর সেই সৌভাগ্যের প্রথম মাইল ফলক ছিল বনী ছাকিফ গোত্রের বীর পুরুষ মালিক বিন আউফের ইসলাম গ্রহণ।

৬৯ হিজরী সনের ঘটনা। তায়েফের অধিবাসী এক তরুণীবধু সন্তান সম্ভবা হলেন। তরুণীর স্বামী ইসলামী সালতানাতের একজন তুখোড় সৈনিক। সেনাবাহিনীতে সে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। ছুটির অবসরে সেই সেনা বাড়িতে এলে স্ত্রী লাজনম্রকণ্ঠে স্বামীকে জানালো অন্তঃসত্তা সে। অনাগত সন্তানের চেহারা দেখার আশায় সে বুক বেঁধে রয়েছে। সেই সাথে স্ত্রী এও জানালো, ভয়ংকর একটি স্বপ্ন দেখে সে ভীত হয়ে পড়েছে। তার স্বপ্নময় প্রত্যাশার আশপাশে উঁকি দিচ্ছে কতগুলো ভীতিকর ভূতুড়ে শঙ্কা।

তরুণী স্বামীকে জানালো– আমি স্বপ্নে দেখেছি হঠাৎ আমার ঘরটি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, এমন ঘন অন্ধকার যে, আমি নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখতে পারছিলাম না। ভয়ে আতঙ্কে আমি জড়সড় হয়ে গেলাম। আমার ভয় হচ্ছিলো ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি ঘরে একা ছিলাম। খুব জোরে চিৎকার করে কাউকে ডাকতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমার মুখ থেকে একটুও শব্দ বের হচ্ছিলো না। মনে করছিলাম ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে যাই, কিন্তু তাও পারছিলাম না। শত চেষ্টা করেও আমার পা এক কদমও উঠাতে পারছিলাম না। গভীরভাবে ব্যাপারটি ভাবতে চেষ্টা করি কিন্তু সব চিন্তা-ভাবনাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। কোন কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না...।

কিন্তু মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছিলাম। আর নানা দোয়া-কালাম পাঠ করছিলাম। এতোটুকু বোধ আমার অক্ষুণ্ন ছিল। এমন সময় দূর আকাশের এক কোণে একটি তারা দেখা দিলো, তারাটি প্রথমে আবছা আলো আঁধারে অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাটি ঝকমকে দীপ্তিমান হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আসমানের তারাটি আমার দিকে নেমে এলো। আঁধার ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে আলোকিত তারাটি আমার ঘরে এসে পড়ল, এতে আমার ঘরটি আলোয় ভরে গেল। এ যেন জমিনের কোন আলো নয়, অন্য রকম আসমানী নূর। এ আলোয় আমার ভয় ভীতি সব দূর হয়ে গেল। মনটা এক ধরনের প্রশান্তিতে ভরে গেল। ঠিক এ সময়ই আমার ঘুম ভেঙে গেল।"

"মন্দ কোন স্বপ্ন দেখোনি। মনে তো হয় ভালোই দেখেছে" বলল তরুণীর সৈনিক স্বামী।

"কিন্তু অন্ধকারটা কি দেখলাম?" অন্ধকারটার কথা মনে হলে আমার কেমন যেন ভয় লাগে। আচ্ছা, তুমি কি এমন কোন আলেম চেনো যে স্বপ্নের তা'বীর ভালো বলতে পারে?"

"ভাগ্যে যা লেখা রয়েছে তা কেউ বদলাতে পারে না। স্বপ্নের তা'বীর যদি ভালো না হয়, তা কি তুমি বদলাতে পারবে?" বলল স্বামী।

"মন্দের কথা মুখে এনো না। আমার বিশ্বাস ভালোই হবে। আগে তুমি জিজ্ঞেস তো করবে? জিজ্ঞেস না করে নিজে নিজেই কেন ব্যাখ্যা দিচ্ছো? স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য এ সেনা অফিসারের যুবতী স্ত্রী স্বামীর কাছে জিদ ধরল। স্ত্রীর সন্তুষ্টি বিধানে অবশেষে সৈনিক স্বামী তায়েফের সমকালীন শ্রেষ্ট বুযুর্গ ইসহাক বিন মূসার শরণাপন্ন হলো। ইসহাক বিন মূসার কাছে ব্যক্ত করল স্ত্রীর স্বপ্নের আদি অন্ত। ইসহাক বিন মূসা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকতে দেখে অনাগত সন্তানের সৈনিক পিতা বলল, "বলুন ইবনে মূসা! স্বপ্নের ব্যাখ্যা যদি মন্দও হয়, তবুও আমাকে বলুন। তাতে আমি ঘাবড়ে যাবো না।"

"না না। তা'বীর মোটেও মন্দ নয়" বললেন ইসহাক বিন মূসা। তোমার স্ত্রীর গর্ভে এমন এক ছেলে জন্ম নেবে আকাশের উজ্জ্বল তারকার মতো যার দ্যুতি সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে। সে আল্লাহর দ্বীনের আলো দুনিয়ার দিকে দিকে বহু জনপদে ছড়িয়ে দেবে। শত শত বছর পরের লোকজনও তার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার নির্দেশে মুসলিম যোদ্ধারা বহু দূর পর্যন্ত ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়ে দেবে। কিন্তু...!"

ইসহাক কথা শেষ না করেই নীরব হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি কোন কথা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চান।

"আল্লাহর কসম! ইবনে মূসা! আপনার এই থেমে যাওয়া খুবই রহস্যজনক। আমি যে কোন মন্দ খবরও শুনতে প্রস্তুত। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন। আমাকে সংশয়ের মধ্যে না ফেলে আপনি যা বুঝতে পেরেছেন তা সরাসরি বলুন।"

"তাহলে শোন! যে তারকা সদৃশ সন্তান তোমার ঘর আলোকিত করবে, সে এমন তারকাদের অন্তর্ভুক্ত যেসব তারকা অল্প সময়ের মধ্যে হারিয়ে যায়,

খসে পড়ে। অবশ্য দৃশ্যত এসব তারকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এদের আলো থাকে দীর্ঘ সময়। এ সন্তান তোমার ঘরে বেশীদিন না থাকলেও তোমার ঘর অন্ধকার হবে না। মানুষের মনে সে জীবিত থাকবে অনন্তকাল। তোমার ঘর আলোকিত থাকবে সারাজীবন। মানুষ মনমুকুরে তার স্মৃতি ধরে রাখবে, তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।"

"তাহলে আমিও তাকে এমনভাবে লালন-পালন করবো, যাতে সে ইসলামের উজ্জ্বল তারকা হিসাবে নিজেকে আলোকিত করতে পারে।" বলল ভাবী সন্তানের পিতা।

"একথাও তোমার জেনে রাখা দরকার, এ সন্তানের লালন-পালনের সুযোগ তোমার হবে না, সে বড় হবে তোমার স্ত্রীর আদর-সোহাগে।"

কেন? আমি তাকে লালন-পালন করতে পারবো না কেন?

"সে কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমার যা বলার ছিল আমি বলে দিয়েছি" বললেন ইসহাক বিন মূসা।

ভাবী সন্তানের সৈনিক পিতা ইসহাক বিন মূসার দরবার ত্যাগ করে স্ত্রীর কাছে ইসহাকের দেয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সবিস্তারে ব্যক্ত করল।

স্ত্রী স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে অজানা আশাবাদে উৎফুল্ল হলো বটে, কিন্তু সন্তানের হায়াত কম হবে ভেবে দুশ্চিন্তায় ডুবে গেল।

সন্তান প্রসবের দিনক্ষণ যখন ঘনিয়ে এলো, তখন ভাবী সন্তানের সৈনিক পিতাকে সরকারীভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করল সে। পিতার মৃত্যুতে ইসহাক বিন মূসার আশঙ্কাই বাস্তবরূপ লাভ করল যে, ভাবী সন্তানকে তার পিতা লালন-পালন করার সুযোগ পাবে না। পরবর্তীতে ইসহাক বিন মূসা এ ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন, ভাবী সন্তানের মা স্বপ্নের প্রথমে যে অন্ধকার দেখেছিল, তা ছিল ভাবী সন্তানের পিতা ও তার স্বামীর মৃত্যুজনিত অন্ধকার, যে অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হয়ে ঘর আলোকিত করবে এ সন্তান।

পিতার মৃত্যু হলো তায়েফ থেকে বহু দূরে। মৃত্যু সংবাদ স্ত্রীর কাছে পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই মৃত সৈনিকের ঘর আলোকিত করে জন্ম নিলো এক দীপ্তিময় পুত্র সন্তান। নবজাতক শিশু খুব নাদুস নুদুস। শিশুর চওড়া কপাল, দ্যুতিময় দুটো চোখ, উন্নত নাসিকা, কান্তিময় চেহারা, প্রগাঢ় দৃষ্টি আর আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি দেখে যে কারো মনে হতো এ শিশু সাধারণ কোন শিশু নয়, এ অন্য শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অকস্মাৎ মৃত্যুবরণকারী সৈনিকের নাম ছিল কাসিম বিন ইউসুফ। আর নবজাতক শিশুর নাম রাখা হলো মুহাম্মদ বিন কাসিম। এই মুহাম্মদ বিন কাসিমই পরবর্তীকালে জগৎ বিখ্যাত ভারত বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে পরিচিত।

কাসিম বিন ইউসুফ আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন আপন ভাই। তখন খলিফা ছিলেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। কাসিম ও হাজ্জাজ ছিলেন যুদ্ধ বিদ্যা ও রণকৌশলে খুবই পারদর্শী। খলিফার সেনাবাহিনীতে উভয়েই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। সময়টি ছিল এমন যখন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের জন্য ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। ইসলামী খেলাফতেও তখন দেখা দিয়েছিল ভাঙন। দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ইসলামী খেলাফত। ইসলামী খেলাফত সিরিয়া ও মিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ইরাক ও হিজাযে স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উমাইয়া খেলাফতের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে উমাইয়া শাসকদের সাথে তাঁর দেখা দেয় সংঘাত।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের খ্যাতিমান দৌহিত্র। তিনি ইয়াযীদ বিন আমীরে মুআবিয়ার আনুগত্য করতেও অস্বীকৃতি জানান এবং হিজায ও ইরাকের মুসলমানদের একত্রিত করে পাল্টা সরকার গড়ে তোলেন। ইয়াযীদের পুত্র মুআবিয়া বিন ইয়াযীদ যখন শাসন কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার ঘোষণা করেন, তখনই উমাইয়া শাসনের সূচনা ঘটে। সেই সাথে নবী বংশ তথা ফাতেমীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় জুলুম অত্যাচার। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ফাতেমীদের ওপর জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো দৃঢ় মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়ান।

উমাইয়া শাসকরা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের শাসনের পতন ঘটানোর জন্য প্রথমে ইরাকে সেনাভিযান চালায়। ইরাক কব্জা করার পর পবিত্র হিজাযেও সৈন্য প্রেরণ করে এবং আক্রমণ চালায় মক্কা শরীফে। উমাইয়া শাসকদের হয়ে উভয় অভিযানেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। মদিনা শরীফের অবরোধ ভেঙে ফেলার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাইতুল্লাহ শরীফের ওপরও মিনজানিক থেকে ভারী পাথর নিক্ষেপ করেন। ফলে বাইতুল্লাহ শরীফের ইমারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা আব্দুল মালিক বিন

মারওয়ানের খেলাফতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে দমনে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফত বিরোধীদের পরাস্ত করেন। নির্মম ও কঠোর দমননীতির কারণে জালেম ও অত্যাচারী শাসক হিসাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে রয়েছেন। নিজের নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হিসাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে শহীদ করে তাঁর মৃতদেহ চৌরাস্তায় কয়েকদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অত্যাচারের ভয়ে মক্কার লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের মরদেহকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনার সাহস করেনি।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এর বৃদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তিহীনা মাতা আবু বকর তনয়া হযরত আসমা লাঠিতে ভর দিয়ে চৌরাস্তায় ঝুলন্ত তাঁর আত্মজের মরদেহে লাঠি দিয়ে ঠোকা দিয়ে কাঁপা কণ্ঠে আবৃত্তি করেন সেই বিখ্যাত পঙ্ক্তি– "এ কোন্ অশ্বারোহী! এখনো যে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেনি।"

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া খেলাফতের অধীনতা বরণ করেন। উমাইয়া খলিফা তাকে হেজাযের গভর্নর নিয়োগ করেন। হাজ্জাজ গভর্নর হওয়ার সাথে সাথে হিজাযের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অপরদিকে ইরাকের অধিবাসী খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বিদ্রোহ ও খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তাদের বিরোধিতা দমনেও খলিফা গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে দায়িত্ব দেন। এক পর্যায়ে রক্তাক্ত যুদ্ধের পর খলিফা মালিক বিন মারওয়ান খারেজীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

খারেজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই হাজ্জাজের আপন ভাই কাসিম মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার ঔরসে জন্মলাভকারী তারকা সন্তানের মুখ দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাই কাসিম ছিলেন হাজ্জাজের ডান হাত। বড় সহযোগী। হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর ঐকান্তিক সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিজয়কীর্তি দিয়ে চাচা হাজ্জাজের জুলুম অত্যাচারের উপাখ্যানকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিতে সক্ষম হন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুহাম্মদ বিন কাসিম এমন ইতিহাস রচনা করেন যে, অমুসলিমরা তাঁর আদর্শিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে তাঁকে পূঁজা করতে শুরু করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন দুনিয়ার আলো দেখলো তখন তার ঘরে দুঃখের বিষাদ ছেয়ে গেছে। নবজাতক শিশুর পিতার মৃত্যুশোকে তাঁর মা ও

আপনজন শোকাতুর। শিশু জন্মের খবর হাজ্জাজের কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি ছুটে এলেন। হাজ্জাজ এলে শিশুকে তার কোলে তুলে দেয়া হলো। শিশুকে দু'হাতে নিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।

"এ শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করেছে বটে কিন্তু একে তুমি এতীম মনে করো না। আমি যতোদিন বেঁচে আছি মনে করো ওর বাবাই বেঁচে আছে। ছোট বউ! তুমি হয়তো জানো না, আমার এই ভাইটি আমার কতো প্রিয় ছিল। সে আমার ছোট হলেও আমরা ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ। তোমার স্বপ্নের কথা এবং ইসহাক বিন মূসার স্বপ্নের ব্যাখ্যার কথা সে আমাকে জানিয়েছে। তুমি মনে রেখো, তোমার এই সন্তান শুধু তায়েফের নয় সারা আরব জাহানের তারকা হবে। তুমি কখনও নিজেকে বিধবা ও একাকী ভেব না। এই শিশুর দাদার খুনের কসম! যে খুন এই শিশুর শরীরে প্রবাহমান। আমি একে এমন শিক্ষা ও দীক্ষা দেব শত শত বছর পরও আরবের লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। যুগের পর যুগ সে বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়রাজ্যে ও অন্তরের মণিকোঠায়।"

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের এসব কথা আবেগতাড়িত বক্তব্য ছিল না। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজকীয় লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর জন্যে বিশেষ শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা হলো। শৈশব থেকেই মুহাম্মদকে যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার সার্বিক ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর খেলার সরঞ্জাম ছিল ছোট্ট ছোট্ট তরবারী, বর্শা ও ঘোড়া। বড় হওয়ার সাথে সাথে তাঁর খেলার সামগ্রীও বড় হতে লাগলো। কৈশোর থেকেই অশ্বারোহণ ছিল তাঁর খেলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুর পিতার ঘাটতি যথাসম্ভব মা মিটিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। মা হলেও তিনি শিশুকে কখনো নিজের বুকে কোলে জড়িয়ে রাখতেন না। নিজের আঁচলে বেঁধে রাখার বদলে তাঁকে আদর সোহাগ দিয়ে সুপুরুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রতি সতর্ক যত্ন নিতেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ এর মাকে বলে রেখেছিলেন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোন সাধারণ সৈনিক নয় সেনাপতি হিসাবেই গড়ে তুলতে সচেষ্ট। শুধু রণাঙ্গনের সেনাপতিই নয় তিনি তাঁকে গড়ে তুলতে চান একজন দক্ষ সেনাপতি ও শাসক হিসাবে।

হাজ্জাজ নিজেও ছিলেন প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বীর পুরুষ। নিজের আজ্ঞা পালনে বাধ্য করতে যে কোন ধরনের জুলুম-অত্যাচারে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না হাজ্জাজ। তার অস্বাভাবিক শাসন শোষণের কারণে

খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান প্রথমে তাকে হিজাযের ও পরবর্তীতে ইরাক, বেলুচিস্তান ও মাকরানের প্রধান গভর্নর নিযুক্ত করেন। একটি মাত্র ঘটনায় খলিফা হাজ্জাজের অস্বাভাবিক কঠোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এমন–

খলিফা আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনী ছিল বিশৃঙ্খল। শত চেষ্টা করেও আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলেন না। সেনাবাহিনীর সবচেয়ে ত্রুটি ছিল, তাদেরকে কোন অভিযানের নির্দেশ দিলে অভিযানের প্রস্তুতি নিতেই তারা অনেক সময় ব্যয় করে ফেলতো। অথচ খলিফা জানতেন, মুসলিম বাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অস্বাভাবিক ক্ষীপ্রগতিতে অভিযান পরিচালনা করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের ধারণাতীত কম সময়ে দুশমনদের অপ্রস্তুত অবস্থায় মুসলিম বাহিনী হামলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতো। তখন খলিফা আব্দুল মালিকের প্রধান উজির ছিলেন রূহ বিন রাবাহ।

ইবনে রাবাহ। একদিন প্রধান উজিরের উদ্দেশে বললেন খলিফা। আমার সেনাবাহিনীর মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে একটি কার্যকর বাহিনীতে পরিণত করবে?

"একজন লোকের প্রতি আমি দৃষ্টি রাখছি আলীজা! বললেন উজির। তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"কে সেই লোক?"

"ওর নাম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তায়েফের লড়াকু বংশের ছেলে সে। সে আমাদের সেনাবাহিনীতেই আছে কিন্তু পদস্থ কোন অফিসার নয় একজন সাধারণ সৈনিক। তবে সে অন্য দশজনের মতো নয়। দেখে শুনে মনে হয় ওর মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞান আছে।"

"ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন" নির্দেশ দিলেন খলিফা।

"নির্দেশ পালন করা হলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফার সামনে দণ্ডায়মান। হাজ্জাজের চেহারা সুরত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অঙ্গ-ভঙ্গিতেই খলিফা হাজ্জাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন।

"ইবনে ইউসুফ! তুমি যদি আমার একটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারো তাহলে তোমাকে আমি অনেক বড় পদে পদোন্নতি দেব।"

"কি হুকুম, আমীরুল মুমেনীন!" বলল হাজ্জাজ।

"সেনাবাহিনীকে আমি এমনভাবে প্রস্তুত দেখতে চাই যে, আমি কোন দিকে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে তারা আমার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাবে। আমার যেন সেনাদের প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা করতে না হয়। আমি কোথাও যাওয়ার আগে আগে তোমাকে জানাবো।"

সেকথার দু'দিন পর খলিফা মালিক বিন মারওয়ান হাজ্জাজকে ডেকে বললেন, "অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বের হবো। অমুক অমুক ইউনিট আমার সফরসঙ্গী হবে।" উজির রূহ বিন রাবাহও তার নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে আমার সহগামী হবে। বললেন খলিফা।

এটা ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্যে একটা পরীক্ষা। তখন সেনারা ছিল শিবিরে। খলিফার নির্দেশ পেয়ে হাজ্জাজ সেনা শিবিরে গিয়ে বললেন, "আমীরুল মুমেনীনের বাহন সফরের জন্য বের হচ্ছে, অমুক অমুক সেনা ইউনিটকে অশ্বারোহণ করে আমীরুল মুমেনীনের সফরসঙ্গী হতে হবে। হাজ্জাজ দেখলেন, উজির তার সেনা শিবিরে তখনও এসে পৌঁছেনি। দু'তিনজন কমান্ডারও শিবিরে ছিল না। সৈন্যদের কেউ গল্পগুজবে লিপ্ত। আর কেউ খানা পাকানোর কাজে ব্যস্ত। হাজ্জাজের কথা তাদের কারো কানে গেছে বলে মনে হলো না। হাজ্জাজ চিৎকার করে শিবিরময় তাড়া করছিলেন।

"এসো হাজ্জাজ! হাজ্জাজকে তাচ্ছিল্যের স্বরে আহ্বান করলো এক সিপাহী। শুধু শুধু কেন গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছো? এসো খানা খাও!"

হাজ্জাজ হাতের কাছে পাওয়া একটি হান্টার উঠিয়ে খাবারে আহ্বানকারী সেনাকে পেটাতে শুরু করলেন। এরপর যে সৈনিককেই বসা দেখলেন, তাকেই হান্টার দিয়ে কয়েক ঘা পিটুনি লাগালেন এবং বললেন, আমি আমীরুল মুমেনীনের নির্দেশ শোনাচ্ছি।"

কিন্তু এরপরও সৈন্যদের মধ্যে রওয়ানা হবার কোন তৎপরতা দেখতে না পেয়ে কয়েকটি ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। অগ্নি সংযোগকৃত ছাউনীগুলোর একটি ছিল উজিরের নিজস্ব সেনা ইউনিটের। ওদের একজন দৌড়ে গিয়ে অগ্নিসংযোগের জন্যে উজিরের কাছে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

হাজ্জাজের তৎপরতায় উদ্দিষ্ট সেনা ইউনিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খলিফার সহগামী হলো। কিন্তু উজির তার ইউনিট নিয়ে আসার পরিবর্তে খলিফার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উজির অভিযোগের স্বরে বললেন–

"আমীরুল মুমেনীন! হাজ্জাজ আমার ছাউনীসহ কয়েকটি সেনা ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন সেনাকে পিটিয়েছে। আমীরুল মুমেনীন নিশ্চয়ই তাকে এমন কোন নির্দেশ দেননি!"

খলিফা হাজ্জাজকে ডেকে পাঠালেন। "একথা কি ঠিক যে তুমি কয়েকটি সেনা ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছো?" জিজ্ঞেস করলেন খলিফা।

"আমীরুল মুমেনীন! আমার মতো গোলামের কি করে এমন দুঃসাহস হবে যে সেনা ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দেবো? আমি কোন ছাউনীতে আগুন দেইনি।

"তুমি কি কয়েকজন সেনাকে প্রহার করোনি?"

"জি-না আমীরুল মুমেনীন। আমি কাউকে প্রহার করিনি।"

খলিফাকে জ্বলন্ত ছাউনী দেখানো হলো, সেই সাথে প্রহৃত সেনাদের শরীর খুলে তাদের আঘাত দেখানো হলো।

"ইবনে ইউসুফ! তুমিই যদি না করে থাক, তাহলে কে এসব ছাউনীতে আগুন দিলো, আর কে এদের প্রহার করলো?

"আগুন আপনি দিয়েছেন আমিরুল মুমেনীন! আপনিই সেনা ছাউনীতে আগুন দিয়েছেন। আর আপনিই সেনাদের প্রহার করেছেন।"

"চুপ করো! গর্জে উঠলেন খলিফা। কিসব প্রলাপ বকছো। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?"

"আমীরুল মুমেনীন! যা কিছু ঘটেছে, আপনার নির্দেশে ঘটেছে" বললেন হাজ্জাজ। আপনি সেনাবাহিনীকে গতিশীল তড়িৎকর্মা দেখতে চাচ্ছিলেন। এটাই ছিল একমাত্র পন্থা যা দিয়ে আমি আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। তখন আমার মুখের নির্দেশ ছিল আপনার নির্দেশ, আর আমার হাতের হান্টার ছিল আপনার হাতের হান্টার। ছাউনীতে ধরানো আগুনও আপনার দেয়া আগুন ছিল, এসব দিয়েই আমি আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি।"

"আল্লাহর কসম! এমন লোকেরই আমার দরকার" আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন খলিফা। এই ঘটনার পর খলিফা হাজ্জাজকে অপ্রত্যাশিত পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীতে উর্ধতন অফিসার নিযুক্ত করে ফেললেন। সেদিন থেকেই হাজ্জাজের জুলুম ও অত্যাচারের সূচনা হলো।

✪✪✪

এমনটিই ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও তার মেজাজ। কঠোরতা, নির্মমতা ও দুঃসাহসিকতার এক জীবন্ত মূর্তি ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সেই হাজ্জাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠতে শুরু করল তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম। হাজ্জাজ ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে বিশেষ এক ধাচে তাঁকে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞ হলেন।

৭০৫ খৃস্টাব্দে খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক মসনদে আসীন হলেন। ওয়ালিদ তার পিতার মতো বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন না। ওয়ালিদের সৌভাগ্য এই ছিল যে, তার পিতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সকল ধরনের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। মালিক বিন মারওয়ান খারেজীদেরও গলাটিপে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া মালিকের সেনাবাহিনীতে কুতাইবা বিন মুসলিম, মূসা বিন নুসাইর, মুসলিম বিন আব্দুল মালিকের মতো বিজ্ঞ ও পারদর্শী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ওয়ালিদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো দক্ষ ও অত্যাচারী গভর্নর ছিল তার সহায়ক ও পরামর্শদাতা।

শুরুতেই হাজ্জাজ খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দুর্বলতাগুলো আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি ওয়ালিদের দুর্বলতার সুযোগে নিজের অবস্থান আরো শক্তিশালী করণে মনোযোগী হলেন। বহুদিন পর একবার হাজ্জাজ জন্মভূমি তায়েফে এলেন। হাজ্জাজের আগমনের সংবাদ শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য হাজ্জাজের বাড়ি গেলেন।

"আরে তুমি এলে কেন? আমি নিজেই তো তোমার সাথে দেখা করতে যাব" ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন হাজ্জাজ। তুমি ভেবেছিলে যে, আমি তোমার খোঁজ না নিয়ে এবং আমার ভাইয়ের আমানতের খোঁজ না নিয়েই চলে যাব? আমি তো ভাবছি, তোমাকে বলব, ভাইয়ের রেখে যাওয়া আমানত এখন আমার হাতে দিয়ে দাও। মুহাম্মদ কোথায়? ওকে দেখার জন্য আরো আগেই আমার আসা উচিত ছিল।"

"আল্লাহ্ আমার ভাইজানকে তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখুন" বললেন মুহাম্মদের মা। আমি মুহাম্মদকে একটি তাজী ঘোড়া কিনে দিয়েছি। আগে সে সাধারণ ঘোড়া দৌড়াতো। এখন এমন এক ঘোড়া দিয়েছি, দক্ষ অশ্বারোহীরাই কেবল এতে আরোহণ করতে পারে। কাসিম তো এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তাঁকে এখন যুদ্ধের অশ্বারোহণ রপ্ত করা দরকার।

কে জানে ও নতুন ঘোড়া নিয়ে কোথায় চলে গেছে। আল্লাহ্ করুন ও যাতে ঘোড়া বাগে রাখতে পারে, খুবই তেজী ঘোড়া।

"আল্লাহ্ যাতে ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে সাহায্য করেন। কারণ তাঁকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পুনরায় উঠে সওয়ার হওয়াও রপ্ত করতে হবে" বললেন হাজ্জাজ। অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠে নয় ঘোড়ার পায়ের আঘাত খেয়েই অশ্বারোহণ রপ্ত করে। শোন বোন! ও যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে আহত হয়ে আসে, তাহলে তাঁকে বুকে জড়িয়ে আহ্লাদ করো না। ওর শরীর থেকে যদি রক্ত ঝরতে দেখো, তাহলে আঁচল ছিড়ে পট্টি বেঁধে দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ো না। ওকে মায়া-মমতার জালে বেঁধে ফেলো না। ওর শরীরে প্রবাহিত রক্ত ওকে দেখতে দাও, সে যাতে বুঝতে পারে কাদের রক্ত সে বংশানুক্রমে শরীরে বহন করছে।

"তুমি এখন বাড়ি যাও বোন। আমি এখনই তোমার বাড়িতে আসছি।"

কিছুক্ষণ পর হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। মুহাম্মদের মা হাজ্জাজের আসার খবর শুনে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। হাজ্জাজ শুধু তার মৃত স্বামীর বড় ভাই নয়, প্রায় আধা মুসলিম জাহানের প্রধান শাসনকর্তা। হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় তার কানে ভেসে এলো ধাবমান অশ্বখুরের আওয়াজ। তিনি পিছনে তাকিয়ে দেখলেন এক অশ্বারোহী তীব্র বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে এদিকেই আসছে। তিনি অশ্বারোহীকে দেখার জন্যে দাঁড়ালেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মা হাজ্জাজের পাশেই দাঁড়ানো।

অশ্বারোহী হাজ্জাজের পাশ দিয়েই অশ্ব হাঁকিয়ে চলে গেল। সে না গতি হ্রাস করলো, না হাজ্জাজের দিকে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করল। অবস্থা দৃষ্টে হাজ্জাজের চেহারায় দেখা দিলো উষ্মা। স্পষ্টই তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এভাবে তার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়াটা তার কাছে ধৃষ্টতা মনে হয়েছে। এতে হাজ্জাজ অপমানবোধ করছেন। কারণ হাজ্জাজ ছিলেন বনী ছাকিফ গোত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তি। তায়েফের লোকজন তাকে খুবই সম্মান করে।

"মনে হচ্ছে আমার কবিলার ছেলেরা আমাকে ভুলে গেছে।" মুহাম্মদ বিন কাসিমের মায়ের উদ্দেশে বললেন হাজ্জাজ। মনে হচ্ছে, এ ছেলেটি আমাকে ভয় দেখানোর জন্য আমার পাশ দিয়ে এভাবে ঘোড়া হাঁকিয়েছে। আচ্ছা ছোট বউ! তুমি কি চেনো ছেলেটি কে?"

"এতো আপনারই ছেলে।" বললেন মুহাম্মদের মা। এ..তো মুহাম্মদ।

"না না। আমাদের মুহাম্মদ এতো বড় হবে কি করে? এই তো সেদিন আমি ওকে এতটুকু রেখে গেলাম।"

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘোড়া ঘুরিয়ে এপথেই ফিরে এলো। ঘোড়ার গতি দেখে মনে হচ্ছিল আরোহী থামবে না। কিন্তু মা ও তারপাশে একজন প্রবীণকে দাঁড়ানো দেখে হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নীচে নেমে এলো। সে চেহারা দেখেই বুঝে নিলো ইনিই তার সম্মানিত চাচা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সে দৌড়ে গিয়ে হাজ্জাজকে সালাম করল।

হাজ্জাজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ঘোড়াটা বেশ ভালো। অবশ্য আরোহী এর চেয়েও ভালো।"

চাচার মুখে প্রশংসাবাণী শুনে মুহাম্মদ বলল, "ঘোড়ার গতি আপনাকে দেখানোর জন্যই আমি আগে থামাইনি। আমি আগেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।"

আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি। এই বলে হাজ্জাজ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"এখন তোমার ছেলে বড় হয়েছে বোন।" মুহাম্মদের মাকে বললেন, হাজ্জাজ। একে আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি।"

"একথা শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মায়ের চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগল। তখনো মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স আঠারোতে পৌঁছেনি। তার কাছে ছেলে এখনো শিশু বৈ-কি। মায়ের চোখে শিশু হলেও মুহাম্মদ অন্য কিশোরদের চেয়ে স্বাস্থ্য-চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ষোল, সতের বছর বয়সের মুহাম্মদকে দেখলে মনে হয় পরিপূর্ণ এক যুবক।

"প্রিয় বোন! জানি মুহাম্মদের বিরহ তোমার জন্য খুবই কষ্টকর। কিন্তু বুক বেঁধে তোমাকে এ আমানত জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে। মুহাম্মদ তোমার ছেলে হলেও সে ইসলামের খেদমতের জন্যে যাচ্ছে, সে শুধু তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে না, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিজেকে নিবেদন করবে। সে এমন এক পিতার সন্তান যাকে পিতার পথ ধরে জাতির সেবায় অবশ্যই নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পিতার অবস্থানকে ডিঙিয়ে তাঁকে আরো বহু দূর অগ্রসর হতে হবে, তাঁকে হতে হবে মুসলিম

বিশ্বের জন্য প্রোজ্জ্বল তারকা। যে তারকার আলোয় পথ দেখবে পথহারা মুসলিম জাতি।

"জী ভাইজান! আমিও এমন স্বপ্ন দেখি।" বললেন মুহাম্মদের রত্নগর্ভা মা। আমি সন্তান পেটে ধারণ করার সময় থেকে এ আশাই পোষণ করছি। নিজেকে এজন্য তৈরী করে রেখেছি, একদিন আমার বুকের ধন আমার কোল থেকে আকাশের তারকার মতো দুনিয়া জুড়ে দ্যুতি ছড়াবে।"

"আমি ওকে বসরা নিয়ে যাচ্ছি।" বললেন হাজ্জাজ। সাধারণ সৈনিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ সে রপ্ত করেছে বটে; কিন্তু তাঁকে আরো উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তাঁকে এখন প্রশাসনিক কাজে যোগ দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ কৌশলের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিখতে হবে প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন। রণাঙ্গনে গিয়ে রপ্ত করতে হবে যুদ্ধের বাস্তব জ্ঞান। এজন্য ওকে আমি সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখায় ভর্তি করে দেবো।"

হাজ্জাজের প্রশাসনিক সদর দফতর ছিল বসরায়। তার বাসস্থান ছিল একটি রাজপ্রাসাদের মতো। হাজ্জাজের ঔরষজাত সন্তান বলতে ছিল মাত্র একটি মেয়ে। তার নাম যুবায়দা। হাজ্জাজ যখন নিজ গ্রাম তায়েফে বেড়াতে গেলেন, তখন তার একমাত্র মেয়ে বসরায়। তখন সে পূর্ণ কিশোরী। এক রাতে যুবায়দার কক্ষের জানালায় বাইরে থেকে হাল্কা টোকা মারার শব্দ হলো। যুবায়দা বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ ছিল। তাই সামান্য আওয়াজেই বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালো সে। জানালা খুলে বাইরে উঁকি দিলো। জানালা দিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য দু'পা জানালায় রেখে নিজের শরীরের ভার বাইরে অপেক্ষমাণ দু'টি হাতের ওপর ছেড়ে দিলো যুবায়দা।

"এখান থেকে চলো বেরিয়ে যাই সুলায়মান! দরজা ভিতর থেকে আটকানো। জানালাটি বন্ধ করে দাও।" বলল যুবায়দা।

সুলায়মান জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে যুবায়দার হাত ধরে প্রাসাদোপম বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়ল।

খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ছোট ভাই সুলায়মান। আঠারো বছরের টগবগে যুবক সে। হাজ্জাজ তনয়া যুবায়দা সুলায়মানের হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে। যুবায়দার বয়সও ষোল বা সতের। শৈশবে একই পাঠশালায় লেখাপড়া করেছে। বেড়ে উঠেছে পাশাপাশি। শৈশবের সোনা ঝরা দিনগুলো তাদের কেটেছে একসাথে খেলাধুলা করে। কিছুটা বড় হওয়ার পর ওদের

মধ্যে দেখা সাক্ষাত কমে যায়। অবাধ মেলামেশার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। দেখা সাক্ষাতে বদনাম হওয়ার আশঙ্কা তেমন ছিল না। শাহী খান্দানের রীতিটাই এমন ছিল। শাহী খান্দানের লোকজনদের নৈতিকতা নিয়ে কথা বলার প্রতি সাধারণদের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না। তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত অবাধ মেলামেশার বড় বাধা ছিল সামাজিক ও পারিবারিক রীতি। তারচেয়েও যুবায়দার জন্য বড় সমস্যা ছিল পিতা হাজ্জাজ। কারণ স্বভাবের দিক থেকে হাজ্জাজ ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে কঠোর ও নির্মম ছিলেন তা যুবায়দাকেও প্রভাবিত করেছিল।

"এখানে লুকিয়ে ছাপিয়ে আমরা আর কতো দিন লুকোচুরি খেলব চাঁদ!" যুবায়দার উদ্দেশে বলল সুলায়মান। আবেগের আতিশয্যে যুবায়দাকে চাঁদ বলে ডাকে সে। আমি ভাইকে বলব যাতে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।"

"তোমার ভাই হয়তো এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন; কিন্তু আমি জানিনা, আমার আব্বা এ বিয়েতে সম্মতি দেবেন কি-না!" বলল যুবায়দা।

"কেন সে কি আমীরুল মুমেনীনের ভাইয়ের কাছেও তার মেয়ে তুলে দিতে রাজি হবে না?" সুলায়মান জিজ্ঞাসু স্বরে বলল।

"তুমি কি তার স্বভাবের কথা জানো না? তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেন। খলিফার প্রভাবে তিনি কখনও প্রভাবিত হননি।"

"তিনি যদি তোমার বিয়ের জন্যে অপর কোন লোক ঠিক করেন তাহলে তুমি কি করবে?" যুবায়দাকে জিজ্ঞেস করলো সুলায়মান।

"তার হুকুম বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেব।"

"আমীরুল মুমেনীনের ভাইয়ের বউ না হতে পারার জন্যে তোমার কি কোন আফসোস হবে না? আমার বউ হয়ে তুমি যে গর্ব করতে পারবে, আর কারো বউ হলে কি তুমি এতোটা গর্বিতা হবে?"

"সুলায়মান! শৈশব থেকেই তুমি আর আমি এক সাথে বড় হয়েছি। ছোট্ট বেলা থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে, তখন তুমি আমীরের পুত্র ছিলে। শাহজাদা হিসাবে আমি তোমাকে ভালোবাসিনি। তোমাকে আমার ভালো লাগে তাই। তুমি যদি কোন ভিখারীর ছেলেও হতে, তবুও তোমাকে আমার ভালো লাগতো। তখন হয়তো তুমি একথা ভাবতে না, আমি কার মেয়ে।"

"একথা আমি এখনও ভাবি না যে, আমি শাহজাদা আর তুমি গভর্নরের মেয়ে।"

"তা হয়তো মনে করো না, তবে নিশ্চয়ই একথা ভাবো যে, তুমি আমীরুল মুমেনীনের ভাই। হয়তো এটাও মনে করতে পারো, তোমার এই মর্যাদা ও সম্মানের জন্য আমার গর্ব করা উচিত।"

"একথা শুনে রাখো সুলায়মান! আমি এমন পুরুষকে নিয়েই গর্ববোধ করবো, যার মধ্যে আমার প্রতি টান থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। সে এমনটি কখনো ভাববে না, কেমন বাবার পুত্র সে, আর আমি কেমন পিতার মেয়ে।"

"আজ তুমি এভাবে কথা বলছ কেন চাঁদ!" বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে আফসোসের স্বরে বলল সুলায়মান, আজকের মতো এমন একটি আনন্দঘন রাতে তুমি এভাবে কথা বলছো কেন?"

"আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না সুলায়মান! তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে এভাবে রাতের আঁধারে আমি তোমার সাথে ঘরের বাইরে বের হতাম না। দেখো তুমি কি আন্দাজ করতে পারো আমি কী ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছি! ভিতর থেকে দরজার খিল এঁটে আমি জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি...। আজ আমি তোমাকে একথা বলতে এসেছি যে, এখন আর আমি ছোট্ট নই, আর...সুলায়মান! এ মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। যে কোন মুহূর্তে আমার কারো না কারো বউ হতে হবে। তুমি জানো আমাদের রীতিনীতি!"

"আমাদের রীতি তো এটাই যে, আমরা যদি কাউকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করে ফেলি। আর যে খলিফা হয় সে একাধিক বউ রাখে।"

"আমি এই রীতিনীতির কথা বলছি না" বলল যুবায়দা। আমি মুসলমানদের সামরিক রীতিনীতির কথা বলছি। যারা রোম পারস্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে ইসলামের সীমানা কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা দেখো। মুসলমানরা পরস্পর বিরোধ বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। কোন জায়গায় দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, কোথাও অসন্তোষ, কোথাও ষড়যন্ত্র। এর ফলে পরাজিত রোমানদের তরবারী আমাদের মাথার ওপরে ঝুলছে। তুমি কি একথা জানো না, রোমানদের সাথে আমাদের যে শান্তিচুক্তি করতে হয়েছে, তাতে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হয়েছে। খুবই মোটা অংকের টাকা দিয়ে আমাদের শান্তি খরিদ করতে হয়েছে। টাকার বিনিময়ে শান্তি চুক্তি করে আমরা একথাই প্রমাণ করেছি যে, দ্বীন ও মিল্লাতের

হেফাযত ও দেশের সীমানা রক্ষার ক্ষমতা এখন আর আমাদের নেই। আমরা খুবই দুর্বল অক্ষম হয়ে গেছি।"

সুলায়মান যুবায়দার এসব কথায় অস্থির হয়ে বলল, আহা চাঁদ! তুমি এমন মনোরম রাত আর আবেগকে গলাটিপে মেরে ফেলছো। হায়! এমন চাঁদনী রাতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর রাতটি আর আমার ভালোবাসার স্বপ্নগুলোকে নিরস, বিষাদময় কথাবার্তার বিবর্ণ চাদরে ঢেকে দিচ্ছো। তুমি কি বলতে চাচ্ছো, যেসব কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ, এসব আমি মোটেও জানি না? তোমার কি একথা জানা নেই যে, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর খেলাফতের মসনদে আমাকেই বসতে হবে?"

"আমি চলে যাচ্ছি...বসা থেকে উঠতে উঠতে বলল যুবায়দা। আমাকে এখন চলে যেতে হবে। মা যদি টের পেয়ে যায়... ।"

"তিনি তো তার ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। বলল সুলায়মান। কি হয়ে গেল তোমার? সুলায়মানও বসা থেকে উঠতে উঠতে বলল। এর আগে তুমি কখনও এমনটি করনি।"

যুবায়দা দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। সুলায়মানও ওর পিছু পিছু রওয়ানা হলো।

"কি ব্যাপার! তুমি কি আমার ভালোবাসাকে ভেঙেচুরে চলে যাচ্ছ?"

"না সুলায়মান! দাঁড়িয়ে বলল যুবায়দা। আমি তোমার ভালোবাসাকে অপমান করছি না। আমি বিয়ের কথা বলছি, আমাকে ভাবতে দাও সুলায়মান! আমাকে ভাবতে দাও। কথা বলতে বলতে জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে ঘরে প্রবেশ করলো যুবায়দা।

কয়েক দিন পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তায়েফ থেকে বসরায় ফিরে আসলেন। তার বাহন মহলে প্রবেশ করতেই যুবায়দা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঘোড়ার গাড়ি থেকে হাজ্জাজ নেমে এলেই পিতাকে জড়িয়ে ধরলো যুবায়দা। পিতাও পরম আদরে আদুরে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। যুবায়দার চেহারা ছিল ঘোড়ার গাড়ির দিকে। সে দেখলো, গাড়ি থেকে দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের এক অচেনা কিশোর বেরিয়ে এলো। পৌরুষদীপ্ত, আকর্ষণীয় কিশোরের চেহারা।

যুবায়দা একেবারে লেপ্টে ছিল পিতার বুকের সাথে। অচেনা কিশোরের দিকে নজর পড়তেই তার বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। কিশোরের প্রতি আটকে গেল তার দৃষ্টি।

"সামনে এসো মুহাম্মদ!" নাম ধরে কিশোরকে আহ্বান করলেন হাজ্জাজ। যুবায়দাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার মেয়ে যুবায়দা। যুবায়দা! এ তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মদ। তুমি একে আর দেখনি। এই আমার ভাইয়ের একমাত্র সন্তান। সে আমাদের সাথে কিছুদিন থাকবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম, চাচা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মহলে দিন কাটাতে লাগলো। যুবায়দা খুব গভীরভাবে মুহাম্মদের চলাফেরা দেখতো, মাঝেমধ্যে টুকিটাকি কথাও বলতো। চাচাতো ভাইয়ের সাথে টুকটাক কথা বললেও যুবায়দা স্বভাবজাত লজ্জা ও পর্দা কখনো লঙ্ঘন করেনি।

এক বিকেলে মহলের বাগানে পায়চারী করছিল মুহাম্মদ। বাগানের একটি জায়গা খুবই ভালো লাগল তাঁর কাছে। পাশাপাশি দু'টি ঘন গাছের ঘন ডালপালায় ঝোঁপের মতো হয়ে উঠেছে। গাছ দু'টি ছিল ফুলধারী। বসন্তের মৌসুম থাকায় ঘন ঝোঁপ সদৃশ্য গাছের ডালপালাগুলো ফুলে ফুলে অপরূপ সাজে সজ্জিত.। ফুলের সমারোহে ছাউনীর মতো গাছের ঝোঁপের নীচে মুগ্ধ মনে বসে পড়লো মুহাম্মদ। দৃশ্যটি তাঁর মন কেড়ে নিলো।

দূর থেকে যুবায়দা মুহাম্মদ এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। ফুলের ঝোঁপের মধ্যে বসতে দেখে যুবায়দাও পায়চারী করতে করতে মুহাম্মদের কাছে চলে এলো।

যুবায়দা কাছে এসে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবতা ভেঙে বলল, এখানে একাকী বসে কি ভাবছো মুহাম্মদ ভাইয়া!

"ফুলে ফুলে সাজানো জায়গাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এজন্য একটু বসলাম।"

"আমিও কি তোমার পাশে বসবো?"

"চমকে উঠলো মুহাম্মদ। বলল, না না!"

"কেন?"

"এটা ভালো দেখাবে না। কেউ দেখলে কিংবা চাচার চোখে পড়লে ব্যাপারটি ভালো দেখাবে না। আমি ভাই একাকী তোমার পাশে বসে থাকতে পারবো না।"

"চুপি চুপি আমিও তোমার সাথে বসতে চাই না মুহাম্মদ ভাইয়া!" কথাটি বলেই চিন্তায় হারিয়ে গেল যুবায়দা।

"পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো যুবায়দা! সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় কোন যুবক যুবতী নিরিবিলি জায়গায় পাশপাশি অবস্থান করা

মোটেও ঠিক নয়...। তুমিও কি আমার মতো হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এসেছো, নাকি আমাকে দেখে ইচ্ছা করেই এসেছো?"

"তোমাকে তো আমি প্রতিদিনই দেখি। একাকী হাঁটতে ভয় ভয় লাগছিল এজন্য...। আচ্ছা, মুহাম্মদ ভাইয়া! একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। আমার এখানে আসায় তুমি কি বিরক্ত হয়েছ? তোমার কাছে কি আমার আসাটা খুবই বিরক্তি সৃষ্টি করেছে? আমাকে কি তোমার কাছে খারাপ লাগে?"

"শোন যুবায়দা! তোমার এখানে আসা অবশ্যই আমার কাছে ভালো লাগেনি। তবে এর সাথে তোমাকে খারাপ লাগার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমার চোখ ও তোমার মুচকি হাসি দেখেই তোমার ভিতরের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। আমার মধ্যেও যে এমনটি নেই তা বলব না। ঝোঁপের ভিতরে বসা থেকে উঠে বেরিয়ে আসতে আসতে মুহাম্মদ বলল, এসো, আমরা মহলের দিকে এগুতে থাকি। যাতে কেউ দেখলেও এটা ভাবতে না পারে যে, আমরা নিরিবিলি বসে ছিলাম।"

"মুহাম্মদ ভাইয়া! তুমি এখন কি করবে?" পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল যুবায়দা।

"আমি আমার ইচ্ছা ও স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই। যেসব প্রশিক্ষণ আমি নিয়েছি এসব কলা-কৌশল আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না।"

"তুমি কি সেনাপতি হতে চাও?"

"আমি কোন পদ পদবীর প্রত্যাশা করি না। আমার মাথায় এখন একটাই চিন্তা, চোখের সামনে একটাই পথ, আমি ওই পথ ধরে চলতে চাই, যে পথ জীবন ও রক্তের বিনিময়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ তৈরী করে গেছেন। একটি পথ তৈরী হয়ে গেছে সে পথে হাজার কোটি মানুষ চলতে পারে। আর যারাই সে পথ অতিক্রম করে তারা কিছু না কিছু পদচিহ্ন তো রেখেই যায়। সে পথে গমনাগমনকারীরা পূর্ববর্তীদের পদচিহ্ন মুছে দিয়ে নতুন পদচিহ্ন তৈরী করে কিন্তু এমন কিছু চিহ্ন থাকে, যেগুলো কখনও মুছে ফেলা যায় না। পথভোলা পথিকরা সেই অক্ষুণ্ন পদচিহ্ন দেখে দেখে তাদের মনযিলে পৌঁছাতে পারে। আমিও সেইসব বীরপুরুষদের অমুছনীয় পদচিহ্ন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।"

"কারা সেইসব কৃতীপুরুষ?" জিজ্ঞেস করল যুবায়দা।

"খালিদ বিন ওয়ালিদ আমার সেই স্বপ্নপুরুষ।" জবাব দিলো মুহাম্মদ বিন কাসিম। বিন ওয়াক্কাস, আবু বকর, ওমরও আমার অনুস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। আমি

এসব মহাপুরুষদের মিশনকে আরো এগিয়ে নিতে চাই। আমি মুসলিম শাসনের সীমানা আরো দূর দারাজ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাই। আমি শুধু শুধু সেনাপতির তকমা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চাই না, আমি চাই আল্লাহর সৈনিক হয়ে জীবন কাটাতে।"

মুহাম্মদের কথা শুনতে শুনতে তার দৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী সংকল্প এবং পৌরুষদীপ্ত মন-মানসিকতার প্রভাবে নিজেকে স্বপ্নময় পুরুষের বিশালতায় হারিয়ে দিলো যুবায়দা। মুহাম্মদ বিন কাসিম এভাবে কথা বলছিল, মনে হয় যেন তাঁর কথাগুলো কোন তরুণের স্বপ্ন নয় অতি বাস্তব। সে কোন কল্পনা বিলাসে নিজেকে আপ্লুত করছে না, ইচ্ছা ও সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার মতো দৃঢ়চিত্ত ও প্রত্যয়ী সে।

"যুবায়দা! আমি আমার মায়ের দেখা স্বপ্নের বাস্তব প্রতীক। কিন্তু সেই স্বপেন্র এখনো বাস্তবতা পায়নি। আমাকে অবশ্যই সেই তারকা হতে হবে যে তারকার স্বপ্ন আম্মু দেখেছিলেন।"

দু'জন কথা বলতে বলতে মহলের প্রবেশ পথে এসে গেলে মুহাম্মদ নীরব হয়ে গেল এবং যুবায়দার উদ্দেশে বলল, "যুবায়দা! এখন তুমি তোমার পথে যাও। আমি একাকী মহলে প্রবেশ করবো।"

মুহাম্মদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল যুবায়দা। তার চোখে চোখ রেখে বলল, "মুহাম্মদ ভাইয়া! জানি না, হয়তো সেই শৈশব থেকে তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি। আবেগাপ্লুত ধরা গলায় বলল যুবায়দা। বলল, আমার মন চাচ্ছে তোমার সফরসঙ্গী হতে...। তুমি কি আমাকে সঙ্গে নেবে?"

"আল্লাহর যদি মর্জি থাকে তাতে আমার আপত্তি নেই।" একথা বলেই দ্রুত পায়ে মহলের পথে পা বাড়ালো মুহাম্মদ।

✪ ✪ ✪

বসন্তকাল। এ সময়ে দারুল খেলাফত তথা রাজধানীতে সেনাবাহিনীর বাৎসরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কুশলী যোদ্ধারা নানা ধরনের নৈপুণ্য, শৈল্পিক ও নান্দনিক যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করে। সামরিক ও বেসামরিক লোকজন এ কুচকাওয়াজ দেখার জন্য উদগ্রীব থাকে। অগণিত দর্শকের সমারোহে মুখরিত হয় ময়দান। খলিফা নিজে উপস্থিত থেকে কৃতী কুশলীবদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন। খেলাধুলার মধ্যে ঘোড়দৌড়, বর্শা, তরবারী, তীর ও মল্লযুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। খলিফা আব্দুল

মালিক বিন মারওয়ানের সময় প্রশাসন নানা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার কারণে বসন্তকালীন মহড়া অনুষ্ঠানের সুযোগ তেমন হয়নি। তিনি কঠোরভাবে সব ধরনের গোলযোগ দমন করায় তার ছেলে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময় কোন গোলযোগ ছিল না। এজন্য খলিফা প্রতি বছরের বসন্তে রাজধানীতে বিশাল আকারে সামরিক মহড়ার আয়োজন করতেন। এ উৎসবে এতো কঠিন প্রতিযোগিতা হতো যে, সামরিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগীর হাতে যদি কেউ মারাও যেত তবুও এতে কোন শাস্তি হতো না।

একদিন খলিফার বিশেষ দূত বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পয়গাম নিয়ে গেল, বাৎসরিক সামরিক উৎসবে যোগদান করার জন্যে তিনি যেন এক্ষুণি খলিফার সাথে দেখা করেন। তা ছাড়াও তার সাথে খলিফার জরুরী পরামর্শ রয়েছে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফার পয়গামে খুশী হলেন। খুশীর প্রধান কারণ তিনি ভাতিজা মুহাম্মদকে খলিফার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। খলিফার পয়গাম এ কাজটির জন্য সুবর্ণ সুযোগ বয়ে আনলো। বাৎসরিক সামরিক উৎসবটি তার জন্যে আরো সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি সামরিক প্রতিযোগিতায় মুহাম্মদকে অংশগ্রহণ করিয়ে খলিফা ও সেনাপতিদের এ বিষয়টি দেখিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, এতটুকু বয়সে তার ভাতিজা সমরবিদ্যায় কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি চাচ্ছিলেন পরিচয়ের শুরুতেই সবার চোখে মুহাম্মদকে তাঁর কৃতিত্বের মাধ্যমে একটা সম্মানজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

তিনি তখনই মুহাম্মদকে ডেকে বললেন, "মুহাম্মদ! তুমি তরবারী চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড়, ও মল্লযুদ্ধে কতটুকু পারদর্শী আমি জানি না। বসন্ত উৎসব একটা সুযোগ। আমি এ সুযোগটাকে কাজে লাগাতে তোমাকে সামরিক প্রতিযোগিতায় সম্পৃক্ত করতে চাই। আশা করি তুমি আমাকে লজ্জিত করবে না।"

"হার জিত আল্লাহর হাতে চাচাজান! আমি বড়াই করতে চাই না। তবে প্রতিযোগিতায় অবশ্যই অবতীর্ণ হবো।"

"তাহলে চলো। তুমি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।"

"কপাটের ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে যুবায়দা আবেদনের স্বরে বলল, এবারের প্রতিযোগিতায় আমিও যাবো আব্বু! আমাকে আপনি একবারও সামরিক প্রতিযোগিতা দেখাতে নিয়ে যাননি!"

একমাত্র কন্যার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না হাজ্জাজ। যুবায়দাকেও নিয়ে যেতে সম্মত হলেন।

বসরা থেকে রওয়ানা হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ ও যুবায়দাকে নিয়ে দারুল খেলাফত রাজধানীতে পৌঁছলেন। তিনি খলিফার সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"আল্লাহর কসম ইবনে কাসিম! তোমার বাবার অবদানকে আমাদের পরিবার কখনো বিস্মিত হবে না।" বললেন খলিফা ওয়ালিদ বিন মালিক। তিনি আমাদের খেলাফতের মর্যাদা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন বীর বাহাদুর, তেমনি ছিলেন বিশ্বস্ত। আশা করি তুমি তোমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলবে। ইবনে ইউসুফ! হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, আপনি কি আপনার ভাতিজাকে কারো মোকাবেলায় প্রতিযোগিতা করতে বলবেন?"

"এজন্যই তো ওকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসেছি আমীরুল মুমেনীন! আমিও দেখতে চাই সে কতটুকু উপযুক্ত হয়েছে!"

"সে যদি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমরা তাঁকে তাঁর পিতার পদেই বরণ করবো" বললেন খলিফা।

"হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন প্রধান প্রশাসক। তার পদমর্যাদা বর্তমানের গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী। হাজ্জাজকে বিশেষ সম্মানে শাহী মহলেই থাকার ব্যবস্থা করলেন খলিফা। মুহাম্মদ বিন কাসিমও চাচার সাথেই শাহী মেহমান হিসাবে থাকার সুযোগ পেলো। যুবায়দাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো অন্দর মহলে বেগমদের কাছে।

হাজ্জাজ যে মহলে অবস্থান করছিলেন, সেই মহলেই বসবাস করতো খলিফা ওয়ালিদের ছোট ভাই সুলায়মান। যুবায়দার শাহী মহলে আসার খবর শুনে সে ভীষণ খুশী হলো। সে তার একান্ত সেবিকাকে বলল, যুবায়দাকে ডেকে নিয়ে এসো। সুলায়মানের একান্ত সেবিকা এসে তাকে জানালো, যুবায়দা হাজ্জাজের ভাতিজা তার চাচাতো ভাইয়ের কক্ষে কথা বলছেন।"

"সে যেখানেই থাকুক তাকে নিয়ে এসো। তাকে গিয়ে বলো, সুলায়মান আপনাকে স্মরণ করছেন।"

সেবিকা যুবায়দার কাছ থেকে ফিরে এসে জানালো, সে এখন আসতে পারবে না।"

"কোথায় সে? কি করছে?" সেবিকাকে জিজ্ঞেস করল সুলায়মান।

"চীফ গভর্নরের ভাতিজার পাশে বসে হেসে হেসে কি যেন গল্প করছে।"

"হাজ্জাজের ভাতিজাও কি তোমার বলার পর কোন কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ, সে বলেছে, পুনর্বার যেন তার কক্ষে আমি না যাই।" সুলায়মানকে জানালো সেবিকা।

একথা শুনে রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো সুলায়মান।

✪ ✪ ✪

সেদিন বিকেলের ঘটনা। বিকেল বেলায় শাহী মহলের বাগানে পায়চারী করতে করতে যুবায়দা একটি ঘন ফুল বাগানে চলে গেল। বাহারী নানা ফুলের সমারোহে বাগানের এ অংশটিকে করে তুলেছে মোহনীয়। তাকে বাগানে পায়চারী করতে দেখে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে পিছন দিক থেকে এসে যুবায়দার দু'চোখ চেপে ধরলো সুলায়মান।

যুবায়দা হাতের ওপর হাত বুলিয়ে হেসে বলল, "হয়েছে আমি ঠিকই চিনে ফেলেছি মুহাম্মদ ভাইয়া!"

একথা শুনে শিথিল হয়ে এলো হাত। দ্রুত সরে গেল দূরে। যুবায়দা চকিতে পিছন ফিরে তাকালো।

বলল, "ওহ! সুলায়মান! আমি আশা করেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আসবে!"

"না, তুমি তো আশা করেছিলে বিন কাসিম আসবে! কিছুটা ক্রোধমাখা স্বরে বলল সুলায়মান। এই জন্যই তো তোমার মুখ থেকে ওর নামই বেরিয়েছে।

"হু, ওর নাম নেয়া কি অপরাধ?"

"তা জানি না, তবে কারো সাথে প্রতারণা করা নিশ্চয়ই অপরাধ! আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখো না যুবায়দা! বিন কাসিম ও আমার ব্যাপারে তোমার অবশ্যই চূড়ান্ত ফায়সালা করা উচিত। ফায়সালা ভেবে চিন্তে করা উচিত। কারণ আমি আগামী দিনের খলিফা আর বিন কাসিম হবে আমার অধীনস্ত একজন কর্মচারী মাত্র। আমি ইচ্ছা করলে তাকে সেনাপতি থেকে সিপাই বানাতে পারব, ইচ্ছা করলে ভিখারীতে পরিণত করতে পারব।...আচ্ছা...তুমি ওর মধ্যে এমন কি দেখেছ, যা আমার মধ্যে দেখতে পাওনি?"

"ওর ভালোবাসায় কোন খাদ নেই" বলল যুবায়দা। আমি ওকে সেনাপতি অবস্থায় যেমন ভালোবাসবো, সিপাহী হলেও তেমনি ভালোবাসবো। তাতে আমার ভালোবাসায় কোন ভাটা পড়বে না। তুমি যদি তাঁকে ভিখারীতে পরিণত করো, তবুও কারো কাছে ওকে হাত পাততে দেবো না। আমার ভালোবাসা পদমর্যাদা ও ক্ষমতার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।"

যুবায়দা নাগাল থেকে চলে আসার জন্যে এগুতে শুরু করলে সুলায়মান আগ বেড়ে ওকে ধরে ফেলল এবং যুবায়দার কাছে প্রেম ভিক্ষা করতে শুরু করল। শৈশবের স্মৃতি মন্থন করে অতীতের ভালো লাগা, এক সাথে খেলাধুলার কথা স্মরণ করাতে লাগল। যুবায়দা তার কাছ থেকে বারবার চলে আসতে চাচ্ছে আর ফিরে ফিরে সুলায়মান তার হাত ধরে আটকে রাখতে চাচ্ছে।

"সুলায়মান! ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো দূর থেকে।"

চকিতে সুলায়মান ও যুবায়দা তাকিয়ে দেখতে পেল ফুল গাছের আড়ালে হাজ্জাজ দাঁড়ানো।

"ভালো হয়েছে যে আমি নিজের চোখে দেখতে পেলাম। আরো ভালো হয়েছে, তুমি কি বলেছো, আর আমার মেয়ে কি বলেছে, তা আমি নিজের কানে শুনেছি।"

প্রিয় সুলায়মান! তোমার ধৃষ্টতাকে আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে করছি না। কারণ যৌবন আসলে একটা পাগলামী। কিন্তু তোমাকে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমার হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিতে পারি না। এ ব্যাপারে কি করবো, সেই সিদ্ধান্ত আমি নেবো, আমার মেয়ের কোন সিদ্ধান্ত এতে থাকবে না। তুমি জানো, তোমার সমবয়স্ক আমার একটি ভাতিজা আছে। ও আমার ভাইয়ের একমাত্র ছেলে...। আমার মেয়ে তারই বউ হবে।"

মাথা নীচু করে অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিল যুবায়দা। হাজ্জাজ যুবায়দার হাত ধরে সাথে নিয়ে বাগান থেকে চলে গেলেন। সুলায়মান ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পিতা-কন্যার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চেহারা তখন ক্ষোভে অপমানে বিবর্ণ হয়ে উঠল, মাথায় যেন শুরু হলো অগ্ন্যুৎপাত। টগবগিয়ে ফুটতে থাকল শরীরে রক্তকণিকা। সে ভেবে পাচ্ছিল না হাজ্জাজ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কাবু করে কিভাবে যুবায়দাকে কব্জা করবে!"

✪ ✪ ✪

দু'দিন পরের ঘটনা। সারা আরবের মানুষ যেনো জমা হয়েছে সামরিক উৎসবে। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে জমা হয়েছে। ময়দানে থাকার জন্য তাঁবু ফেলেছে দলে দলে। যেদিকেই চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সারা ময়দান ভরে গেছে তাঁবু, ঘোড়া আর উটে।

শহরের রাস্তা দিয়ে লোকের ভীড়ে পথ চলা দায়। বিশাল ময়দান। একদিক থেকে তাকালে অপর দিকের সীমানা খুঁটি দেখা যায় না। ময়দানের মাঝখানে বৃত্তাকারে চিহ্ন দেয়া। এ বৃত্তের বাইরে আগত লোকজন অবস্থান নিয়েছে। বৃত্তের এক পাশে সুদৃশ্য প্যান্ডেল। নানা রংয়ের জড়িদার ঝালর ও বাহারী শামিয়ানা লটকানো এক মঞ্চ। মঞ্চের মাঝখানে শাহী সিংহাসন। এর পাশে দামী দামী কুরছি। এসব কুরছিতে বসবে খলিফার বেগম সাহেবাগণ। তাদের ডানে বামে উজির, সেনাপতি ও খেলাফতের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। সেই সাথে বিভিন্ন কবিলা ও গোত্রের সর্দার ও গোত্রপতিদের বসার ব্যবস্থা।

সবার সামনে খলিফা ওয়ালিদ বিন মালিকের সিংহাসন। তার একপাশে প্রধান গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বসার আসন। হাজ্জাজের সাথেই তার একমাত্র কন্যা যুবায়দা উপবিষ্ট।

অগণিত দর্শক ময়দানের চারপাশে। কেউ বসা, কেউ দাঁড়ানো, কেউ নিজের বাহনের পিঠে আরোহী।

খলিফার ইঙ্গিতে প্রতিক্ষার প্রহর শেষে শুরু হলো সামরিক উৎসব। বাৎসরিক প্রতিযোগিতা। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিযোগিরা পালাক্রমে ময়দানে প্রবেশ করে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে অতিক্রম করছে। ঘোড়দৌড়, তরবারী চালনা, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা একের পর এক ঘটে চলছে। তরবারী প্রতিযোগিদের এক হাতে ছিল চামড়ার তৈরী ঢাল, অন্য হাতে তলোয়ার। এই খেলায় বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী মারাত্মকভাবে আহত হলো। সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল অশ্বারোহী যোদ্ধাদের প্রতিযোগিতা। প্রথমে অশ্বচালনায় বিভিন্ন নৈপুণ্য প্রদর্শনের পর আরোহীদের মধ্যে তরবারী চালনার প্রতিযোগিতা হলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম না ছিল প্যান্ডেলের অতিথিদের মধ্যে, না ছিল সাধারণ দর্শক সারিতে। সুলায়মানকেও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। দর্শনার্থীরা প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করতে আনন্দ ধ্বনিতে ময়দান মুখরিত করে রাখছিল। শোরগোল এতোটাই তীব্র ছিল যে, কারো কথাই শোনা

যাচ্ছিল না। ময়দানের ধাবমান ঘোড়া ও উটগুলো এতো ধুলোবালি উড়াচ্ছিল যে, ধুলোর অন্ধকারেই ওরা হারিয়ে যাচ্ছিল।

"এখন ময়দান খালি করে দাও, কেউ মাঠে থাকবে না।" হঠাৎ শাহী ঘোষকের কণ্ঠে শোনা গেল জলদগম্ভীর নির্দেশ।

কয়েকবার এ ঘোষণা দেয়ার পর মাঠ সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেল। উড়ন্ত ধুলোবালিও হ্রাস পেতে পেতে মাঠ পরিষ্কার হয়ে গেল। হঠাৎ মাঠের এক কোণ থেকে একটি তাজি ঘোড়া মাঠে প্রবেশ করলো। দেখলেই বোঝা যায় এটি সেনাবাহিনীর শাহী নিরাপত্তা ইউনিটের বিশেষ ঘোড়া। গলার নীচ থেকে লেজ পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠ মখমল কাপড়ে আবৃত। সুদৃশ্য ঝালর পেটের দিকে ঝুলছে। সোনালী বর্ণের ঝিকমিকে দু'টি পাদানী ঝুলছে অশ্বপিষ্ঠের দু'পাশে।

এ অশ্বপৃষ্ঠে বসা এক সুদর্শন যুবক। তার মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, হাতে বর্শা। কিন্তু বর্শার মাথা চামড়া দিয়ে আবৃত। কোমরে ঝুলছে তরবারী। মাঠে প্রবেশ করে অশ্বারোহী একটা চক্কর দিলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল আরোহী শাহী খান্দানের বৈ-কি?

আরোহী হাঁক দিলো– আছে কি তায়েফের কোন আরোহী যে আমার মোকাবেলা করার সাহস রাখে? আরোহী গলা ফাটিয়ে অজ্ঞাত প্রতিপক্ষের প্রতি হুমকি ছুড়ে দিলো।

এ অশ্বারোহী আর কেউ নয়, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ভাই শাহজাদা সুলায়মান। সে বিশেষ করে তায়েফের নাম উচ্চারণ করার দ্বারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান করছে।

শাহজাদার এই হুমকিমূলক আহ্বানে ময়দান জুড়ে নেমে এলো নীরবতা। ভবিতব্য দেখার জন্য সকল দর্শনার্থী উৎকর্ণ ও অপলক নেত্রে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় মাঠের এক কোণ থেকে প্রবেশ করলো এক অশ্বারোহী। এটিও সেনাবাহিনীর চৌকস সওয়ারী। এর আরোহীও যুবক। হাতে বর্শা আর কোমরে ঝুলন্ত তরবারী।

"ইবনে আব্দুল মালিক! তায়েফের কাসিম বিন ইউসুফের ছেলে তোমার মোকাবেলা করতে এসেছে।"

শাহজাদার হুমকির জবাবে পাল্টা হুমকি ছেড়ে দিলো যুবক। সারা ময়দান জুড়ে তখন পিনপতন নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর মাঠের দু'প্রান্ত থেকে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ শানিয়ে ঘোড়া হাঁকালো তারকা দুই প্রতিযোগী। উভয়েই পরস্পরের প্রতি বর্শা উদ্যত করলো। উভয়েই চাচ্ছিল বর্শার আঘাতে প্রতিপক্ষকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিতে। মুখোমুখি এসে সুলায়মান বর্শা দিয়ে বিন কাসিমকে আঘাত করলো। বিন কাসিম আঘাত সামলে নিয়ে দূরে গিয়ে আবার মুখোমুখি উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকালো। দর্শনার্থীদের কারো চোখের পলক পড়ছে না। সবাই খলিফার আপন ভাই সুলায়মানকে চিনতো, প্রতিপক্ষ যুবককে অধিকাংশ লোক চিনতে না পারলেও এ মোকাবেলা যে বিশেষ তাৎপর্যবহ তা বুঝতে কারো বাকি রইল না।

এক পর্যায়ে পা-দানীতে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম সুলায়মানের দিকে বর্শার আঘাত হানলো। সুলায়মান নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল বটে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। বর্শা তার পিঠে আঘাত হানলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বহু চেষ্টা করেও ঘোড়ার পিঠে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। বর্শা পিঠে আঘাত হানলেও বিদ্ধ হলো না। কারণ বর্শার মুখে চামড়ার খোল ছিল।

অভিজাত যুবকদ্বয়ের এ যুদ্ধ এতে শেষ হয়নি। সুলায়মান ঘোড়া থেকে নেমে পড়ায় বিন কাসিমও লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং উভয়েই কোষমুক্ত করলো তরবারী। এবার পরস্পরের মধ্যে শুরু হলো অসিযুদ্ধ। শুরু হলো যুবকদ্বয়ের প্রচণ্ড মোকাবেলা। তরবারীর ঝলকানি ও আঘাতের শব্দে সারা ময়দানে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। উভয়েই সমানে সমান। আঘাতের তীব্রতা দেখে দর্শকদের মনে হচ্ছিল হারজিত নয় একে অপরকে মৃত্যুঘাটে পৌঁছে না দিয়ে এদের কেউ ক্ষান্ত হবে না। সুলায়মান বিন কাসিমের উদ্দেশে বলল, "বিন কাসিম! পরাজয় মেনে নাও। নয়তো তুমি যদি পড়ে যাও, অথবা তোমার তরবারী যদি পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমি তোমার বুকে তলোয়ার বিদ্ধ করবো।"

সুলায়মান ছিল আবেগ তাড়িত। সে যুবায়দাকে পাওয়ার জন্য খেলাচ্ছলে বিন কাসিমকে হত্যা করতেই উদ্যত ছিল। সুলায়মানের হুমকিতে মুহাম্মদ বিন কাসিম জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করলো না।

হঠাৎ মুহাম্মদ বিন কাসিম সুলায়মানের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করে তুলল। সুলায়মান তখন প্রতিঘাতের বিপরীতে আঘাত সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সুলায়মানের বেকাবু অবস্থা। মুহাম্মদ বিন

কাসিম সুলায়মানকে প্রতিঘাত করার কোন সুযোগই দিচ্ছিল না। এক পর্যায়ে এমন এক শক্ত আঘাত হানলো বিন কাসিম সুলায়মান আঘাত ফেরাতে সক্ষম হলো বটে; কিন্তু তরবারী তার হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লো। সে তরবারীর দিকে দৌড় দিলো বটে কিন্তু বিন কাসিম তাকে আর সেই সুযোগ দিলো না।

সুলায়মান তখন খালি হাত। বিন কাসিম দু'টি আঘাত করতেই ও পিছাতে পিছাতে পড়ে গেল। মুহাম্মদ বিন কাসিম তার একটি পা বুকের উপর রেখে তরবারী সুলায়মানের ঘাড়ে চেপে ধরলো।

মঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন হাজ্জাজ—"মুহাম্মদ তরবারী উঠিয়ে নাও।"

"ঠিক আছে আমি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিলাম।" দৃঢ় কণ্ঠে বলল বিন কাসিম। বনী ছাকিফের কসম করে বলছি— জীবনে আর কোনদিন তুমি তায়েফবাসীদের আত্মসম্মানে আঘাত করবে না।"

"আমি জীবিত থাকলে তোর মতো হতভাগ্য আর কেউ দুনিয়াতে হবে না।" জমিন থেকে উঠতে উঠতে বলল সুলায়মান।

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের এ কথাগুলো কোন পরাজিতের আস্ফালন ছিল না। এ কথাগুলো ছিল তার জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞাই শেষ পর্যন্ত ভারতের বিজয় ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিল।

পর্ব দুই

৭০০ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৮১ হিজরী সন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স তখন মাত্র সতের বছর। সিন্ধু অঞ্চলে দাহির নামের এক কট্টর হিন্দু রাজা মসনদে আসীন হলো। তখন সিন্ধু অববাহিকা ছিল দু'টি রাজ্যে বিভক্ত। এক অংশের রাজধানী ছিল আরুঢ় অনেকে বলত আলোড়। আর অপর অংশের রাজধানী ছিল ব্রাহ্মণাবাদ। ব্রাহ্মণাবাদের রাজার নামই ছিল রাজ। ক্ষমতা দখলের এক বছরের মাথায় সে মারা গেল। রাজের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণাবাদের মসনদ অপর অংশের রাজা দাহিরের এক জ্ঞাতি ভাই দখল করে নেয়। এতে রাজা দাহির খুব খুশী হয় এই ভেবে যে, তারই এক জ্ঞাতি ভাই সিন্ধু অঞ্চলের অপর অংশের ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

রাজা দাহির মসনদ দখল করার তিন চার বছর পরের ঘটনা। রাজা দাহিরের রাণী মায়ারাণী হরিণ শিকার করতে গেল। তখন সিন্ধু অববাহিকা যেমন ছিল ঘন জঙ্গলাপূর্ণ; তদ্রূপ জংলী পশু পাখিতে ছিল ভরা। তখনকার রাজা-রাণীদের হরিণ শিকার ছিল একটি আভিজাত্যের প্রতীক। ছুটন্ত হরিণের পিছে তাজি ঘোড়া হাঁকিয়ে বিষাক্ত তীর ছুড়ে হরিণকে ঘায়েল করা ছিল শাসকদের একটি অন্যতম খেলা। এ কাজে বেশীর ভাগ পুরুষরা অংশ নিলেও কোন কোন রাজ বংশের সাহসী মেয়েরাও রীতিমতো বন্যপ্রাণী শিকার করত।

তাদের শিকার কাজে সহযোগিতা করতো অনুগত ভৃত্য ও দেহরক্ষী সৈন্যসান্ত্রী।

মাত্র এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে রাণীর। বয়স উনিশ কিংবা বিশের বেশী নয়। মায়ারাণী ছিল খুবই সুন্দরী, সেই সাথে শিকার প্রেমী। বংশগতভাবে মায়ারাণী রাজবংশের মেয়ে হওয়ায় অশ্বারোহণ ও তীর নিক্ষেপে পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সেদিন সে দু'টি ঘোড়া ও দু'চাকার রথ নিয়ে শিকার করতে বের হলো। রথচালক ছিল শাহী নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য। সে

যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে বহনকারী ঘোড়ার গাড়ি চালাতো। যদ্দরুন ঘোড়ার গাড়ি চালনায় তার পারদর্শিতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য।

শিকারের জায়গায় পৌছেই চার পাঁচটি হরিণ চোখে পড়লো রাণীর। মায়ার নির্দেশে রথচালক ঘোড়া দৌড়িয়ে দিলো। শিকারীর তাড়া খেয়ে হরিণ উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। পলায়নরত হরিণের পিছনে ঘোড়ার গাড়িও ছুটতে লাগলো তীরবেগে। কিছুদূর গিয়ে হরিণগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এদের একটির পিছনে ছুটতে লাগলো মায়ারাণী। শাহী আস্তাবলের প্রশিক্ষিত ঘোড়াও দৌড়াতে লাগলো হরিণের পিছু পিছু। দৌড়াতে দৌড়াতে এমন জায়গায় এসে গেল যে, জমিন কোথাও পাথুরে টিলাময় আবার কোথাও বালুময়। হরিণ জীবন বাঁচাতে এমন জোরে জোরে লম্ফ দিচ্ছিল যে, এক একটি লাফে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরত্ব অতিক্রম করত। এমতাবস্থায় মায়ারাণী চার-পাঁচটি তীর নিক্ষেপ করেছিল কিন্তু কোনটিই লক্ষভেদ করতে পারেনি। হরিণের ডানে বামে গিয়ে পড়েছে মায়ারাণীর ছোড়া তীর। এমন সময় হরিণ দৌড়ে পৌছে যায় টিলা ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায়। নাগালের বাইরে চলে যায় হরিণ। তবুও দ্রুত হাঁকাতে শুরু করলো রথচালক ঘোড়ার গাড়ি। উঁচু নীচু জমিনে আঘাত লেগে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে যাওয়ার উপক্রম। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়েছে মায়া।

হরিণ টিলার ফাঁকে ফাঁকে নীচু দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। আর আঁকাবাঁকা পথে এগুচ্ছিল। রাণী এরপরও হরিণের পিছু ছাড়লো না। হরিণ যেদিকে মোড় নিতো মায়ার ঘোড়ার গাড়িও সেদিকে ঘুরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে উল্টে যাওয়ার উপক্রম হত। এমতাবস্থায় আবারো তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো মায়া। কিন্তু কোনটিই হরিণকে স্পর্শ করল না। এ সময় সামনে ঘন টিলাময় জায়গা এসে গেল। হঠাৎ একটি টিলার ওপাশ থেকে এক অশ্বারোহী বেরিয়ে এলো। আরোহীর হাতে বর্শা। আরোহী তার ঘোড়া ধাবমান হরিণের পিছনে ছুটালো। মায়ারাণীর গাড়িও ততক্ষণে খোলা জায়গায় এসে গেছে। মায়ারাণীর রথচালক হরিণের পিছু ধাবমান অশ্বারোহীকে চিৎকার করে বলল, সামনে থেকে সরে যাও! এটা মহারাণীর শিকার। কিন্তু অশ্বারোহীর কানে রথচালকের চিৎকার প্রবেশ করেছে বলে মনে হলো না। সে যথারীতি হরিণের পিছনে ছুটতে লাগল।

"মহারাণী! তীর ধনুক আমার হাতে দিন! হরিণের আগে আমি এই বেকুবকেই খতম করে ফেলব।" বলল রথচালক।

"মনে হচ্ছে, অশ্বারোহী আমাদের দেশের নয়।" বলল মায়ারাণী।

এমন সময় হরিণ একটু ঘুরে দৌড়াতে লাগলো, অশ্বারোহীও ঘুরে গেল সেদিকে। এখন স্পষ্টই অশ্বারোহীর চেহারা দেখা গেল।

"দেখে মনে হচ্ছে এ কোন আরব।" বলল রথচালক। বুঝতে পারছি না, এদিকে আসার সাহস ও কিভাবে পেল! রথ তখনো আগের মতোই এগুচ্ছিল। মায়ারাণী আবারো কয়েকটি তীর ছুড়ল কিন্তু পূর্ববৎ এগুলোও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। এমন সময় অশ্বারোহী পাদানীর ওপর দাঁড়িয়ে তার হাতের বর্শাটি হরিণের দিকে নিক্ষেপ করলে নিক্ষিপ্ত বর্শা গিয়ে পড়ল হরিণের কাঁধে। বর্শা বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটি লাফ দিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অশ্বারোহী লুটিয়ে পড়া হরিণের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এদিকে ধাবমান মায়ার ঘোড়ার গাড়িও ততোক্ষণে পড়ে থাকা হরিণের পাশে গিয়ে থেমে গেল।

অশ্বারোহী মায়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিল। রথচালক অশ্বারোহীর প্রতি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"তুমি সেইসব আরবদের কেউ যাদেরকে মহারাজা আশ্রয় দিয়েছেন? স্বদেশী ভাষায়ই জিজ্ঞেস করল রথচালক। তুমি কি জানো না, কি অপরাধ করেছো? মহারাণী ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমার গাড়ির পিছনে বেঁধে ঘোড়া দৌড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। তুমি আরব হয়েও এতোটা বেকুব ও বেআদব হলে কি করে?"

"না, আমি মহারাজের আশ্রিত আরবদের কেউ নই। তাছাড়া আমি কোন বেআদবীও করিনি, বেকুবও নই।"

"আরে! তুমি আমাদের ভাষাও জানো! আশ্চর্যান্বিত কণ্ঠে বলল রথচালক।

✪ ✪ ✪

"মায়ারাণীর রাগান্বিত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সে রাগান্বিত হলো না। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে মায়া গিয়ে দাঁড়াল অশ্বারোহীর সামনে। গভীরভাবে তাকালো আরোহীর চোখের দিকে।

অজ্ঞাত আরব অশ্বারোহীর বয়স ছিল ত্রিশের কোঠায়। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রং, একহারা শরীরের গড়ন। শক্ত গাঁথুনী শরীরের। গাঢ় কালো চোখের তারায় হাসির ঝিলিক। চেহারার মধ্যে এক ধরনের মায়া মায়া ভাব। প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বর ছাপ আরোহীর চেহারায়। মায়া যুবকের দিকে তাকিয়ে তার

সম্মোহনীতে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। আরব যুবকের মুচকি হাসি মায়ারাণীর প্রতি যেন এক ধরনের বিদ্রূপ করছিল।

এমন সময় অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে সেদিকে দৌড়ে এলো ছয়জন অশ্বারোহী। এরা ছিল মায়ারাণীর নিরাপত্তারক্ষী।

"সংগ্রাম, নিরাপত্তা রক্ষীদের আমার কাছে আসতে দিয়ো না। ওদেরকে দূরেই থামিয়ে দাও। আর তুমিও রথ নিয়ে যাও। এর ভাগ্যের ফায়সালা আমি একাকীই করব।"

চালক রথ নিয়ে চলে গেল এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের দূরেই থামিয়ে দিলো।

"এখানে কেন এসেছ?" আরোহীকে জিজ্ঞেস করল মায়ারাণী। হরিণ শিকারের জন্যে এসেছিলে? আমার অনুমতি ছাড়া তো তুমি হরিণ নিয়ে যেতে পারবে না।"

"এটা যদি আমি নিজের জন্যে শিকার করতাম, তাহলে মরে যাওয়ার আগেই আমি সেটিকে জবাই করতাম। আমি এটিকে তোমাদের জন্যই শিকার করেছি। আমি জানি তোমরা মরা জীবজন্তু খেয়ে থাকো।"

"আমাদের জন্য তুমি কেন শিকার করলে? তুমি কি আমাকে নারী মনে করে ভেবেছিলে আমি এটিকে শিকার করতে পারবো না?" জিজ্ঞেস করল মায়া। তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করেছ? না আমাকে এর পিছনে আসতে দেখোনি?"

"আমি তোমাকে নারী হিসেবে দেখেছি ঠিক, কিন্তু শিকারের ব্যাপারে তোমাকে আমি আনাড়ী মনে করিনি। আমি এ টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি যখন থেকে হরিণের পিছু নিয়েছ, তখন থেকেই আমি তোমাকে দেখছি বারবার তুমি হরিণের দিকে তীর নিক্ষেপ করছ, কিন্তু রথ এদিক সেদিক হওয়ার কারণে তোমার ছোড়া তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদিকে হরিণটিও বাঁচার জন্যে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। এদিকের মাটি অসমতল হওয়ার কারণে তোমার রথ যেভাবে হেলে যাচ্ছিল এবং হোচট খাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল রথ না আবার উল্টে যায়। এজন্য আমি ভাবলাম তোমার জন্য হরিণটি শিকার করে দেবো, যাতে তোমার ঝুঁকির আশঙ্কায় পড়তে না হয়।"

সুদর্শন আরব যুবক বলে যাচ্ছিল স্মিত হাস্যে।

মায়ারাণী মন্ত্রমুগ্ধের মতো যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন যুবক তাকে যাদু করে ফেলেছে। তার মুখ থেকে কোন কথাই আর বের করতে পারল না।

"তুমি কি জানতে আমি কে?" ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রাণী।"

"না আমি জানতাম না যে তুমি রাজা দাহিরের স্ত্রী। তোমার ঘোড়ার গাড়ি ও পিছনের নিরাপত্তা রক্ষীদের দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি শাহী খান্দানের কেউ হবে।"

"এখনতো জানলে? এখন কি আমাকে তোমার ভয় হচ্ছে না?"

"না, ভয় করছি না। তোমাদের এখানে ভয় করার অর্থ এক রকম, আর আমাদের দেশে ভয় এর অর্থ অন্যরকম।

আমরা শুধু আল্লাহ্‌কেই ভয় করি। আমরা মুসলমান। আমাদের দেশে কোন রাজা মহারাজা নেই। সেখানে কেউ রাজা-বাদশাহ্‌ হয় না।"

"তুমি এখানে কেন এসেছিলে?" যুবককে জিজ্ঞেস করলো মায়ারাণী।

"আমি একটি অপরাধ করে এসেছি। এখন যদি সেই অপরাধের কথা তোমাকে বলি, সেটি হবে আরেকটি অপরাধ। অবশ্য তোমাকে একথা বলতে পারি, আমি এখানে কোন অপরাধ করতে আসিনি। আশ্রয় নিতে এসেছি।"

মায়ারাণী রথচালককে ইশারায় আহ্বান করলো। রথচালক দৌড়ে এলো। রথচালক এলে মায়া বললো, হরিণের গা থেকে বর্শাটা খুলে এখানেই রেখে দাও, আর হরিণটি গাড়িতে করে নিয়ে যাও। রথচালক রাণীর নির্দেশ পালন করে যখন যেতে লাগল, তখন আবার ডাকলো মায়ারাণী। রাণী এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, কোন আশঙ্কা নেই সংগ্রাম। আমি এর কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করছি। এ লোক আমাদের কাজে আসতে পারে। তোমরা একটু দূরে চলে যাও।"

"মহারাণী! আপনার যে জ্ঞান আছে তাতে আমার কিছু বলার নেই। আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না। একটু সতর্ক থাকবেন।"

"তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। যাও। এ লোক আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

চলে গেল রথচালক। রাণীর নিরাপত্তা রক্ষীরাও আরো দূরে সরে গেল। রাণী পুনর্বার আরব যুবকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

✪ ✪ ✪

"তুমি কি নিজের সম্পর্কে আমাকে আর কিছু বলবে না?" আরব যুবককে জিজ্ঞেস করলো মায়া।

"নিজের সম্পর্কে আর কিছু বলার আগে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"ঠিক আছে, যা জিজ্ঞেস করার তা করো।"

"আমি তোমাদের দেশ সম্পর্কে জানি। এদেশের রাজা বা রাণী সাধারণ মানুষের সাথে এভাবে কথা বলে না, যেভাবে তুমি আমার সাথে বলছ। তোমাদের এখানে তো মানুষ মানুষের দেবতায় পরিণত হয়েছে।"

"আমি তোমাকে সাধারণ কোন ব্যক্তি মনে করছি না।" বলল মায়ারাণী। আমার মনে হয় তুমি কোন শাহী খান্দানের লোক। আচ্ছা, তুমি আমাদের ভাষা শিখলে কোত্থেকে?" তুমি কি আমাদের দেশ সম্পর্কে আরো বিশেষ কিছু জানো?"

রাণী কিছুক্ষণ নীরব থেকে আরব যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সাথে আমার কঠোর স্বরে কথা বলার কোন দরকার নেই, কারণ আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, এ মুহূর্তে তুমি আমার নিরাপত্তা রক্ষীদের বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছো। আমি তোমাকে আরব গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করছি। তুমি কি আমার সন্দেহ নিরসন করতে পারবে?"

"না, তোমার এ সন্দেহ নিরসন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমি তোমাকে সন্দেহাতীতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি আমি কারো গোয়েন্দা নই। আমার নাম বেলাল বিন উসমান। আমি আমার খেলাফতের বিদ্রোহী। আমি জানতে পেরেছিলাম এখানে আরবের অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে, এদের সবাই ছিল বিদ্রোহী।"

"হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।" বলল মায়ারাণী। আমরা হাজার হাজার বিদ্রোহী আরবকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি ওদের কাছে যাওনি কেন?"

"আমার কাছে তাদের কোন ঠিকানা নেই। তাছাড়া আমি একা নই, আমার সাথে আরো চারজন রয়েছে। আমরা চার পাঁচ দিন যাবত এখানে লুকিয়ে রয়েছি। আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে রাজা পর্যন্ত আশ্রয়ের জন্যে যাওয়া যাবে। তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমাদের ভাষা আমি কি করে শিখেছি। ছোট্ট বেলায় আমি আমার পিতার সাথে এদেশে এসেছিলাম এবং ছিলাম প্রায় পাঁচ ছয় বছর। তখনই আমি তোমাদের দেশের ভাষা শিখেছি।"

"তুমি কি তখন সিন্ধু অঞ্চলে থাকতে?"

"না, আমি প্রথমে গিয়েছিলাম সরন্দ্বীপে। তুমি কি জানো, ওখানে অনেক আগে থেকেই মুসলমানরা বসবাস করে?"

"হ্যাঁ, একথা আমি জানি। আমি জানি অনেকদিন আগে থেকেই আরব বণিকরা যাতায়াত করত। এদের অনেকেই সেখানে বসতি গড়ে তোলে। আমি একথাও জানি যে, মালাবারে যেসব মুসলমানরা বসবাস করে, তারা ইসলামও প্রচার করে। তারা এ অঞ্চলের অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে মুসলমানও বানিয়েছে।"

"আমার পিতাও একজন ধর্মপ্রচারক। অবশ্য তিনি ব্যবসাও করতেন। আমি সেই সুবাদে পিতার সাথে এদেশে এসেছিলাম। আব্বার সাথে আমি হিন্দুস্তানের বহু জায়গায় গিয়েছি। তখনই আমি এদেশের ভাষা শিখেছি। আমার পিতা আমাকে একজন ধর্ম প্রচারক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার। আব্বু তখন আমার আগ্রহের কথা বিবেচনা করে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য অভিজ্ঞ উস্তাদের কাছে পাঠান। আমি বড় হওয়ার পর তিনি আমাকে আরব দেশে পাঠিয়ে দেন। আমি খলিফার সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম কিন্তু কিছুদিন পর সেনাবাহিনী ও খেলাফতের মধ্যে দেখা দিল বিরোধ। যেসব সেনা সদস্য ও নাগরিক তৎকালীন খলিফার বিরোধী ছিল তারা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। কিন্তু খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেল এবং বিদ্রোহীরা গ্রেফতার ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতে লাগল। এখানকার রাজা যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তারা সেই খলিফা বিদ্রোহী আরব। আমি যেহেতু বিদ্রোহীরই সন্তান, তাই আমাকেও পালাতে হলো।"

"আরব বিদ্রোহীরা এদেশে এসেছিল সে তো অনেক আগের কথা, কিন্তু এতোদিন পরে তোমাকে কেন আসতে হলো?" জিজ্ঞেস করল মায়া।

"আমি আসলে ওইসব বিদ্রোহীদের কেউ নই, যাদের বিরুদ্ধে প্রথম ধরপাকড় হয়েছিল— বলল বেলাল। বিদ্রোহের সময় আমিও বিদ্রোহীদের সাথে ছিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে আমি ভাবলাম, পরস্পর যুদ্ধ করা মোটেও ঠিক নয়। এই বোধ থেকে আমি তৎকালীন খেলাফতের বিশ্বস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সংখ্যা এখনো সেদেশে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করার কারণে আমি ওদের শত্রুতে পরিণত হই, খেলাফতের পক্ষে চলে যাওয়ার কারণে বিদ্রোহীরা আমাকে হত্যার হুমকি দেয়। এদিকে বিদ্রোহীদের সঙ্গ দেয়ার জন্যে খেলাফতের মধ্যে

অনেকেই আমাকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। ঘরে বাইরে আমি শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ি, সেখানে আমার বেঁচে থাকাটাই মুশকিল হয়ে পড়ে। এ কারণে চার সাথীকে নিয়ে আমি দেশ ত্যাগ করে চলে আসি।

এখনও আমি সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে রয়েছি। আমি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। কখনও মনে হয় বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করাই হবে আমার কর্তব্য।"

বেলালের কথা শুনতে শুনতে মায়ারাণীর চেহারার রং বদলে যেতে লাগলো। কোন কিশোরী প্রেমে পড়লে প্রেমিকের সংস্পর্শে গেলে চেহারার যে অবস্থা হয় মায়ারাণীর চেহারাও তদ্রূপ। প্রেমিকা যেমন প্রত্যাশ্যা করে প্রেমিক সারা জীবন তার সামনে বসে থাকুক, আর কথা বলুক, মায়ার অবস্থাও হলো তাই।

"তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো?" রাণীকে জিজ্ঞেস করল বেলাল। তোমাদের দুর্গে আমার কোন একটা চাকুরী হলেই হলো। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একটা নিরাপদ আশ্রয়। একটা নিশ্চিন্ত ঠিকানা পেলে আমি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারতাম আমি ভুল পথে আছি কি-না?"

"আমি তোমাদের জন্য একটা কিছু করবো।" বলল রাণী।

তুমি কি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারবে? জিজ্ঞেস করল মায়া। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে আর একবার দেখা হওয়া উচিত।"

"তুমি যেখানকার কথা বলবে, আমি সেখানেই চলে আসব।" বলল বেলাল।

মায়ারাণী বেলালকে রাজা দাহিরের দুর্গের পার্শ্ববর্তী একটি জায়গার কথা বলল। আগামীকাল অমুক সময় তুমি সেখানে থাকবে, আমি তোমার কাছে আসব।" এই বলে মায়া চলে গেল।

"বেলাল মায়ার কাছ থেকে বিদায় হয়ে একটি উঁচু টিলার ওপর তার চার সঙ্গীর কাছে চলে গেল। বেলাল সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বলল, রাজা দাহিরের কাছে পৌঁছানোর জন্যে ক'দিন যাবত যে চেষ্টা করছিলাম, ঘটনাক্রমে আজ সে ব্যবস্থা আল্লাহ্ করে দিয়েছেন। বেলালের জন্য এভাবে মায়ার মুখোমুখি হওয়া যদিও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তবুও ঝুঁকি নিয়েছিল বেলাল। কিন্তু মায়ারাণী তার কথায় এতোটা প্রভাবিত হয়ে যাবে তা ছিল আশাতীত।

✪ ✪ ✪

সিন্ধু অঞ্চলে দেশ ত্যাগী পাঁচ আরব মুসলমানের উপস্থিতি কোন আশ্চর্য ঘটনা ছিল না। কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্মের বহু পূর্বেই আরবের বহু মুসলমান ভারত ভূখণ্ডে পৌছে গিয়েছিলেন। অনেকেই ভারতের ভুখণ্ডে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সর্বপ্রথম মুসলমানরা মালাবার অঞ্চলে আসেন। অবশ্য ইসলামের আগে থেকেই আরব বণিকদের এ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ছিল। যেসব মুসলমান মালাবার অঞ্চলে এসেছিলেন, তারা ছিলেন মূলত নৌচালক ও বণিক। মুসলমানরা এখানে আসার সময় ভারতে বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃস্টান ও ইহুদি এই চার ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ ছিল পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু।

ইতিহাস সাক্ষী দেয় রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায়ই ইসলাম ভারতের মালাবার অঞ্চলে পৌছে গিয়েছিল। হেরা গুহার অন্ধকারে যে আলোক রশ্মি উদিত হয়েছিল, তা আরব বণিকদের মাধ্যমে উপমহাদেশের মালাবার অঞ্চলে রাসূলে আরাবী সা.-এর জীবদ্দশাতেই পৌছে গিয়েছিল। আরব বণিকদের হাতে বহু ভারতীয় ইসলাম ধর্মেও দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মালাবারের অদূরেই ছিল সরন্দ্বীপ যা বর্তমানে শ্রীলঙ্কা নামে পরিচিত। মুসলমান বণিকরা যখন জাহাজে করে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে এ অঞ্চলে আসতো, তারা শুধু পণ্যই নিয়ে আসত না, সাথে নিয়ে আসত ইসলামের পবিত্র আলো। মুসলমান বণিকদের সাথে যখন শ্রীলংকা ও মালাবারের লোকদের সখ্যতা গড়ে উঠলো, তখন তারা মুসলমানদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সততায় আকৃষ্ট হলো। পরে যখন তারা ইসলামের তাবলীগ শুরু করলেন, তখন তাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সততায় মুগ্ধ হয়ে বহু লোক ইসলামে দীক্ষা নিল।

ভারতের লোকজন যখন দেখল ইসলামে কোন রাজা প্রজার বিভেদ নেই, মানুষ হিসাবে সবাই সমান। সবাই এক আল্লাহর বান্দা। আরব মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তৎকালীন শ্রীলঙ্কার উপকূল ও মালাবারের রাজাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এমন কি মালাবারের রাজা যামুরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর রাসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য হিজাযে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু আরব উপকূলে সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ ডুবে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত যামুরানকে ইয়েমেনের তীরে দাফন করা হয়।

হযরত ওমর রা.-এর খেলাফতের সময় সেনাপতি উসমান বিন আবু আস বোম্বাই এর নিকটবর্তী থানা বন্দর আক্রমণ করেছিলেন। তার আক্রমণের

উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশে যেসব আরব বণিকের জাহাজ যাতায়াত করে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বন্দর কব্জায় রাখা।

এটিই ছিল ভারতে মুসলমানদের প্রথম অভিযান। অভিযান সফল হয়। কিন্তু এ অভিযানে আমীরুল মুমেনীনের অনুমোদন ছিল না বলে বন্দরের কব্জা বহাল রাখা হয়নি। ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন-সেনাপতি উসমান বিন আবু আস যখন মালে গনীমতের অংশ মদিনায় প্রেরণ করেন তখন ভারত অভিযানের সংবাদে হযরত ওমর সেনাপতি বরাবর অনুমতি ছাড়া অভিযান পরিচালনার জন্যে কঠোর পয়গাম পাঠান।

হযরত ওমর লিখেন—

"ভাই উসমান! তোমার এ অভিযান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তুমি যে পরিমাণ সৈন্যবল নিয়ে অভিযান পরিচালনা করলে, এরা তো একটি কীটের চেয়ে বেশী ছিল না, যে কীটকে তুমি একটি কাষ্ঠখণ্ডে বসিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলে। তুমি এতোদূরে গিয়ে অভিযান পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে যদি বিপদে ফেঁসে যেতে, তাহলে আমার পক্ষে তোমাকে কোন সহযোগিতা করার উপায় ছিল না। আর যদি সেখানে সৈন্য ক্ষয় করে আসতে, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তোমার কবিলা থেকে এতো সংখ্যক লোক সেনাবাহিনীতে নিয়ে নিতাম।"

এর কিছুদিন পর আমীরুল মুমিনীনের অনুমতিক্রমে উসমান বিন আবু আস সিন্ধু অঞ্চলে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। সেই অভিযানে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করেন। এক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সেনাপতি উসমান নিজে, আর অপর অংশের নেতৃত্ব তাঁর ভাই মুগীরাকে দেন। উসমানের এ বাহিনী সামুদ্রিক জাহাজে করে ডাভেল অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলে অভিযান চালায়।

সে সময় ডাভেলের রাজা ছিল চচন্দ। ডাভেলে সামা নামের এক বীর পুরুষ ছিল রাজা চচন্দ এর সেনাপতি। সে দুর্গের বাইরে সেনাবাহিনীকে নিয়ে এসে মুগীরার বিপরীতে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবুও মুগীরা শত্রু পক্ষের পেটে ঢুকে সামাকে হুমকি দিলেন। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের সেনাপতিদ্বয় মুখোমুখি হয়ে গেল। মুগীরা 'আল্লাহু আকবার' বলে তকবীর দিয়ে সামার ওপর হামলে পড়লেন। সামা আহত হলো, কিন্তু সে প্রতিপক্ষকে এমন আঘাত করল যে, মুগীরার পক্ষে সেই আঘাত সামলানো সম্ভব হলো না। মারাত্মক আহতাবস্থায় শাহাদাত বরণ করলেন মুগীরা রা.।

অবশেষে বিজয়ী হলো মুসলিম বাহিনী। কিন্তু সেই বিজয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল খুব বেশী। শেষ পর্যন্ত নানা কারণে সেখানে আর মুসলমানরা কব্জা বহাল রাখেনি।

এ ঘটনার ছয় বছর পর সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রবিয়া ইরান জয় করেন। ইরান জয়ের পর তিনি সিস্তান আক্রমণ করেন। সিস্তানের শাসক মিরখান হাতিয়ার ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করেন। সিস্তান দখল হওয়ার পর সেনাপতি আব্দুল্লাহ সেনাপতি তামিম তাগলিবীকে মাকরান অভিযানে প্রেরণ করেন। তখন মাকরানের শাসক ছিল রাজা রাসেল। রাসেল সিন্ধের রাজা চচন্দের সাহায্য প্রার্থনা করলে চচন্দ রাসেলের সাহায্যে বিরাট সেনাবাহিনী পাঠালো। উভয় সেনাবাহিনী একত্রিত হলে মুসলিম বাহিনীর বিপরীতে হিন্দুদের সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল, তবুও মুসলমানরাই বিজয়ী হলেন। মাকরান মুসলমানদের কব্জায় নীত হলো।

অবশ্য এর আগেও একবার হযরত ওমর রা.-এর খেলাফত কালে ইরাকের শাসক আবু মূসা আশআরী রবিয়া বিন যিয়াদ নামের একজন সেনাপতিকে মাকরান অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন মাকরান তাঁদের অধীনে এসেছিল। কিন্তু বিজয়ের পর মুসলিম সেনাবাহিনীকে কব্জা ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

সেই অভিযানে অর্জিত মালে গনীমতের অংশ ভিন্ন করে বাইতুল মাল মদিনায় প্রেরণ করলে সরকারী অংশ মদিনায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অভিজ্ঞ সেনানায়ক শিহাব আবদীকে।

বাইতুল মালের অংশ নিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমরের কাছে সমর্পণ করলে তিনি বললেন—

"আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের বিজয়কে মোবারক করুন।" তোমাদের ওপর আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন। আচ্ছা শিহাব! আমাকে বলো তো মাকরানের অবস্থান কিরূপ? ওখানকার ভৌগোলিক অবস্থা কেমন?"

"আমীরুল মুমিনীন! বলল শিহাব। মাকরানের জমিন খুবই শুষ্ক। সেখানে কোন ফল ফুল জন্মে না। দু'চারটি ফলজ বৃক্ষে যা ফল পাওয়া যায়, সেগুলো খাওয়ার অযোগ্য। ওখানকার অধিবাসীরা লুটতরাজে অভ্যস্ত। একজন অপরজনকে লুট করেই এরা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই অপরজনকে খুন করে। আমরা যদি সেখানে অল্পসংখ্যক সেনাবাহিনী মোতায়েন করি, তাহলে তাদের ওরা লুটতরাজ করে নিঃশেষ

করে দেবে, আর যদি বেশী পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করা হয়, তাহলে খাদ্যাভাবে মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"

"আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন।" শিহাব আবদীর কথার প্রেক্ষিতে বললেন হযরত ওমর রা.। তুমি তো কাব্য করছ, ওখানকার প্রকৃত অবস্থা আমাকে বলো।"

"আমীরুল মুমিনীন! আমি যা দেখেছি, হুবহু তাই আপনার কাছে ব্যক্ত করলাম। আল্লাহর কসম! আমি কেন; যেই সেখানে যাবে সে একথাই বলবে। সত্যকে ও বাস্তবতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না আমীরুল মুমিনীন!"

"না, শিহাব আবদী। তোমার ধারণা ঠিক নয়।" বললেন ওমর। ইসলামের সৈনিকদেরকে ক্ষুৎ-পিপাসা কখনো মেরে ফেলতে পারে না। কায়সার ও কিসরাকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্যকারী মুজাহিদদের বেলায় একথা বলা যায় না যে, তারা ঘুমিয়ে থাকবে আর ডাকাতেরা সহায় সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। তাদের বেলায় একথাও বলা হবে অপমানকর যে, তারা ক্ষুধা পিপাসায় ধুকে ধুকে মারা যাবে।"

একথা বলার পর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. মাকরান থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর মাকরানের কিছু অংশ কব্জায় রেখে বাকী অংশ ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনী সেখান থেকে ফিরে আসে।

✪ ✪ ✪

মহাভারতে মুসলমানদের অভিযান শুধু মাকরানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ওমর ফারুকের শাহাদাতের পর হযরত উসমানের সময়ও মহাভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের বিজয়াভিযান অব্যাহত ছিল। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আলী রা.-এর খেলাফত কালেও যথারীতি তা অব্যাহত থাকে। তখন মুসলমানরা ক্বিলাত পর্যন্ত অগ্রাভিযান চালিয়েছিলেন। হযরত আলী রা.-এর শাহাদাতের পর খেলাফত বনী উমাইয়াদের হাতে চলে যায়। বনী উমাইয়ার শাসনামলেও মহাভারতের পশ্চিমাঞ্চল মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতেই দেখা দেয় গোলযোগ। ক্ষমতার লোভ খেলাফতের মধ্যে সৃষ্টি করে অস্থিরতা। সত্য আর মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘাত। যারা ছিলেন হক এর পক্ষে তাদের বলা হয় বিদ্রোহী। এতে করে খেলাফত দু'ভাগে বিভক্ত

হয়ে পড়ে। দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় বিজয়ী সেনাবাহিনী। জুলুম ও অত্যাচারের যুগ শুরু হয়ে যায়। শাসকদের মধ্যে জুলুম অত্যাচারে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। ক্ষমতালোভীরা ইসলামের পতাকা ও তাকবীরকে দ্বীনের পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করেন।

উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে তিনি কঠোর হস্তে সকল ধরনের বিদ্রোহ দমন করেন এবং উমাইয়া শাসনকে পাকাপোক্ত করেন। সেই বিদ্রোহের সময় অন্তত পাঁচশ প্রথম শ্রেণির যোদ্ধা আরবভূমি ত্যাগ করে মহাভারতের এক অংশের পৌত্তলিক শাসক রাজা দাহিরের আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজা দাহির দেশত্যাগী এসব মুসলমানদেরকে মাকরান অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। দাহিরের আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন আলাফী বংশের। এ গোত্র যুদ্ধবাজ হিসাবে ছিল বিখ্যাত।

বিলাল বিন উসমানও বিদ্রোহজনিত কারণে চারজন সঙ্গী নিয়ে দাহিরের কাছে আশ্রয়ের আশায় ভারতের মাটিতে পৌছে। কিন্তু এলাকা অপরিচিত থাকা এবং রাজা পর্যন্ত পৌছানোর কোন মাধ্যম না পাওয়ার কারণে তারা ঠিকানাহীন ঘুরে ফিরছিল। বিলাল এ কথাও জানতো যে, বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে রাজা দাহির খেলাফতের সাথে শত্রুতা তৈরী করেছে। তাছাড়া দাহিরের পিতা মাকরান অভিযানে মুলমানদের প্রতিপক্ষ রাজা চচন্দকে সামরিক সহযোগিতা করাও ছিল শত্রুতার অন্য কারণ। এজন্য বেলাল ভয় করছিল রাজা দাহির তাদের গ্রেফতার করে কয়েদখানায় বন্দি করতে পারে।

✪ ✪ ✪

দুর্গ থেকে কিছুটা দূরের একটি জায়গায় পরদিন মায়ারাণী বেলালকে সাক্ষাত করতে বলেছিল। পরদিন বেলাল যখন মায়ারাণীর সাথে সাক্ষাত করতে যাবে, তখন তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিলো। রাতে এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিস্তর কথাবার্তা হলো। বেলালের সঙ্গীরা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল, মায়া তোমাকে ধোঁকা দিতে পারে, তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। বেলালের মনেও এ আশঙ্কা ছিল। কারণ মায়া তাকে বলেছিল, তোমাকে আমার গোয়েন্দা মনে হয়। বেলাল সাথীদের এ কথা বলার পর সাথীরা তাকে মায়ারাণীর সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে জোরালো বাঁধা দেয়। কিন্তু বেলালের মনে দৃঢ় আস্থা জন্মে মায়া তাকে গ্রেফতার করবে না, তার সাথে প্রতারণা করবে না।

"তোমরা কি করবে? সবাইকে আমার সাথে দেখলে মায়া আমার সাথে সাক্ষাত করবে না। তা ছাড়া ওর মনে যদি কোন দূরভিসন্ধি থাকে তাহলে একসাথে গেলে সবারই গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরচেয়ে বরং এটাই ভালো হবে, তোমরা এখানে থাকো, আমাকে ঝুঁকি নিতে দাও। তাতে গ্রেফতার হলে আমি একাই হবো। যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ফিরে না আসি, তাহলে বুঝবে আমি কোন বিপদে পড়ে গেছি, তোমরা তখন এখান থেকে পালিয়ে যাবে।"

বেলালের পরামর্শ সঙ্গীরা মানতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিলো সবাই যাবে। তবে বেলাল যাবে অশ্বারোহণ করে, যাতে কোন বিপদের আশঙ্কা দেখলে পালাতে পারে। আর তার সাথীরা বেলাল ও মায়ার সাক্ষাত স্থল থেকে দূরে লুকিয়ে থাকবে। কোন বিপদ দেখলে তারা বেলালের সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে হাতে বর্শা নিয়ে রওয়ানা হলো বেলাল। মায়ারাণী যে জায়গায় তাকে সাক্ষাত করতে বলেছিল, জায়গাটি তাদের অবস্থান স্থল থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে। কিভাবে যাবে কখন যাবে সবই মায়া বেলালকে বলে দিয়েছিল।

✪ ✪ ✪

টিলা, পাহাড়ী উপত্যকা ও গিরিখাদ পেরিয়ে বেলাল যখন খোলা জায়গায় পৌছলো, তখন বেলালের চোখে পড়লো ঘন সবুজ একটি ময়দান। ঘন উঁচু ঘাসে ভরা জায়গাটি, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। মাঝে মধ্যে কিছু গাছও রয়েছে। গাছগুলো খুবই তরতাজা, সবুজ পত্রপল্লব ও ফলফুলে ভরা। বেলাল এই ঘন ঘাসপূর্ণ মাঠ পেরিয়ে যখন সামনে অগ্রসর হলো, তখন দেখতে পেল একজন অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছে। কালো বর্ণের ঘোড়াটিকে দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় শাহী আস্তাবলের বিশেষ ঘোড়া সেটি।

দূর থেকেই বেলালের বুঝতে অসুবিধা হলো না, অশ্বারোহী কোন পুরুষ নয়, নারী। কিন্তু বেলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। বেলাল পাকা যোদ্ধা। মায়ারাণীর দেহ সৌন্দর্যে নিজেকে মোটেও আকৃষ্ট করেনি বেলাল। সে জানে নারী সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে হিন্দুস্তানের হিন্দুরা নারীকে শত্রুদের ঘায়েল করতে ব্যবহার করে এ ব্যাপারটি সে পূর্বেই অবগত ছিল। সে তার ঘোড়াকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলো, উড়ে চললো ঘোড়া। কিন্তু মায়ার দিকে

নয়। মায়া যে জায়গার কথা বলেছিল বেলাল চললো সেদিকে। রাণী পৌঁছার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় বেলাল পৌঁছে গেল। জায়গাটি খুবই সুন্দর। চতুর্দিকে ছোট বড় গাছপালা। থোকা থোকা লতাগুল্মে জংলী ফুলের সমারোহ। বিশাল ময়দানের মাঝখানে একটি ছোট ঝিলের মতো। স্বচ্ছ স্ফটিক পানির মধ্যে শাপলা, পদ্মফুল ফুটে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গাছে গাছে অসংখ্য নাম না জানা পাখির কলকাকলী। অসংখ্য ঝোপ ঝাড়ের পিছনে দু'দশজন মানুষ লুকিয়ে থাকা কোন ব্যাপারই নয়।

বেলাল ঘোড়া দৌড়িয়ে পুরো এলাকাটি একটু দেখে নিল। সে বুঝতে চাইলো রাণীর কোন লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে কি-না। কিন্তু অশ্বখুরের শব্দে পাক পাখালীর ছুটাছুটি ছাড়া কোথাও কোন জনমানুষের চিহ্ন সে খুঁজে পেল না। গোটা এলাকাটি পর্যবেক্ষণ শেষ করে বেলাল ঝিলের পাড়ে পৌঁছলে মায়ারাণীকেও আসতে দেখা গেল। মায়া বেলালকে দেখেই এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে বেলালের প্রতি একটা মুচকি হাসি দিল। বেলালও ঘোড়া থেকে নেমে ধীরে ধীরে নির্মোহভাবেই মায়ার দিকে অগ্রসর হলো।

বেলাল কাছে পৌঁছলেই হঠাৎ করে মায়া বেলালের একটি হাত তার দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল এবং বেলালের হাতটি তার কাঁধে নিয়ে বেলালের শরীরের সাথে নিজের শরীর মিশিয়ে দিল। বেলালের পাঁজর তার পাঁজরকে স্পর্শ করছে। বেলাল নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মায়ার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল।

"নিজেকে সরিয়ে নিলে কেন? আমাকে কি তোমার ভালো লাগেনি?" বেলালকে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল মায়া। তুমি কি আমাকে এদেশের রাণী ভেবে ভয় পাচ্ছ? না, কোন ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি ভালো করেই বুঝতে পেরেছি, তুমি আরবের কোন বেদুঈন নও, তুমি কোন না কোন বাহাদুর সর্দারের ছেলে। আমি জানি, আরব দেশ থেকে পালিয়ে যারা এসেছে তারা সাধারণ নাগরিক নয়, সবাই ওখানকার নেতৃস্থানীয় লোক, নয়ত নেতৃস্থানীয় লোকজনের সন্তান। তুমি তাদের মতোই একজন।"

"আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি না রাণী। আমি এটা দেখে অবাক হচ্ছি যে, তুমি এদেশের রাণী হয়েও একাকী দুর্গের বাইরে এতোদূর এসেছো? না-কি তোমার দেহরক্ষীরা তোমার পিছনে পিছনে আসছে?"

"না, এখানে আমার কোন দেহরক্ষী আসবে না। আমি অন্য দশজন রাণীর মতো নই। অন্যসব রাণী তো প্রজাদের মধ্যে সমীহ সৃষ্টি করার জন্য বিশাল নিরাপত্তা প্রহরী বেষ্টিত হয়ে প্রাসাদের বাইরে বের হয়।"

"রাজা একাকী তোমাকে দুর্গের বাইরে বের হতে বাধা দেয়নি?"

"না। তুমি জেনে আশ্চার্যান্বিত হবে যে, মহা ভারতের কোন রাণী সাধারণত দুর্গের বাইরে যায় না, কিন্তু আমার ব্যাপারটি ভিন্ন।"

"এটা আবার কেমন ব্যাপার?"

"এটা পরে বলব। আমি আগে বুঝতে চাই, তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি কোন ভালোবাসার উদ্রেক হয়েছে কি-না। তোমার প্রতি ভালোবাসা-ই আমাকে একাকী এখানে টেনে এনেছে। আচ্ছা! তুমি কি আমাকে ভালোবাসার যোগ্য মনে করো না?"

"অবশ্যই যোগ্য মনে করি। কিন্তু সেই সাথে আরো অনেক কিছুই মনে করছি আমি। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার জন্য একটি মায়াবী ফাঁদ তৈরী করছ!"

"আমি জানতাম, আরবের লোকেরা না-কি আমাদের দেশের লোকদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী হয়। কিন্তু তোমার মধ্যে তো কোন বুদ্ধি বিবেক দেখছি না। তুমি এটা কি করে ভাবতে পারলে যে, আমাদের সেনাবাহিনী তোমাদের মতো পাঁচজন ভবঘুরেকে গ্রেফতার করতেও অক্ষম। তোমাকে যদি গ্রেফতার করারই ইচ্ছা থাকত, তাহলে রাতে কয়েকজন সেনা পাঠিয়ে দিলেই তো তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারত।"

"তুমি আমার মধ্যে ভালোবাসার কি দেখলে রাণী?" এদেশে কি আমার চেয়ে কোন ভালো মানুষ তুমি পাওনি?"

"বেলাল! আমি এদেশের রাণী। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমার চেয়েও আরো সুশ্রী সুন্দর টগবগে যুবক আমাকে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু ভালোবাসার কথা মুখে উচ্চারণ করার দুঃসাহস পাচ্ছে না। কারণ দেশের রাণীকে সাধারণ প্রজারা দেবীতুল্য মনে করে। রাণীকে সাধারণ প্রজারা পূঁজা করে...। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য বেলাল! এদেশের রাণী আজ তোমার মতো এক অজ্ঞাত বিদেশী যুবকের কাছে প্রেম নিবেদন করছে, ভালোবাসার ভিখারী সেজে একটু মমতা ভিক্ষা করছে। বেলাল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস পূর্বজন্মে অবশ্যই আমরা একসাথে ছিলাম।"

"মৃত্যুর পর মানুষ আবার দুনিয়ায় পুনর্জন্ম লাভ করে, এ বিশ্বাস আমার ধর্মে নেই।"

"ভালোবাসার মধ্যে ধর্ম বিশ্বাস টেনে এনে দেয়াল সৃষ্টি করোনা বেলাল। একটু সময় আমার পাশে বসো, আমার হৃদয় ভেঙে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো না।"

"নিজের একান্ত পাশে বেলালকে বসালো রাণী। বেলাল ছিল একজন সুদর্শন সাহসী যোদ্ধা। প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সুদর্শন যুবক। হিন্দুস্তানের যে কোন রাণীই এই যুবককে দেখলে আকৃষ্ট হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মায়ারাণীও ছিল রূপবতী, সুন্দরী। যে কোন যুবকের পক্ষে মায়ার রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। তাছাড়া মায়ার তীক্ষ্ণ ধী, প্রখর দৃষ্টি ও বাচনভঙ্গী যে কোন সুপুরুষকেই মায়ার বাঁধনে জড়ানোর জন্য যথেষ্ট। যে কোন যুবককেই প্রেমের বাঁধনে নিজের গোলামে পরিণত করার মতো গুণের অধিকারী ছিল মায়া।

✪ ✪ ✪

দীর্ঘ সময় একান্তে কাটিয়ে বেলাল ও রাণী যখন সবুজ শ্যামল নৈসর্গিক বেলাভূমি থেকে বেরিয়ে এলো, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। জঙ্গলের বৃক্ষগুলো বিকেলের আলোয় দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। বেলালের সঙ্গীরা দূরের একটি উঁচু জায়গায় বসে এদিকে দৃষ্টি রাখছিল। তারা ভাবছিল অবশ্যই দুর্গ থেকে সেনাবাহিনী এসে জায়গাটিকে ঘিরে ফেলবে এবং বেলালকে ধরে হত্যা করবে নয়তো গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলেও এমন কোন দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল না।

অনেকক্ষণ পর বেলাল যখন তার সঙ্গীদের কাছে এলো তখন সে নেশাগ্রস্তের মতো। সে এসে সঙ্গীদের সাথে এমনভাবে কথা বলছিল, দেখে তাকে নেশাগ্রস্তের মতো মনে হচ্ছিল। তার সঙ্গীরা তাকে যা জিজ্ঞেস করছিল সে জবাব দিচ্ছিল তার উল্টো। সে শুধু রাণীর প্রশংসা করছিল। সঙ্গীরা ওকে গালমন্দ করার পর চৈতন্যোদয় হলো।

"আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সবার জন্যই ঠিকানার ব্যবস্থা করতে পারবো।" বলল বেলাল। রাণী আমাদেরকে মর্যাদার সাথেই তার দুর্গে রাখবে। আগামীকাল আবার আসবে রাণী।

পরদিন আগের জায়গায় আবার রাণীর সাথে দেখা করতে গেল বেলাল। রাণী ও বেলাল পাশাপাশি এভাবে বসল যে, একজন অপরজনের মধ্যে হারিয়ে যাবে। রাণী ও বেলাল বৃক্ষশাখায় লীলারত কপোত কপোতির মতো একজন অপরজনের প্রেমে হারিয়ে যাচ্ছিল।

"এখনও কি তুমি আমাকে সন্দেহ কর?" বেলালকে জিজ্ঞেস করল রাণী। নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করো, এখনও কি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব?"

“এ সন্দেহ এখন আর আমার নেই। তবে আমি এ প্রশ্নের কোন জবাব পাচ্ছি না, তুমি এভাবে আমার সাথে প্রেম করে তোমার স্বামীকে কেন ধোঁকা দিচ্ছ? কেন তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছ?” সে এতো বিশাল রাজ্যের রাজা। তাছাড়া যতটুকু শুনেছি, সে একজন সুস্থ সবল মানুষ। দেখতেও বিশ্রী নয়। বয়স্কও নয়। তারপরও তুমি তাকে ভালোবাসার অযোগ্য মনে করছ কেন?”

“তাকে আমি ভালোবাসি না একথা ঠিক নয়। এতোটাই আমি তাকে ভালোবাসি যে, তার জন্য আমি আমার জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তার শরীরে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক তাও আমি সহ্য করতে পারি না”— বলে নীরব হয়ে গেল রাণী। দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে রাণী বেলালের উদ্দেশ্যে বলল, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না বেলাল! আমি তোমাকে এমন কথা শোনাব যা কখনো তুমি শোননি।

“বেলাল! রাজা দাহির আমার স্বামী বটে; কিন্তু আমি তার সহোদর বোন!”

একথা শুনে আঁৎকে উঠলো বেলাল। “বলো কি? এমনটি কি করে সম্ভব?”

“তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, আমি যা বলছি তাই সত্য। আমি রাজা দাহিরের সহোদর বোন, তবুও সে আমার স্বামী। অন্য দশটি হিন্দু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা যেভাবে হয়ে থাকে সে ধরনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই আমাদের বিয়ে হয়েছে। মন্দিরের বড় পণ্ডিতই আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়িয়েছে। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামী স্ত্রী কিন্তু শারীরিকভাবে ভাই-বোন। আমাদের কোন সন্তান হবে না। রাজা দাহির নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে আমাকেও জীবন্ত তার চিতায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।”

“এ বিয়ে কিভাবে সম্ভব হলো?” জিজ্ঞেস করল বেলাল। কেন তোমাদেরকে এমন বিয়ে করতে হলো?”

“তাহলে শোন বলছি, বলে মায়ারাণী রাজা দাহিরের সাথে তার বিয়ের কারণ সবিস্তারে জানাল।

✪ ✪ ✪

মায়া বেলালকে বিয়ের যে কাহিনী শোনালো তা ভারতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। পুরনো ইতিহাস ঘাটাঘাটি করলে এই বিয়ের সত্যতা পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দাহির সিন্ধু অঞ্চলে রাজা হওয়ার পর সারা দেশের প্রজাদের অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখে। সেই সাথে নিজ দেশের সীমান্ত এলাকা সম্পর্কেও সে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। কয়েক

মাসের পর্যবেক্ষণ শেষে রাজা দাহির যখন রাজধানী আরুরে ফিরে এলো তখন রাজধানীর প্রজারা তার গমন পথে ফুল বিছিয়ে দিলো এবং তার ওপর ছিটিয়ে দিলো ফুলের পাপড়ী। রাস্তার দু'পাশে নারী পুরুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজাকে রাজধানীতে স্বাগত জানাল।

রাজা দাহির রাজধানীবাসীর আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে সেদিনই বিকেলে রাজপ্রাসাদে সাধারণ সভা আহ্বান করল। তাতে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করল এবং অভ্যাগত সবাইকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করল। সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর শহরের বড় দুই পণ্ডিত তার কাছে গিয়ে তার খুবই প্রশংসা করল এবং রাজাকে দেবতার আসনে সমাসীন করল।

"আমরা মহারাজ ও মহারাজের বোন মায়াদেবীর ভাগ্য গণনা করিয়েছি- জ্যোতিষীদের হয়ে বলল এক ঋষি। মহারাজের ভবিষ্যত আমরা যা দেখেছি তাতে কোন অসুবিধা নেই, সব ঠিকই আছে তবে একটু...। মায়ার ভাগ্য গণনা করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি, যে ব্যক্তির সাথে মায়ার বিয়ে হবে সেই সিন্ধু অঞ্চলের রাজা হবে।"

"নিশ্চয়ই তা হবে আমার মৃত্যুর পর?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলল রাজা দাহির।

"না, মহারাজ! এবার এগিয়ে এসে বলল জ্যোতিষী। মহারাজের জীবদ্দশাতেই সে রাজা হবে।"

"কে হবে সেই রাজা? কোত্থেকে আসবে সে?" জিজ্ঞেস করল দাহির।

"এ বিষয়টি অস্পষ্ট মহারাজ! বলল জ্যোতিষী। ভাগ্য যেক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে জ্যোতিষী ও গণকরাও অক্ষম। তারাও কিছু বলতে পারে না।"

"অবশ্য এটা পরিষ্কার বোঝা যায় মহারাজ, মায়ার স্বামী বাইরে থেকে আসবে না, সে হবে স্থানীয়।" বলল অপর এক গণক।

"এমন তো নয়, যে আমার বোনের স্বামী হবে সেই আমাকে হত্যা করবে?" জানতে চাইলো রাজা।

"এ ব্যাপারটিও পরিষ্কার নয় মহারাজ! বলল প্রধান গণক। এটা পরিষ্কার যে-ই হবে মায়ার স্বামী সেই হবে সিন্ধু অঞ্চলের রাজা।"

"আমরা এটা কর্তব্য মনে করেছি মহারাজ! মহারাজের যে কোন সমস্যা সংকট সম্পর্কে আগে ভাগেই আপনাকে অবগত করান।" বলল প্রধান ঋষি। যাতে মহারাজ বিপদ আসার আগেই প্রতিকার ব্যবস্থা নিতে পারেন।"

রাজা দাহির পণ্ডিত ও গণকদের পেট থেকে একথা বের করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করল, বোনের বিয়ের পর তার ভাগ্যে কি ঘটবে। কিন্তু পণ্ডিত ও গণকরা এ ব্যাপারে তাকে স্পষ্ট কিছুই বলল না। পূর্বে দেয়া বক্তব্যের বাইরে আর কোন কথাই বলল না পণ্ডিত ও গণকদল। রাজা দাহির পণ্ডিত ও গণকদের কথা শতভাগ সত্য বলে বিশ্বাস করত। তাই চিন্তায় পড়ে গেল রাজা। রাজা দাহির ছিল কট্টর ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। গণক ও পণ্ডিতদের কথার বাইরে কোনকিছু চিন্তা তার দেমাগে মোটেও প্রবেশ করেনি।"

রাজাকে চিন্তার সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিল পণ্ডিত ও গণকদল। পণ্ডিত ও গণকদল চলে যাওয়ার সাথে সাথে রাজার স্বস্তি ও সুখ বিদায় নিল। আকাশ পাতাল চিন্তা করে রাতে একরতিও ঘুমাতে পারল না রাজা। অগত্যায় সে তলব করল তার প্রধান উজির বুদ্ধিমানকে।

"প্রধান উজির শুধু নামেই বুদ্ধিমান ছিল না। তার জ্ঞান বুদ্ধির ওপর রাজা দাহিরের ছিল অগাধ আস্থা। প্রকৃত পক্ষেও যে কোন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিমানের কোন জুড়ি ছিল না। রাজার নির্দেশ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো উজির। রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে নমস্কার ও কুর্নিশ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, এতো রাতে কেন অধমকে তলব করেছেন মহারাজ?"

রাজা দাহির উজির বুদ্ধিমানকে পণ্ডিত ও গণকদের সবকথা জানাল এবং বলল, "উজির! ব্যাপারটি তুমি গভীরভাবে চিন্তা করো তারপর আমাকে বলো, আমি কি করতে পারি?" অচিরেই আমার বোনের বিয়ে হচ্ছে। তাহলে কি আমি নিজে থেকেই এই রাজ্যপাট ভগ্নিপতিকে দিয়ে দেব? এতে অন্তত আমি বেঁচে থাকতে পারব—তাছাড়া আর কি করার আছে আমার?"

"মহারাজ! দেশের প্রজা, সেনাবাহিনী ও দেশের শাসনক্ষমতা থেকে স্বেচ্ছায় রাজার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মোটেও ঠিক হবে না। জগতের পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যেগুলো পাঁচটি জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরিণতি ভালো হয় না। রাজা রাজ্য ত্যাগ করলে, উজির উজারতি ছেড়ে দিলে, পীর মুরীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, শিশু মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, আর দাঁত মুখের পাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোনটারই কোন মূল্য থাকে না। আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন মহারাজ! আমি আপনাকে রাজ্যপাট ত্যাগ করার কথা কোন্ মুখে বলব!"

"আমি তোমার কাছে কোন ব্যাখ্যা চাচ্ছি না। আমি তোমার কাছে জানতে চাই এখন আমাকে কি করতে হবে?"

"মহারাজ! এমনটিই আপনাকে করতে হবে যেমনটি কোনদিন কেউ করেনি।" বলল উজির। মায়াকেই আপনি বিয়ে করে নিন এবং তাকে রাণী করে ফেলুন। তবে বিয়ে হলেও তার সাথে আপনার ভাই-বোনের সম্পর্কই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে, নয়তো তা হবে মহাপাপ। এতে রাজত্বে কোন ঝুঁকি থাকবে না।

"বুদ্ধিমান! তোমাকে ধন্যবাদ। বড় দামী পরামর্শ দিয়েছ তুমি, বলল রাজা। এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। কিন্তু এতে যে লোকজন খুবই সমালোচনা করবে। মানুষ আমার বদনাম করবে এবং নানা কল্পকাহিনী তৈরী করবে।"

"মহারাজ! বদনাম ও লোকজনের সমালোচনার ব্যাপারটি বেশীদিন থাকবে না। কারণ কোন ব্যাপারেই লোকজনের আগ্রহ বেশীদিন থাকে না। কিছুদিন আগের ঘটনা। একলোক তার একটি ভেড়ার পশমের ওপর কিছু মাটি ঢেলে দিয়ে মাটিতে পানি ঢেলে ভিজিয়ে দিল। পানিতে ভিজে মাটি ভেড়ার গায়ে লেপ্টে যায়। মালিক এতে কিছু কলাই বীজ ছিটিয়ে দিয়ে পানি দিতে থাকে। কিছুদিন পর কলাই অংকুরোদগম হয়ে ভেড়ার গায়ে কলাই গাছ জন্ম নেয়। অতঃপর মালিক সেটিকে বাজারে নিয়ে গেলে ভেড়াটি দেখার জন্য লোকজনের ভীড় লেগে যায়। এ ভীড় থাকে কয়েকদিন। সপ্তাহান্তে দেখা গেল আর কেউ ভেড়া দেখার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এর সপ্তাহখানিক পর ভেড়ার পাশ দিয়ে হেটে গেলেও ভেড়ার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখেনি...।

মহারাজকেও এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, মানুষ কিছু দিন এ নিয়ে কানাঘুষা করবে ঠিক, তবে তা বেশী দিন নয়। তাছাড়া মহারাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করার দুঃসাহস কার আছে?"

✪ ✪ ✪

রাজা দাহিরের মাথায় ক্ষমতার মোহ চেপে বসল। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য উজির বুদ্ধিমানের দেয়া পরামর্শেই আপন বোনকে বিয়ে করল রাজা। অবশ্য বিয়ের আগেই উজির বুদ্ধিমানকে বলল, রাজার কাজকর্ম দেশের প্রজারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং সেটি নীতিতে পরিণত হয়। রাজা দাহির ছিল প্রজা বৎসল। এ কারণে সে দেশের নেতৃস্থানীয় পাঁচশ প্রজাকে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করে এনে গণকদের গণনা ও উজিরের পরামর্শ সম্পর্কে

জানিয়ে তাদের মতামত চাইল। হঠাৎ এক কোণ থেকে মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল, "না মহারাজ! এমনটি হতে পারে না।" এরপর অপর একজন, তারপর আরো কয়েকজন রাজার এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে শুরু হয়ে গেল তুমুল প্রতিবাদ। সবাই একবাক্যে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠল।

"শোন! তোমরা সমর্থন না করলেও আমি মায়াকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।" গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল রাজা। তোমরা কি চাও, আমি রাজ্যপাট ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাব, বাকী জীবন বনবাসে কাটিয়ে দেব? তোমরা যদি আমার রাজত্বে কোন কষ্ট করে থাকো, আমি যদি তোমাদের কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে বলো আমি কাকে কি কষ্ট দিয়েছি।"

সভা নীরব হয়ে গেল। সবার দিকে চোখ বুলিয়ে রাজা বলল, "আমার শাসনকালে আমি কি কারো ওপর কোন জুলুম করেছি? করে থাকলে বলো।"

সবাই মাথা নীচু করে ফেলল।

"আমি মায়ার সাথে শুধু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাই পালন করব, কখনো আমাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হবে না।" বলল রাজা।

"তাহলে কোন অসুবিধা নেই মহারাজ! আওয়াজ এলো এক কোণ থেকে। দেখাদেখি সবাই এ কথায় সায় দিল।"

এ ঘটনার তিনদিন পর রাজা দাহির সহোদর বোন মায়ারাণীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করল। নেতৃস্থানীয় প্রজা ও সভাসদদের উপস্থিতিতে আবেগ উত্তেজনা ও আমোদ প্রমোদহীন অনাড়ম্বর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো রাজা দাহিরের সাথে মায়ারাণীর বিয়ের পর্ব। লোকজন এই বিয়ের কথা শুনে নাক ছিটকালো, কানে আঙুল দিল। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস কারো ছিল না।

✪ ✪ ✪

এভাবে ঘটে গেল আমার বিয়ে অনুষ্ঠান। বেলালকে বলল রাণী। আপন ভাইয়ের জন্য আমি নিজ আগ্রহেই এ ত্যাগ স্বীকার করেছি। কারণ সিংহাসন থেকে ভাইকে বঞ্চিত করতে চাই না আমি। তাছাড়া আমার কানে যখন একথাগুলো এলো যে, আমার ভাবী স্বামী আমার ভাইকে খুন করে মসনদ দখল করবে, তখন আর বিয়ের প্রতি আমার কোন আগ্রহ থাকেনি।

"তোমার হয়তো জানাই ছিল না, কার সাথে তোমার বিয়ে হচ্ছে?" বেলাল জানতে চাইলো।

"জানা ছিল।" সেও রাজা ছিল। 'ভাটি' নামের এক রাজ্যের রাজা ছিল সে। তার নাম ছিল সোহান রায়।

আমি তখন ব্রাহ্মণাবাদে আমার অপর ভাই মিহির সেনের এখানে। সেই ভাই আমাকে রাজা দাহিরের কাছে এ পয়গাম দিয়ে পাঠাল যে, আমাকে যেন অতি তাড়াতাড়ি রাজা সোহান রায়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমার ভাই মিহির সেন আমার বিয়ের যৌতুক হিসাবে পাঁচশ ঘোড়া ও পাঁচশ মটকি ভর্তি মাল-সামানও দিয়েছিল। তাছাড়া একটি দুর্গও দিয়েছিল যৌতুক হিসাবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা দাহিরের অপর ভাই মিহির সেন যখন জানতে পারে রাজা দাহির বোন মায়াকেই বিয়ে করেছে তখন সে দাহিরের প্রতি রেগে আগুন হয়ে গেল। জরুরী পয়গাম পাঠাল। পয়গাম পাওয়া মাত্র মায়াকে সোহান রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু রাজা দাহির তার বিয়ে করার কারণ, গণকদের গণনা ও উজিরের পরামর্শ এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার সমস্যা জানিয়ে ফেরত পয়গাম পাঠাল কিন্তু তাতে মিহির সেনের ক্ষোভ প্রশমিত হলো না। সে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে সেনাভিযান করল। অবরোধ করল রাজা দাহিরের দুর্গ। কয়েকদিন অবরোধের মধ্য থেকে রাজা দাহির তার সৈন্যদের অবরোধ ভাঙার নির্দেশ দিল। রাজার হুকুম পেয়ে দাহিরের সেনারা অবরোধ ভাঙতে যখন দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলো তখন মিহির সেন বুঝতে পারল দাহিরের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী তাই মোকাবেলায় প্রবৃত্ত না হয়ে রাজা দাহিরের কাছে পয়গাম পাঠাল, তুমি দুর্গের বাইরে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করো। তোমার ও আমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে।

রাজা দাহির উল্টো খবর পাঠাল আমার তো যাবার প্রয়োজন নেই। তুমিই তো আসতে পারো, আমি তোমাকে স্বাগত জানাব। অবশেষে মিহির সেন নিজেই হাতি সাজিয়ে তাতে আরোহণ করে দাহিরের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বলল, দুর্গের বাইরে চলো, তোমার সাথে আমার একান্ত কথা আছে। ভাই মিহির সেনের প্ররোচনায় দুর্গের বাইরে যেতে রাজি হয়ে গেল রাজা দাহির। দাহির সেনের হাতিতে সাজানো হলো হাওদা। দাহির বসল হাওদায় আর মিহির বসল হাতির সামনে মাথার কাছে। রাজা দাহিরের উজির বুদ্ধিমান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাজার হাতির পিছু পিছু যেতে লাগল। হাতি যখন দুর্গ ফটকের কাছাকাছি পৌছলো তখন উজিরের কানে কানে কে যেন এসে ফিস ফিস করে কি কথা বলল আর অমনি উজির রাজাকে ইশারা করে বুঝাল,

আপনি দুর্গের বাইরে যাবেন না বিপদ আছে। অনন্যোপায় হয়ে দুর্গের প্রধান ফটক দিয়ে হাতি বের হওয়ার সময় রাজা দাহির হাওদায় দাঁড়িয়ে গেটের নীচে ঝুলে থাকা গাছের ডালে ঝুলে পড়ল। হাতি প্রধান ফটক পেরিয়ে গেলে সৈন্যসামন্ত এসে রাজাকে নামাল। দুর্গফটক পেরিয়ে রাজা মিহির সেন পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল রাজা দাহির হাওদাতে নেই। হতাশ সে। তার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল। রাজা দাহির অনিবার্য বিপদ থেকে রক্ষা পেল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজা উজিরকে জিজ্ঞেস করল, উজির! তুমি আমাকে ফেরালে কেন? উজির বলল মহারাজ! আমার গোয়েন্দারা একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাকে খবর দেয়, আপনার ভাই আলোচনার নামে চক্রান্ত করে দুর্গের বাইরে নিয়ে আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা মিহির সেন রাজা দাহিরকে হত্যা করার জন্যই দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু যখন দেখল দাহির তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে আর তার সৈন্যবাহিনীও দাহিরের বিপুল সৈন্য সংখ্যার সাথে মোকাবেলায় পেরে উঠতে পারবে না, তখন অবরোধ তুলে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু অত্যধিক মনোকষ্ট ও গরমে রাজা সেন জ্বরে আক্রান্ত হলো। গরমে সারা শরীরে ফুস্কা পড়ে গেল। কয়েকদিন জ্বরে ভুগে দাহিরের দুর্গের বাইরেই সে মারা গেল। ৬৭২ খৃস্টাব্দের ঘটনা সেটি। তখন রাজা মিহির সেনের বয়স ছিল মাত্র বত্রিশ বছর।

✪ ✪ ✪

বিয়ের ঘটনা সবিস্তারে বলার পর মায়ারাণী বেলালের উদ্দেশ্যে বলল, কি ভাবছ বেলাল? মনে রেখো, রাজা দাহির আমার জীবনে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে না। সে আমাকে বিয়ে করেছে সত্য কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন দাম্পত্য সম্পর্ক হয়নি। আমরা সেই ভাই-বোনের পবিত্রতা বজায় রেখেছি। তবে রাজা দাহির জানে আমি যুবতী। এ সময়ে আমার স্বামীর ঘরে থাকার কথা ছিল। সে আলবৎ জানে, যৌবনের চাহিদা কি? যুবতীর মন কিসে তৃপ্তি পায়। যে তার মসনদ রক্ষা করতে গিয়ে আমার জীবন যৌবনকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

"আমি শুনেছি, তোমাদের দেশে নাকি তরুণী-মেয়েদেরকে দেবতার নামে জবাই করে দেয়া হয়?"

"তুমি ঠিকই শুনেছ। কেবল পণ্ডিত বা গণক যদি একবার বলে দেয় যে, বিপদ আসন্ন। কোন কুমারীকে দেবতার নামে বলি দিলে এই মুসীবত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তাহলে রাজার তত্ত্বাবধানেই কুমারী বলি দেয়া হয়। বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পালন করা হয় পণ্ডিতদের নির্দেশ।"

"আমাদের দৃষ্টিতে এসব কর্মকাণ্ড হারাম এবং এক আল্লাহর সাথে শরীক করার পর্যায়ে পড়ে। অথচ তোমাদের প্রভু নিজের বান্দাদের প্রাণ হরণ করে আনন্দিত হয়?"

"বেলাল! আমি তোমাকে আগেই অনুরোধ করেছি, আমার সাথে ধর্ম সম্পর্কে কথা বলবে না। আমি যখন তোমার কাছে আসি তখন আমি নিজেকে হিন্দু ধর্মের অনুসারী মনে করি না, আর তোমাকেও মুসলমান বলে ভাবি না। আমি নারী আর তুমি পুরুষ আমার কাছে এ সত্যটাই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। নারী সেই পুরুষকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে যে পুরুষ তার চোখে ভালো লাগে। দেখো, আমি এ দেশের ঘোষিত রাণী। ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে শিকলে বেঁধে আমার গোলাম বানিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু তা না করে তোমার প্রেমে পড়ে আমি নিজেকে তোমার বাঁদীতে পরিণত করেছি। আমি কি তোমার সেই সংশয় ও প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছি, কেন আমি আমার স্বামীকে ধোঁকা দিচ্ছি এবং কেন তাকে আমি প্রেমিক হিসাবে নিজের জীবন যৌবন উৎসর্গ করতে পারছি না?"

"আমার ভাই রাজা দাহির জানে, সে আমার যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্নগুলোকে মরুভূমিতে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। এতে আমি জীবন তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে ধুকে ধুকে মরছি। আমার সারা অস্তিত্বে আমার স্বপ্নগুলো সারাক্ষণ জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে। সে পুরুষ। দেশের রাজা। রাজমহলে রয়েছে অসংখ্য সেবিকা দাসী। সে যে কোনভাবে তার দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে। বিশেষ কোন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন বাধ্যবাধকতা তার নেই। কিন্তু আমি রাণী। আমার জন্য এ ব্যবস্থা নেই। এ জন্য সে আমাকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে। তবুও আমি আমার মর্যাদাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু এমনটিও সম্ভব নয় যে, আমি স্বামী হিসাবে কাউকে ভালোবাসবো, তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকব। স্বামীর চরনে নিজের ভালোবাসার অর্ঘ দেব।"

"আমি তোমার অবস্থা বুঝেছি রাণী। কিন্তু আমি তো বিদেশ বিভূয়ে এক পলাতক। তোমার দেশে আমি পরবাসী। এখানে আমার কোন ঠিকানা নেই।

নেই ঘরবাড়ি। তুমি কতদিন এভাবে চুপি চুপি আমার সাথে মিলিত হবে? তুমি মায়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছ।”

“চুপি চুপি মিলব কেন? আমি তোমাকে আমার সাথেই রাখব।” বলল মায়া।

“রাণী! রাণীকে নিজের বুকে টেনে বলল বেলাল। আমি যদি এখানে পরবাসী না হতাম, তাহলে তোমাকে মুসলমান বানিয়ে আমার বিবি করে নিতাম।”

“তুমি আবার ধর্মের কথা বলছ। উষ্মা মাখা কণ্ঠে বলল রাণী। আমি নিজেও ধর্মান্তরিত হতে চাই না, তোমাকেও আমার ধর্মে টেনে আনতে চাই না। আমরা একজন অপরজনের ভালোবাসায় সিক্ত হতে চাই, আজীবন ভালোবেসে যেতে চাই। বলো বেলাল! তুমি কি আজীবন আমাকে ভালোবেসে যাবে?”

✪✪✪

এ ঘটনার ছয় বছর পর রমলের রাজা রাজা দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করে কিছু এলাকা দখল করে নিল এবং আরো সামনে অগ্রসর হতে লাগল। রমলের রাজা ছিল হস্তিবাহিনী সজ্জিত। তার প্রায় সব হাতিই ছিল মাদা হাতি। হাতিগুলো ছিল খুবই তাজা তাগড়া আর অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী ও ভয়ংকর। তদুপরি রমল বাহিনী যুদ্ধের সময় এসব হাতিকে মদ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে ফেলত, তখন এগুলোর ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার সামনে কারো দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকত না। এছাড়া রমলের সৈন্যসংখ্যাও ছিল বিপুল। রমলের আগ্রাসী ক্ষমতার বর্ণনা শুনে ভড়কে গেল রাজা দাহির। সে উজির বুদ্ধিমানকে ডেকে ভীত শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই অবস্থায় কি করা যায় উজির?”

“মোকাবেলা ছাড়া আর কি করার আছে মহারাজ! বলল উজির বুদ্ধিমান। সৈন্যবাহিনী কম তাতে কি হয়েছে? খাজাঞ্চীখানার দরজা খুলে দিন। প্রজাদের বলুন, যারা বাহাদুরের মতো লড়াই করবে, তাদের দেয়া হবে এসব ধনরত্ন।”

“সাধারণ প্রজাদের তো লড়াই করার ট্রেনিং নেই, তারা কিভাবে একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করবে?”

“তাহলে শত্রুদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিন।” বলল উজির।

"সন্ধি করার মানে হলো পরাজয় বরণ করা। এরচেয়ে তো মৃত্যুও ভালো। জানা নেই, শত্রু পক্ষ সন্ধি প্রস্তাব দিলে কি পরিমাণ টাকার বিনিময়ে সন্ধি করার শর্ত দেয়। আমি সন্ধি প্রস্তাব করতে চাই না, পরাজয়ও বরণ করতে চাইনা।" বলল রাজা দাহির।

"তাহলে একটাই পথ আছে মহারাজ! আপনি যেসব আরবদেরকে এখানে আশ্রয় দিয়েছেন এদেরকে আপনার দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে রাজি করুন।"

"কিন্তু এরাও তো সংখ্যায় বেশী নয়। মাত্র পাঁচশ বা এর কিছু বেশী হবে। এতো অল্প মানুষ কিভাবে বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করবে?" বলল রাজা।

"মহারাজ! আপনি কি জানেন না, এরা সেই জাতি যারা রোম ও পারস্যের বিশাল সমরশক্তিকে গুড়িয়ে দিয়ে বিজয় অর্জন করেছে। এরা লড়াকু জাতি। হাতে গোনা সৈন্য নিয়ে বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় বিজয় অর্জনের অভিজ্ঞতা এদের আছে।" বলল উজির।

তারিখে মা'সুমীতে বর্ণিত হয়েছে "রাজা দাহির তার দেশ রক্ষার জন্য তার আশ্রিত আরবদের কাছে নিজে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলার অনুরোধ করল।" আশ্রিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল পাঁচশ। এদের অধিকাংশই ছিল প্রথম সারির যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সন্তান। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে সাঈদ বিন আসলাম নামের মাকরানের গভর্নরকে এরা হত্যা করে বিদ্রোহ করেছিল। এই অপরাধে খলিফার রোষের শিকার হয়ে এরা সিন্ধুতে এসে রাজা দাহিরের কাছে আশ্রয় নেয়। আশ্রিতরা সবাই মিলে হারেস বিন আলাফীকে তাদের নেতা ঘোষণা করে।

রাজার আগমন সংবাদ শুনে আশ্রিত আরবদের সর্দার হারেস আলাফী রাজাকে স্বাগত জানিয়ে বলল— "মহারাজ! আজ আপনাকে অন্যদিনের মতো দেখাচ্ছে না। এমন ব্যতিক্রম দেখছি কেন মহারাজ!"

"আমার মর্যাদা এখন প্রশ্নের মুখোমুখি। তোমাদের তরবারীই পারে আমার সম্মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে। আমি তোমাদের উপকারের প্রতিদান নিতে আসিনি, উপকারের ডঙ্কা বাজাতে আসিনি। আমি বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে এসেছি।"

হারেস আলাফী তাকে বসিয়ে আরব আশ্রিতদের আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাল।

"মহারাজ! বলুন, আমাদের তরবারীর এমন কি প্রয়োজন পড়েছে আপনার? আমরা অবশ্যই আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করতে প্রস্তুত।"

"রাজা দাহির আশ্রিত আরব সর্দার হারেসকে জানাল, তার বিরুদ্ধে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী আক্রমণ করতে আসছে। রাজধানী থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে তাঁবু গেড়েছে শত্রুবাহিনী।

"একথা শুনে হারেস আলাফী বলল, "আল্লাহর কসম! মুসলমানরা বন্ধুত্বের দাবী আদায়ে কখনো পিছপা হয় না। আমরা অবশ্যই আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করব। প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করব না।"

"তাহলে এখনই কোন পরিকল্পনা তৈরী করে নাও, দয়া করে শত্রুদের হাত থেকে আমার দেশকে রক্ষা করো। রাজা দাহির হতাশ ও পরাজিতের স্বরে বলল। শুনেছি শত্রুদের হাতে পাগলা হাতি রয়েছে। হস্তিবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কোন বাহিনীই রুখতে পারে না, ওদের চিৎকারেই সৈন্যরা ভয় পেয়ে যায়। তোমরা কি এসব হাতির মোকাবেলা করার ব্যবস্থা করতে পারবে?"

"মহারাজ! কিছুটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, এক আরব বৃদ্ধ। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের ঘটনা স্মরণ করো। তখন তুমি খুবই ছোট ছিলে। পারস্যের অগ্নি পূজারীরা আমাদের কাছে পরাজিত হয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটাল যে, এর আগে কোন যুদ্ধে এতো অধিক পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ কোথাও ঘটেনি। অগ্নি পূজারীরা মনে করেছিল, এটাই হবে ওদের সাথে আমাদের শেষ লড়াই, এরপর আমাদের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ওরা বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে এলো। আমরা অনেকে জীবনেও হাতি দেখিনি। হাতি ছিল আমাদের জন্যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমি তখন যুবক। সে লড়াইয়ে ছিলাম আমি। হে রাজা! তুমি হয়তো জেনে থাকবে, পারস্য সম্রাটকে জঙ্গী হাতি সরবরাহ করেছিল তৎকালীন সিন্ধু অঞ্চলের রাজা....। আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সেইসব হাতির চিৎকার আমার কানে বাজে। এসব হাতি আমাদের ভয়ানক ক্ষতি করেছিল। তবে আমরা হাতির সুড় কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম। কি মনে করো রাজা! কাজটি খুব সহজ ছিল?"

"অবশ্যই নয়, দোস্ত!" বলল রাজা দাহির। হ্যাঁ, আমি বড় হয়ে শুনেছি। কাদেসিয়ার যুদ্ধে হস্তিবাহিনী মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও মুসলমানরা যখন হাতিগুলোর সুড় কাটতে শুরু করে তখন আহত হাতিগুলোই

পারসিকদের জন্য হয়ে ওঠে বিপদ। হাতির পায়ে পিষ্ট হয়েই মারা পড়ে বহু পারসিক সৈন্য। ফলে শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।”

৬৩৫ খৃস্টাব্দে কাদেসিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তখন পারস্যের রাজা ছিলেন ইয়াজদেগির্দ। তিনি পূর্বাঞ্চলের সকল অমুসলিম রাজাদের কাছ থেকে এই বলে সাহায্য নিয়েছিলেন যে, যদি মুসলমানদের এখনই প্রতিরোধ না করা যায়, তাহলে দুনিয়াতে কোন ধর্মই আর থাকবে না। মুসলমানরা সবাইকে গোলাম বাঁদীতে পরিণত করবে। পারস্যের রাজা ইয়াজদেগির্দ সিন্ধু রাজার কাছেও সাহায্যের আবেদন করেছিল। সিন্ধু রাজা তার কিছু সৈন্যসহ এই ভয়ানক জঙ্গী হাতি উপহার দেয়। কতগুলো হাতি সিন্ধু রাজা পারস্য সম্রাটকে দিয়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি। তবে এতটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, সম্রাটের জন্য রাজা নিজের ব্যবহৃত সাদা কালো মিশ্রিত কাজলা রঙের হাতিটিও দিয়েছিল। কাদেসিয়া যুদ্ধে সেই হাতিতে সওয়ার ছিল পারস্যের বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি রুস্তমের। কাদেসিয়া যুদ্ধেই আমাদের সৈন্যদের হাতে রুস্তম নিহত হয়।”

“এ জন্যই তো আমি তোমাদের কাছে এসেছি। হস্তিবাহিনীর মোকাবেলা করা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব। আমি তোমাদের উপকার করেছি, আশা করি এই বিপদে তোমরাও আমার উপকার করবে।”

“যাও রাজা! আমরা ইনশাআল্লাহ্ তোমার সাহায্যের জন্য পৌঁছে যাবো। দেখবে হাতি ময়দানেই আসবে না। আমাদের মধ্যে লড়াই করার মতো যতজন রয়েছে সবাই যুদ্ধ করবে। তুমি আমাদেরকে কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করো। আর বাকী সৈন্যদেরকে তুমি শত্রুবাহিনীর দিকে পাঠিয়ে দাও। ওদের থেকে মাইল খানিক দূরে তাঁবু ফেলে ওদের বলো প্রতিরক্ষা খাল খনন করতে। তুমি আমাকে পাঁচশ সৈন্য আমার অধীনে পাঠিয়ে দিও। আর বাকীদের তোমার সাথে রাখো। এরপর যা ঘটবে তা তোমার শত্রুবাহিনী যেমন টের পাবে তুমিও নিজের চোখেই দেখতে পাবে।” বলল আরব সর্দার আলাফী।

অতঃপর যা ঘটলো, তা আরব মুসলমান যোদ্ধাদের ইতিহাসের স্বাভাবিক ঘটনা। অবশ্য তাদের বাহাদুরী শুধু সিন্ধু রাজা দাহির আর তার শত্রুরাই দেখেনি। আজো ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে সেই আরব সর্দার হারেস আলাফীর সাথীদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী কথা বলে। ইতিহাসের পাতায় সারা জগতের মানুষ সেই কাহিনী দেখে নিতে পারে।

"হারেসের কথা মতো রাজা দাহির পাঁচশ অশ্বারোহী তার অধীনে পাঠিয়ে দিল। অপরদিকে রাজা দাহিরের সেনাবাহিনী রাজধানী ত্যাগ করে রমলের রাজার অবস্থানের তিন মাইল দূরে তাঁবু ফেলে দ্রুত প্রতিরক্ষা খাল খনন করে ফেলল। এর মধ্যে আলাফী বেশ বদল করে রাজা দাহিরের শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে ওদের সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখে বুঝতে পারল— এই বাহিনীর মোকাবেলায় রাজা দাহিরের অস্ত্র সমর্পণের কোন বিকল্প নেই। বিশাল সেই বাহিনী আর বিপুলশক্তির অধিকারী। শত্রুদের শর্ত মেনে সন্ধিচুক্তি করে প্রাণ রক্ষা ছাড়া রাজা দাহিরের বাঁচার কোন পথ নেই।

রমলের রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীর তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছিল এবং আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রমলের রাজা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল রাজা দাহিরের বাহিনী তার বাহিনীর মোকাবেলায় একেবারেই নগণ্য। তাই সে চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। ভাবল, বিজয় তার অবশ্যম্ভাবী। সে ভাবতেই পারল না নগণ্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজা দাহিরের বাহিনী তার বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।

দু'দিন পরের ঘটনা। রমলের বাহিনী রাতের দ্বিপ্রহরের সময় গভীর ঘুমে অচেতন। এমন সময় আরব সর্দার হারেস তার আরব সাথী ও রাজার দেয়া পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে রমলের বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালালো। সে রমলের শিবিরে ঢুকে তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। সারা শিবির জুড়ে ভয় আতঙ্কে সেনারা পালাতে শুরু করল। জীবন নিয়ে পালানো ছাড়া প্রতিরোধের কোন চিন্তাই করতে পারল না। কিন্তু আলাফীর গুপ্ত হামলা এতোটাই তীব্র ছিল যে, রমলের বাহিনী পালানোর অবকাশও পেল না। প্রায় হাজারের ওপরে সৈন্য মারা গেল। বন্দি হলো বহু সেনা। আলাফীর যোদ্ধারা পঞ্চাশটি হাতি ধরে নিয়ে এলো। এতে রমল রাজার কোমর ভেঙে গেল।

অভাবিত এ সাফল্যে রাজা দাহির আরবদের অপরিমেয় পুরস্কারে ভূষিত করল। তাছাড়াও মাকরান অঞ্চলে বিশাল এলাকা তাদেরকে বসতি স্থাপনের জন্য লা-খিরাজী দান করল। এখানেই পরবর্তীতে এই আরব আশ্রয় প্রার্থীরা বসতি স্থাপন করে।

রাজা দাহিরের আশ্রিত আরবরা যখন রমলের রাজার আক্রমণ থেকে রক্ষা করল দাহিরের রাজত্ব, তখন বেলাল ও তার সাথীরা রাণী মায়ার একান্ত কর্মচারী হিসাবে রাজ প্রাসাদে নিরাপদ জীবন যাপন করছে। রাণী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাহিরের বিবাহিতা হলেও বেলালকেই সে মনে প্রাণে প্রাণ

পুরুষ হিসাবে স্থান দিয়ে রেখেছে এবং তার চার সাথীকে একান্ত নিরাপত্তারক্ষীর মর্যাদা দিয়ে রাজ মহলেই বিশেষ মর্যাদায় রেখেছে। রাণী বাইরে গেলে এরাই থাকে তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী। ঘরে বাইরে সবখানে বেলাল ও তার সাথীরাই মায়ারাণীর সেবক, কর্মচারী, পাহারাদার, নিরাপত্তারক্ষী সেই সাথে জীবন ও প্রাণের আত্মীয়।

এক পর্যায়ে রাজা দাহিরের সেই দুরবস্থা আর থাকল না। রাজা দাহির তার দুর্বলতা কাটিয়ে রাজত্বকে মজবুত করতে সক্ষম হলো। দেখতে দেখতে রাজা দাহিরের রাজ্য মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। উত্তরে সীস্তান ও মাকরানের কিছু অঞ্চলও রাজা দাহিরের দখলে চলে এলো। দক্ষিণে গুজরাট ও মালো পর্যন্ত বিস্তৃত হলো রাজা দাহিরের রাজত্ব।

এতো দিনে মায়ারাণীর শরীরেও ভাটার টান দেখা দিয়েছে। আর যোদ্ধা বেলালও পৌঢ়ত্বের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। এরা একজন অপরজনকে দেখে ও কথা বলেই জীবন কাটাত।

রাজা দাহিরের রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি পেল ঠিক, তবে শেষ পর্যায়ে এসে দাহিরের মধ্যে দেখা দিল রূঢ়তা। সে প্রজাদের ওপর শুরু করল অত্যাচার উৎপীড়ন। দাহিরের রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ছিল বেশী। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের অধিকাংশই ছিল জাট। রাজা দাহির বৌদ্ধদের জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেলল, তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধকে নস্যাৎ করে দিতে গুড়িয়ে দিলো তাদের উপাসনালয়।

আরব দেশের সাথেও দাহির শত্রুতা সৃষ্টি করল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের শাসক থাকাকালে রাজা দাহিরের আক্রমণাত্মক ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন যেসব বিদ্রোহী আরব হাজ্জাজ ও আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করেছিল, রাজা দাহির তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে আরব শাসকদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছিল। এসব খবর হাজ্জাজের কানে পৌঁছলে হাজ্জাজ এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সে সময় হাজ্জাজ ছিলেন অর্ধেক আরবের শাসক। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও যুদ্ধবাজ হিসাবে তার জুড়ি ছিল না। হাজ্জাজের অত্যাচারের ভয়েও কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী দেশত্যাগ করে রাজা দাহিরের রাজ্য সিন্ধুতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজা দাহির এসব বিদ্রোহী মুসলমানকে আরব শাসকদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ চালানোর জন্য নানাভাবে প্ররোচনা দিচ্ছিল।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আপন ভাতিজা ও হাতে গড়া সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন পারস্যের গভর্নর, তখন পারস্যের রাজধানী ছিল সিরাজ শহরে। সে সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স মাত্র সতেরো বছর। কিন্তু বয়স কম হলে কি হবে, মেধা মনন ও অভিজ্ঞতায় সে যেকোন পৌঢ় ব্যক্তির চেয়েও ছিল বেশী দক্ষ। মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও শক্তি ছিল তাঁর মা ও চাচা হাজ্জাজের দেয়া প্রশিক্ষণের ফসল। সামরিক রণকৌশলে সে ছিল একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি। পারস্যের কুর্দিরা ছিল বিদ্রোহী ও লড়াকু। পারস্যের সম্রাট ও কুর্দিদের বিদ্রোহ এবং চক্রান্তে অসহায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অস্বাভাবিক মেধা ও প্রজ্ঞার দ্বারা কুর্দিদের এমনভাবে আয়ত্বে এনেছিলেন যে, তাঁর আঙুলের ইশারায় কুর্দিরা উঠত বসত।

মুহাম্মদ বিন কাসিম গভর্নরের দায়িত্ব নেয়ার আগে সিরাজের তেমন গুরুত্ব ছিল না। বিন কাসিম সিরাজের আশে পাশের আরো কিছু পারসিক অঞ্চল জয় করে মুসলিম সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই সাথে কুর্দিদের বিদ্রোহ ও চক্রান্ত দমন করতে সক্ষম হন। তিনিই সিরাজকে রাজধানী ঘোষণা করে এখানে একটি আধুনিক শহরের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই সিরাজ নগরীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আশৈশব এতীম ও ক্ষুদে এই শাসক ও সেনাপতির তখনও প্রৌজ্জ্বল তারকা খ্যাতি অর্জিত হয়নি। অবশ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্থান সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল, যেদিন তিনি খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ভাই সুলায়মানকে বাৎসরিক সামরিক প্রদর্শনীতে পরাজিত করেছিলেন। সুলায়মান ভেবেছিল তার ভাই হয়তো এটাকে নিছক একটা খেলার জয় পরাজয় হিসাবেই মূল্যায়ন করবেন। কিন্তু খলিফা সেইদিনের খেলার মধ্যেই মুহাম্মদ বিন কাসিম যে অন্য দশজনের চেয়ে ভিন্ন, তা বুঝতে পেরেছিলেন।

খলিফা সেদিন রাতেই মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে এনে তাঁর সাথে কথা বলেন। এতোটুকু তরুণের মধ্যে অস্বাভাবিক মেধা ও প্রজ্ঞা দেখে তিনি বিস্মিত হন। সেই বয়সেই মুহাম্মদ বিন কাসিম দক্ষ সেনাপতিদের মতো সামরিক বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারতেন এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর মন্তব্য হতো অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

ইবনে ইউসুফ! হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে বললেন, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক। এই ছেলে একজন প্রতিভাধর সেনাপতি হবে একথা আমি

হলফ করে বলতে পারি। দেখবে আগামী প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। এই ছেলে আরব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত। একে ব্যারাকে নিয়ে যান ইবনে ইউসুফ! তাঁকে সেনাপতির পদমর্যাদা দিয়ে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিন।"

ঐতিহাসিকরা তৎকালীন লেখকদের কথা উদ্ধৃত করে লেখেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের গায়ের রং ছিল গোলাপী, চোখ দুটো ছিল বড় বড়, কপাল চওড়া, হাত দুটো শক্ত, সুডৌল ও দীর্ঘ। শরীর ছিল পুষ্ট এবং আওয়াজ ছিল ভারী। চেহারা ছিল চমকানো। মুখের ভাষা ছিল খুবই মিষ্ট, বলার ভঙ্গি ধীর ও সরল। পুরো অবয়বে মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন একজন মূর্তিমান সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী। যে তাকে দেখত মুগ্ধ ও প্রভাবিত না হয়ে পারত না। তাঁর ঠোঁটে কথা বলার সময় ঈষৎ হাসি লেগে থাকত। মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করত কিন্তু নির্দ্বিধায় প্রয়োজনের কথা বলতে পারত। তিনি সবার সাথে খুব সহজে কথা বলতেন এবং শুনতেন। কিন্তু প্রশাসনিক কাজে ছিলেন খুবই নীতিবান। কেউ তাঁর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে এমনটি কল্পনাও করতে পারতো না। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর ও আপসহীন।

✪ ✪ ✪

একদিন মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর চাচার রাজধানী বসরায় এলেন।

"মুহাম্মদ! মৃত্যুর আগে আমি একটি অপূর্ণ আশা পূরণ করে যেতে চাই!" বললেন হাজ্জাজ।

"কি সেই অপূর্ণ আশা চাচাজান?"

"এটা এমন একটা আশা যা পূর্ণ করাটা এখন আমার কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আমি সিন্ধু রাজ্যের প্রতিটি ইমারতের ইট খুলে ফেলতে চাই। আমার মনে হয়, তুমি আমার এই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে এবং সিন্ধু রাজ্যকে ইসলামী সালতানাতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে।"

"এজন্য তো আমীরুল মুমেনীনের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আপনি অনুমোদন এনে দিন। আমি আপনার প্রত্যাশা পূরণ করে দেবো। ইনশাআল্লাহ।"

"এটা একটা সমস্যা বটে। আমীরুল মুমেনীন এখনো অনুমতি দিচ্ছেন না। আমি এমন একটা অজুহাতের চেষ্টা করছি, যাতে তিনি অনুমতি দিতে বাধ্য হন। সিন্ধু দেশ ও হিন্দুস্তান থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় ধরনের

চক্রান্তের পাঁয়তারা চলছে। তোমার দস্তাবিজ রক্ষক হয়তো তোমাকে বলে থাকবে কাদেসিয়ার যুদ্ধে সিন্ধু রাজা বহু জঙ্গী হাতি দিয়ে পারস্য সম্রাটকে সহযোগিতা করেছিল। ওরা পারসিকদেরকে সেনাবাহিনী দিয়েও আমাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করেছে।"

"হ্যাঁ, চাচাজান! আমি একথাও শুনেছি যে, কাদেসিয়া যুদ্ধের দু'বছর আগে জঙ্গে সালাসিলে হিন্দু মারাঠা ও জাটরা অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারা নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়েছিল।"

পারসিকদেরকে যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন সেনাপতি হরমুজ তৎকালীন সিন্ধু রাজার কাছে সাহায্যের আবেদন করে এবং সিন্ধু রাজার সাথে মৈত্রী চুক্তি করে। অপরদিকে যেসব হিন্দু জাট তাদের দেশে গোলামী ও মানবেতর জীবন যাপন করছিল, তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মোটা অংকের ভাতা বরাদ্দ দিয়ে তার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। হিন্দু জাটরা ছিল জাতিগতভাবে লড়াকু ও সাহসী। হরমুজের হাতে বন্দি জাটদের অধিকাংশই ছিল অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও প্রথম শ্রেণির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য। হরমুজ এদেরকে নিজ দেশের সেনাদের মতো সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে সেনাবাহিনীতে পদায়ন করে নেয়। সেই সাথে এদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ঢুকিয়ে দেয়।

এসব জাট (অনেকে এদেরকেই গোর্খা বলেন) সৈন্যরাই পাঁচ, সাতজনের একেকটি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। এতে করে কেউ পালিয়ে যেতে চাইলেও পালাতে পারতো না এবং প্রতিপক্ষ অগ্রসর হতে চাইলে শিকলে পেঁচিয়ে বাধাগ্রস্ত হতো।

এসব আমি আমার উস্তাদের কাছে শুনেছি চাচাজান। উস্তাদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, সবই আমি হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি। শিকলে বেঁধে যুদ্ধ করেছিল বলেই এই যুদ্ধকে "জঙ্গে সালাসিল" বলা হয়। পারসিক সেনাপতি হরমুজ খালিদ বিন ওয়ালিদের মুখোমুখি যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এরপর পারসিকদেরকে মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

"আমার গোয়েন্দা সিন্ধু দেশের খবরাখবর আমাকে নিয়মিত পাঠাচ্ছে। আমার গোয়েন্দারাও বিদ্রোহীদের বেশ ধারণ করে ওদের সাথে রয়েছে। রাজা দাহির এতোটাই বদমাশ হয়ে পড়েছে যে, সমুদ্রের ডাকাতদেরও সে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এসব ডাকাত দল সরন্দ্বীপ ও মালাবার অঞ্চল থেকে যেসব মুসলমান হজ্জ্ব করতে আসে এবং যেসব আরব মুসলমান ব্যবসায়িক

মালপত্র নিয়ে ওদের সমুদ্রকূল দিয়ে যাতায়াত করে, এসব ডাকাতেরা তাদের সবকিছু লুটে নেয়। এরই মধ্যে কয়েকটি মুসলিম জাহাজ এরা লুট করেছে।

"আমাদেরকে অবশ্যই মুসলমানদের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং জাহাজ চলাচলের নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে।" বললেন মুহাম্মদ বিন কাসিম।"

"আমি ব্যবস্থা বলতে একটাই বুঝি, সিন্ধু অঞ্চল আমরা দখল করতে না পারলেও অন্তত সিন্ধু অববাহিকার সমুদ্র অঞ্চল ও উপকূলের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই আমাদের কব্জায় আনতে হবে।" বললেন হাজ্জাজ। সিন্ধু অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দর হলো ডাভেল। এটিকে দখলে নিতে পারলেই সমুদ্র পথ আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।"

"আমীরুল মুমেনীন থেকে যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে দিন। পরে একটু সময় দিন আমি ডাভেল বন্দরের নিয়ন্ত্রণ আপনার অধীনে এনে দেবো।" বললেন মুহাম্মদ।

"খলিফার অনুমতি নেয়ার চেষ্টা আমি অনেকদিন থেকেই করছি।" বললেন হাজ্জাজ। কিন্তু তিনি অনুমতি দিচ্ছেন না। হয়তো অনুমতি তিনি দেবেনই না। রাজা দাহির। নিজের বোনের স্বামী। আমি ওর দেহকে আরবদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে দেখতে চাই, ওকে আমি তুলা ধোনা করতে চাই...।"

"পরদিন মুহাম্মদ বিন কাসিম চাচা হাজ্জাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিরাজ নগরে চলে গেলেন।

✪ ✪ ✪

এর প্রায় দু'মাস পরের ঘটনা। বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দুপুরের আহারের পর আরাম করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন তার নিরাপত্তারক্ষী কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে, আর লোকটি ভিতরে প্রবেশে দ্বাররক্ষীর বাধা মানতে চাচ্ছে না। এ নিয়ে দ্বাররক্ষী ও আগন্তুকের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে। এরই মধ্যে কারো কণ্ঠে শোনা গেল "হে হাজ্জাজ সাহায্য করো! হে হাজ্জাজ সাহায্য করো! হাজ্জাজ আমাদের সাহায্য করো।"

হাজ্জাজ দ্বাররক্ষীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে কি হচ্ছে?"

"বাইরে এক ক্লান্ত-শ্রান্ত লোক এসেছে। সে সরন্দ্বীপ থেকে এসেছে বলে দাবী করছে। বলছে তাদের জাহাজ ডাকাতরা লুটে নিয়েছে এবং আরোহী সবাইকে ডাকাত দল বন্দি করে নিয়ে গেছে...।"

"তাকে এক্ষুণি ভিতরে নিয়ে এসো। জলদি যাও! আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকো না।"

"হাজ্জাজ দ্বাররক্ষীকে বিদায় করে সাহায্যপ্রার্থীকে নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি নিজেই দ্বাররক্ষীর পিছনে পিছনে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি বাইরে এসে দেখতে পেলেন, একজন অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে রয়েছে, আর ঘোড়াটি অত্যধিক খাটুনীর কারণে ঘেমে নেয়ে গেছে এবং হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ধুকছে ঘোড়াটি। আরোহীর মাথা বুকের সাথে মিশে গেছে। লোকটি হাজ্জাজের আগমন টের পেয়ে মাথা উঁচু করলে হাজ্জাজ দেখতে পেলেন, তার মুখ ব্যাদান হয়ে রয়েছে এবং চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে শুকিয়ে গেছে। শরীরে ধুলোবালির আস্তরণ পড়ে গেছে।

লোকটি হাজ্জাজকে দেখে বলে উঠলো, "হে হাজ্জাজ! আমাদের জাহাজ হিন্দুস্তানের ডাকাতরা লুট করেছে এবং আরোহী সবাইকে ধরে রাজা দাহিরের রাজমহলে নিয়ে গেছে।"

"তাড়াতাড়ি আরোহীকে পানি পান করানো হলো। হাজ্জাজের নির্দেশে তাকে মেহমানখানায় নিয়ে যেতে চাইলে লোকটি বলল, আগে আমার কথা শুনে নাও। পরে শোনার কথা বললে আরোহী বলল, এক্ষুণি আমার কথা শুনে নাও। আমার প্রাণ বায়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। হায়াত আমাকে বেশী সময় দেবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি এক নির্যাতিতা আরব কন্যার ফরিয়াদ বার্তা নিয়ে এসেছি।"

আগন্তুক বলল, সরন্দ্বীপে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মুসলমানদের জীবনযাত্রা ও তাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সেখানকার শাসক মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

তিনি মুসলিম খলিফার কাছে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আটটি জাহাজ বোঝাই করে উপহার উপঢৌকন পাঠালেন। এসব উপহার উপঢৌকনের মধ্যে দামী তৈজসপত্র ছাড়াও ছিল কিছু হিন্দুস্থানী উন্নত ঘোড়া অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্য পশু, কিছু সংখ্যক হাবশী দাস দাসী।

এসব উপহার সরন্দ্বীপের রাজা পাঠিয়েছিলেন সরন্দ্বীপে বসবাসকারী মুসলমানদের দিয়ে। তাদের জাহাজে ছিল কিছু সংখ্যক আরব ব্যবসায়ী যারা আরব ও হিন্দুস্তানে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাতায়াত করতেন। তাছাড়া কিছু

সংখ্যক মুসলমান পরিবার আরব ভূখণ্ডে তাদের আপনজনদের সাথে সাক্ষাতের জন্যেও রওয়ানা হয়েছিল। এই কাফেলায় আরো ছিলেন কিছু সংখ্যক উমরার উদ্দেশ্যে সফরকারী মুসলমান। এদের সাথে এমন কিছু তরুণ-তরুণী ছিল যারা হিন্দুস্তানের অধিবাসী আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের পিতা-মাতার মূল জন্মভূমি আরব দেশ দেখতে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল আরব ভূ-খণ্ডে।

সরন্দ্বীপ ও মালাবার থেকে যেসব মুসলমান আরব দেশে সফর করতো, তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন সিন্ধু এলাকা থেকে অনেক দূর দিয়ে যাতায়াত করে। যাতে তারা সিন্ধু এলাকার নৌ-ডাকাতদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই আটটি জাহাজ সিন্ধু উপকূলে পৌঁছার আগেই সাগরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল। বইতে শুরু করল উল্টো বাতাস। মাল্লারা জাহাজকে আটকাতে বহু চেষ্টা করলো কিন্তু ঝড়ো বাতাসের কারণে আটকানো সম্ভব হলো না। বাতাসের ধাক্কায় জাহাজ সিন্ধু উপকূলে চলে গেল।

এমতাবস্থায় সামুদ্রিক তুফানের চেয়ে আরো ভয়ংকর মনুষ্য তুফানে আক্রান্ত হলো জাহাজ। আরব মুসাফিরদের জাহাজে হানা দিলো সিন্ধু অঞ্চলের নৌ-ডাকাতেরা। এরা অনেকগুলো নৌকা নিয়ে চতুর্দিক থেকে আরব জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলল এবং তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে লম্বা রশি ফেলে আরবদের জাহাজে চড়তে শুরু করল। এদিকে আরব বনিকদের অধিকাংশেরই কোন অস্ত্র চালনার ট্রেনিং ছিল না। জনাকয়েক যুবকের হাতে মামুলী অস্ত্র ছিল, প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারা সবাই ডাকাতের হাতে নিহত হয়েছে।

জাহাজের সব ধন-দৌলত ডাকাতরা লুট করে, আরোহীদেরকে বন্দি করে নারী-পুরুষ, শিশুসহ সবাইকে ডাভেলের কারাগারে আটকে রেখেছে।

হাজ্জাজকে জাহাজ লুটের বিস্তারিত ঘটনা শোনাতে শোনাতে মুসাফিরের আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে এলো। কণ্ঠ হয়ে এলো অস্পষ্ট। হাজ্জাজ তার সামনে খাবার ও পানীয় এগিয়ে দিলেন; কিন্তু মুসাফির এই বলে খেতে অস্বীকার জানালো যে, আমি এক আরব কন্যার ফরিয়াদ শোনানো পর্যন্ত বেঁচে থাকবো, এরপর আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

ক্ষীণ কণ্ঠে খুবই কষ্টে মুসাফির বলল, ডাকাতরা আমাদেরকে যখন ডাভেলের উপকূলে নামালো, তখন ওরা সবাইকে নির্বিচারে চাবুক মারতে

শুরু করে। ওরা আমাদেরকে চাবুক মেরে মেরে তাড়িয়ে নিচ্ছিলো। কিন্তু বনী রাবিয়ার এক তরুণী ডাকাতদের এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পশ্চিম দিকে মুখ করে হাত তুলে চিৎকার করে বলল, হে হাজ্জাজ! আমাদের সাহায্য করো, হে হাজ্জাজ! আমাদের সাহায্য করো।"

"হাজ্জাজ মৃত্যু পথযাত্রী আগন্তুকের কথা শুনে আবেগতাড়িত হয়ে বলে ওঠেন "লাব্বাইক ইয়া বিনতি! লাব্বাইক ইয়া বিনতি! হে কন্যা আমি আসছি! হে আত্মজা, আমি অচিরেই তোমার পাশে উপস্থিত হচ্ছি।"

আগন্তুক আরো জানালো, গভর্নর! আপনি জেনে রাখুন, ওখান থেকে কোন বন্দির বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ডাকাতরা যখন দল বেঁধে তাড়িয়ে নিচ্ছিল, বেলাভূমিতে পথিমধ্যে অসংখ্য পুরনো নৌকা ছিল। আমি ছিলাম পিছনের সারিতে। হঠাৎ একলোক আমাকে আরবী ভাষায় ইঙ্গিত করে বলল, এদিকে এসো, লুকিয়ে পড়ো এ ভাঙা নৌকার আড়ালে। আমি এক সাথীর হাত ধরে টেনে নিয়ে একটি বড় নৌকার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। ডাকাত দল অন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই আরব লোকটি মধ্যবয়সী ছিল।

ডাকাত দল যখন অনেক দূরে চলে গেল, তখন আরব লোকটি আমাকে জানালো, "আমার নাম বেলাল বিন উসমান। বিদ্রোহী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আমি স্বেচ্ছায় এ দেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি ডাভেলে থাকি না। আমি থাকি এখান থেকে অনেক দূরে রাজা দাহিরের রাজ্যে। আমি রাজা দাহিরের স্ত্রী রাণীর একান্ত প্রহরী। সমুদ্র সফরের জন্য রাণী এখানে এসেছে। আমি যখন দেখলাম, ডাকাতরা আমার দেশের লোকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি এদিকে এসেছিলাম। আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না। আমি তোমাদেরকে দুটো ঘোড়া দিচ্ছি। এতে সওয়ার হয়ে সোজা বসরার শাসকের কাছে পৌছে যাবে। হাজ্জাজকে গিয়ে বলবে, এসব ডাকাত রাজা দাহিরের লোক। রাজা দাহির যাকে ডাভেলের শাসক নিযুক্ত করেছে, সে নিজেই ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ডাকাতদের আস্তানা থেকে কোন বন্দির মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। বেলাল দু'টি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমাদেরকে ডাভেল থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

আমার সঙ্গীর ঘোড়া বিরামহীনভাবে দৌড়ে ক্ষুৎ-পিপাসায় রাস্তায় পড়ে যায়। আমি পিছনে ফিরে দেখলাম, আমার সাথী ঘোড়ার নীচে পড়ে গেছে, আর ঘোড়াটি হাঁপাতে হাঁপাতে মরে গেল। কিন্তু আমার থেমে গিয়ে ওকে সাহায্য করার সুযোগ ছিল না। আমি আমার ঘোড়াকে চাবুক মারলাম। যখন

আমার ঘোড়াটিও ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে এলো তখন আমি একটি সৈন্য শিবির দেখে ওখানে ঘোড়া বদল করলাম। এরপর পথের আরেকটি সেনা ছাউনী থেকে এ ঘোড়াটিও বদল করে নিলাম। রাস্তায় আমি এক ঢোক পানি পানের জন্যেও থামিনি...। একথা বলেই আগন্তুকের যবান বন্ধ হয়ে গেল এবং থেমে গেল ঠোঁটের নড়াচড়া। চোখ দুটো বুজে এলো। দেখতে দেখতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

অবস্থা দৃষ্টে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মধ্যে এমনই অস্থিরতা সৃষ্টি হলো যে, তিনি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন এবং রাগে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু লাগলেন।

তখন আরব সাগরের কুলে অবস্থিত মাকরান ইসলামী শাসনের অধীনস্থ ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন হারুন নাসিরীকে মাকরানের উপশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। রাজা দাহিরের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় খলিফার জন্য প্রেরিত উপহার উপঢৌকন জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও আরব বংশোদ্ভূত মুসলমান নারী শিশুসহ জাহাজের সকল মুসলমান আরোহীকে জলদস্যুরা রাজা দাহিরের রাজ্যে বন্দি করে রাখার সংবাদ এবং একজন আরব কন্যার ফরিয়াদ ও উদ্ধার অভিযানের আহ্বানের দাস্তান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জাতিত্ববোধ প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দেয়, চরম প্রতিশোধের আক্রোশে তার দেমাগে আগুন ধরে যায়। তিনি তখনি রাজা দাহিরের নামে একটি চরমপত্র লিখে দূতের মাধ্যমে দাহিরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

হাজ্জাজ লেখেন, রাজা দাহির! তুমি তোমার রাজ্যে যেসব আরব মুসলমানকে বন্দি করে রেখেছ, তাদেরকে এই পত্র পৌঁছামাত্র সসম্মানে তাদের জাহাজে সওয়ার করে আরবে ফেরত পাঠাবে। সেই সাথে লুণ্ঠিত মালপত্র, ধন-দৌলত সব একটি জাহাজে দিয়ে দেবে। তাছাড়া যাদের বন্দি করে ক্ষতি করেছো এর ভর্তুকিও দিতে ভুল করবে না।”

হাজ্জাজ তার লিখিত পত্রে খলিফার সীল না লাগিয়ে নিজের সীলমোহর লাগিয়ে পত্রটি দূতের মাধ্যমে রাজা দাহিরের কাছে না পাঠিয়ে মাকরানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুনের কাছে পাঠিয়ে তাকে লিখে দিলেন, তুমি তোমার কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে দূতের সাথে পাঠাবে এবং সিন্ধু রাজা দাহিরকে বন্দিদের মুক্তির জন্য আবেদন করবে না, বরং বলবে, আমার পত্র পাওয়া মাত্রই কথা মতো কাজ করলেই তার জন্য ভালো হবে। হাজ্জাজ একথাও মাকরানের শাসককে লিখে দিলেন, তিনি যেন মাকরানে গোয়েন্দা ব্যবস্থা আরো তীব্রতর করেন এবং আরো দক্ষ গোয়েন্দা নিয়োগ করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দীর্ঘদিন ধরে রাজা দাহিরের ওপর বজ্র হয়ে আঘাত হানার জন্য একটা উপায় তালাশ করছিলেন। মুসলমানদের জাহাজ লুণ্ঠন হাজ্জাজের হাতে সেই সুযোগ এনে দিলো। জাহাজ লুটের ঘটনা শোনার পর থেকে হাজ্জাজের নাওয়া-খাওয়া, আরাম-আয়েশ নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রতিশোধের অগ্নিস্পৃহা তার হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। তিনি রাজা দাহিরের জবাবের অপেক্ষা না করেই সিন্ধু রাজ্যে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজা দাহিরের জবাব পৌঁছে গেল হাজ্জাজের কাছে। দূত জানালো, সে মাকরানের শাসকের দেয়া একজন অফিসারকে নিয়ে রাজা দাহিরের রাজধানী ব্রাহ্মণাবাদে গিয়ে রাজা দাহিরের সাথে সাক্ষাত করে হাজ্জাজের দেয়া পয়গাম পৌঁছায়। রাজা দাহিরের এক দোভাষী তাকে আরবী পয়গাম ভাষান্তরিত করে শোনাচ্ছিল। পয়গাম শোনার সময় রাজা দাহিরকে দেখে মেনে হচ্ছিল, সে হাজ্জাজের দেয়া কোন পয়গাম নয় তার কোন বিপন্ন প্রজার আবেদন শুনছে মাত্র। রাজা দাহির পয়গাম শুনে দূতের দিকে তাকিয়ে বলল, আরবদের জাহাজ রাজার লোকেরা লুট করেনি। লুট করেছে জলদস্যুরা, এদের ওপর সিন্ধু রাজার শাসন চলে না।

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফারিশ্‌তা লিখেছেন, রাজা দাহির হাজ্জাজের পয়গামের জবাবে লিখেছিল, "তোমাদের জাহাজ যারা লুট করেছে এবং লোকজনকে কয়েদ করেছে এরা খুবই লড়াকু দুর্ধর্ষ। তোমরা এদের কাছ থেকে তোমাদের বন্দি ও মালপত্র ফেরত নিতে পারবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না।" ফারিশ্‌তা লিখেন, রাজা দাহির প্রকারান্তরে এ কথাই বলল যে, তোমাদের জাহাজ আসলে আমাদের লোকেরাই লুট করেছে। কিন্তু তোমরা এ জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।

✪ ✪ ✪

তখনও পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককে জাহাজ লুট ও নাগরিকদের বন্দি করার ঘটনা অবহিত করেন নি। কিন্তু রাজা দাহিরের জবাব আসার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে দীর্ঘ পয়গাম পাঠালেন, সেই পয়গামে রাজা দাহিরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবও গেথে দিলেন। তা ছাড়া তিনি সিন্ধু রাজ্যে আক্রমণের জন্য খলিফার অনুমতি চাইলেন।

খলিফার দরবার থেকে সিন্ধু আক্রমণের অনুমতি দেয়া হলো না। কেন সিন্ধু আক্রমণ করা যাবে না এর পক্ষে কোন কারণ উল্লেখ করেন নি খলিফা।

খলিফার নেতিবাচক জবাব পেয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অনুমতির প্রত্যাশায় খলিফার কাছে দীর্ঘ একটি পত্র লিখলেন। এ পত্রে তিনি খলিফাকে উজ্জীবিত এবং তার মধ্যে ইসলামী জাতীয়তাবোধ ও জাত্যভিমান জাগিয়ে তোলার জন্য জাহাজে পাঠানো উপহার উপঢৌকন এবং আরোহীদের মধ্যে থাকা নারী শিশু ও হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশে সফরকারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। শেষ পর্যায়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা ওয়ালীদকে লিখলেন—

"আমীরুল মুমিনীন! আপনি হয়তো ভাবছেন, দূরবর্তী এলাকায় নতুন একটি যুদ্ধ শুরু করার কারণে বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হবে। আমি আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এ যুদ্ধ শুরুর আগে ও পরে যতো ব্যয় হবে আমি এরচেয়ে দ্বিগুণ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেবো।"

হাজ্জাজের পীড়াপীড়িতে অবশেষে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

খলিফার অনুমতি পাওয়ার পর হাজ্জাজ তাৎক্ষণিকভাবে সিন্ধুরাজ্যের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রাখা সেনা ইউনিটকে। এ অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহানকে। আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহান সেনাদের নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ধারণাতীত কম সময়ের মধ্যে ডাভেল পৌছে গেলেন।

এ অভিযানে হাজ্জাজ একটি মারাত্মক ভুল করলেন। গোয়েন্দারা তাকে রাজা দাহিরের সমরশক্তি ও সেনাদের যুদ্ধ ক্ষমতার সঠিক তথ্য চিত্র দিয়েছিল কিন্তু অত্যধিক ক্ষুব্ধ থাকার কারণে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের বাহিনীর সমর শক্তি পর্যালোচনা করেন নি। তিনি তার সেনাদের লড়াই ক্ষমতার ওপর বেশী আশ্বস্ত ছিলেন। ভেবেছিলেন ডাভেলের পৌত্তলিক সেনারা এদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোরই সাহস পাবে না। কিন্তু ঘটনা হাজ্জাজের ধারণার বিপরীত ঘটে গেল।

রাজা দাহির অসতর্ক ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আরবরা যে কোন মূল্যে কয়েদীদের মুক্ত করতে তার দেশে আক্রমণ চালাবে। এজন্য সে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রেখেছিল। মুসলিম বাহিনী পৌছার খবর পেয়ে সে সকল সেনাদেরকে দুর্গ বন্দি করে

তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুলল। দাহিরের সেনাদের মধ্যে বিচক্ষণ কমান্ডারের অভাব ছিল না। এরা দুর্গের বাইরে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে রাজাকে রাজী করালো এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু করল। শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়ল মুসলিম বাহিনী। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে নাবহান প্রথম দিনের যুদ্ধেই আচমকা এক আঘাতে নিহত হলেন ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো।

সেনাপতির অবর্তমানে সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে নাবহান শত্রুদের মোকাবেলায় কোন ত্রুটি করেননি কিন্তু তার মৃত্যুটা ছিল একটা দুর্ঘটনা। সেনাপতির মৃত্যুর ফলশ্রুতিতে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যখন হতাশা ছড়িয়ে পড়লো এর পূর্ণ সুযোগ নিলো দাহিরের বাহিনী। তারা আরো প্রবল বিক্রমে আঘাত হানলো। সেনাপতি হারা বাহিনী আঘাতের তীব্রতা সামলাতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হলো। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয় হাজ্জাজের জন্য বয়ে আনলো মারাত্মক বিপর্যয়।

পর্ব তিন

পরাজয়ের গ্লানি হাজ্জাজ হজম করে নিলেন বটে কিন্তু এ পরাজয় তার ঘুম, নাওয়া-খাওয়া, আরাম স্বস্তি সবই দূর করে দিলো। স্বভাবতই হাজ্জাজ ছিলেন কঠিন হৃদয়ের মানুষ। সেই সাথে আগ্রাসী। তার স্বভাব চরিত্রে ক্ষোভ ও গযব ছিল রক্তের শিরায় শিরায় মেশানো। হাজ্জাজ যখন কারো বিরুদ্ধে ক্ষেপে যেতেন তখন মনে হতো তার হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশমাত্র নেই। মায়া মমতা কি জিনিস এটা বোধ হয় হাজ্জাজ কখনও বুঝেন নি। খেলাফতের যেসব বিদ্রোহী ভয়ে আরব দেশ ত্যাগ করে আরব সাগরের এপারে এসে মাকরানে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা কোন না কোন শর্তে খলিফার আনুকূল্যে দেশে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু তাদের কেউ হাজ্জাজের ভয়ে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করারও সাহস করত না। কারণ তারা জানত খলিফা তাদের বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেও হাজ্জাজ তাদের কখনও ক্ষমা করবে না।

যে হাজ্জাজের নির্মমতা ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে খলিফা নিজেও গুণে গুণে তার সাথে কথা বলতেন, সেই হাজ্জাজের পক্ষে এতো বড় পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করা সম্ভব ছিল না। হাজ্জাজ যখন খবর পেলেন, তার পাঠানো সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে দাহির বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে এবং সেনাপতি নাবহান মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তিনি সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলকে ডেকে তাকে ডাভেল আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে বললেন—

"তোমাকেও যদি রণাঙ্গন থেকে পিছপা হতে হয়, তাহলে এদিকে আর ফিরে এসো না। যেসব বিদ্রোহী মাকরানে বসতি গড়েছে, ওদের ওখানে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিও। কারণ ওদের জন্য আরবের দরজা বন্ধ। ওখানে গিয়ে মরে যেয়ো। আমি যে কোন মূল্যে রাজা দাহিরের কব্জা থেকে ডাভেলের দুর্গ ছিনিয়ে আনতে চাই, সেই সাথে চাই দাহিরের মৃত কিংবা জীবিত দেহ। এর বিকল্প অন্য কিছু আমার দরকার নেই।"

"আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হোক ইবনে ইউসুফ! বললেন সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল। আমি ডাভেল ফেরত সৈন্যদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সেনাপতি আব্দুল্লাহ রণাঙ্গনে পিঠ দেখায়নি। সাহসিকতার সাথে সে শত্রুদের মোকাবেলা করেছে। সে দাহির বাহিনীর মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে ওদের মধ্যভাগে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু রাজা দাহিরের ছিল হস্তি বাহিনী। ওরা হাতির ওপর থেকে অসংখ্য তীর বৃষ্টি ছুড়ে তাকে ঘায়েল করে ফেলে।

মুহতারাম ইবনে ইউসুফ! আপনি ইরাকের শাসক। আব্দুল্লাহ্‌র বাহাদুরী ও মৃত্যুকে কাপুরুষতার ভারতীয় আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দেবেন না। মৃত্যু যে কোন মানুষের জীবনে যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। আল্লাহ্‌র কুদরতকে নিজের কব্জায় নেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হোন সম্মানিত আমীর!"

"আল্লাহর কসম করে বলছি ইবনে তোফায়েল! তোমার এই সাহসিকতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আসলে পরাজয়ের গ্লানি ও প্রতিশোধের আগুন আমাকে এমন ভয়ানক কুফরী কথার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করুন।"

বুদাইল! তুমি একটু ভেবে দেখো। আমার সিন্ধু অভিযানে খলিফা মোটেও রাজি ছিলেন না। তাকে অনেক ফুসলিয়ে রাজি করিয়েছি। এই ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়ের খবর পেয়ে তিনি আমাকে যে পয়গাম পাঠিয়েছেন, তা আমার মাথাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ইবনে ইউসুফ! আমি সিন্ধু অভিযানে সম্মতি না দেয়ার কোন কারণ উল্লেখ না করায় আপনি রুষ্ট হয়েছিলেন। এখন বুঝলেন তো কেন আমি এতোদিন আপনাকে সিন্ধু অভিযানের অনুমতি দেইনি?" পুনর্বার আমাদের অভিযানের জন্য কি খলিফার অনুমতি পাওয়া যাবে? হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করল সেনাপতি বুদাইল।

"কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই আমার। এটা আমার পরাজয়, এটা ইসলামের পরাজয়। এ পরাজয়কে অবশ্যই বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। আমি আমীরুল মুমিনীনকে বুঝাতে চাচ্ছি, সিন্ধু এলাকার অধিকার কেন আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে।

বুদাইল! তুমি নিজেও বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করো। আমি এখন দু'জনের পরাজয়ের শিকার। রাজা দাহিরের কাছেই শুধু আমি পরাজিত হইনি, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দৃষ্টিতেও আমি পরাজিত। তুমিও যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তাহলে জীবনের জন্য আমার হাত পা অকার্যকর হয়ে

যাবে, আর আরব সাগরের ওপারে সরন্দীপ (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) ও মাকরানে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে আরো অসহায় করে তুলবে। এরপর দেখবে হিন্দুস্থানের জলদস্যুরা কোনকিছুর তোয়াক্কা না করে অবাধে তাদের জাহাজ ও ঘরবাড়ি লুটতরাজ করে তাদের ধরে ধরে গোলাম বাঁদী বানাবে।"

"না, এমনটি হবে না, ইবনে ইউসুফ!" বলল বুদাইল বিন তোফায়েল।

এ কথা একটু চিন্তা করো বুদাইল! আমার ধর্মের এক নির্যাতিতা কন্যা আমাকে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে। বন্দিদশা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ডাক দিয়েছে। সেই নির্যাতিতা আরব কন্যার ফরিয়াদ এখানে নিয়ে আসা লোকটি আমার সামনে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা গেছে। সে আমার কাছে খবর পৌঁছানোর দায়িত্ব জীবন দিয়ে পালন করেছে। কিন্তু আমি যদি এর পরও স্বজাতির এসব নির্যাতিতা নারী শিশুদের উদ্ধারে তৎপরতা না চালাই, কেয়ামতের দিন আমি ওদের সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াবো!"

✪ ✪ ✪

বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলকে পুনরায় আক্রমণের জন্য ব্রিফিং দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজা দাহির তার রাজধানী অরুঢ় এ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। তার সামনে মাকরানে বসতি স্থাপনকারী আশ্রিত মুসলিম নেতা হারেস আলাফীকে ডেকে আনা হলো। দাহির বাহিনীর হাতে সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন নাবহানের মৃত্যু ও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের পর এটাই দাহির ও আলাফীর প্রথম সাক্ষাত।

"শাইখ আলাফী! তোমাদের শত্রুকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, এতে তুমি কী খুশী হওনি?"

"না মহারাজ! এ পরাজয়ে আমরা খুশী হতে পারি না। এটা শুধু শাসকগোষ্ঠী বনি উমাইয়ার পরাজয় নয়। এটা মুসলমানদের পরাজয়। ইসলামের পরাজয়।" বলল আলাফী।

"তাহলে তো আমাদের বিজয়েও তোমরা খুশী হতে পারোনি।" বলল রাজা দাহির।

"মহারাজ! আপনার চেহারা ছবি, আপনার দৃষ্টি অভিব্যক্তি বলছে, আপনি আমার সাথে নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চান। এসব উপকথার চেয়ে কি এটা ভালো হয় না, যে কথা বলার জন্য আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে আলোচনা শুরু করুন।"

"ঠিকই বলেছ আলাফী! বলল রাজা দাহির। আমি একটা জরুরী কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি আমাকে পরামর্শ দাও, আরবরা কি পুনর্বার আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে?"

"আরববাসীর আত্মমর্যাদাবোধ যদি মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে পুনর্বার হামলা করাটা নিশ্চিত বলা যায়। খলিফা হয়তো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কট্টরপন্থী ও নির্মমতার জীবন্ত মূর্তি। সে অতো সহজে এ লজ্জাজনক পরাজয় হজম করে নেবে না। এবারের যুদ্ধে সে আপনার সমরশক্তির সঠিক আন্দাজ করে নিতে পারবে। পুনর্বার আক্রমণ করলে সে কোন মতেই পরাজয় বরণ করতে আসবে না।"

"তখন কি তোমরা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না?"

"না, মহারাজ! আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের ঠিকানা আরব দেশ। আমরা এখানে আশ্রিত হলেও স্বজাতি ও স্বদেশীদের বিরুদ্ধে আমরা তরবারী ধরতে পারবো না।"

"আরব বাহিনী যদি পুনর্বার আক্রমণ করে, তাহলে তোমাদের সহযোগিতা আমাদের খুব প্রয়োজন হবে। এ সহযোগিতার জন্য তোমরা যে প্রতিদান চাও, আমি তাই তোমাদের দেবো। তোমরা যদি চাও, তাহলে যে এলাকায় তোমরা থাকো সেটি তোমাদের জন্য স্বাধীন করে দিতে পারি। তখন সেটি হবে একান্তই তোমাদের রাজ্য।"

"আমরা আপনাকে এতটুকু সহযোগিতা করতে পারি যে, আমরা আপনার বিরুদ্ধে তরবারি ধরব না। আমরা নিরপেক্ষ থাকব।" বললেন আলাফী।

"একটু ভেবে চিন্তে বলো আলাফী! ধমকির স্বরে বলল রাজা দাহির। আমি তোমাদেরকে এখানে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের আবার ঠিকানা ছাড়া করতে পারি। যেভাবে আবাদ করেছি, সেইভাবে বরবাদও করতে পারি। তোমাদেরকে আমরা দেশ থেকে বের করে দিতে পারি, কয়েদখানায় বন্দি করতে পারি।"

"মহারাজ! আমাদের ব্যাপারে কোনকিছু করার আগে আপনার উজির বুদ্ধিমানের সাথে পরামর্শ করে নিন।" বললেন আলাফী। আমি আবারো আপনাকে বলছি, আমরা আপনাকে এই সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে শরীক হবো না আর আপনার পক্ষেও যুদ্ধ করব না। আমরা থাকব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আপনার একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আপনি যাদের লুট করেছেন, এদের সাথে আমাদের লোকজনও রয়েছে। রয়েছে নারী শিশু বৃদ্ধ

ও অসহায় লোক। আপনি আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। এর বিপরীতে আমরা আমাদের লোকজনকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে পারি। আপনি তো শুধু হুমকি দিয়েছেন। আমরা বাস্তবে ঘটিয়ে দেখাতে পারি।"

"আমি তোমাদেরকে একথা কিভাবে বিশ্বাস করাবো, বন্দিরা কোথায় রয়েছে আমি তা জানি না। আমি কাউকেই জাহাজ লুট করার নির্দেশ দেইনি। জাহাজ লুণ্ঠনকারীরা অত্যন্ত লড়াকু জাতির লোক। তোমরাও জাহাজ লুটের জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করলে? এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের ওপর আর আমার ভরসা করা ঠিক হবে না।"

আলাফী দাঁড়িয়ে গেলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "মহারাজ! আমরা আপনার সবচেয়ে প্রতাপশালী শত্রুকে যেভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম এরা পুনর্বার আপনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করতেও ভয় পাবে। হিন্দুস্তান থেকে যদি আপনার বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে আমরা তাদেরকে চিরদিনের জন্য খতম করে দিতে পারব। কিন্তু আমরা আরব আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না। আপনাকে বুঝতে হবে, আমাদের বিরোধ শাসকদের সাথে; ধর্ম জাতি ও সালতানাতের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই।"

"এতে পার্থক্য আর কি রইলো?" বলল দাহির। রাজা আর রাজ্যের মধ্যে তো কোন তফাত নেই। যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাকে আমি রাজ্যের দুশমন, দেশ ও জাতির শত্রু, বিদ্রোহী মনে করব।"

"ইসলামী শাসনে কোন রাজা থাকে না।" বললেন আলাফী। এখানকার খলিফাকে কখনো রাজা মনে করা হয় না আর নাগরিকদেরকে কখনও প্রজা ভাবা হয় না। কেউ যদি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাকে খলিফা খেলাফত ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে অভিহিত করতে পারে না। এসব কথা থাক মহারাজ! আমি আপনাকে আবারো বলছি, আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না।"

কথা শেষ করে হারেস আলাফী রাজার কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে চলে এলেন। রাজমহলের বাইরে তার ঘোড়া অপেক্ষমান। তিনি অশ্বারোহণ করে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর এক লোক হঠাৎ তার পথ আগলে 'আসসালামু আলাইকুম' বললে আলাফী ঘোড়া থামিয়ে দিলেন।

"কে তুমি?" স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন আলাফী।

"আপনার স্বদেশী। আরবী ভাষায় জবাব দিলো লোকটি। আমার নাম বেলাল বিন উসমান।"

"আল্লাহর কসম! তোমার চোখের দৃষ্টিতে আমি মরুভূমির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এখানে কিভাবে এলে? কি করছ?"

"আমি রাজমহলের নিরাপত্তা রক্ষী।" বলল বেলাল। বনী উসমান কবিলার ছেলে আমি। আপনি কি আমার বাবা উসমান বিন হিশামকে চিনতেন?"

"এসো বেটা, এসো। আমরা যখন দেশ ছেড়েছি, তখন তুমি হয়তো খুবই ছোট ছিলে...। তোমার বাবাতো পাহাড় চিড়ে কলিজা বের করে আনতে পারতেন। একমাত্র আল্লাহ্কে ভয়কারী এই মানুষটিকে সমীহ্ করতো না এমন মানুষ তখন আরবে ছিল না। তিনি বিশেষ কোন নেতা ছিলেন না বটে; কিন্তু নেতারাও তার সামনে মাথা হেট করে দিত।...যাক সেসব কথা। এখন বলো তো! এখানে কিভাবে এলে? আর আমাদের কাছে এলে না কেন?"

বেলালের ইঙ্গিতে আলাফী ঘোড়া থেকে নেমে এলেন এবং উভয়েই একত্রে হেঁটে এগুতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে বেলাল আলাফীকে জানালো, কিভাবে সে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কেমন করে রাজমহলের নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু মায়ারাণীর সাথে একান্ত সম্পর্কের কথা আলাফীর সাথে চেপে গেল বেলাল।

"যাক, আমি যে জন্য পথ রোধ করে আপনাকে থামিয়েছি, সে কথা বলছি। কিন্তু ভয় করছি, আপনি রাজার উপকার ভোগী। রাজা দাহির আপনাদের ওপর এতো বেশী অনুগ্রহ করেছে, যার ফলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, রাজ আনুকুল্যের চাপে আপনারা তলিয়ে গেছেন কি-না!"

"এমন আশঙ্কা কেন করছো ইবনে উসমান!"

"আমি দেখেছি, কাফেরদের অনুগ্রহে অনেকের ঈমান চাপা পড়ে যায়।...আমি আপনার উদ্দেশ্যে এসব কথা এ জন্য বলছি, রাজা দাহির আরবদের জাহাজ লুট করিয়েছে এবং আরব শিশু কন্যাসহ মুসলমান হজ্জ যাত্রীদেরকে বন্দি করে রেখেছে। আরব সৈন্যদের আক্রমণে আশা করেছিলাম বন্দিরা মুক্তি পাবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা গুঁড়িয়ে দিয়ে আরব বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।"

"আরে বাবা! তুমি আসলে কি বলতে চাও, সে কথা বলো। যেসব বিষয় আমি তোমার চেয়েও ভালো জানি, সেসব কথা আমাকে বলার দরকার কি?"

"হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি, বন্দিদের উদ্ধারের জন্য আপনি কি কিছু করবেন? বনী উমাইয়ার প্রতি আপনার ক্ষোভ ও ঘৃণা কি নির্যাতিত নিরপরাধ লোকগুলোর সাহায্য করতে বাধা দিচ্ছে?"

বেলালের সংশয় ও শঙ্কা দূর করতে আলাফী রাজা দাহিরের সাথে তার কথোপকথন ও তার সর্বশেষ অবস্থানের কথা জানালেন।

"আমার মনে হয় খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক একটি পরাজয়েই এখানকার বন্দি মুসলমানদের কথা ভুলে গেছে।"

"খলিফা ভুলে যেতে পারে; কিন্তু হাজ্জাজ ভুলবে না। আমি তাকে ভালোভাবে চিনি। সে খুনের বদলা খুনের বিনিময়েই নিয়ে থাকে।"

"কিন্তু আমি হাজ্জাজের আক্রমণের অপেক্ষা করবো না। আপনি তো জানেন, কেমন বাবার রক্ত শরীরে বহন করছি। এতোদিন পরামর্শ নেয়ার মতো কাউকে পাইনি আমি। আজ রাজমহলে আপনার আসার কথা শুনে পূর্ব থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম। রাজমহল থেকে আপনাকে বের হতে দেখেই আমি আপনার সাথে কথা বলার জন্য পথ আগলে দাঁড়িয়েছি।"

"তা তো বুঝলাম! কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি কি করতে চাও?"

"আমি বন্দিদেরকে মুক্ত করতে চাই।" বলল বেলাল। কিন্তু কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে তারা যাবে কোথায়? আপনি কি তাদের আশ্রয় দিতে পারবেন?

"ইবনে উসমান! তুমি যদি বন্দিদের মুক্ত করতে পারো, তাহলে তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি তাদেরকে জায়গা করে দেবো এবং সুযোগ মতো তাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো-তুমি এদেরকে মুক্ত করবে কিভাবে?

"এজন্য আমাকে রাতের বেলায় কয়েদখানায় প্রবেশ করতে হবে। হয়তো জীবনবাজী রাখতে হবে। এমনও হতে পারে, আমরা কয়েদখানায় প্রবেশ করে আর কোনদিনই বাইরে আসার সুযোগ পাবো না।"

"তোমরা কতোজন?"

"তিন চার জনের বেশী নয়।" বললো বেলাল।

বেলাল ও আলাফী হাটতে হাটতে কথায় কথায় বন্দিদের মুক্ত করার পরিকল্পনা তৈরী করল। এমতাবস্থায় দুর্গের প্রধান ফটক এসে গেল। আলাফী বেলালকে বললেন "এখন আর আমার সাথে তোমার যাওয়া ঠিক হবে না, দুর্গের ভিতরেই তুমি থেকে যাও।"

বেলাল যখন প্রাসাদে ফিরে আসছিল, তখন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল দাহিরের বন্দিশালা থেকে বন্দিদের মুক্ত করার পরিকল্পনা। কারণ আলাফী তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সাথে সুন্দর পরিকল্পনাও দিয়েছেন। মায়ারাণীর প্রতি বেলালের মনে খুবই ক্ষোভের সঞ্চার হলো। বেলাল অনেকবার মুসলিম বন্দিদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য মায়ারাণীকে রাজা দাহিরের কাছে প্রস্তাব করার কথা বলেছে। কিন্তু প্রতিবারই মায়ারাণী তাকে একথা বলে নাকচ করে দিয়েছে যে, রাজা দাহিরের ওপর তার কোনই প্রভাব নেই। রাজা এ ব্যাপারে কারো কথা শুনবে না। রাজ কাজে নাক গলানো রাজা মোটেও পছন্দ করে না।"

মায়ারাণীর আগের সেই রূপ সৌন্দর্য নেই। এতোদিনে সে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মায়রাণীর বয়স বাড়লেও বুড়িয়ে যায়নি। রাজকীয় আরাম আয়েশে থাকার কারণে শরীরের কাঠামো একটুও ভাঙেনি। এখনও প্রায়ই মায়ারাণী বেলালকে একান্তে ডেকে নিয়ে বহুক্ষণ কাছে রাখে। কিন্তু বেলালের এই অনুরোধ না রাখায় বেলাল মায়ারাণীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বেলাল মায়ারাণীকে তাদের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলেছিল, বিষয়টি রাজার কাছে উত্থাপনের জন্য। কিন্তু বেলাল বুঝতে পারল মায়ারাণী আসলেই রাজার কাছে অসহায়। এদিকে বেলাল ও আলাফী বন্দিদের মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা করছে, আর অপর দিকে বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার সেনাপতি বুদাইলকে অভিযানের শেষ দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। হাজ্জাজ বলছিলেন-বুদাইল! তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছ, সিন্ধু অভিযানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতখানি? আমি অনেক আগেই সিন্ধু অঞ্চলের উপকূল দখল করতে চেয়েছিলাম। আশা করি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ তুমি।"

"হ্যাঁ' ইবনে ইউসুফ! আমি বুঝতে পেরেছি, সিন্ধু উপকূলে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রীলংকা ও মাকরানে আমাদের জাহাজ নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে।" বললেন সেনাপতি বুদাইল।

"আল্লাহর কসম! তুমি আমার মনের কথাই বলেছ বুদাইল! তুমি হয়তো জানো, আমীরুল মুমিনীন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি সিন্ধু আক্রমণের ঘোর বিরোধী। তিনি নির্বিবাদে হুকুমত করতে চান। আসলে অত্যধিক শান্তিকামিতা দুশমনকেও দোস্ত বানিয়ে ফেলে। অত্যধিক শান্তিপ্রিয় মানুষ এটা বুঝতেই চায় না আদর্শিক দুশমন কখনো বন্ধু হতে পারে না। দুশমনই থেকে যায়। তুমি তো জানো, আমীরুল মুমিনীন আমাকে সিন্ধু অভিযান থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, আমি এখন তার অনুমতি ছাড়াই পুনর্বার অভিযান চালাবো।"

"এতে আমীরুল মুমিনীন বিগড়ে যাবেন না তো?" জিজ্ঞেস করলেন সেনাপতি বুদাইল।

"বিগড়ে গেলে যাক। আমিরুল মুমিনীনের সন্তুষ্টির চেয়ে আমার কাছে জাতির সম্মান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। খেলাফতের মসনদে বসে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বুঝতেই পারছেন না, আজ যদি আমরা এক ব্রাহ্মণ রাজার দাপটে এভাবে চুপসে যাই, তাহলে দু'দিন পরেই সে আমাদের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি দেখাবে। ব্রাহ্মণদের মেজাজ আমি জানি। যে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য নিজের সহোদর বোনকে বউ বানিয়ে রাখতে পারে, ওর ওপর কিভাবে আস্থা রাখা যায়?"

"একটি বিষয় তো আপনি ভাবেননি ইবনে ইউসুফ" বললেন সেনাপতি বুদাইল। সিন্ধু রাজা দাহির তার দেশে পাঁচশ বিদ্রোহী মুসলমানকেও আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। শুনলাম ওইসব আরবরা তার পক্ষে একটি যুদ্ধও করেছে এবং রাজা দাহিরের প্রবল শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। এমন আশঙ্কা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না, খেলাফতের শত্রু এসব বিদ্রোহী মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধেও হাতিয়ার তুলে নেবে?"

"তা হতে পারে।" বললেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আমি ওদের খবর নেয়ার জন্য গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত এমন কোন খবর আসেনি যে, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেবে। এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও আমাদের এজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ এরা আমাদের বিদ্রোহী, আমাদের বিরুদ্ধে দুশমনদের পক্ষ নেয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে আমরা দ্বীপান্তর করেছি। আর কিছু স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেছে। এদের মনে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে। এই ঘৃণা ও ক্ষোভ তাদেরকে বিরোধিতার প্ররোচনা দিতে পারে। এটা মনে রেখেই আমাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে।"

"হ্যাঁ' ইবনে ইউসুফ। আমি এ পরিস্থিতির জন্য তৈরী। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। যেদিন থেকে মুসলমানদের তলোয়ার পারস্পরিক সংঘাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে, উম্মতের অধঃপতন সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে। যেই আমার সামনে আসুক না কেন, আমি তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে কসুর করবো না। কিন্তু আমার ভয় হয়, মুসলমান ভাইদের শিরে তরবারী চালাতে আমার হাত কাঁপে কি-না।"

"তার মানে হলো, তখন তোমার প্রতিপক্ষ মুসলমান ভাই তোমার শরীর থেকে তোমার মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই না?" বললেন হাজ্জাজ। শোন বুদাইল! খলিফার অনুমতি না নিয়েই এতো দূরের ঝুঁকিপূর্ণ একটি অভিযান চালাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি নিছক আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়; মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত স্বার্থে। মুসলমানদের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে।

বুদাইল! তোমার মনে রাখতে হবে, মসনদ টিকিয়ে রাখতে খলিফা ওয়ালিদ যদি তার সহোদর ভাইকে গলাটিপে হত্যা করতে পারে। মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে আমি কিছু লোকের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করব না। আমি খেলাফতের বিশ্বস্ত তা ঠিক, তবে নিজের অবস্থানকে আমি অবশ্যই এতোটুকু মজবুত করতে চাই যাতে খলিফা আমার ব্যাপারে নাক গলাতে চিন্তা-ভাবনা করে।...একথাও মনে রাখবে বুদাইল! তোমার ভাগ্য এখন আমার হাতে। তুমি যদি সিন্ধু জয় করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করব।"

"হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তৎকালীন খলিফার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিন্তু খলিফার মতো তিনি দোস্ত-দুশমন চিনতে ভুল করতেন না। কারা তার শত্রু, আর কারা মিত্র, এ ব্যাপারে তার হিসাব ছিল নির্ভুল। মুসলমানদের জাহাজ লুণ্ঠনকারী রাজা দাহিরকে চরম শিক্ষা দিতে তিনি অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে পাগলপ্রায় করে তুলেছিল।

"ইবনে তোফায়েল! সেনাপতি বুদাইলের উদ্দেশ্যে বললেন হাজ্জাজ। তুমি আর আম্মান ফিরে যাবে না। তোমাকে মাত্র তিনশ অশ্বারোহী দিচ্ছি। আমি মাকরানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুনকে পয়গাম পাঠিয়েছি, সে তোমাকে তিন হাজার সৈন্য দেবে। তুমি সোজা মাকরানে চলে যাবে। সেখানে গেলে মুহাম্মদ বিন হারুন তোমার ওখানে করণীয় কি তা বলে দেবে। আমার সকল গোয়েন্দা কর্মীরা তার সাথে যোগাযোগ রাখে।

✪ ✪ ✪

রাজা দাহির তার উজির বুদ্ধিমানকে ডেকে পাঠালো।

"বিজ্ঞ উজির কি ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?" উজিরকে জিজ্ঞেস করল রাজা দাহির। উজির কি মনে করেন, আরব দেশের দিক থেকে আরেকটা তুফান আসবে?"

"তুফান আসাটা তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা মহারাজ! তুফান কখনো পূর্বদিক থেকে আসে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আসে। তুফান যেদিক থেকেই আসুক না কেন, সেটা লক্ষণীয় বিষয় নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমরা সেই তুফান মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি কতটুকু নিয়েছি। আমি একথা বলতে পারি, আরব দেশ থেকে একটা ঝড় অবশ্যই আমাদের দিকে আসবে, এজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে মহারাজ!"

"রমলের রাজার আক্রমণ প্রতিরোধে তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে আশ্রিত আরব মুসলমানদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য। তোমার পরামর্শে আমি তাদের সহযোগিতা চাইলে তারা রমলের বাহিনীকে শোনচীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। এবার সম্ভাব্য আরব আক্রমণে আমি আরব সর্দারকে ডেকে এনে সহযোগিতা চেয়েছিলাম। আরব সর্দার আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সে আমাকে উল্টো আরব বন্দিদের মুক্ত করে দিতে বলেছে। আরো জানিয়েছে, মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। এখন তুমিই বলো, এদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? আমি কি এদের অকৃতজ্ঞতার স্বাদ বুঝিয়ে দেবো?"

"না মহারাজ! বলল উজির। শত্রু সংখ্যা বাড়াবেন না। এদেরকে শত্রু বানালে এরাও সুযোগ বুঝে পিছন দিক থেকে আঘাত হানবে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব আরো মজবুত করুন, আর গোয়েন্দা লাগিয়ে ওদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করুন। অবশ্য এদেরকে বন্ধু মনে করে কখনো বিশ্বাস করবেন না। মুসলানদেরকে সব সময় শত্রু ভাবতে হবে। সেই সাথে ওদেরকে মাকরানেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ করুন। তাদেরকে যদি অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দেন, তাহলে তারা ইসলামের প্রচার করতে শুরু করবে। আসলে এরা এমন শত্রু যে শত্রু মহারাজের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠছে। আর এটি এমন অন্ধকার যে অন্ধকার মহারাজের প্রদীপের নীচেই বিরাজ করছে।"

"এরা যদি আরব আক্রমণকারীদেরকে গোপনেও কোন সহযোগিতা করে, তাহলে আমি ওদের সবাইকে খুন করে ফেলব। সিন্ধু ও সারা ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু ধর্ম থাকবে, আর কোন ধর্ম থাকবে না।" বলল রাজা দাহির।

"বন্দিদের ছেড়ে দিলে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে এ নিয়ে কি মহারাজ কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন?" বলল উজির।

"না উজির! এ নিয়ে আমি কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি।" বলল রাজা দাহির। বন্দিদেরকে আমি মুক্ত করে দিলে আরব শাসকরা আমাকে দুর্বল

ভাবতে থাকবে। তাছাড়া আমি আরব দূতের কাছে তো অস্বীকার করেছি বন্দিরা আমার নাগালের ভিতরে নেই, আমি তাদের বন্দি করিনি। এখন আমি কোন মুখে ওদের মুক্ত করে ওরা আমার কাছেই বন্দি ছিল একথা প্রমাণ করব। না, এটা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বন্দিদের বাকী জীবন বন্দিশালাতেই কাটাতে হবে।"

✪ ✪ ✪

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আরব মুসাফিরদেরকে অরুঢ়ের এক দুর্গসম বন্দিশালায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল। বন্দিশালার প্রশাসকের নাম ছিল কুবলা। সে ছিল কট্টর হিন্দু। রাজা দাহিরের সময় অরুঢ়ের জেলখানা ছিল খুবই বিখ্যাত। বন্দিশালার ভিতরটা ছিল বিশাল। এতে কোন মানুষকে ঢুকানো হলে, সে আর সভ্য জগতের বাসিন্দার মধ্যে গণ্য হতো না। বন্দিশালায় কয়েদীদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো যা সভ্য জগতের মানুষ ভাবতেও শিউরে উঠতো।

বন্দিশালার একটি গারদখানায় ছিল অনেক কক্ষ। আরব বন্দিদেরকে এসব কক্ষে রাখা হয়। একেকটি কক্ষে এক একটি কবিলা রাখা হয়েছিল।

সে রাত ছিল বন্দিদের প্রথম রাত। মধ্য রাতের পর বন্দিশালার দারোগা বন্দিদের দেখতে এলো। বন্দিদের যখন কয়েদখানায় ঢুকানো হচ্ছিল কয়েদখানার দারোগা কুবলা তাদের দেখেছিল। বন্দিদের মধ্যে ছিল যুবতী সুন্দরী তরুণী। এদের দেখার উদ্দেশ্যেই রাতের দ্বিপ্রহরে দারোগা কুবলা বন্দিশালায় নতুন বন্দিদের দেখতে এসেছিল। কুবলা বন্দিশালার বন্দিদেরকে নিজের কেনা গোলাম বাঁদী ভাবতো। কোন বন্দি কোন দিন কুবলার কাছ থেকে কোন মানবিক আচরণের প্রত্যাশা করতো না। আরব মুসাফির বন্দিরা মুসলমান হওয়ার কারণে অমুসলিম কুবলার কাছ থেকে সদাচারের প্রত্যাশা করার কোনই অবকাশ ছিল না।

মাটির নীচের বন্দিশালার সিঁড়িতে পৌঁছলে কুবলার কানে ভেসে এলো ক্ষীণ আওয়াজের গণসঙ্গীতের মতো আওয়াজ। কুবলা আওয়াজ শুনে থেমে গেল এবং আওয়াজটি বুঝার চেষ্টা করল। সমবেত কণ্ঠের এ আওয়াজ তার ভালো লাগল। সাধারণত বন্দিদের শিকলের আওয়াজ, চাবুক পেটানোর শব্দ ও আর্তচিৎকার শুনতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু জাহান্নাম সদৃশ এই জিন্দানখানায় সঙ্গীতের মতো মিষ্টি মধুর আওয়াজ নির্মম নিষ্ঠুর কুবলার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো।

তখন কুবলার সাথে বন্দিশালার কয়েকজন কর্মকর্তা ছিল। কুবলাকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

"এরা আজকের আনা নতুন কয়েদী। মনে হচ্ছে এরা আরব ও মুসলমান। যখন থেকে এদেরকে এখানে আনা হয়েছে তখন থেকেই তাদের মতো করে জপতপ করছে।" বলল এক কর্মকর্তা।

কুবলা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামতে লাগল। যতোই এগুতে লাগলো তার কানে গুঞ্জন আরো বেশী পরিষ্কার হয়ে ওঠল। আরো বেশী আকর্ষণীয় মনে হতে থাকল। জেলখানার ছোট্ট কক্ষগুলোর সামনে দিয়ে কুবলা পায়চারী করতে থাকে। কোন কক্ষে ছিল দু'জন বন্দি, কোন কক্ষে তিনজন আবার কোন কক্ষে গোটা একটি দল। বন্দিরা সবাই কিবলামুখী হয়ে কলেমা তাইয়্যেবা জপছে। তাদের কেউ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজনবোধ করেনি, কে এসেছে?

কুবলা শেষ কক্ষের পাশে গিয়ে এক প্রহরীর কানে কানে কি যেন বলল। প্রহরী চেচিয়ে বলল, "সকল বন্দি খামোশ হয়ে যাও। জেলার সাহেব সবার উদ্দেশ্যে কথা বলবেন।"

বন্দিরা নীরব হয়ে গেল। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কেউ কেউ। ক্ষোভ, ঘৃণা ও নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠলো কয়েকজন। তাতে এতোটাই শোরগোল শুরু হয়ে গেল যে কে কি বলছে কিছুই বোঝা গেল না। কক্ষগুলোর দরজা ছিল তালাবদ্ধ, প্রহরীরা লোহার ডাণ্ডা পেটাতে লাগল। কিন্তু চেচামেচি নিয়ন্ত্রণে আনার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না।

"সবাই একসাথে চেচামেচি করলে তো কিছুই শোনা যাবে না। তোমাদের একজন কথা বলো" গম্ভীর কণ্ঠে বলল কুবলা। আমি তোমাদের কাছে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"এদিকে এসো" কুবলাকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন এক আরব বৃদ্ধ। কে তুমি? কথা যা বলার আমার কাছে বলো।"

কুবলা বৃদ্ধের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বৃদ্ধ বলল, "তুমি কি এই কয়েদখানার দারোগা? এটা কেমন জুলুম বলো, আমাদের কেন কয়েদখানায় বন্দি করা হলো?"

"আমি কাউকে কয়েদখানায় বন্দি করতে পারি না, আর ইচ্ছে করলেই কাউকে এখান থেকে ছেড়ে দিতেও পারি না" বলল কুবলা। আমি নিছক

হুকুমের তাবেদার। তোমরা আমাকে গালিগালাজ করলে লাভ হবে না। আমি তোমাদের কাছে কিছু কথা জানতে চাই। আচ্ছা, তোমরা সবাই মিলে কি গাইছিলে? এ আওয়াজ আমার খুব ভালো লেগেছে।"

"এ আওয়াজ কি তোমার অন্তরকে মোমের মতো নরম করে দেয়নি?" জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ।

"হ্যাঁ, অবশ্যই আমি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছি। আমাকে বলো তো তোমরা কি বলছিলে?"

"এ আরব বৃদ্ধ মালাবার অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। ভারতীয় অঞ্চলে তার ব্যবসাও দীর্ঘদিনের। এজন্য সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা তার জানা ছিল। তিনি সিন্ধি ভাষা যেমন বুঝতে পারেন অনুরূপ বলতেও পারেন। বৃদ্ধ বললেন, এটা কোন সঙ্গীত নয়। এটা আমাদের কলেমা। এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, ইবাদত করার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাছাড়া আমাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফের কিছু আয়াত সবাই মিলে পড়ছিলাম।"

"এর দ্বারা তোমাদের কি উপকার হবে?" জানতে চাইলো কুবলা।

"সবচেয়ে বড় কথা হলো বিপদে এ কলেমা পাঠ করলে অন্তরে প্রশান্তি আসে, আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হন। তাছাড়া এর বরকতে এই জাহান্নাম থেকেও মুক্তির ব্যবস্থা হবে" বললেন আরব বৃদ্ধ।

"তোমরা কি বিশ্বাস করো, তোমাদের সবাইকে এখান থেকে ছেড়ে দেয়া হবে? জিজ্ঞেস করল কুবলা।

"আমরা যদি অপরাধী হতাম, তাহলে এই বন্দিদশা থেকে আর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতাম না, তখন আল্লাহর কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইতাম। আমরা নিরপরাধ। অন্যায়ভাবে আমাদেরকে বন্দি করা হয়েছে। আমাদের সহায়-সম্পদ লুটে নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের কাছে এবং তোমাদের রাজার কাছে আমরা কোন সাহায্যই চাইবো না। তোমাদের রাজার ধ্বংস লেখা হয়ে গেছে" বললেন বৃদ্ধ।

"তোমরা কি মহারাজের ধ্বংসের জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছ?" জিজ্ঞেস করল কুবলা।

"না, আমরা কারো অমঙ্গল কামনা করি না। শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তুমি যদি নেক কাজ করো তার পুরস্কার পাবে আর জুলুম অত্যাচার করলে তোমার ওপরও জুলুম করা হবে।"

আরব বৃদ্ধের এ কথা শুনে কুবলা যে অসৎ ইচ্ছা নিয়ে বন্দি পরিদর্শনে এসেছিল তার মন থেকে সব কুচিন্তা দূর হয়ে গেল। রাজা দাহিরের নির্দেশ ছাড়া সে কোন কয়েদীকে মুক্তি দিতে পারত না ঠিক; তবে কুবলা কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ও আরব বন্দির কথা শুনে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো তা বন্দিদের জন্য খুবই ইতিবাচক প্রমাণিত হলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা দাহিরের প্রধান জেলখানার দারোগা কুবলা ছিল জ্ঞানী, বিদ্বান ও একজন লেখক ব্যক্তি। জেলখানার প্রশাসনে সাধারণত এমন লোকেরাই নিযুক্ত হয়ে থাকে, যারা নিরীহ বন্দিদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করে নির্দোষ মানুষের হাড় গুড়ো করে প্রশান্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু কুবলার মতো পণ্ডিত মানুষকে রাজা দাহির জেলখানার দারোগা নিযুক্ত করেছিল কেন তা বলা মুশকিল।

✪ ✪ ✪

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল যেদিন মাত্র তিন'শ অশ্বারোহী নিয়ে বসরা থেকে রওয়ানা হলেন, সেদিন রাতে মায়ারাণীর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী বেলাল বিন উসমান তার তিন সাথীকে নিয়ে আরব মুসাফিরদের বন্দি করে রাখা জেলখানার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। জায়গাটি ছিল অন্ধকার। সেখানে ছিল কয়েকটি জানালা। দিনের বেলায়ই বেলাল জায়গাটি দেখে গিয়েছিল। কয়েদখানার দেয়ালে মাঝে মাঝে বুরুজ। চার কোণের চারটি বুরুজের ওপর পাহারারত সশস্ত্র প্রহরী।

বেলাল তার সাথীদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেল যেটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। বেলাল দেয়ালের নীচে দাঁড়িয়ে হুঁক লাগানো রশি দেয়ালের উপরে ছুড়ে মারলে হুক দেয়ালের ওপরে আটকে গেল। রাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় দেয়ালের ওপরে লোহার হুক নিক্ষিপ্ত হওয়ার আওয়াজটি হয়তো প্রহরীরাও শুনতে পেয়েছিল। বেলাল ও সাথীরা দেয়ালের সাথে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হুকের ঝংকার ধ্বনীতে প্রহরীদের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

দীর্ঘক্ষণ তারা উৎকর্ণ থেকেও ওপরে কোন শব্দ পেলো না। সবার আগে বেলাল রশিটা শক্তভাবে ধরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে রশি বেয়ে দেয়ালের ওপরে উঠে পড়ল।

দেয়ালের ওপরের অংশটি ছিল যথেষ্ট চওড়া। অনায়াসে দেয়ালের ওপর দিয়ে কেউ ঘোড়া হাঁকাতে পারতো। দেয়ালের ওপরে উঠে বেলাল একটি ছোট বুরুজের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। একে একে বেলালের তিনসঙ্গীও ওপরে উঠে এলো। তাদের সবারই হাতে তরবারী আর কোমরে গুঁজে রাখা খঞ্জর।

তাদের কারো কয়েদখানার ভিতরের অবস্থা জানা ছিল না। কয়েদখানার কোথায় কি সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। আরব মুসাফিরদের কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে এ সম্পর্কেও তারা ছিল অজ্ঞাত। বিশাল জেলখানা। জেলখানার দেয়ালের ওপরে জায়গায় জায়গায় মশাল জ্বলছে। আসলে ভাবাবেগে বেলাল বন্দিদের মুক্ত করতে এ অভিযানে নেমে পড়েছিল। অভিযান শুরু করার আগে তার প্রয়োজন ছিল জেলখানার ভিতরের অবস্থা জেনে নেয়া। সে হারেস আলাফীকে বলেছিল, জেলখানার প্রহরীদের হত্যা করে সে ওদের হাতিয়ার বন্দিদের দিয়ে দেবে, এরপর সবাই মিলে বাকী প্রহরীদের পরাস্ত করে প্রধান গেট খুলে বন্দিদের মুক্ত করে মাকরানে পৌঁছে দেবে।

বেলাল তার তিনসঙ্গীকে দেয়ালের ওপরে ওঠার জায়গাতে রেখে এক কোণের বুরুজের দিকে অগ্রসর হলো। পা টিপে টিপে অগ্রসর না হয়ে এমনভাবে অগ্রসর হলো, তাকে দেখে মনে হবে সে যেন জেলখানার কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বেশ ক'বছর যাবত রাজমহলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য থাকার কারণে বেলাল নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ কোড ও সাংকেতিক ভাষা জানতো এবং বলতে পারত। সে যখন বুরুজের কাছাকাছি পৌঁছল প্রহরী তাকে দেখে হাঁক দিলো।

"কে রে ওখানে?" হাঁক দিলো প্রহরী।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক।" বলল বেলাল।

"প্রহরী তাকে জেলখানার কোন পদস্থ কর্মকর্তা মনে করে বুরুজের ভিতরেই দাঁড়িয়ে রইলো। বেলাল তরবারী কোষমুক্ত করে ধীরে ধীরে বুরুজের দিকে অগ্রসর হলো। বুরুজের ভিতর দিকটা ছিল অন্ধকার। চারটা খুঁটির ওপরে গম্বুজ আকার ছাদ দিয়ে তৈরী বুরুজ চতুর্দিকে খোলা। বেলাল প্রহরীর কাছে গিয়ে তরবারীর আগাটা বুকে চেপে ধরে বলল, তোমার অস্ত্র ফেলে দাও। সে কোমরে কোষবদ্ধ তরবারী ও খঞ্জর হাতে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করল। বেলাল

তাকে মেঝের ওপরে ফেলে তরবারীর আগা তার ঘাড়ের ওপরে চেপে ধরে বলল, "আরব কয়েদীরা কোথায়? সত্যিকথা বলবে এবং গড়িমসি না করে এক্ষুণিই বলবে।"

প্রহরী বলল, "আরব বন্দিরা মাটির নীচের কয়েদখানায়।"

"সেখানে যাওয়ার পথ কি? নীচের কয়েদখানার চাবি কার কাছে?"

"আমি তোমাকে সব বলছি, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে তরবারী সরিয়ে নাও। তুমি আমার জীবন কেড়ে নিও না। আমি তোমার কাজে কোন অসুবিধা করবো না। কারণ এই বন্দিশালাটা আমার বাবার সম্পত্তি নয়, আর আমার বাবা এদেশের রাজাও নয়। আমরা তো পেটের দায়ে চাকরী করি মাত্র।"

প্রহরীর কথায় বেলাল তার ঘাড় থেকে তরবারী সরিয়ে নিলো।

"ঠিক আছে, এখন বল।" তাড়া দিলো বেলাল।

"আমি তোমার সাথে বন্ধুর মতো কথা বলছি, তুমিও আমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে এটাই প্রত্যাশা করি। তুমি যদি একা হও, কিংবা তোমরা পাঁচ সাতজন হয়ে থাকো, তাহলে আমি পরামর্শ দেবো, তোমরা ফিরে চলে যাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল বেলাল।

"তোমরা যদি বন্দিদের মুক্ত করতে এসে থাকো, তা তোমরা করতে পারবে না। আমি তোমাকে সরলভাবে বলছি, তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি বলো, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারব। আমাকে যদি বিশ্বাস করো তাহলে যা জিজ্ঞেস করবে, আমি তা তোমাকে বলে দেবো। তবে আমি তোমাকে বলতে পারি উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে না তোমরা, খুবই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে।" বলল প্রহরী।

"আগে বলো তো হঠাৎ করে আমার প্রতি তোমার এতোটা হৃদ্যতা কেন সৃষ্টি হলো?" জিজ্ঞেস করলো বেলাল।

তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে এতোটা সহজ হয়ে গেলে? মৃত্যুকে তোমরা এতোটাই ভয় কর? আমাকে দেখো, স্বজাতি বন্দিদের মুক্ত করতে জীবন বাজি রাখছি আর তোমরা...?"

"আরে দোস্ত...! কিসের জন্য জীবন বাজি রাখব আমি?" বলল প্রহরী। এদের আটকে রাখার জন্য? যেসব নিরপরাধ মানুষকে ডাকাতি করে অন্যায়ভাবে এখানে আটকে রাখা হয়েছে! এসব হচ্ছে রাজা মহারাজাদের

পাপ। এসব পাপের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে আমি কখনও প্রস্তুত নই। নিরপরাধ আরব বন্দিদের মুক্ত করতে কেউ আসলে আমি কেন সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব। আমার সাধ্য থাকলে তালা খুলে আমি ওদের মুক্ত করে দিতাম। কারণ আমি জানি এদের আটকে রাখার কারণে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে একটা মহাবিপদ ধেয়ে আসছে, আর এ বিপদ আসছে তোমাদের দেশ থেকে।"

"আমি মনে করেছিলাম তুমি এতোটা বুদ্ধিমান হবে না। কিন্তু তুমি বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলছ," বলল বেলাল।

"ঠিকই বলেছ। এগুলো আমার কথা নয়। আমাকে এসব সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন আমার বাবা। বাবা বলেছেন, আমাদের রাজা একবার আরব সৈন্যদের পরাজিত করে মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়েছেন কিন্তু তিনি আরবদের মানসিকতা সঠিক জানেন না। আরব সৈন্যরা নিশ্চয়ই আবার আঘাত হানবে, তখন আর রাজার পক্ষে তাদের প্রতিরোধ সম্ভব নাও হতে পারে। আমাদের রাজা নিজেকে আসমানের দেবতা মনে করছে। কিন্তু সে যে অপরাধ করেছে, যে পাপ করেছে এর শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। সে তার বোনকে বিয়ে করেছে, এই অপরাধের শাস্তি না হয়েই পারে না।"

"আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করব, এখন এর ঠিক ঠিক জবাব দেবে? প্রহরীকে সতর্ক করল বেলাল।

প্রহরী বেলালকে নীচে নামার রাস্তা দেখিয়ে দিলো এবং পাতাল কক্ষের চাবি সম্পর্কে বলল, পাতাল কক্ষের চাবি কোন প্রহরীর কাছে থাকে না। ওইসব চাবি একটি কক্ষে রাখা আছে। সেই কক্ষ বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকে। চাবির ঘরটিই কয়েদখানার দফতর। সেখানে দুই প্রহরী থাকে। তারা সাধারণ সিপাই নয় উঁচুপদের কর্মকর্তা। জেলখানার কোথায় কোথায় প্রহরী পাহারারত রয়েছে তাও জানিয়ে দিলো।

✪ ✪ ✪

প্রহরীর মাথায় পাগড়ী ছিল। বেলাল এক ঝটকায় প্রহরীর মাথা থেকে পাগড়ী ছিনিয়ে নিল। প্রহরীকে ধাক্কা দিয়ে উপুড় করে মেঝেতে চেপে ধরলো। প্রহরীকে পিঠমোড়া করে হাত পা বেঁধে ফেলল বেলাল। অবশিষ্ট পাগড়ী ছিড়ে প্রহরীর চোখ বেঁধে দিলো।

"আমি তোমাকে প্রাণে মারবো না দোস্ত।" প্রহরীর উদ্দেশ্যে বলল বেলাল। কিন্তু তোমার উপর আমি ভরসাও করতে পারছি না। যদি কেউ আসে তাহলে তোমার বাঁধন খুলে দেবে।"

প্রহরীকে বেঁধে রেখে বেলাল তার সাথীদের কাছে ফিরে এলো। সাথীদের নিয়ে সে বাঁধা প্রহরীর বুরুজে গিয়ে প্রহরীর গোপন সুড়ঙ্গ পথের সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে গেল। সুড়ঙ্গ পথটি ছিল গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টিকারী। পথটির কোন কোন স্থানে মনে হতো পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। বেলাল ধাঁধা সৃষ্টিকারী পথটি সাথীদের নিয়ে অতিক্রম করে পৌঁছে গেল প্রহরীর বলা চাবির ঘরে। সে ঘরের সামনে পৌঁছে বেলাল দেখলো লোহার দরজা। কিন্তু দরজাটি ছিল খোলা। লোহার গেটটি ঘরের বহিঃপার্শ্বে, ভিতরের দিকে আরো একটি দরজা। প্রথম দরজার দু'পাশে দু'টি কক্ষের একটি খোলা অপরটি তালাবদ্ধ। আর ঘরের মূল দরজায় ভিতর থেকে অনেক বড় একটি তালা ঝুলছে। যে ধরনের তালা সাধারণত দুর্গসমূহের প্রধান গেটে লাগানো থাকে। বেলাল ও সাথীরা পাশের খোলা কক্ষে ঢুকে পড়ল। দরজার দু'পাশের দেয়ালে মশাল জ্বলছে। বেলাল একটি মশাল হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরটিতে দেখতে পেল দু'পাশে দু'টি চৌকিতে উর্দি পরিহিত দু'জন লোক বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। বেলাল উভয়কে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিলো। ঘুমন্ত লোকগুলো হন্তদন্ত হয়ে জেগে বুকের ওপর উন্মুক্ত তলোয়ারধারী অচেনা লোক দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

বেলাল ওদের নির্দেশ করল "পাতাল কক্ষের চাবি দাও। আর সদর গেটের চাবিও আমাদের হাতে দিয়ে দাও।"

প্রহরীদের একজন দেয়ালের পাশে গিয়ে দেয়াল থেকে একটি পাথর সরিয়ে এর ভিতর থেকে একটি চাবি বের করে বেলালের হাতে তুলে দিলো। যে কোন অজ্ঞাত মানুষের পক্ষে বোঝার উপায় ছিল না, দেয়াল থেকে এ পাথরটি আলাদা করা যেতে পারে।

বেলাল ধমক দিয়ে বলল, "আমি পাতাল কক্ষ ও সদর দরজার চাবি চাচ্ছি।"

প্রহরী ভয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে তালাবদ্ধ দরজা খুলে দিলো এবং বেলালের দিকে তাকালো। বেলাল মশাল নিয়ে প্রহরীর কাছে গেল। প্রহরী বেলালকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। বেলাল দেখতে পেলো সেই কক্ষের দেয়ালের সাথে অসংখ্য চাবি ঝুলানো রয়েছে। অসংখ্য চাবির গোছা থেকে

দু'টি তুলে প্রহরী বেলালকে দেখিয়ে বলল, এটাতে পাতাল কক্ষের চাবি আর এটাতে সদর দরজার চাবি রয়েছে।

কক্ষটি ছিল যথেষ্ট বড়। দেয়ালের একপাশে ঝুলানো ছিল অনেকগুলো চাবির গোছা, আর অপর পাশের দেয়ালে কতগুলো তরবারী, বর্শা, খঞ্জর ঝুলছে। বেলাল ও তার তিন সঙ্গী মিলে দুই প্রহরীর পাগড়ী দিয়ে বুরুজের প্রহরীর মতোই ওদেরকে হাত পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখলো। এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো এবং যথাস্থানে মশাল রেখে বেলাল সাথীদের নিয়ে কয়েদখানার ভিতরে প্রবেশ করল। কয়েদখানার এক পাশে বড় বড় হল রুমের মতো প্রশস্ত কক্ষ। আর অপর পাশে ছোট ছোট অসংখ্য কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে মশাল জ্বলছে। অধিকাংশ বন্দি ঘুমাচ্ছে। আর কেউ কেউ কষ্ট যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কারা কক্ষের মশালের আলো ফাঁক দিয়ে বাইরে পড়ছে। এই আলোতে টহল দিচ্ছে প্রহরীরা। বেলাল তার সাথীদের নিয়ে আলো আঁধারীর মাঝে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তারা কোন মতে প্রহরীদের দৃষ্টির অগোচরে পাতাল কক্ষে নামার সিঁড়ি কোঠায় চলে এলো।

পাতাল কক্ষের সিঁড়ি কোঠা ছিল গর্তের মতো। সিঁড়ি কিছু ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। মাঝামাঝি মশাল জ্বালানো। মশালের আলোর আভায় সিঁড়ি কোঠার ওপর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। বুরুজের প্রহরীর বলা কথা মতো বেলাল ও সাথীরা পাতাল কক্ষের সিঁড়ি পর্যন্ত বিনা বাঁধায়ই পৌঁছে গেল।

পাতাল কক্ষের সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে বেলাল শ্লোগান দেয়ার মতো করে বলল, "আল্লাহর কসম! আজ তোমরা এই জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে।"

তখন রাত দ্বিপ্রহর পেরিয়ে শেষ প্রহরে পড়েছে। শেষ রাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় বেলালের হাঁকে সব কয়েদী জেগে উঠল এবং হৈ চৈ শুরু করে দিলো।

"চুপ করো সবাই! মুক্ত হতে এখনো আরো কাজ বাকী রয়েছে।" উচ্চ আওয়াজে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বলল বেলাল। বেলালের কথায় সবাই নীরব হয়ে গেল। বেলাল বলল, আমাদের সবার হয়তো জেলখানার প্রহরীদের সাথে লড়াই করতে হবে।"

পাতাল কয়েদখানার প্রথম কক্ষের তালা খোলার জন্য বেলাল চাবি ঘুরাতে লাগল। কিন্তু তালা কিছুতেই খুলছে না। চাবি ছিল অনেকগুলো। একটি একটি করে সবগুলো চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করল বেলাল, কিন্তু কিছুতেই তালা খোলা সম্ভব হলো না।

"মনে হয় আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। বলল বেলালের এক সাথী। ওই বেঈমান মনে হয় আমাদের সঠিক চাবি দেয়নি।"

সবাই একই কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করছিল ঠিক এমন সময় হঠাৎ একটা মৃদু কম্পন, সেই সাথে একটা হাল্কা বিস্ফোরণের আওয়াজ ও একজনের বিকট আর্তচিৎকার শোনা গেল। সবাই চকিতে এদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখল বেলালের এক সাথী ঝুঁকে রয়েছে, তার পিঠের দিকে বর্শা প্রবেশ করে পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে এবং দেখতে দেখতে বেলালের এই সাথী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সবাই সিঁড়ি কোঠার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো, সেখানে দশ বারোজন সশস্ত্র লোক দূর নিক্ষেপণ যোগ্য বর্শা হাতে দাঁড়ানো। বেলাল দেখল ওদের সাথে বুরুজের সেই প্রহরীও রয়েছে যাকে সে হাত পা বেঁধে রেখে এসেছিল।

"আরব বন্ধু!" বুরুজের প্রহরী বেলালের উদ্দেশে বলল, আমি তোমাকে সতর্ক করে বলেছিলাম, নীচে যেয়ো না। কিন্তু তুমি আমার কথা শোননি। তুমি হয়তো ভেবেছিলে বাঁধা অবস্থায় সারা রাত আমাকে পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমি জানতাম কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাঁধন খুলে দেয়ার লোক এসে পড়বে। আমার প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদান আমি তোমাকে সতর্ক করার মাধ্যমে আদায় করেছিলাম, এখন আমি যার নুন খাই তার হক আদায় করছি। এখান থেকে কোনদিন কোন বন্দি বেরিয়ে যেতে পারেনি। তোমরাও আর বেরিয়ে যেতে পারবে না। জল্লাদ ছাড়া আর কেউ তোমাদেরকে এখান থেকে বের করতে পারবে না।"

"তরবারী ফেলে নিরস্ত্র হয়ে ওপরে উঠে এসো। নয়তো নিক্ষিপ্ত বর্শায় তোমাদের পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়া হবে।" নির্দেশের কণ্ঠে বলল এক অফিসার ধরনের লোক।

অবস্থা বেগতিক দেখে বেলাল সাথীদের উদ্দেশ্যে অনুচ্চ আওয়াজে বলল, "বন্ধুরা! এরা আমাদের জীবিত রাখবে না। এসো লড়াই করেই মরি।"

বেলাল ও সাথীদের হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারী। এরা বিজলীর মতো উন্মুক্ত তরবারী উঁচিয়ে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে এলো। কিন্তু ওপরে দাঁড়ানো জেল প্রহরীরা প্রস্তুত ছিল এমনটির জন্যেই। তারা দূর নিক্ষেপণযোগ্য বর্শা তাক করে রেখেছিল এদের দিকে। বেলালের এক সাথী ওপরে উঠে আঘাত হানার আগেই তার পেট বিদ্ধ করলো প্রহরীদের নিক্ষিপ্ত বর্শা। সে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ল আর অসাড় দেহ গড়িয়ে নীচে পড়তে লাগল। বেলালও তার

অপর এক সঙ্গীর তরবারী এক প্রহরীর পেট বিদ্ধ করল বটে। কিন্তু তরবারী টেনে আর দ্বিতীয় আঘাতের সুযোগ পেল না। প্রহরীদের আঘাতে পড়ে গেল বেলালের সঙ্গী। একই সঙ্গে তিনটি বর্শা বিদ্ধ করল বেলালের সেই সঙ্গীকে। আর বেলাল পা পিছলে কয়েক ধাপ নীচে পড়ে গেল। এমতাবস্থায় কয়েকজন প্রহরী তাকে ঝাপটে ধরে ওপরে টেনে নিয়ে সুরক্ষিত একটি লোহার গারদে ভরে তালা লাগিয়ে দিলো। এ ঘরটিতে তাজা ও পঁচা মানুষের রক্তের দুর্গন্ধ। বেলালের মনে হলো, এখানে প্রতিদিনই হয়তো কোন না কোন মানুষকে জবাই করা হয়। ঘরের দেয়ালেও ছিটা-ফোঁটা রক্তের দাগ।

✪ ✪ ✪

বেলা একটু বেড়ে ওঠার পর রাজা দাহির তার খাস কামরায় লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে পায়চারী করছিল। আর রাগে ক্ষোভে ফুঁসছিল। অধোবদনে তার সামনে দণ্ডায়মান মায়ারাণী।

"ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাজা বলল, "তোমার কথায় আমি ওদেরকে প্রাসাদে রাখতে অনুমতি দিয়েছিলাম। অথচ তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো, মহাভারতের কোন রাজা দূরের কথা কিংবা কোন প্রজাও মুসলমানকে বিশ্বাস করে না। তোমার কথায় আজ আমাকে এতোটা মূল্য দিতে হলো। যারা গো-মাতাকে হত্যা করে, তাদেরকে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি বলতে পারো, আমি চার পাঁচশ আরবকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি কি দেখনি আমি ওদের কতোটা নিরাপদ দূরে রেখেছি। তাছাড়া ওদেরকে আমি স্বাধীন ছেড়ে দেইনি। ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেদুঈনের ছদ্মবেশে বহু সংখ্যক সেনাকে আমি ওদের এলাকায় ছড়িয়ে রেখেছি। মাকরানে মুসলমান বসতির চারপাশে যেসব বেদুঈন পরিবার রয়েছে এরা সবাই আমার সেনাবাহিনীর লোক। কারণ আমি জানি, আরবরা প্রতি আক্রমণ করতে পারে, আর এরা তাদের সগোত্রীয় ভাইদের সহযোগিতা করতে পারে এ আশঙ্কা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। এজন্য ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ করার জন্য আমি ছদ্মবেশে সেনা মোতায়েন করে রেখেছি।

"ওদেরকে বিশ্বস্ত ও সৎ ভেবে আমি নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলাম।" বলল মায়ারাণী। এটাকে আমার অনভিজ্ঞতা বলতে পারো। ওরা যে অপরাধ করেছে-এর শাস্তি তো ওরা পেয়েই গেছে। আর যে ধরা পড়েছে; ওকে তুমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড .....।"

"এমন নিমক হারামকে আমি বেঁচে থাকতে দেবো না। গজরাতে গজরাতে বলল রাজা দাহির। আমি জেল দারোগাকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি ওকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করার আগে ওর কাছ থেকে এটা বের করতে চেষ্টা করতে যে, ওর সাথে আর কারা ছিল? কারা ছিল ওদের সহযোগিতায়? অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আরব সর্দার আলাফীর সাথে ওদের যোগাযোগ ছিল কিংবা ওদের কেউ এদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকবে। কয়েদখানার দারোগা ওর পেট থেকে এসব কথা বের করেই ছাড়বে। যদি কিছুই না বলে তাহলে বলে দিয়েছি ওকে জল্লাদের হাতে দিয়ে দিতে।

"বেলালের ব্যাপারে এমন কঠোর ফয়সালা শোনার পরও রাণীর চেহারায় কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। যে বেলালের প্রতি আসক্ত হয়ে সার্বক্ষণিকভাবে সঙ্গ পাওয়ার জন্য রাণী ওকে রাজমহলে নিয়ে এসেছিল। বেলাল যাতে রাণীকে ছেড়ে চলে না যায় এজন্য কৌশলে বেলালের সঙ্গীদেরকে মহলের নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নিয়েছিল রাণী। বেলালের প্রেমের পরশে দীর্ঘ দু'দশকের মতো সময় পার করে দিয়েছে রাণী। আর আজ প্রাণের লোকটি মৃত্যুর মুখোমুখী। তাও এমন কঠিন মৃত্যু যা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

অতি প্রত্যুষেই জেলখানার দারোগা নিজে এসে রাজা দাহিরকে সংবাদ দিয়ে গেছে গতরাতে জেলখানায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে। তখনই রাজা দাহির ধৃত বেলাল বিন উসমানের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিল। রাজা বেলালকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে, বেলালের তিনসঙ্গীর মরদেহকে দাফন কিংবা সৎকার না করে জেলখানার বাইরে ফেলে দিতে।

রাজার নির্দেশে বেলালকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছিল জেলখানার দারোগা কুবলা। বেলালকে একটি শক্ত তক্তার মধ্যে শুইয়ে দু'পা রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে উপুড় করে রাখলো। দু'হাতের কব্জিতে রশি বেঁধে দু'দিক থেকে দু'দল লোক চিৎকার দিয়ে টানতে লাগল আর কুবলা জিজ্ঞেস করতে লাগল, "বল তোর সাথে আর কে কে ছিল? বেলালের মনে হচ্ছিল তার হাত দুটো শরীর থেকে ছিড়ে যাচ্ছে। কুবলা বেলালকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল "বল মাকরানের কোন মুসলমান তোর এই অভিযানের কথা জানে?" বেলালের শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে গেল। কষ্ট যন্ত্রণায় চেহারা নীল হয়ে গেল।

কুবলা বেলালের কাছে জানতে চাইলো "বলল, আলাফীর সাথে তোর কি কথা হয়েছিল?"

বেলাল বলল, "আমার তিন সঙ্গী ছাড়া আমার সাথে আর কেউ ছিল না। যারা আমার সাথে ছিল তারা সবাই মারা গেছে। আমি জীবনে কখনো মাকরান যাইনি। আমার অভিযানের কথা আর কেউ জানে না।"

কুবলা যতোবার বেলালকে জিজ্ঞেস করল, ততোবার একই জবাব দিলো বেলাল।

আসল কথা বলছে না ভেবে কুবলা শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। এভাবে চললো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত।

দুপুরের দিকে বেলাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। দুপুরের পর বাঁধন খুলে দিলে বেলালের শরীর অসাড় হয়ে গেল। ওকে টেনে-হেঁচড়ে সেই পুঁতিদুর্গন্ধময় কক্ষে রেখে তালাবদ্ধ করে দিলো প্রহরীরা। কষ্ট যন্ত্রণায় বারবার বেলাল পানি পান করতে চাচ্ছিল কিন্তু পানির পেয়ালা তার মুখের কাছে নিয়ে ফিরিয়ে আনা হলো, পানি পান করতে দেয়া হলো না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় বেলালের মুখ ব্যাদান হয়ে গেল।

দুপুরের পর আবারো একটি খাড়া তক্তার সাথে বেলালকে বেঁধে চার হাত পা ওজনী পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো, আর দারোগা কুবলার জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকল। কিন্তু বেলালের মুখ থেকে নতুন কোন কথাই বের হলো না। রাতের বেলায় আবারো সেই অন্ধকার দুর্গন্ধময় কক্ষে তাকে ফেলে রাখলো। কক্ষের দুর্গন্ধ আর নিজের শরীরের ঘামের দুর্গন্ধ মিলে আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠল। রাত নামার সাথে সাথে পোকা-মাকড়, বিচ্ছু বেলালের অসাড় দেহটাকে ঘিরে ধরল। নাকে মুখে, সারা শরীরে বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কামড়ে জ্বালা বিষের যন্ত্রণায় বেলালকে মৃতপ্রায় করে তুলল। উহ্ করার বোধটুকুও বেলালের অবশিষ্ট রইল না।

✪✪✪

মধ্য রাতে সেই কক্ষের দরজা খুলে বেলালকে টেনে-হেঁচড়ে আবার শাস্তির জায়গায় নিয়ে গেল প্রহরীরা। এবার পা দুটো ছাদের সাথে রশি বেধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। বেলালের ঝুলন্ত হাত দুটো মাটি থেকে আধা হাত উঁচুতে ঝুলে রইল। হাত ওপরে উঠানোর শক্তি নেই। এবার শুরু হলো চাবুক। এক একটি চাবুকের আঘাতে বেলালের শরীরের চামড়া উঠে আসতে লাগল, সেই সাথে ফিনকি দিয়ে ঝরতে থাকল রক্ত। আর চলল কুবলার

জিজ্ঞাসাবাদ। বল? তোর সাথে কি কথা হয়েছিল আলাফীর? মাকরানের কে কে তোর সহযোগী ছিল? কারা ছিল এই পরিকল্পনায়?

কিন্তু বেলালের মুখে না শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ বের হলো না।

বেলাল বলল, আমার সাথে যারা ছিল, তারা সবাই মারা গেছে। অবশেষে আফসোস করে কুবলা বেলালের উদ্দেশ্যে বলল, "আরে হতভাগা! এভাবে কেন মরছো? বলে ফেলো এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকো। বলো, এই তিন ব্যক্তি ছাড়া তোমার সহযোগিতায় আর কে কে ছিল?"

"বেলালের কণ্ঠে কথা উচ্চারিত হচ্ছিল না। কথা বলার মতো শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল বেলালের। বহু চেষ্টা করে শুধু এতটুকু বলল, ছিল একজন।"

"ছিল!" স্বীকারোক্তি শুনে কুবলা চাবুক মারা বন্ধ করে দিলো এবং ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনতে নির্দেশ দিলো। এরপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো "বলো, কে সে? তিনজন ছাড়া আর কে ছিল তোমার সাথে?"

"আল্লাহ্! আমার আল্লাহ্ ছিল আমার সাথে।" এ কথা শুনে রেগে গিয়ে আবারো কয়েক ঘা চাবুক লাগিয়ে দিলো কুবলা। বলল, ডাক তোর আল্লাহ্কে। এখান থেকে তোকে আর তোদের সাথীদের মুক্ত করে নিক।"

"হ্যাঁ, আল্লাহ্ সবাইকে মুক্ত করবেন। আমার আল্লাহ্ আসছেন। আসলেই টের পাবে।"

এভাবেই কেটে গেল রাত। সকাল বেলায় শাস্তির কক্ষ থেকে বেলালের অসাড় দেহটি জল্লাদের গারদে রেখে তালাবদ্ধ করতে নির্দেশ দিলো জেল দারোগা কুবলা। আজো বেলালকে খানাপানি কিছু দেয়া হয়নি। দিনের বেলায় শুরু হলো নতুন ধরনের শাস্তি। সারা দিন ভয়ংকর শাস্তি দেয়ার পর রাতের বেলায় আবারো ফেলে রাখা হলো জল্লাদের গারদে। এখন আর বেলালের কোন হুঁশ জ্ঞান নেই। নিথর অসার মৃতপ্রায় বেলাল পড়ে রইল মেঝেতে। বোধশক্তি আছে কি-না তাকে দেখে কারো পক্ষে বলা মুশকিল। খুবই হাল্কাভাবে নাকের কাছে হাত রাখলে নিঃশ্বাস অনুভব করা যায়। চাবুকের আঘাত পোকায় কামড়ানো ফোলা ক্ষতবিক্ষত শরীরে নিঃশ্বাসের ওঠানামা বোঝা যায় না।

তৃতীয় দিন সকাল বেলায় রাজা দাহিরকে বলা হলো, তিনদিন বিরামহীন চেষ্টার পরও বেলাল কারো নাম উচ্চারণ করেনি। জ্ঞাত অজ্ঞাত কারো

সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেনি। বেলালকে যেসব শাস্তি দেয়া হয়েছে সবিস্তারে জেল দারোগা কুবলা সবই জানালো রাজাকে। সেই সাথে বেলাল কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাও ব্যক্ত করল সবিস্তারে। অবশেষে কুবলা বলল, "আমার মনে হয় সঙ্গী তিনজন ছাড়া এর সাথে আর কারো যোগসূত্র ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতো। মাকরানের আরবদের সম্পর্কে তাকে অজ্ঞাতই মনে হয়েছে।"

"ঠিক আছে, জল্লাদের হাতে দিয়ে দাও ওকে। আর হ্যাঁ, বধ করার আগে খাবার দিও। অনাহারে কাউকে বধ করা ঠিক নয়।"

"রাজার নির্দেশে খাবার ও পানি দেয়া হলো বেলালকে। পানি পান করে বেলালের প্রাণ ফিরে এলো এবং কিছুটা বোধশক্তি ফিরে পেল। সন্ধ্যায় কুবলা তাকে বলল, "আজ রাত তোমার জীবনের শেষ রাত। যদি কোন শেষ ইচ্ছা বা কথা থাকে তাহলে ব্যক্ত করতে পারো।"

"একটাই আমার ইচ্ছা, একটাই আমার শেষ কথা, নিরপরাধ আরব নারী শিশুদের মুক্ত করে দাও।"

"আরে বোকা! এটা আমার সাধ্যের বিষয় নয়।" বলল কুবলা।

"আর একটি ইচ্ছা আছে আমার। দীর্ঘদিন আমি মায়ারাণীর সেবা করেছি। সে যদি একবার এখানে আসতো তাকে একটু দেখে নিতাম।"

"এটাওতো আমার সাধ্যের বাইরে।" বলল দারোগা কুবলা। রাণীকে এখানে আসার কথা আমি কোন্ অধিকারে বলব?"

"মরার আগে আমার প্রতি এতটুকু দয়া করো। রাণীর কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দেখো, সে অবশ্যই আসবে।"

"তাই যদি হয়, যে রাণী তোমার কথায় এখানে আসবে, তাহলে তাকে বলে তুমি মুক্ত হয়ে যাও। সে তো রাজার কাছ থেকে যে কোন দাবী আদায় করিয়ে নিতে পারে। ইচ্ছা করলে তোমার প্রাণও বাঁচিয়ে দিতে পারবে।" বলল জেল দারোগা কুবলা।

✪ ✪ ✪

পরদিন ভোরেই মায়ারাণী জেলখানায় এসে উপস্থিত। বেলালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার অন্তিম সাক্ষাতের আবেদনে রাণী আসবে। আর তার আবেদন ছাড়াই তার মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

"আগের মতো প্রেমিকার মতো করে আসেনি রাণী। রাণী এসেছে পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে। তার সাথে সুসজ্জিত রাজকীয় প্রহরী। মায়ার পরনেও রাজকীয় পোশাক। আগে পিছে জন পনেরো গার্ড। রাজকীয় ঘোড়ার গাড়িতে জেলখানায় প্রবেশ করে রাণী সোজা গিয়ে দাঁড়াল জল্লাদ গারদের সামনে। দূর থেকেই দেখা যায় মরার মতো পড়ে আছে বেলাল। থেতলানো চেহারা ও শরীর। সারা গায়ে রক্তমাখা। ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে পূর্ব পরিচয় না থাকলে বেলালকে চেনাই ছিল দায়। মায়ারাণী গারদের পাশে গিয়ে বেলালকে ডাকলে বেলাল কোন মতে উঠে লোহার বেড়া ধরে দাঁড়াল।

"এসেছো রাণী! আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আসবে! আমার দেশের নিরপরাধ বন্দিদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম আমি। তুমিও এ কাজটি করতে পারতে। কিন্তু তুমি আমার কথা রাখলে না। টালবাহানা করে প্রত্যাখ্যান করেছিলে।"

"বেলাল! তুমি আমাকে বলো তো, এ কাজ করতে কে তোমাকে উস্কানী দিয়েছে? তুমি তো এমন কাজ করতে পারো না। কে তোমাকে প্ররোচিত করেছিল? কার কথায় তুমি একাজ করতে গেলে?"

"হায়! একথা জানার জন্য তো জেলখানার দারোগা আমার হাড় গুড়ো করে দিয়েছে, শরীরের চামড়া তুলে ফেলেছে, সারা শরীর থেতলে দিয়েছে। আমার কাছে একথার কোন জবাব নেই। যদি জবাব থাকতো, তাহলে আমার এ দশা হতো না রাণী!"

মায়ারাণী প্রেমের দোহাই দিয়ে বেলালের কাছ থেকে জানতে চাইলো, আসলে তোমার সাথে এ কাজে আর কে কে ছিল?

কিন্তু বেলাল যে হারেস আলাফীর সাথে মিলে এই পরিকল্পনা করেছিল রাণীর প্ররোচনাতেও তা মুখে আনলো না। আসলে রাণী প্রেমের টানে বেলালের মতো রাজদ্রোহীর সাথে জেলখানায় সাক্ষাত করতে আসেনি। এসেছিল প্রেমের বাহানা নিয়ে বেলালের অপরাধের শিকড় তালাশ করতে।

"মায়া! তুমি তো ইচ্ছা করলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারো। রাজা তোমার কথা শোনে। আমাকে বাঁচিয়ে দিলে আমি আর এদেশে থাকবো না, দেশ ছেড়ে চলে যাবো।"

"না। আমি তোমার কাছে যে কথা জিজ্ঞেস করেছি, তুমি তার জবাব দাওনি। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি না।"

"না, রাণী না। আসলে এর পিছনে কারো উস্কানী ছিল না। বিবেকের তাকিদেই আমি নিরপরাধ স্বদেশীদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। তোমাকেও তো এদের মুক্তির ব্যাপারে রাজাকে বলার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। আমি তোমাকে ধোঁকা দেইনি। আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারি না। তোমার সাথে আমার যে সম্পর্ক, তাতে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। তোমার সাথে আমি কিছুই আড়াল করিনি। মায়া! আমি তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি! তুমি আমাকে রক্ষা করো রাণী!"

অস্বাভাবিক নির্যাতন, কঠোর শাস্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর মানসিক যন্ত্রণায় বেলালের শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। জীবনের স্বপ্নে বাঁচার জন্য সে মায়ার প্রতি প্রাণ বাঁচানোর আবেদন করে। কারণ শরীরের চেয়েও বেলালের দেমাগের অবস্থা বেশী খারাপ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া দীর্ঘদিন রাজপ্রাসাদে রাণীর প্রেমের জালে আটক থেকে কষ্টসহিষ্ণু আরব জীবনকে হারিয়ে বিলাস আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল বেলাল। এজন্যই জীবনের জন্য মায়ার কাছে আবেদন করে। নয়তো সহজাত আরবরা এমন একটি ঘটনার পর কষ্ট ও যন্ত্রণা যতোই হোক, জীবন ভিক্ষার জন্য এভাবে আকুতি জানায় না। কিন্তু বেলালের আকুতি মায়াকে মোটেও প্রভাবিত করতে পারেনি।

"না, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।"

"সেই সময়টির কথা স্মরণ করো রাণী। যখন তুমি আমার কাছে একটু আদর, একটু সোহাগ, একটু প্রেমের পরশের জন্য ভিখারিণীর মতো অনুরোধ জানাতে। যেভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সবার চোখের আড়ালে তুমি আমাকে দিনের পর দিন কাছে রাখতে সেইসব মুহূর্তের কথা একদিনে ভুলে যেয়ো না রাণী!"

"হু, মহব্বত! ঘৃণাভরে বলল রাণী। বেলাল! সেটিকে মহব্বত বলছো তুমি! আমি যদি তোমাকে ভালোই বাসতাম, তোমার প্রেম যদি আমার মনে সত্যিকার অর্থেই জায়গা করে নিতো, তাহলে হয় আমি তোমার ধর্মে দীক্ষা নিতাম, নয়তো তোমাকে আমার ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতাম। সেটি প্রেম ছিল না, সেটি ছিল শারীরিক প্রয়োজন। যাকে কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না। প্রয়োজনে মানুষ যেমন গৃহপালিত জন্তু পোষে, আমিও প্রয়োজনের তাকিদে তোমাকে পুষেছিলাম। সেই প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গেছে। আমি এজন্যই তোমাকে বলতাম, ধর্মের কথা আমার সামনে উচ্চারণ করো না। এখন তুমি রাজদ্রোহী। তুমি যে অপরাধ করেছো, একটু চিন্তা করে দেখো, তুমি যদি রাজা দাহিরের জায়গায় থাকতে, তাহলে কি এমন অপরাধীকে ক্ষমা করতে?"

একথা বলেই মায়ারাণী সেখান থেকে সরে গেল। কুবলা মায়ার জন্যে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে মায়ারাণীর উদ্দেশ্যে বলল, কি হুকুম মহারাণী?

"আগে যা ছিল তাই।" বলল মায়ারাণী।

মায়া জেলখানা থেকে বের হতেই বন্দি গারদ থেকে বেলালকে বের করে আনা হলো। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না। তাকে টেনে হেঁচড়ে বের করলো প্রহরীরা। বেলালকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো। তার পা দুটোও বাঁধা হলো শক্ত রশি দিয়ে। এরপর তাকে হামাগুড়ি দিয়ে মাথা নীচ করে বসিয়ে দেয়া হলো জল্লাদের বলিখানায়। জল্লাদ তার মাথার চুল ধরে নীচের দিকে ঝুকিয়ে দিয়ে দীর্ঘ চওড়া একটি ধারালো রামদা দিয়ে এক কোপে ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সেই সাথে চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেল বেলাল।

✪ ✪ ✪

বেলালের শিরোচ্ছেদের দু'দিন পর সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে মাকরানে পৌঁছলেন। মাকরানের গভর্নর মুহাম্মদ বিন হারুন হাজ্জাজের নির্দেশে তিন হাজার অশ্বারোহী সেনাকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। সেনাপতি বুদাইল মাত্র একরাত মাকরানে যাপন করে পরদিন ফজরের নামায পড়েই ডাভেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেনাপতি বুদাইল জানতেন না, আরব বন্দিদেরকে কোন জায়গায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। ইতিহাসে বলা হয়েছে মাকরানের গভর্নরও জানতেন না, বন্দি আরব মুসাফিরদেরকে রাজা দাহির কোথায় বন্দি করে রেখেছিল।

হাজ্জাজ নির্দেশ দিয়েছিলেন, সবার আগে ডাভেল কব্জা করবে কারণ ডাভেল সিন্ধু অঞ্চলের একমাত্র সমুদ্র বন্দর। হাজ্জাজ মনে করেছিলেন সমুদ্র বন্দর কব্জায় এসে গেলে সমুদ্র পথে সামরিক সাহায্য ও রসদপত্র পাঠানো সহজ হবে। হাজ্জাজের নির্দেশ পালন করতেই সর্বাগ্রে সেনাপতি বুদাইল ডাভেল বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

রাজা দাহির মাকরানের আশ্রিত মুসলমানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মাকরানের আশপাশে বহু সেনা সদস্যকে বেদুঈনের বেশে পরিবার-পরিজনসহ নিয়োগ করে রেখেছিল। হারেস আলাফী দ্বিতীয়বার আরব আক্রমণ প্রতিরোধে অস্বীকৃতি জানানোর পর দাহির তার গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে

জোরদার করে। রাজা দাহিরের ছদ্মবেশী সেনাদের একজন সেনাপতি বুদাইলের অগ্রবর্তী সেনাদেরকে ডাভেলের দিকে অগ্রসর হতে দেখে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ডাভেলের দিকে রওয়ানা হয়।

ডাভেলের অধিবাসী ও সেনা কর্মকর্তারা মুসলমানদের এ অভিযান সম্পর্কে একেবারেই বেখবর ছিল। কিন্তু রাজা দাহিরের গোয়েন্দা সদস্য বুদাইলের সহকর্মীদের একদিন আগেই ডাভেল পৌঁছে ডাভেলের শাসককে বলল, আরব সেনারা আসছে। সে তার দেখা সেনা বাহিনীর সংখ্যা ও অবস্থা সম্পর্কেও সংবাদ দিলো।

খবর পাওয়া মাত্রই ডাভেলের শাসক শহর জুড়ে প্রচার করে দিলো, "সবাই হুঁশিয়ার হয়ে যাও, সকল যুবক তুণ ধনু নিয়ে তৈরী হয়ে যাও, আরব মুসলমানরা আবার শহর দখল করার জন্য এগিয়ে আসছে। সেনাবাহিনী শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবে, বেসামরিক লোকেরা শহরের ভিতরে অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকবে। দেবদেবী ও মন্দিরের সম্মান রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার আবার সময় এসেছে।"

ডাভেল ছিল শহরের প্রধান মন্দীরের নাম। মন্দিরের নামেই শহরের নাম হয়ে যায় ডাভেল।

ডাভেলের শাসক সংবাদবাহী অশ্বারোহীকে বলল, তুমি অরুঢ় চলে যাও এবং রাজা দাহিরকে গিয়ে মুসলিম ফৌজ আসার খবর দাও।"

ডাভেলের শাসক তার সেনাবাহিনীকে শহরের অদূরে ময়দানে এগিয়ে নিলো এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সবাইকে কাতারবন্দি করে রাখলো। ডাভেলের শাসক এমন একটি এলাকায় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গেল যে এলাকা পেরিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ডাভেলে প্রবেশ করতে হবে। এলাকাটি ছিল অসমতল, অসংখ্য উঁচু নীচু টিলা ও গিরি খন্দকে ভরা। ডাভেল শাসক তার সেনাদেরকে বিভিন্ন উঁচু টিলার আড়ালে লুকিয়ে রাখলো। এবং কিছু সৈন্যকে রাখলো সমতল এলাকায়। এ জায়গাটি ছিল আড়াল থেকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য খুবই উপযোগী। মুসলমানদের এ এলাকা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাদের জন্যে এলাকাটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

সিন্ধী সেনাদের মনোবল ছিল চাঙা। কারণ এর আগে তারা মুসলিম বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। আর মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকেও তারা শহীদ করে দিয়েছিল। সেই বিজয়ের

ঘটনা বলে সিন্ধুবাহিনীর সেনাপতিরা সেনাদের মনোবল আরো চাঙা করে তুলেছিল।

✪✪✪

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল তার সেনাদের নিয়ে অনেকটা নির্ভয়েই আসছিলেন। অবশ্য আরবদের যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে তিনি সেনাদের একটি অংশকে অনেক আগে অগ্রবর্তী দল হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দু'জন পিছিয়ে এসে সেনাপতি বুদাইলকে জানালো পথিমধ্যে ডাভেলের সৈন্যরা ওঁৎ পেতে রয়েছে। এরা দু'জন ডাভেল সেনাদের যে অবস্থায় দেখেছিল তা সবিস্তারে সেনাপতি বুদাইলকে জানালো।

সেনাপতি বুদাইল ছিলেন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি শত্রুদের রণপ্রস্তুতির খবর শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, প্রতিপক্ষ তাদের আগমন সংবাদ অনেক আগেই পেয়ে গেছে। তিনি সেনাদেরকে তিনভাগে ভাগ করে একটি অংশ নিজের সাথে রেখে মূল পথে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং অপর দুই ভাগকে দু'দিকে অনেকটা ঘুরে শত্রু বাহিনীর পিছন দিয়ে দু'বাহুতে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

শত্রুপক্ষ ওঁৎ পেতে ছিল। তাছাড়া তারা মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ সরবরাহের জন্য কিছু সেনাকে অগ্রবর্তী দল হিসাবে পাঠিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দল সেনাপতি বুদাইলের বাহিনীকে তিনভাগ করে দু'ভাগ দু'পাশের বাহুতে আক্রমণের প্রস্তুতির খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দল শুধু সেনাপতি বুদাইলের কমান্ডে পরিচালিত সেনাদের দেখে ছিল। বুদাইলের সাথে যে সেনাবাহিনী ছিল শত্রুবাহিনী তাদেরকেই গোটা মুসলিম বাহিনী কিংবা অগ্রবর্তী বাহিনী ভেবেছিল। সেনাপতি বুদাইল গতি মন্থর করে দিলেন, যাতে তার ডান বামের দু'দল শত্রুদের ওঁৎপেতে থাকা জায়গায় দূরবর্তী পথ ঘুরে চলে আসতে পারে।

মুসলিম বাহিনীর দুই অংশ পথ ঘুরে শত্রুদের ওঁৎপেতে থাকা জায়গায় পৌঁছে দু'দিক থেকে একই সাথে হামলা করলো। এই অতর্কিত আক্রমণটিকে শত্রু বাহিনী মনে করল আরব বাহিনী দু'দিক থেকে তাদের চেপে ধরেছে। ফাঁদ পেতে রাখা ডাভেল বাহিনী নিজেরাই ফাঁদে আটকে গেল। এমনটির জন্য ডাভেল বাহিনী মোটেও প্রস্তুত ছিল না, তাই ডাভেল সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা।

সেনাপতি বুদাইল শত্রু বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, তার পাঠানো অন্য দু'ভাগের সেনারা শত্রু বাহিনীকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করেছে, তিনিও তার বাহিনী নিয়ে শত্রুদের মধ্যভাগে আঘাত হানলেন। হিন্দুরা তিনদিক থেকে যুগপৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেল, এখন তারা বিজয়ের জন্য নয়, প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করছিল। রণক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। ডাভেল বাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে লাগল। কিন্তু এমতাবস্থায়ই সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে এলো। আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে শত্রু বাহিনীর সেনারা পালাতে শুরু করলো। রাতের অন্ধকার সেদিনের মতো যুদ্ধ মুলতবি করে দিলো। সেনাপতি বুদাইলের সেনারা ছিল সফর ও যুদ্ধে ক্লান্ত। তারা সফরের অবস্থাতেই যুদ্ধ করেছে ফলে তাদের পক্ষে আর ডাভেলের দিকে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখা সম্ভব হলো না। সেনাপতি বুদাইলের নির্দেশে সেখানেই রাতযাপনের সিদ্ধান্ত নিলো তারা।

✪ ✪ ✪

সকালে সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল ডাভেলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের চার পাশে অসংখ্য শত্রুসেনাদের মরদেহ ছড়িয়ে রয়েছে। রাতে শত্রুসেনাদের মরদেহ বাঘ, শিয়াল জংলী জানোয়ারেরা ছিড়ে খেয়েছে আর সকাল হতেই শকুন ভিড় করেছে মরা দেহের ওপর। অসংখ্য শকুন শত্রুদের মরদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। কোন শত্রু দল তাদের মরদেহ ওঠানোর জন্য আসেনি।

রণাঙ্গন থেকে ডাভেলের দিকে রওয়ানা করে মুসলিম বাহিনী বেশী দূর অগ্রসর না হতেই একদিক থেকে বিরাট আকারে ধুলিবালি উড়তে দেখা গেল। সৈন্য ও সেনাপতিদের জন্য এই ধুলিবালি অপরিচিত কোন জিনিস নয়। বুদাইল ধুলিস্তর দেখেই বুঝতে পারলেন শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই এ বাহিনী সিন্ধুরাজার সৈন্য। সেনাপতি বুদাইল সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে নিলেন।

দেখতে দেখতে ধুলোবালির অন্ধকার এগিয়ে আসতে লাগল। যখন একেবারে কাছে চলে এলো তখন বুদাইল দেখতে পেলেন বিশাল এক বাহিনী উট ও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে। এদের মধ্যভাগে রয়েছে হস্তিবাহিনী।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, সিন্ধুরাজা দাহির ডাভেল সেনাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিল এ বাহিনী। দাহিরের বাহিনীতে চার হাজারের চেয়ে বেশী

অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিল। তা ছাড়া আধা ড'জন প্রশিক্ষিত হাতিও ছিল। বলা হয় রাজা দাহিরের পালক পুত্র জেসিয়া এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

ডাভেলের দিকে মুসলিম সেনারা অগ্রসর হচ্ছে এ খবর অরুঢ়ে পৌছার সাথে সাথেই রাজা দাহির দ্রুতগতিতে সেনা অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিল। এ বাহিনী জানতো না, ডাভেলের সৈন্যরা প্রথম সংঘর্ষেই পরাজিত হয়ে পালিয়েছে।

সেনাপতি বুদাইল অগ্রাভিযান মুলতবী করে সেনাদেরকে তিনভাগ করে ছড়িয়ে দিলেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সেনা সংখ্যা তিন হাজারের নীচে নেমে এসেছিল। পূর্বদিনের লড়াইয়ে কয়েকশ সৈন্য আহত ও কিছু সংখ্যক নিহত হয়। সিন্ধু বাহিনীর সুবিধা ছিল, তাদের প্রত্যেকেই ছিল অশ্বারোহী, নয়তো উষ্ট্রারোহী প্রশিক্ষিত হাতিও ছিল তাদের সহযোগী। এছাড়া তারা ছিল বিজয়ের নেশায় উজ্জীবিত।

সেনাপতি বুদাইল আগে আক্রমণ না করে শত্রুদেরকে আগে আঘাত হানার সুযোগ দিলেন এবং তার বাহিনীকে বেশী এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন। হিন্দুরা প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানলো। মুসলিম বাহিনী কয়েকবার দুই প্রান্তে আঘাত করার চেষ্টা করলো কিন্তু দাহিরের ছেলে খুবই দক্ষতার সাথে তার বাহিনীকে প্রত্যাঘাত থেকে বাঁচিয়ে মোকাবেলা করছিল।

দেখতে দেখতে যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হলো। হাতির ওপর থেকে মুসলিম বাহিনীর দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। দাহির পুত্র জেসিয়া ছিল একটি হাতির ওপরে উপবিষ্ট। দিনের শেষ ভাগে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধটি কঠিন হয়ে উঠলো। সেনাপতি বুদাইল জেসিয়ার হাতিটিকে অকেজো করে দেয়ার জন্য মধ্যভাগে অগ্রসর হয়ে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেনাপতি বুদাইল তার একান্ত রক্ষীদের নিয়ে জেসিয়ার হাতির কাছাকাছি পৌছে জেসিয়ার হাতির শুঁড় কাটার চেষ্টা করছিলেন। আর হাতির ওপর থেকে অসংখ্য তীর তার দিকে ছুড়ে মারছিল শত্রু সেনারা।

এক পর্যায়ে সেনাপতি বুদাইল হাতির কাছে চলে গেলেন, তিনি হাতির শুঁড়ে আঘাত হানবেন, এমন সময় তার কোন সহযোদ্ধার বর্শা হাতির শুঁড়ে আঘাত হানে। হাতি বিকট চিৎকার দিলে সেনাপতি বুদাইলের ঘোড়া ভড়কে গিয়ে উল্টো লাফিয়ে ওঠে। এতে সেনাপতি বুদাইল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। অমনি শত্রু সেনারা তাকে ঘিরে ফেলল। তিনি পড়ন্ত অবস্থা থেকে ওঠার আগেই শত্রুবাহিনী তাকে ধরে ফেলল কিন্তু দাহির পুত্র গর্জন করে

বলল "ওকে ধরার দরকার নেই ছেড়ে দাও।" সেনারা ছেড়ে দিতেই জেসিয়ার নিক্ষিপ্ত বর্শা তার বুকে বিদ্ধ হলো এবং সেনাপতি বুদাইল শাহাদাত বরণ করলেন।

কেন্দ্রীয় কমান্ডের অভাবে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। বিক্ষিপ্তভাবে আরব সৈন্যরা সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করল। কিন্তু যুদ্ধের কায়া পাল্টে গেল। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আহত ও নিহতের সংখ্যা বাড়তে লাগল। অবশেষে অন্ধকার উভয় বাহিনীর মধ্যে দেয়াল সৃষ্টি করলে যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। অন্যথায় মুসলিম বাহিনী প্রায় নিঃশেষে নিহত হতো কিংবা বন্দি হয়ে পৌত্তলিকদের জিন্দানখানায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হতো।

✪ ✪ ✪

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের মৃত্যু ও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের খবর যখন বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পৌঁছাল, অপমান ক্ষোভ ও অনুতাপে তার মাথা ঝুকে গেল। হাজ্জাজের মনে হচ্ছিল বর্শা সেনাপতি বুদাইলের বুক বিদীর্ণ করেনি, হাজ্জাজের নিজের বুক বিদীর্ণ করেছে। তিনি যখন মাথা ওপরে ওঠালেন, তখন ক্ষোভে তার চেহারা রক্তিম হয়ে গেছে, চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে রক্তবাণ।

"এতোটা কাপুরুষ তো ছিল না বুদাইল!" অনুতাপ অনুশোচনা স্বগতোক্তি করলেন হাজ্জাজ। সে একটি শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে আরেকটি বাহিনীর কাছে হেরে গেল কেন?"

"আমীরে ইরাক! আপনার ওপর আল্লাহ্ রহম করুন। আল্লাহ্ সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের বীরত্ব ও শাহাদাত কবুল করুন! তিনি ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি শত্রুদের আক্রমণ করতে দুশমনদের মধ্যভাগে চলে গিয়েছিলেন। সেনাপতির কথা ভুলে তিনি সিপাহীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু সেনাপতির রক্ষণভাগ গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। শত্রু সেনাপতির নিরাপত্তা ব্যুহ ভেদ করে তার ঘোড়াকে শত্রু সেনাপতির হাতির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় হাতির ওপর থেকে শত্রু বাহিনী তার ওপর যেভাবে তীর বর্শা নিক্ষেপ করছিল, তা থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করে শত্রু সেনাপতিকে বহনকারী হাতির শুঁড় কেটে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আহত হাতির ভয়ঙ্কর চিৎকারে তার ঘোড়া ভড়কে গিয়ে লাফিয়ে উল্টে পড়লে তিনি মাটিতে পড়ে যান, আর শত্রু বাহিনীর বর্শা তার গায়ে আঘাত হানে। তার

এই সাহসিকতা বর্ণনাতীত। আল্লাহর কসম! তিনি ভীরু ছিলেন না, ভয় শংকার লেশমাত্র ছিল না তার মধ্যে।"

ডাভেল থেকে ফিরে আসা তিন সেনার একজন এ কথাগুলো হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে বলল।

"তুমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?"

"জী, হ্যাঁ, আমীরে ইরাক! আমি যা বলছি, নিজের চোখে তা দেখে এসেছি। আমি তার পিছনেই ছিলাম, তিনি যখন বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়েন, তখন তার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে ছিলাম আমি।"

"বুদাইল মারা গেল আর তুমি পালিয়ে এলে? রক্তচক্ষু নিয়ে সেনার দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বললেন হাজ্জাজ। ওর জীবন বাঁচাতে তুমি মরণ স্বীকার করতে পারলে না। সিংহের মতো বাহাদুর সেনাপতিকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে তুমি পালিয়ে এলে?"

কথা শেষ করতে করতে হাজ্জাজ তরবারী কোষমুক্ত করে এক আঘাতেই সেনার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

"কাপুরুষ, ভীতু! ভীতু না হলে কেউ সেনাপতিকে শত্রুবেষ্টিত রেখে পালিয়ে আসতে পারে না" বলে হাজ্জাজ রক্তমাখা তরবারীটি তার একান্ত প্রহরীর দিকে ছুড়ে মারলেন।

দ্বিতীয় অভিযানের শোচনীয় পরাজয়ের খবরও যথারীতি দামেশকে পৌঁছে গেল। খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক পরপর দু'বার অভিযান ও পরাজয়ের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে হাজ্জাজকে দামেশকে আসার জন্য বার্তা পাঠালেন।

"আমীরুল মুমিনীন! খলিফার বার্তার লিখিত জবাব দিলেন হাজ্জাজ। আপনি নিষেধ করার পরও কেন দ্বিতীয়বার আমি সিন্ধু অঞ্চলে সেনা পাঠালাম আর শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলাম, এর জবাবদিহির জন্য যদি ডেকে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে এ মুহূর্তে আমি আসতে পারছি না। প্রথম অভিযানের সময় আমি এ শর্তে আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম যে, যে ক্ষয়ক্ষতি এ অভিযানে হবে আমি রাজকোষ এর দ্বিগুণ সম্পদে ভরে দেবো। আমি তখনই আমিরুল মুমিনীনের মুখোমুখী হবো, যখন আমার শর্ত আমি পূরণ করতে সক্ষম হবো। সিন্ধু অভিযান এখন আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এখন আমি আমার ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠাব। আশা করি আমিরুল মুমিনীন আমার এ সিদ্ধান্তে বাধা দেবেন না। জাতির সামনে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। পৌত্তলিকদের অহমিকা চূর্ণ করে মুসলমানদের বিজয় কেতন সিন্ধু রাজার রাজপ্রাসাদে উড্ডীন করার সুযোগ দিয়ে জাতির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখার সুযোগ দেবেন।"

"ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক হাজ্জাজের চারিত্রিক অবস্থা জানতেন। জানতেন হাজ্জাজ কোন ব্যাপারে জিদ ধরলে তা না ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয় না। এসব কারণে হাজ্জাজকে তিনি রীতিমত আতঙ্ক মনে করতেন।

খলিফার দূত হাজ্জাজের সকাশে থাকাবস্থায়ই সেনাপতি আমের বিন আব্দুল্লাহ্ হাজ্জাজের সাথে দেখা করতে এলেন এবং বললেন—

"সম্মানিত আমীর! আপনি যদি আমাকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান, তাহলে আমি কেবল আগের দু'পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েই ক্ষান্ত হবো না, অভিযানে যতো ব্যয় হয়েছে, তাও পূরণ করে দেবো। আর সিন্ধু এলাকার কর্তৃত্ব আপনার পায়ের নীচে এনে দেবো।"

"তোমার মনে যদি কোন বদ চিন্তা না থেকে থাকে, একজন সেনাপতি হিসাবে এ প্রস্তাব করে থাকো, তাহলে তোমার প্রস্তাবের জন্য আমি মোবারকবাদ জানাই। কিন্তু আমার মন বলছে, এ অভিযানের সাফল্য ঘরে তুলতে হলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রয়োজন।"

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের খুবই প্রিয় ব্যক্তি। সেনাপতি বুদাইলের রণকৌশল ও বীরত্বের প্রতি হাজ্জাজ ছিলেন আস্থাশীল। সেনাপতি বুদাইলের মৃত্যুতে হাজ্জাজ খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি একদিন বসরার কেন্দ্রীয় মসজিদের মুয়ায্যিনকে ডেকে বললেন, "আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন এবং তোমার কণ্ঠের আওয়াজকে আরো বুলন্দ করে দিন। তুমি আজ থেকে প্রত্যেক আযানের পর সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের নাম উচ্চ আওয়াজে উচ্চারণ করবে, যাতে আমি তার কথা ভুলে না যাই, তার রক্তের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকি এবং প্রতি নামাযের পর বুদাইলের জন্য দোয়া করতে পারি।"

✪ ✪ ✪

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দ্বিতীয় সিন্ধু অভিযান যখন ব্যর্থ হয়েছে এবং সেনাপতি বুদাইলের শাহাদাত ও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ে হাজ্জাজ প্রতিশোধ স্পৃহায় অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম পারস্যের সিরাজ এলাকার গভর্নর। কয়েক মাস আগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফই মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে এই বলে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, রায়া এলাকায় যে উপজাতীয়রা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এসব বিদ্রোহ দমনের জন্য তুমি সেনা অভিযানের প্রস্তুতি নাও। সেনাভিযান ছাড়া এসব উপজাতীয় বিদ্রোহ দমনের বিকল্প কোন পন্থা নেই। উপজাতীয়দের বিদ্রোহের দুঃসাহস চিরতরে নিঃশেষ করে দাও। নয়তো এরা এক সময় সালতানাতের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন হাজ্জাজের নির্দেশে উপজাতীয় বিদ্রোহ দমনে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন এবং রায়া অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন, ঠিক এমন সময় তাঁর কাছে হাজ্জাজের পয়গাম এলো—

"প্রিয় বৎস! আজ সেই সময় উপস্থিত, যার জন্য আমি তোমাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। রায়া অভিযান মুলতবি রেখে তুমি সিরাজেই অবস্থান নাও। আমি তোমার জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যে বাহিনী পৌঁছে যাবে। তোমাকে সিন্ধু অভিযানে যেতে হবে। আমি যে কোন মূল্যে সিন্ধু অঞ্চলকে সালতানাতের পতাকাতলে দেখতে চাই। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবিলম্বেই জানতে পারবে। ইতোমধ্যে আমাদের দু'টি অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিস্তারিত দূতের কাছ থেকে জেনে নিও। আল্লাহর কাছে শুধু এতটুকুই কামনা, তিনি যেন তোমার এ অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত না করেন।"

তৃতীয় ও চূড়ান্ত সিন্ধু অভিযানের প্রস্তুতির জন্যে হাজ্জাজ নাওয়া খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলেন। দিনরাত তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও রসদপত্রের আয়োজনে। এক শুক্রবারে বসরার সকল পুরুষকে একত্রিত করে তিনি ভাষণ দিলেন—

"হে বসরাবাসী! তোমাদের মনে রাখা উচিত, সময় দু'ধারী তরবারীর মতো। সময় শতত পরিবর্তনশীল। আজ এর পক্ষে তো কাল ওর পক্ষে। সময় কখনো আমাদের অনুকূলে থাকে, আবার কখনো আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। অনুকূল পরিস্থিতিতে আমাদের আলস্যে ভর করা উচিত নয়। সময় অনুকূলে থাকার সময় আমাদের উচিত নিজেদের শক্তিকে শাণিত এবং সেনাবাহিনীকে

সংগঠিত ও সুসংহত করা। আর সময় প্রতিকূলে চলে গেলে সময়ের বয়ে আনা প্রতিকূলতাকে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করা। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও অফুরন্ত অনুগ্রহ বিস্মিত হওয়া মোটেও ঠিক নয়। আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়...।

প্রিয় বসরাবাসী! আমি সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের কীর্তি ভুলতে পারছি না। স্বজাতির এক অসহায় কন্যার ফরিয়াদ আমার কানে সব সময় ধ্বনিত হচ্ছে। "হাজ্জাজ! আমাদের উদ্ধার করো, হাজ্জাজ! আমাদের সাহায্য করো...।" বুদাইলের রক্তের প্রতিশোধও আমাকে অস্থির করে তুলেছে। মনে হয় সে আমাকে ডাকছে, 'হাজ্জাজ প্রতিশোধ নাও, হাজ্জাজ পৌত্তলিকদের দর্প চূর্ণ করো...। আল্লাহর কসম! আমি অসহায় আরব নারী-শিশুদের উদ্ধার ও সেনাপতি বুদাইলের রক্তের প্রতিশোধ নিতে ইরাকের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। পৌত্তলিকদের উচিত শিক্ষা না দেয়া পর্যন্ত আমার চিত্ত স্থির হবে না।

হে আরববাসী! শুধু আরবদের জাত্যাভিমান নয়; ইসলামের চেতনার মর্ম মূলে আঘাত হেনেছে এক মূর্তিপূজারী বেঈমান রাজা। রাজা দাহির আমাদের নারী-শিশু বন্দি করে আমাদের তিরস্কার করছে। তোমরা কি দুশমনদের বুঝিয়ে দিতে অক্ষম যে, কোন্ জাতিকে উস্কানী দিচ্ছে এ পৌত্তলিক। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় যে জাতি অবলীলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে ভ্রূক্ষেপ করে না, অসহায় আর্তের সাহায্য যে জাতির ঐতিহ্য, সেই জাতির ধমনী কি আজ এমনই শীতল হয়ে গেছে, শরীরের রক্ত কি জমে গেছে? স্বীয় কন্যা-জায়া-তরুণীদের সম্ভ্রম ও শিশুদের জীবন বাঁচানোর আর্তনাদেও কি আমাদের চৈতন্যোদয় হবে না?

হাজ্জাজের ভাষণ শেষ হতে না হতেই চতুর্দিক থেকে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, জিহাদ, আল জিহাদ, লাব্বাইকা ইয়া হাজ্জাজ। শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠল। আবেগ উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে ওঠল সমাবেশ।

পর্ব চার

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দূত যখন সিরাজে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌঁছল, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম রায়া অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় দূতকে দেখে পয়গাম দ্রুত হাতে নিয়ে চকিতে চোখ বুলালেন তিনি। তার চেহারার রং বদলে গেল, তিনি পয়গামটি একপাশে ফেলে দিলেন ছুঁড়ে মারার মতো করে।

"হু, চাচা তো এখনো ততোটা বুড়ো হয়নি। কিন্তু তার বিবেক এতোটা কমজোর হয়ে গেল কি করে? সিন্ধু অভিযানের জন্য কি আর কোন সেনাপতি ধারে কাছে ছিল না? আমাকে এতো দূর থেকে কেন যেতে হবে? তিনি কি জানেন না, রায়া উপজাতিদের বিদ্রোহ দমনে আমাকে কতোটা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে? আমি এখান থেকে চলে গেলে আবারো কি বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে না? আর এমন কি ঘটলো যে, এখনও পর্যন্ত সিন্ধু রাজার কবল থেকে বন্দিদের মুক্ত করা গেল না?"

"আমীরে সিরাজ! আপনার ওপর আল্লাহ্ রহম করুন!" বলল দূত। বন্দিদের উদ্ধার করতে গিয়ে দু'টি অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, দু'জন সেনাপতি ইতোমধ্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং দু'বার মুসলিম বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে।"

"দু'জন সেনাপতি প্রাণ দিয়েছেন? বলো কি? বিস্ময়ে হতবাক হলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তিনি দূতকে বললেন, বলো, তাড়াতাড়ি বলো, কি ঘটেছিল সেখানে, কারা ছিলেন সেনাপতি?"

"প্রথম অভিযানে আব্দুল্লাহ বিন নাবহান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সিন্ধু উপকূলের ডাভেল বন্দর দখলের অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন। তার বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধাও শাহাদাত বরণ করে। দ্বিতীয় অভিযানের সেনাপতি ছিলেন বুদাইল বিন তোফায়েল। তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

তার শাহাদাত আমাদের বাহিনীর জন্য পরাজয়ের কারণ ঘটে। তৃতীয়বার সেনাপতি আমের বিন আব্দুল্লাহ তাকে সিন্ধু অভিযানে পাঠানোর জন্য আপনার চাচার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজ বললেন, না, আর কারো প্রতি আমি আস্থা রাখতে পারছি না। আমার ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে আমি অভিযানে পাঠাব। আমার বিশ্বাস, বিজয় তার পদচুম্বন করতে বাধ্য হবে।"

দূতের কথা শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের চেহারায় যে পরিবর্তন দেখা দিলো, তা ছিল ব্যাপক অর্থবোধক। একটা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন করে ফেলল বিন কাসিমকে। তিনি দাঁড়িয়ে পিছনে হাত বেঁধে দৃঢ় পায়ে কক্ষ জুড়ে পায়চারী করছিলেন, আর দূত তার পিছু পিছু হাঁটছিল। তিনি গভীর দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেন হিসাব করছিলেন। দূত নিবিষ্ট মনে তাঁকে অনুসরণ করছিল।

"ইবনে নাবহান ও ইবনে তোফায়েল তো পরাজয় বরণ করার মতো সেনাপতি ছিলেন না।" দাঁড়িয়ে দূতকে লক্ষ্য করে বললেন বিন কাসিম।

"আল্লাহর কসম! তারা রণাঙ্গনে পিঠ দেখানোর মতো ব্যক্তি ছিলেন না। উভয়েই বেপরোয়াভাবে শত্রু বাহিনীর রক্ষণভাগে ঢুকে পড়েছিলেন।"

দূত দু'টি সিন্ধু অভিযান সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা দিলো। আরো জানালো, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মানসিক অবস্থা।

"তার অবস্থা এমনটিই হওয়া উচিত।" বললেন বিন কাসিম। আরবদের নাওয়া খাওয়া হারাম হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। প্রতিটি আরব মুসলমানের স্ত্রী গমন হারাম করে দেয়া উচিত।"

ঠিক আছে। তুমি এখন গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। শরীরটা ঠিক হলে চলে যেয়ো। চাচাকে বলবে, আপনার ভাতিজা আপনার আশা পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ্! হ্যাঁ, আমি অবশ্যই আমাদের বন্দিদের মুক্ত করবো এবং আল্লাহ্ যদি সহায় হন, সিন্ধু অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু মন্দির চূড়ায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করব।"

দূত চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মুহাম্মদ বিন কাসিম তার পারিষদবর্গকে ডেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পয়গামের কথা ব্যক্ত করলেন।

পারিষদবর্গের একজন বললেন, আমীরে মুহ্তারাম! রায়া অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন মুলতবি করে দেয়ার কথাটা হাজ্জাজ ঠিক বলেননি। সিন্ধু

অভিযানে এখান থেকে শুধু আপনিই যাচ্ছেন। আর আপনার ক'জন দেহরক্ষী যাবে। আর আমরা তো এখানেই আছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আপনার অবর্তমানেও বিদ্রোহ দমন অভিযান আমরা অব্যাহত রাখব।"

"আমরা যদি এ পর্যায়ে এসে বিদ্রোহ দমন অভিযান মুলতবি করে দেই, তাহলে উপজাতিদের গোয়ার্তুমী প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার ধারণ করবে।" বললেন অপর একজন কর্মকর্তা।

"আমি আপনাদের অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু এ কথাটি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, দু'বার সিন্ধু অভিযানে পরাজিত হওয়ার পর তৃতীয় কোন পরাজয়ের সংবাদ হাজ্জাজ কোন অবস্থাতেই শুনতে চাইবেন না। পরাজয় তাঁর কাছে অসহ্যকর হয়ে গেছে। তিনি পরাজয়ের জন্য আর কোন সৈনিক, সেনাপতিকে ক্ষমা করার কথা ভাবতেও রাজি হবেন না। আপনারা সবাই তাকে কমবেশী জানেন। আমি এখান থেকেই বুঝতে পারছি, তার মানসিক অবস্থা এখন কেমন।"

"পরিণতির কথা মাথায় রেখেই আমাদেরকে বিদ্রোহ দমনাভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।" বললেন অপর কর্মকর্তা।

"হাজ্জাজের ওপরে আল্লাহ্ আছেন। আমাদের হাজ্জাজের সন্তুষ্টি নয় আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হওয়া উচিত।" বললেন একজন সেনাপতি।

"তার পারিষদবর্গ কি বলছে সেদিকের চেয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট করে ফেলেছিল সিন্ধু অঞ্চলের মানচিত্র। তিনি সিন্ধু অঞ্চলের মানচিত্র মেলে ধরে সেদিকে তাকিয়ে পারিষদবর্গের কথা শুনছিলেন। আর সিন্ধু অঞ্চলের অবস্থা চিন্তা করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

✪ ✪ ✪

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মন-মানসিকতা অনুধাবন করা আর কারো পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। প্রতিশোধের নেশায় হাজ্জাজ প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। হাজ্জাজ যদি কারো ওপরে ক্ষেপে যেতেন, তবে কেবল সেই আন্দাজ করতে পারত ক্ষোভের গভীরতা। হাজ্জাজের মতের বিরুদ্ধে কেউ বাধা দিলে তিনি তার শিরশ্ছেদ করে ফেলতেন। কখনো এমন মনে হতো যে, স্বজাতির সকল মানুষকেই হত্যা করে ফেলবেন হাজ্জাজ। কোন অধীনস্থ তার হুকুমের ব্যতিক্রম করাকে তিনি মোটেই বরদাশ্ত করতে পারতেন না।

মামুলী ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে হাজ্জাজ তার অধীনস্থদের কঠোর শাস্তি দিতেন। হাজ্জাজের হাতে স্বজাতির যতো লোক নিহত হয়েছে, এতো লোক শত্রুপক্ষেরও নিহত হয়নি। যে পরিমাণ মুসলমানের রক্ত হাজ্জাজের হাতে প্রবাহিত হয়েছে, এ পরিমাণ দুশমনদেরও সম্ভবত হয়নি। সেই কঠোর কঠিন হাজ্জাজ কিভাবে নিরপরাধ আরব নারী শিশুদের এক লুটেরা হিন্দু রাজার হাতে নির্যাতিত হওয়াকে সহ্য করতে পারেন! অবশ্য একথা বলা চলে, হাজ্জাজ তার বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য ছিলেন কঠোর আর দুশমনদের জন্যে ছিলেন সাক্ষাত মৃত্যু।

রাতের বসরা হয়ে উঠল দিনের মতো কর্মমুখর। হাজ্জাজ যে নির্দেশ দিতেন, তিনি এর শতভাগ বাস্তবায়ন দেখতে চাইতেন। সিরীয় সৈন্যদের থেকে তিনি বেছে বেছে ছয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে বসরার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁবু ফেলে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেন। এসব সৈন্যরা একাধারে রাতদিন তরবারী, তীর ও বর্শা চালনার উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে লাগল। সেই সাথে চলল অশ্বারোহণ মহড়া। কোন সৈন্য যদি ক্লান্ত হয়ে থেমে যেত কিংবা পড়ে যেত, তাহলে হাজ্জাজের নির্দেশ ছিল, "তাকে চাবুক মেরে তুলে দেবে।"

সৈন্যদের প্রশিক্ষণ হাজ্জাজ নিজে তদারকি করতেন। হাজ্জাজ যখন দেখতেন, সৈন্যদের শরীর ক্লান্তি অবসাদে চুরচুর হয়ে গেছে। তখন তিনি সবাইকে একত্রিত করে বলতেন, "তোমরাই ইসলাম ও আরবের মর্যাদার রক্ষক। সেই সাথে একথা চিন্তা করো, যে সব নারী ও শিশুকে হিন্দু রাজা বন্দি করে রেখেছে, এরা তোমাদের কারো না কারো মা, বোন অথবা কন্যা।"

অপর একদিন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ বললেন, "আজ আবারো আমি তোমাদের বলছি, অসহায় এক আরব কন্যা আমাকে সাহায্যের ডাক দিয়েছে, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি...। আমি একাকী কি তাদের মুক্ত করতে পারব? তোমাদের আত্মমর্যাদা কি একথা সায় দেবে? তোমাদের নির্যাতিতা অসহায় বিপন্ন কন্যা-জায়াদের মুক্ত করতে আমি কোন চেষ্টা না করে তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ভুলে থাকবো?... না, তোমরা আমার সঙ্গী না হলেও আমার পক্ষে তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা সম্ভব নয়, আমি একাকী হলেও তাদের ডাকে সাড়া দেবো...।"

"আমরাও যাবো।" এক বাক্যে সমবেত সৈন্যদের মুখে উচ্চারিত হলো। সৈন্যরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "আপনি একা নন, আমরাও যাবো।"

এভাবে সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমে অবসন্ন ক্লান্ত সৈন্যদেরকে নানা কথায় হাজ্জাজ উজ্জীবিত করতেন, তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে চাঙ্গা করে তুলতেন এবং আবেগকে আন্দোলিত করতেন। যার ফলে কঠোর পরিশ্রান্ত সৈন্যরা সারাদিনের কষ্টকর প্রশিক্ষণের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠত।

✪✪✪

ট্রেনিং এর পাশাপাশি বসরার উন্মুক্ত মাঠে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অসি চালনা, ঘোড়দৌড় ও মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। এসব আয়োজনের ফলে দৃশ্যত মনে হলো ইরাক ও সিরিয়ার সকল ঘোড়া ও উট বসরার মাঠে এসে জড়ো হয়েছে।

হাজ্জাজ সারা দেশে প্রচার করে দিয়েছিলেন, "বসরায় ঘোড়দৌড়, অশ্বচালনা, তরবারী চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ, হাতিয়ার ও লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এসব প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হবে কিংবা দক্ষতা দেখাবে, তাদেরকে সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে ভর্তি করে নেয়া হবে এবং দেশের বাইরে তাদেরকে এমন জায়গায় যুদ্ধে পাঠানো হবে, যেখান থেকে তারা লাভ করবে অঢেল ধন-সম্পদ।"

সে সময় মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ যেমন ছিল উন্নত, তেমনি সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে আসীন হওয়া এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী সৈন্য হিসাবে মালে গনীমতের অধিকারী হওয়ার প্রতি আগ্রহ থাকতো যে কোন আরব যুবকের। সৈন্য ভর্তির মেলা ও প্রতিযোগিতা চলল টানা কয়েকদিন।

দিন যতোই যেতে লাগল প্রতিযোগী যুবকদের ভীড় ও মেলাঙ্গনে মানুষের সমাগম আরো বাড়তে লাগল। হাজ্জাজ বসরার কিছু লোককে নিয়োগ করে রেখেছিলেন, যারা মেলাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে প্রচার করতো সিন্ধু অঞ্চলের এক হিন্দু রাজা মুসলমানদের একটি জাহাজ লুট করে জাহাজে আরোহী বহু আরব নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে বন্দি করে রেখেছে। আমাদের উচিত আরবের মর্যাদা রক্ষায় যুদ্ধ করে হিন্দু রাজাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আরব শিশু কন্যাদের মুক্ত করে আনা। প্রচারক দল নানাভাবে ভাষার লালিত্য দিয়ে মেলায় আগত মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমান জাগিয়ে দিচ্ছিল। যা হাজ্জাজ প্রত্যাশা করেছিলেন। এর ফলে মেলায় আগত সকল মানুষের

মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকের মধ্যে জাত্যাভিমান ও ইসলামের চেতনা উজ্জীবনী শক্তিতে পরিণত হয়।

মেলা চলাকালে কয়েক দিন প্রতিযোগিদের উৎসাহ দিতে হাজ্জাজ নিজেও উপস্থিত হয়ে সমবেত দর্শক প্রতিযোগিদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করেন, যে কথা তিনি বসরার জামে মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলেছিলেন। খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান প্রতি বছর দামেশকে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সেই প্রতিযোগিতা দেখা ও অংশগ্রহণের জন্য বহু দূর থেকে লোকজন আসতো। ঘটনাক্রমে যেদিনগুলোতে খলিফা আব্দুল মালিক সামরিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন, ঠিই একই সময়ে বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বসলেন। কিন্তু হাজ্জাজের প্রতিযোগিতার প্রচারণা এতোটাই তুঙ্গে ছিল যে, দামেশকের অধিকাংশ লোক হাজ্জাজের মেলায় যোগদান করতে বসরায় চলে এলো।

সেদিন ছিল মেলার ষষ্ঠ দিন। অস্ত্রবিহীন চার অশ্বারোহী একে অন্যের সওয়ারী কেড়ে নেয়া এবং অশ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রতিপক্ষকে ফেলে দেয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। চার প্রতিযোগির প্রত্যেকেই সমানে সমান। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। উর্ধ্বশ্বাসে সবাই ঘোড়া ছুটাচ্ছে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে আর দর্শকদের চিৎকার উল্লাসে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠেছে। আর অশ্বারোহীদের কসরতে মাঠের ধুলোবালি আকাশে উঠে যাচ্ছে। মধ্য মাঠ ধুলোতে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে হাজ্জাজ প্রতিযোগিদের পাশাপাশি তার ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। হাজ্জাজের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিরা যেমন উজ্জীবিত হলো দর্শকরাও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো।

দর্শকদের কোলাহলে বসরার সবকিছু চাপা পড়ে গেল। হাজ্জাজ প্রতিযোগিদের দিকে নিবিষ্ট ছিলেন ঠিক এ মুহূর্তে ধুলি অন্ধকারের মধ্য থেকে ধাবমান এক অশ্বারোহী এসে হাজ্জাজের ঘোড়ার পাশাপাশি নিজের ঘোড়া হাঁকাতে লাগল। কিন্তু হাজ্জাজের সেদিকে খেয়াল ছিল না, তার পাশেই আর এক অশ্বারোহী রয়েছে। হঠাৎ আরোহী হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "বসরার আমীর কি আমাকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিতে চান?" হাজ্জাজের কানে ভেসে এলো তাকে চ্যালেঞ্জ করার আওয়াজ। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইলেন, কোন অশ্বারোহী তাকেই চ্যালেঞ্জ করছে কি-না। হাজ্জাজ দেখলেন তারপাশেই খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক।

খলিফাকে তার পাশে চলতে দেখে হাজ্জাজ না বিচলিত হলেন, না তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। অথচ তিনি জানতেন, খলিফা দামেশক থেকে এসেছেন, এ সময় তার দামেশকেই থাকার কথা। হাজ্জাজ খলিফার ঘোড়াকে ঠেলে ঠেলে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে ঘোড়া থামালেন।

"মনে হচ্ছে ইবনে ইউসুফ আমাকে শুধু ঘোড়া থেকেই নয় মসনদে খেলাফত থেকেই ফেলে দিতে চাচ্ছেন" বললেন, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক। নয়তো আপনি বসরায় এ ধরনের মেলার আয়োজন করছেন, তা অন্তত আমাকে জানাতে পারতেন। আপনি কি জানেন না, এ সময় দামেশকে সামরিক উৎসবের আয়োজন করা হয়?"

"খলিফাতুল মুসলিমীন! গুরু গম্ভীর সম্মোহনী কণ্ঠে বললেন হাজ্জাজ। আপনার প্রতিযোগিতা হয় একটি বিনোদনমূলক উৎসব। আর আমি এ আয়োজন করেছি প্রয়োজনের তাকিদে। আমি সিন্ধু আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য এ ব্যবস্থা করেছি। আশা করি আপনার গোয়েন্দারা আপনাকে সবই বলেছে। না বললে এ সময়ে আপনার এখানে আসার কথা নয়।"

"আপনি রীতি রক্ষার প্রয়োজনেও আমাকে এ সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি যে, দ্বিতীয় আরেকটি অভিযানে আমাদের সৈন্যরা সিন্ধু রাজ্যের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। এখন তৃতীয়বার আপনি অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু... সেই পরাজয়ের লজ্জা কি আপনাকে আমার দরবারে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন খলিফা।

হাজ্জাজ ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ক্রোড় হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, "লজ্জা যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে আমি শুধু আল্লাহকেই করি। খলিফাতুল মুসলিমীন! স্বভাবত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে বললেন হাজ্জাজ। আপনি সেই সময় দুনিয়াতে এসেছেন, যখন আমি পূর্ণ যুবক। আমি দুনিয়ায় যা দেখেছি, আপনি তা দেখেননি। আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। আমি এ বয়সেও যা করতে সক্ষম, আপনার পক্ষে তা হয়তো সম্ভব নয়। আপনি আপনার মসনদকে ঘিরে চিন্তা করেন, আমার চিন্তা সমগ্র আরব ও মুসলিম সালতানাতকে ঘিরে।

আমি জানি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আপনি চান আমি কেন অভিযানের আগে আপনার অনুমতি নিলাম না। আমি জানতাম, আপনি

আমাকে অভিযানের অনুমতি দেবেন না। আমি আপনাকে বলেছিলাম, সিন্ধু অভিযানে যে পরিমাণ সরকারী সম্পদ ব্যয় হবে, আমি তার দ্বিগুণ সম্পদ সরকারী কোষাগারে জমা দেবো। এখন আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সিন্ধু এলাকার কর্তৃত্ব আপনার পায়ের নীচে এনে দেবো।"

খলিফাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে হাজ্জাজ আরো বললেন, আমি যদি এই হিন্দুরাজার ঔদ্ধত্যের জবাব না দেই, তাহলে এরা আজ আমাদের জাহাজ লুট করে আরোহীদের বন্দি করেছে, কাল এখানে এসে আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে যাবে। দু'টি পরাজয় যদি আমরা হজম করে নেই, তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয়, আপনি খেলাফতের মসনদে নয় নিজেকে দুশমনের বন্দিশালায় দেখতে পাবেন।"

খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর অবস্থান ও যুদ্ধ প্রস্তুতির পরিস্থিতি দেখে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আসলে তখন মুসলমানদের অবস্থা পূর্বের মতো ছিল না। মসনদে সীমিত হয়ে পড়েছিল মুসলমানদের জাঁকজমক। খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক সিন্ধু অভিযানের বিপক্ষে ছিলেন। চাহিদার পরিপন্থী হলেও এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। খলিফা নির্বিবাদে খেলাফতের মসনদে সমাসীন থাকাটাই পছন্দ করতেন।

হাজ্জাজ সিরীয় সেনা ইউনিট থেকে সিন্ধু অভিযানের জন্য যে ছয় হাজার সেনাকে নির্বাচন করেছিলেন, এদের সবাই ছিল অশ্বারোহী কিংবা উষ্ট্রারোহী। এরা শুধু বাহনওয়ালাই ছিল না, প্রত্যেকেই ছিল টগবগে যুবক, তাগড়া। বয়স্ক দুর্বল ও অচৌকস কোন সেনাকেই হাজ্জাজ এ দলে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। সামরিক মেলার আয়োজন করে মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকেও ছয় হাজার যুবককে নির্বাচন করে হাজ্জাজ আরেকটি সেনা ইউনিট গড়ে তোলেন। এরা দীর্ঘ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য না হলেও ছিল দক্ষ, চৌকস ও উজ্জীবিত তারুণ্যের অধিকারী। এ বাহিনীকে গঠন করা হয় মূল বাহিনীর সহযোগী হিসাবে। সাপ্লাই ও রসদপত্র সরবরাহের সেচ্ছাসেবী এবং প্রয়োজনে সৈন্যবল বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করার জন্য।

হাজ্জাজ সেনাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেন। সেনাদের প্রতিটি প্রয়োজন তিনি এভাবেই পূরণ করলেন, মনে হচ্ছিল এরা সৈনিক নয় যেন শাহী খান্দানের লোক। সুঁই সুতা থেকে নিয়ে খাদ্য বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুই তিনি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী ও

উন্নতমানের সরবরাহ করেন। তখন ইরাকের লোকেরা যে কোন আহারে সিরকা বেশী ব্যবহার করতো। হাজ্জাজ প্রতিটি সৈন্যের জন্যে পর্যাপ্ত সিরকার ব্যবস্থা করেন। তরল সিরকা পরিবহন সমস্যা মনে করে সিরকায় তুলা ভিজিয়ে তা শুকিয়ে প্যাকেট করে দেন। যাতে খাবার সময় সিরকা ভেজানো তুলা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সৈন্যরা সাচ্ছন্দ্যে আহার করতে পারে। তিনি সেনাপতি ও কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সৈন্যদের খাবার ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে যেন কোনরূপ কৃচ্ছ্রতার আশ্রয় না নেয়। কারণ সৈনিকদের ব্যবহার্য সবকিছুই তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করেছেন।

হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানে প্রাত্যহিক খরচ নির্বাহের জন্য ৩০ হাজার দীনার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন। সৈন্যদের খাবার ও রসদ পত্র জাহাজে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং পদাতিক সৈন্যদের জন্য ছয় হাজার দ্রুতগামী উষ্ট্রী জাহাজে প্রেরণ করেন। এ ছাড়াও পণ্য পরিবহণের জন্য দিয়েছিলেন কয়েক হাজার উট।

জাহাজে পাঠানো সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে অন্যতম ছিল মিনজানিক। ছোট বড় মিনজানিক ছিল কয়েকটি। তন্মধ্যে একটি মিনজানিক এতোটাই বিশাল ছিল যে, পাঁচশ মানুষ প্রয়োজন হতো এটাকে ঠেলে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নেয়া এবং এটি দিয়ে পাথর নিক্ষেপের জন্য। এই মিনজানিকের নাম ছিল 'উরুস'। এটি দিয়ে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হতো। যে পাথর পাঁচ ছয় জন মানুষে গড়িয়ে গড়িয়ে মিনজানিকের মধ্যে তুলে দিতো। উরুসের নিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথর যে কোন কঠিন দুর্গ প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করতো এবং শত্রুদের জন্য এটি ছিল ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার।

তৃতীয় ও চূড়ান্ত সিন্ধু অভিযানের বিশাল ব্যবস্থাপনার জন্য হাজ্জাজ বহুমুখী প্রচারণার দ্বারা জনগণের মধ্যে যেমন জাত্যাভিমান ও ইসলামী চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তদ্রূপ ইরাকের নারী পুরুষের মধ্যে জাগাতে পেরেছিলেন জিহাদী আবেগ। ইরাকের নারীরা তাদের স্বামী, সন্তানদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং জিহাদের ব্যয় নির্বাহে নিজেদের সঞ্চিত সম্পদ ও অলংকারাদি হাজ্জাজের জিহাদ ফান্ডে অকাতরে ঢেলে দিয়েছিলেন। যার ফলে এতো বিশাল আয়োজন করা হাজ্জাজের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

হাজ্জাজের নবগঠিত সেনাবাহিনী প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যখন সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে বসরা থেকে সিরাজের পথে রওয়ানা হলো, সেদিন

বসরার সকল নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সেনাবাহিনীর রণসজ্জা দেখা এবং তাদের বিদায় জানানোর জন্য ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। মুজাহিদদের সাফল্য ও শত্রুদের প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়লো বসরার লোকজন। হাজ্জাজ যেন সবার বুকে আগুন ধরিয়ে দিলেন। জনতার মুহুর্মূহু শ্লোগান ও শুভ কামনায় সিক্ত হয়ে হাজ্জাজের নবগঠিত বাহিনী বসরা ছেড়ে সিরাজের পথে অগ্রসর হতে লাগল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সেনাদের সাথে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। অবশেষে একটি উঁচু জায়গায় থেমে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে শেষ সৈন্যটি তাকে অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের গমন প্রত্যক্ষ করলেন এবং হাত নেড়ে তাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করতে থাকলেন। দীর্ঘক্ষণ সেনাদের আত্মীয়-স্বজনেরা সৈন্যদের গমন পথের ধুলা ওড়ার দৃশ্য অবলোকন করে তাদের পুত্র, স্বামী, ভাইদের বিজয়ের দোয়া করে অবশেষে ঘরে ফিরলেন। এই বাহিনীর সহ-সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো জাহাম বিন জাফর জাইফীর কাঁধে।

✪✪✪

হাজ্জাজের প্রেরিত সেনাদের পৌছার জন্য বড় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। সেনাদের পৌছার অপেক্ষা করাটা ছিল তার জন্য পীড়াদায়ক। তিনি কোন কাজে অহেতুক সময় ক্ষেপণ করাটা মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। মাঝে মধ্যে তিনি ঘোড়ায় চড়ে বসরার পথে বহু দূর পর্যন্ত সৈন্যদের আসার খবর জানার জন্য চলে যেতেন। একদিন নিজের কক্ষে কাজে মগ্ন ছিলেন বিন কাসিম। হঠাৎ তার কক্ষের দরজা সজোরে খুলে গেল এবং তিনি কিছুদিন যাবত যে সংবাদের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সে খবর পৌছে গেল।

"বসরার দিকে বহু দূরে ধুলি ঝড় দেখা যাচ্ছে। আল্লাহর কসম! এটা ধুলিঝড় নয়।" বলল সংবাদদাতা।

"ঘোড়া প্রস্তুত করো।" নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন বিন কাসিম।

দ্রুত ছুটালেন ঘোড়া। সাথে সাথে তাঁর দেহরক্ষী দল তাঁর অনুসরণ করলো। অনেক পথ অগ্রসর হয়ে বসরার সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানালেন বিন কাসিম। এখন হাজ্জাজের নির্দেশ মতো গোটা বাহিনীর সেনাপতির

দায়িত্ব নিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। জাহাম বিন জাইফী হলেন তাঁর সহযোগী।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু অভিযানের খবরাখবর দ্রুত পাওয়া ও নির্দেশ পৌছানোর জন্য বসরা থেকে মাকরান পর্যন্ত বহু সংখ্যক সেনা চৌকি স্থাপন করলেন। এসব চৌকিতে কিছু সংখ্যক সৈন্য, দ্রুতগামী ঘোড়াসহ দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য অবস্থান করতো। তারা উভয় দিকের বার্তা দ্রুত অপর চৌকিতে পৌছে দিতো। এভাবে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন হাজ্জাজ। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, স্বাভাবিকভাবে বসরা থেকে মাকরান পৌছতে একজন মুসাফিরের সময় লাগতো যেখানে দেড়মাস, সেক্ষেত্রে হাজ্জাজ মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সংবাদ পৌছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

জাহাম বিন জাইফীর কাছে হাজ্জাজ মৌখিকভাবে বলে দিয়েছিলেন বিন কাসিম তার পরবর্তী নির্দেশ পাওয়ার আগে যেনো আক্রমণ শুরু না করেন। ডাভেলে পৌছার আগেই কিছু ছোট ছোট দুর্গ অস্ত্রমুক্ত করার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ পুননির্দেশ দেয়ার শর্ত করায় বিন কাসিমকে হাজ্জাজের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

হাজ্জাজের প্রেরিত বাহিনী সিরাজ পৌছার পরদিনই মুহাম্মদ বিন কাসিম মাকরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। সে সময় আরব সাগরের কূলে অবস্থিত মাকরানের যে অংশটি মুসলিম শাসনাধীন ছিল এর শাসক ছিলেন মুহাম্মদ বিন হারুন। তাকে আগেই সংবাদ পাঠানো হয়েছিল তৃতীয় এবং চূড়ান্ত আঘাতের জন্য নতুন সেনাবাহিনী আসছে। তাই মাকরানের শাসক বিন হারুন কিছুটা পথ এগিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীকে স্বাগত জানাতে ঘোড়ার পিঠে বসে রইলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মনে করেছিলেন মাকরানের শাসক হয়তো ঘোড়া দৌড়িয়ে তার কাছে চলে আসবেন। কিন্তু তিনি দেখলেন বিন হারুন ঘোড়ার পিঠে অধোমুখে ঠাঁয় বসে আছেন। তিনি এ অবস্থা দেখে নিজেই ঘোড়া হাঁকিয়ে কাছে গিয়ে যখন তার সাথে মোসাহাফা করলেন, তখন অনুভব করলেন বিন হারুনের দেহে প্রচণ্ড জ্বর। জ্বর এতোটাই তীব্র যে তার ঘরের বাইরেই বের হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু মুহাম্মদ বিন হারুন স্বদেশী সৈন্যদের স্বাগত জানানোর আবেগকে ধরে রাখতে পারেন নি। প্রচণ্ড জ্বর নিয়েই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই অসুখ নিয়েই তিনি বিন

কাসিমের বাহিনীকে সঙ্গ দেন, সার্বিক সহযোগিতা করেন। আর এই অসুখেই তার মৃত্যু ঘটে।

✪ ✪ ✪

"হ্যাঁ, তাদের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন। কারণ তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। তাছাড়া আরবরা দক্ষ যোদ্ধা, লড়াকু। তারা নিশ্চয়ই রাজা দাহিরের পক্ষাবলম্বন করবে। কারণ রাজা দাহির আশ্রয় দিয়ে তাদের বিরাট উপকার করেছে।"

"আমাদের বিরুদ্ধে আগের দুই যুদ্ধে বিদ্রোহী আরবদের কেউ অংশ গ্রহণ করেছিল এমন কোন খবর আমরা পাইনি।" বললেন মাকরানের শাসক। আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, রাজা দাহির আলাফীকে তার সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তাব করেছিল এবং লোভও দেখিয়েছিল, কিন্তু আলাফী এতে সম্মত হয়নি।"

"আল্লাহ্ আপনার ওপর রহম করুন, সম্মানিত আমীর! আমি আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা করেই বলতে চাই, আপনার দেয়া তথ্যকে আমি বিশ্বাস করি। আপনি দেখেছেন বিগত দুইটি অভিযানের চেয়ে বসরা ও সিরিয়ার শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবার অনেক বেশী সৈন্য পাঠিয়েছেন। এই বিশাল বাহিনীকে অবতরণ করতে দেখে রাজা দাহির নিশ্চয়ই তার সহযোগীদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য জোর চেষ্টা চালাবে। এও তো সম্ভব, যে কোন মূল্যে সে আরব অভিবাসীদেরকে তার পক্ষে যুদ্ধ করতে সম্মত করবে।" বললেন বিন কাসিম।

"এ ব্যাপারে আমরা আলাফীকে ডেকে কথা বলতে পারি। আমরা আলাফীকে রাজা দাহিরের সহযোগিতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে পারি। অবশ্য এর আগে এরা এক যুদ্ধে রাজা দাহিরের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং দাহিরের এক শক্তিশালী শত্রুকে এরাই শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। যাক, তুমি চাইলে আমি আলাফীকে এখানে ডেকে আনতে পারি।"

"তাকে কি এখানে ডেকে আনা সম্ভব?"

"ডাকলে হয়তো নাও আসতে পারে, তবে খবর পাঠিয়ে দেখা যাক। আমি তাকে গোপনে এক জায়গায় আসার কথা বলবো, সেখানে গোপনে আমি এবং তুমি অথবা তুমি একাকী তার সাথে দেখা করে কথা বলবে।" বললেন মাকরানের শাসক।

"আমি তো তার ঠিকানায় গিয়ে কথা বলতেও প্রস্তুত।" বললেন বিন কাসিম।

"না ভাই! যে আমাদের শাসক ও খলিফার বিদ্রোহী। তার প্রতি এতোটা আস্থাবান হওয়া ঠিক হবে না। কারণ বিদ্রোহী মন কখন কি করে বসে ঠিক নেই। তুমি একজন দক্ষ সেনাপতি ও বিচক্ষণ যোদ্ধা হতে পারো, তারপরও আমি বলবো, এ ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করাই সমীচীন হবে। আমি বরং এমন এক জায়গায় তাকে সাক্ষাতের কথা বলি যেটা আমাদের দখলে নয় আবার তার নিয়ন্ত্রণাধীনও নয়।" এই বলে মাকরানের শাসক এক ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলেন।

ডাকে সাড়া দিলো এক মধ্যবয়সী লোক।

"ইবনে হায়সামা! তুমিই পারবে এ কাজটি করতে। বনী উসামার হারেস আলাফীকে আমার কথা বলবে। সেই সাথে বলবে অমুক জায়গায় সাক্ষাত করতে।"

"সম্মানিত শাসক। আলাফীকে ডাকার কারণ জানতে পারি কি? কারণ আমি কি তাকে বলবো মুহাম্মদ বিন হারুন আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। সে যদি আমার কাছে আরব সেনা উপস্থিতির কথা জানতে চায় তাহলে কি বলবো?"

"সে সতর্ক মানুষ। আরবের সেনা উপস্থিতির কথা তার কাছে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। তাছাড়া সৈন্য আগমনের বিষয়টিও তার না বোঝার কথা নয়। এসব কথা তোমাকে বলে দেয়ার বিষয় নয়, তুমি বুদ্ধিমান লোক। তোমার মূল কাজ হলো, তাকে সাক্ষাতের জন্য রাজি করানো। আশা করি তুমি তা পারবে। আমরা কেন তার সাথে সাক্ষাত করতে চাই, তাও তার বুঝতে অসুবিধে হবে না।"

মুহাম্মদ বিন হারুন একটি জায়গার কথা বলে বললেন, আলাফীকে নিয়ে তুমি আজ রাত এশার পর সেখানে উপস্থিত হবে।"

✪ ✪ ✪

মাকরানে আট দিন কেটে গেছে বিন কাসিমের। এ দিনগুলোতে জাহাজ থেকে আসবাবপত্র, পণ্য সামগ্রী ও রসদ নামানোতেই লেগে গেল। এ ছাড়া যেসব সামগ্রী ও রসদ ডাভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেগুলো যাচাই করে অন্য জাহাজে তোলা হলো। আর এরই মধ্যে যেসব এলাকা দিয়ে বিন

কাসিমকে অগ্রসর হতে হবে যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী সেসব এলাকার আগাম পরিস্থিতি জানার জন্য বিন কাসিম অগ্রবর্তী গোয়েন্দাদের পাঠিয়ে দিলেন। মাকরানের যে এলাকায় সেনাবাহিনী অবতরণ করল, সেই এলাকাটি সেনাদের ব্যস্ততা ও কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন দিন রাত সবই একাকার হয়ে গিয়েছে। আর বিন কাসিমের সেনারা প্রস্তুতি নিচ্ছিল যথাযথ আক্রমণের।

✪✪✪

এদিকে রাজা দাহির তার রাজ দরবারে সমাসীন। তার সভাসদবর্গ উপস্থিত। আরব সেনাদের আগমন সংবাদ পেয়ে রাজা দাহির জরুরী সভা তলব করেছে। সংবাদ বাহকদের সংবাদ পাওয়ার পর রাজা দাহিরের পারিষদবর্গ কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রহরী এসে খবর দিলো, "এক উষ্ট্রারোহী বাইরে অপেক্ষা করছে মহারাজ! মনে হয় কোন জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছে।"

"ওকে এক্ষণই এখানে নিয়ে এসো।" আগন্তুক দৌড়ে রাজ দরবারে প্রবেশ করে মেঝেতে বসে দু'হাত প্রসারিত করে রাজাকে কুর্নিশ করে হাঁটু ভাঁজ করে বসলো।"

"কি খবর এনেছো?"

"পানি, এক ঢোক পানি!"

সংবাদবাহী পানি ছাড়া আর কোন কথাই বলতে পারলো না। ক্ষুৎ-পিপাসায় লোকটির মুখ হাঁ করে আছে। রাজার নির্দেশে তড়িঘড়ি এক গ্লাস পানি আগন্তুককে পান করানো হলো। পানি পান করে আগন্তুক বলল, "মহারাজের জয় হোক। আরব দেশ থেকে এখন যে সেনাবাহিনী এসেছে, এটি কোন বাহিনী নয় উট, ঘোড়া আর মানুষের প্লাবন। জাহাজ থেকে যেসব রসদপত্র নামানো হয়েছে, এসবের কোন হিসাব কিতাব নেই। সৈন্য সংখ্যাও কতো তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মাকরানের উপকূল জুড়ে জাহাজ ও নৌকার সংখ্যা এতো বিপুল যে, জাহাজের ভিড়ে কোন কিছুই আন্দাজ করা যায় না।"

"এ আগন্তুক ছিল মাকরানের সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত দাহিরের এক গোয়েন্দা সদস্য। সে এক পথিকের কাছে শুনতে পায় যে, বহু জাহাজ ভরে আরব দেশ থেকে অগণিত সৈন্য মাকরানে অবতরণ করছে। খবর পেয়ে

রাজা দাহিরের এই গোয়েন্দা বেশ বদল করে মাকরানের মুসলিম শাসিত এলাকায় গিয়ে স্বচোখে আরব সৈন্য অবতরণের দৃশ্য দেখে দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে রাজ-দরবারে সংবাদ নিয়ে আসে।

দাহিরের এ গোয়েন্দা রাজাকে জানায়, "আমি শুনেছি, জাহাজে করে যে পরিমাণ সৈন্য এসেছে এর চেয়ে ঢের বেশী এসেছে স্থলপথে। আসলে রাজা দাহিরের সংবাদ বাহকের খবর ছিল অতিরঞ্জিত। সে নিজে যেমন মুসলিম বাহিনীর অবতরণ দৃশ্য দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, সে অনুযায়ী রাজার কাছে যে রিপোর্ট দিলো তাও ছিল ভীতি জাগানিয়া। বাস্তবের চেয়ে বহুগুণ বেশী ভীতিকর হিসাবে চিত্রিত করেছিল সে বিন কাসিমের বাহিনীকে। যার ফলে রাজা দাহিরের মধ্যে দেখা দেয় মারাত্মক শঙ্কা। রাজা দাহির সাধারণ বৈঠক মুলতবি করে সামরিক অফিসারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসলো। প্রধান উজির বুদ্ধিমানকে রাখা হলো এ বৈঠকে।

বৈঠকে রাজা তার সেনা অফিসারদের জানালো, "আবার আরবরা আক্রমণ করতে এসেছে। বলো এবার আরব সেনাদের কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে?" আমাদের হাতে দু'টি সেনাপতি হারিয়ে এবং দু'বার পরাজিত হয়ে ওরা আমাদের শক্তির কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছে। এ জন্যই মনে হয় এবার বেশী সংখ্যক সৈন্য ও রসদপত্র নিয়ে এসেছে। ওদের দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে। এবার একটা বড় সেনাবাহিনীকে বাজি খেলায় পাঠিয়েছে। আমরা এবারের বাজিতেও বিজয়ী হবো। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?" অন্যদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো রাজা।

রাজার সেনা কর্মকর্তারা রাজার মতোই উচ্চাশা নিয়ে রাজার মতকেই সমর্থন করলো। তাদের কেউই রাজার মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করার সাহস পেল না। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র দাহিরের প্রধান উজির বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। সবার মতামত দেয়ার পালা শেষ হলে উজিরে আযম বুদ্ধিমান বলল, "মহারাজ! রণাঙ্গনে তরবারী কাজ করে অহংকার কাজ করে না। সেখানে তীর বল্লম কাজ করে, চাপাবাজি রণাঙ্গনে কোনই কাজে আসে না। কায়সার ও কিসরা আরব মুসলমানদের দুর্বল ভেবেছিল। ইয়াজ্‌দেগির্‌দ তো বলেছিল, আরব সৈন্যরা তার ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী শক্তিশালী রোম ও পারস্য বাহিনীকে আরবরা পরাজিতই শুধু করেনি, শোচনীয়ভাবে নাস্তানাবুদ করেছে। এটা কোন কাল্পনিক গল্প নয়, রূঢ় বাস্তব ঘটনা।

"হ্যাঁ, এটাতো সত্য ঘটনা। ওখানে মুসলমানরা হিন্দুস্তানের হাতিগুলো পর্যন্ত বেকার বানিয়ে ফেলেছিল" বলল রাজা। আচ্ছা কি যেন নাম ছিল সেই রণাঙ্গনের?"

"কাদেসিয়া" বলল উজির বুদ্ধিমান। আগত মুসলমানরা ওইসব যোদ্ধারই সন্তান। এরা ইচ্ছা করলে আমাদেরও পরাজিত করতে পারে। এখন যদি ওরা অনেক বেশী সৈন্য নিয়ে এসে থাকে, তাহলে এই সৈন্যদের সেনাপতিও পূর্বের সেনাপতিদের তুলনায় বেশী অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এমনও হতে পারে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজেই কমান্ড করবে। মহারাজ তো হাজ্জাজের নির্মমতা ও কঠোরতার কাহিনী শুনেছেন। আশ্রিত আরবরা আমাকে বলেছিল, খলিফাকে হাজ্জাজ তেমন আমল দেয় না। হাজ্জাজ তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় তার ইচ্ছামতো শাসন চালায়।"

"হাজ্জাজ নিজে সেনাপতি হলে তাতে কি হবে?" জিজ্ঞেস করল রাজা দাহির। তাহলে আমিও আমার সেনাবাহিনীর কমান্ড আমার হাতে রাখবো।

শুধু এটাই নয় মহারাজ। আপনার জেনে রাখা উচিত লড়াই শুধু রণাঙ্গনেই হয় না। সব লড়াই শুধু তীর ঢাল তলোয়ারে সীমাবদ্ধ থাকে না। সর্বক্ষেত্রে বিজয় শুধুই শক্তিশালী সামরিক শক্তির অধিকারীদের পক্ষে যায় না, দুর্বলের ভাগ্যেও কোন কোন সময় জয় লেখা হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দুর্বল প্রতিপক্ষও শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পঙ্গু করে দেয়।"

"এটা কি করে সম্ভব?" রাজা দাহির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো উজির বুদ্ধিমানের কাছে। জবাবের অপেক্ষা না করেই রাজা দাহির বলল, "উজির যদি মনে করে থাকো যে, আমরা রণাঙ্গনে মোকাবেলা না করে অন্য কোন ধোঁকা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে শত্রুদের পরাভূত করতে পারবো সেটাকে আমাদের রক্ত প্রশ্রয় দেবে না। আমরা রণাঙ্গনে শত্রুদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে চাই এবং আমাদের তলোয়ারের কার্যকারিতা দেখাতে চাই। দু'বার আমরা যাদের হাঁটু ভেঙে দিয়েছি, তৃতীয়বারও অবশ্যই ওদের পরাজিত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো।"

"কিন্তু বিষয়টা সে রকম নয় মহারাজ! আমি অন্য কথা বলছি। হাজ্জাজ নিজে যদি এই বাহিনীর কমান্ড দেয় তাহলে যুদ্ধের পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের হয়ে যাবে মহারাজ! বলল উজির বুদ্ধিমান। আমি একথা বলছি না যে, মহারাজ দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকুন। লড়াই আমাদের করতেই হবে এবং রণাঙ্গনেই মোকাবেলা হবে। কিন্তু লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগে

শত্রুদেরকে যদি দুর্বল করে দেয়া যায়, তাহলে সেটি হবে বিজয়ের জন্য সহায়ক। তখন খুব তাড়াতাড়ি শত্রুদের মাথা কেটে দেয়া সম্ভব হবে।"

"কিভাবে শত্রুদেরকে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই দুর্বল করে দেয়া যায়?"

"কিছু কিছু দুর্বলতা মানুষের মধ্যে এমন থাকে যা বীর বাহাদুরকে দুর্বল এবং দুর্বলকেও বীর বাহাদুর করে ফেলে। রাজা যেমন রাজ সিংহাসন ছাড়া থাকতে পারে না, পুরুষ ও তদ্রূপ নারীসঙ্গ ছাড়া স্বস্তি পায় না। রাজা যেমন তার মুকুট জগতের সবচেয়ে মূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে সাজাতে চায়, প্রতিটি সামর্থবান পুরুষও চায় তার চাহিদা মেটানোর জন্য সবচেয়ে সুন্দরী রূপসী নারীর সঙ্গ।"

"কথাটা বুঝলাম না উজির। পরিষ্কার করে বলো এবং সেই কথা বলো যা কার্যকর করা সম্ভব।" উষ্মা মাখা কণ্ঠে বলল রাজা।

"মহারাজ! নারী একটা নেশা। সম্পদ ও ক্ষমতা এই নেশাকে আরো তীব্র করে তোলে। ক্ষমতা হাতে এসে গেলে এ নেশা মেটানোর সুযোগ পূর্ণতা পায় এবং নেশাগ্রস্ত পুরুষ তার ব্যক্তিত্ব আত্মসম্মান ও কর্তব্যবোধ ভুলে যায়। পাঁচ ছয়শ মুসলমান অনেক দিন যাবত আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে আমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি এবং আরবদেরও খবর নিয়েছি, এদের শাসকদের ব্যাপারেও জেনেছি, এদের মধ্যে নারী ও দৌলতের দুর্বলতা খুবই কাজ করে। কাজেই তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার আগে এদেরকে নারী ও দৌলত দিয়ে অন্ধ বানিয়ে ফেলা হবে বেশী কার্যকর।"

"বুদ্ধিমান! তুমি কি হাজ্জাজ ও হাজ্জাজের বাহিনীর কথা বলছো?" পরিষ্কার বুঝে উঠতে না পেরে উজিরের কাছে জানতে চাইলো রাজা দাহির।

"না, আমি বলছি সেই আরবদের কথা যাদেরকে আপনি আপনার আশ্রয়ে রেখেছেন। বলল উজির। মহারাজ প্রথম যুদ্ধের বেলায়ই দেখেছেন এই আরবরা আক্রমণকারী আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ শাসকরা ওদের ঘোর দুশমন। তাদের শত্রু কবিলার হাতে খেলাফতের ক্ষমতা। এসব আশ্রিত আরব হলো বনী উসামা গোত্রের। আর বর্তমান আরব শাসকরা হচ্ছে বনী উমাইয়া গোত্রের। তদুপরি স্বদেশীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে এরা নারাজ। এখন এদের মধ্যে ওদের জাতিগত শত্রুতা আর শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষকে চাঙ্গা করতে হবে। এমন কোন পন্থা

অবলম্বন করতে হবে, যার ফলে আগত আরব সৈন্যদের প্রতি আশ্রিত আরবদের ঘৃণা ও হিংসা আক্রোশে পরিণত হয়।"

"তাতো বুঝলাম। কিন্তু এখন সেই কথা বলো, যা দিয়ে আমি এসব আরবের রক্তে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।" বলল রাজা দাহির।

"মহারাজের জয় হোক" উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল উজির। এ কাজের দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিয়ে নিচ্ছি। মহারাজ সৈন্যদের দিকে নজর দিন, তাদের প্রস্তুত করুন। লড়াইয়ের কলাকৌশল মহারাজ আমার চেয়ে ঢের ভালো জানেন। তবে আমার মতামত হলো, দুর্গের বাইরে ময়দানে গিয়ে লড়াই করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ মুসলিম বাহিনী ডাভেল পর্যন্ত আসবে। মহারাজের রাজধানী তাদের কাছে এতোটা মূল্যবান নয়, ডাভেল তাদের কাছে যতোটা দামী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডাভেল এ অঞ্চলের একমাত্র বড় সমুদ্র বন্দর। ডাভেলের আগে আমাদের আরো দু'টি ছোট ছোট দুর্গ আছে। এগুলো মুসলমানরা হাতিয়ে নিতে পারবে। অবশ্য তাতে উপকার হবে মহারাজের। কারণ এসব দুর্গে মুসলমানদের যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হবে এবং অবরোধ আরোপ করে দীর্ঘদিন কাটাতে হবে। এতে করে তাদের আহার সামগ্রী ব্যয় হবে। ফলে ডাভেল পর্যন্ত পৌঁছতেই তাদের অর্ধেক সম্পদ ব্যয় হয়ে যাবে। তারা ডাভেলকে অবরোধ করলেও মহারাজ রাজধানীতেই অবস্থান করবেন, তাতে ফায়দা হবে এটাই যে, ডাভেল জয় করে যখন ওরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হবে তখন ওদের সৈন্যরা ক্লান্তি, অবসাদ ও রসদপত্রের ঘাটতির শিকার হবে। এমতাবস্থায় আমরা আশ্রিত আরবদের প্রস্তুত করে ওদের দিয়ে হাজ্জাজের বাহিনীর ওপর আঘাত করাবো।"

উজির বুদ্ধিমানের পরিকল্পনা ছিল যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। দৃঢ়তার ছাপ ছিল তার কথায়। রাজা ও রাজার অপর কোন সেনাপতি উজির বুদ্ধিমানের পরিকল্পনার বিপরীতে যৌক্তিক কোন কথাই বলতে পারেনি। তাই উজিরের পরামর্শ মেনে নিয়ে রাজা ও সেনাপতিরা সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে লেগে গেল। বুদ্ধিমানের পরামর্শে রাজা দাহিরের সেনাপতি কূটকৌশলের প্রতি বেশী নজর দিলো। অপর দিকে রাজা প্রধান সেনাপতিকে নির্দেশ দিলো কোন চৌকস গোয়েন্দাকে মাকরান পাঠিয়ে আরব বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার সঠিক ধারণা নিয়ে আসার জন্য। রাজা এই নির্দেশও দিলো, গোয়েন্দাকে শুধু সৈন্য

সংখ্যা জেনে আসলে হবে না, মুসলিম বাহিনীর কমান্ড কে করছে তাও জেনে আসতে হবে।"

✪ ✪ ✪

মাকরানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুন ও বিন কাসিম মনে করেছিলেন হারেস আলাফী তাদের সাথে সাক্ষাতে না আসার সম্ভাবনাই বেশী। এটা ছিল একটা অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনা যে, আলাফী শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সাথে সাক্ষাতের ওয়াদাই করেননি, আমীর মাকরানের পাঠানো দূতকে বিশেষ সম্মান ও ইজ্জত করে আগেই বিদায় করে দিয়েছেন এই বলে যে, তুমি গিয়ে আমীরে মাকরানকে বলো আমি অবশ্যই আসবো।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং আমীরে মাকরান ইবনে হারুন কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম দেহরক্ষী নেয়ার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু বিন হারুন বললেন, "উমাইয়া শাসকদের প্রতি এদের মধ্যে যে ক্ষোভ ও ঘৃণা রয়েছে, তাতে এদের ওপর এতোটা আস্থা রাখা ঠিক হবে না। দেশ ত্যাগের বঞ্চনায় এদের মধ্যে কোন প্রতিহিংসা যে কোন সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম ও আমীরে মাকরান দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাক্ষাতের জায়গা পৌঁছে দেখেন হারেস আলাফী একাকী দাঁড়ানো। আমীরে মাকরান নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছার আগেই দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার কিছু আগে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই তারা যেন গোটা এলাকাটিকে ঘিরে ফেলে এবং খুব সতর্ক থাকে যেন তাদের বেষ্টনীর মধ্য থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে কিংবা কেউ ঢুকতে না পারে।

চাঁদনী রাত। চাঁদনী রাতের খোলা ময়দানের দৃশ্য যেনো এক স্বপ্নালোকের অবতারণা করেছে। চারদিকে ঝি ঝি পোঁকার ডাক আর শীতল বাতাসের ঝাপটায় গাছ গাছালী ও ঝোপ ঝাড়ের শাখা দোলার মায়াবী শব্দ। এমতাবস্থায় নিরাবেগ ভঙ্গিতে হারেস আলাফী তার ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়ানো।

আমীরে মাকরান ও মুহাম্মদ বিন কাসিম তার কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে অগ্রসর হলে আলাফী উভয়ের সাথে মোসাফাহা করলেন।

"আমরা পরস্পর পরিচিত। আলাফীর উদ্দেশ্যে বললেন আমীরে মাকরান।

"আমরা দু'জন পরিচিত না হলেও একজন অপরজনকে জানি।" বিন কাসিমের দিকে তাকিয়ে বললেন হারেস আলাফী। "আমি এই তরুণকে এই প্রথম দেখছি, তুমিই তো কাসিমের ছেলে, হাজ্জাজের ভাতিজা, তাই না?"

"দু'জন সেনাপতিকে হারানোর পরও হাজ্জাজ কি যুদ্ধটাকে শিশুদের খেলা মনে করেন না-কি?"

"জী' হ্যাঁ, আমি বিন কাসিম। আমিই এ বাহিনীর সেনাপতি।"

"অভিজ্ঞ দু'জন সেনাপতি যেক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে তোমার মতো তরুণ কি করে সেনাপতির দায়িত্ব পালনের সাহস করতে পারে? তুমি কি তাদের চেয়েও বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ? তুমি কি ভাবছ, এখানে তুমি জিতে যেতে পারবে? হাজ্জাজের ভাতিজা হওয়া ছাড়া তোমার সেনাপতি হওয়ার আর কি বিশেষ যোগ্যতা আছে?"

"জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে" বললেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। আমি আমার গুণাবলী বলার জন্য আপনার কাছে আসিনি। তবে একথা নিশ্চয়ই বলবো, শুধু ভাতিজা হওয়ার সুবাদে আমাকে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়নি।...থাক এসব কথা। আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে মিলিত হয়েছি, এ ব্যাপারে কথা বলাই হবে বেশী যৌক্তিক।"

"হ্যাঁ, কাজের কথাই হওয়া উচিত" বললেন আলাফী। তবে এর আগে আমি একটা কথা বলে নিতে চাই। তোমরা কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। যার ফলে বিরাট নিরাপত্তা দল নিয়ে এসেছো। অথচ অবিশ্বাস কিন্তু তোমাদেরকে আমার করা উচিত ছিল, কারণ আমি তোমাদের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী। কাজেই গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় আমার তো ভয় করার কথা। এজন্য আমার সাথীরা আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমি তাদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এসেছি।"

"আল্লাহর কসম! আপনি যে আত্মশক্তিতে আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন, এর মূল্য দেয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, আল্লাহ আপনার এ আত্মবিশ্বাসের প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। আপনাকে আমীরে মাকরান নয় আমি ডেকেছি। আমি আপনাকে ডাকার স্পর্ধা পেয়েছি, আরব জাতির সম্মান ও আরবের মান রক্ষার প্রয়োজনে। আমি আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারি না, অনুরোধ পাঠাতে পারি।"

"আমি জানি কেন তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাও।" বললেন হারেস আলাফী। তুমি জানো না, যে কয়েদীদের মুক্ত করার জন্য তোমরা এসেছো,

এদের মুক্ত করতে গিয়ে ইতোমধ্যে তিন বিদ্রোহী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তারা কয়েদখানার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল কিন্তু কয়েদীদের মুক্তি বোধ হয় এ মুহূর্তে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। তাই সম্ভব হলো না। আমি সেদিন আমার লোকজন নিয়ে দূরে অপেক্ষা করছিলাম। আমার কাজ ছিল মুক্ত কয়েদীদেরকে আরবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা। কয়েদীদের মুক্ত করার অভিযানে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল তার নাম বেলাল বিন উসমান। হারেস আলাফী বিন কাসিমকে বন্দি মুক্তির ব্যাপারে বেলালের চেষ্টার কথা বিস্তারিত জানালেন।

"আমি সেই বন্দিদের মুক্ত করতেই এসেছি।" বললেন বিন কাসিম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হতে আসিনি। তবে এ কাজে আপনার সহযোগিতা আমার খুব প্রয়োজন।"

"উমাইয়া শাসকরা কি তোমাকে বলেছে আলাফীকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে নিতে? না হাজ্জাজের নির্দেশে তুমি এ পদক্ষেপ নিয়েছো? আলাফী আমীরে মাকরানের দিকে তাকিয়ে বলল। অবশ্য এটা আমীরে মাকরানের বুদ্ধিও হতে পারে।"

"না, দোস্ত! আমীরে মাকরান আলাফীর উদ্দেশ্যে বললেন। আপনার সাথে দেখা করে কথা বলার চিন্তাটা একান্ত বিন কাসিমের ব্যক্তিগত চিন্তা।"

"আমি সিরাজ থেকে সরাসরি এখানে এসেছি। আমি বসরায়ও যাইনি, দামেশকেও যাইনি। আমার কয়েকজন সেনাপতি এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, মাকরানে বসবাসকারী আরব মুসলমান বিদ্রোহীরা রাজার পক্ষাবলম্বন করতে পারে। বিষয়টিকে আমিও আশঙ্কা জনক মনে করেছি। সেই আশঙ্কা থেকেই আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করেছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করব। মনে না চাইলে আপনারা আমাদের সহযোগিতা নাই বা করলেন। কিন্তু সিন্ধু রাজের সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন। নয়তো ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কলংক হয়ে থাকবে। সেই সাথে একথাও বলা হবে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় আপন ভাইদের পরাজিত করতে আরব মুসলমানরা বেঈমান হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল...। যদিও আমি জানি, আমাদের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আপনার হৃদয়ে প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে কিন্তু মুসলমানদের সম্মান রক্ষায় আপনাকে এ অনুরোধ করতে আমি দুঃসাহস দেখাচ্ছি।"

"প্রিয় ভাতিজা বিন কাসিম! তোমার ওপর আল্লাহ্ রহম করুন। মনে হচ্ছে, বয়সের তুলনায় তুমি অনেক বেশী বুদ্ধিমান ও সতর্ক। শোন, আমার

ও আমার সাথীদের মনে বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ আছে। তুমি নিজেও তো উমাইয়া গোত্রের ছেলে ও ছাকাফী বংশের সন্তান।"

বিন কাসিম...তোমার চাচা হাজ্জাজ আমাদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। সে আমাদের কবিলার এক সর্দার সুলায়মান আলাফীকে প্রথমে কয়েদ করেছে। অতঃপর তার মাথা কেটে আমাদের বংশের ছেলেদের হাতে নিহত মাকরানের গভর্নর সাঈদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল গভর্নরের স্বজনদের সন্তুষ্ট করার জন্য।"

"এসবই আমাদের গোত্রীয় শত্রুতা।" বললেন' বিন কাসিম। কিন্তু আমি আপনাকে এমন এক দুশমনের কথা বলছি, যে দুশমনের কারণে আমরা পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে বন্ধুতে পরিণত হাতে পারি।"

"এসব কথা আমাকে বলতে হবে না বিন কাসিম! তুমি এমনটি মনে করো না যে, খান্দানী শত্রুতার কারণে আমি চিহ্নিত শত্রুকেই বন্ধু বানিয়ে ফেলব" বললেন আলাফী। তোমার হতাশ হওয়ার কারণ নেই বিন কাসিম! আমি ধর্মীয় শত্রুকে আমার জাতির বিরুদ্ধে গিয়ে দোস্ত হিসাবে কোলে তুলে নেব না। আমি তোমাদের সহযোগিতা করবো বটে। তবে তোমাদের সঙ্গ দেবো না। একথা স্মরণ রেখো, আমাদের শত্রুতা শাসকদের সাথে; আমার দেশ, আমার জাতি ও ধর্মের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। অহংকারী ও জালেম শাসকদের বিরোধিতা করা গাদ্দারী নয়, বরং অযোগ্য ও অপরিণামদর্শী শাসকদের কব্জা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা দেশ প্রেমের অংশ। আমরা আমাদের শাসকদের বিদ্রোহী ঠিক; কিন্তু শাসন ব্যবস্থার বিদ্রোহী নই। আমরা তাদেরই প্রতিবাদ করেছিলাম, যারা শাসক হওয়ার যোগ্য ছিল না, অথচ জোর করে খেলাফতের মসনদ কব্জা করে রেখেছিল।"

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেন, এই সাক্ষাতে হারেস আলাফী বিন কাসিমের কথায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিন কাসিমও হারেস আলাফীর আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আলাফী বিন কাসিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাজা দাহিরকে কোন ধরনের সহযোগিতা করবেন না, বরং নেপথ্যে দাহিরের বাহিনীকে দুর্বল করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবেন। তবে আলাফী একথা বলেননি কিভাবে তিনি রাজার বাহিনীকে দুর্বল করার জন্য চেষ্টা করবেন। একথাও তিনি জিজ্ঞেস করেননি, বিন কাসিম কখন কিভাবে কোথায় আক্রমণ করবেন। কারণ তাতে সংশয় ও সন্দেহ দানা বাধতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের উপাদান।

এখানকার সেনাবাহিনী কতটা লড়াকু? আলাফীর কাছে জানতে চাইলেন বিন কাসিম। আসলেই কি এখানকার বাহিনী এতোটা সাহসী, যার ফলে এরা দু'বার আমাদের দু'টি অভিযানের সেনাপতিদের হত্যা করেছে এবং শোচনীয়ভাবে তাদের কাছে আমাদের সেনারা পরাজিত হয়েছে?

"তুমি যদি এদের ওপরে তোমার ভীতি ছড়িয়ে দিতে পারো তাহলে সহজেই রাজার বাহিনীকে কাবু করা সম্ভব।" বললেন আলাফী। এখানকার সেনাবাহিনী বাহাদুর নয় বটে তবে একেবারে কাপুরুষও নয়। আগের দু'টি অভিযানে এজন্য এরা বাহাদুরী করেছে যে, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল কম এবং আক্রমণে ছিল তাড়াহুড়া। হাজ্জাজ দাহির বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারেনি। এতোটা দূরে এসে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিটাই অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল। আমি তোমাদের সৈন্যবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জামের খবর পেয়েছি। এ বিপুল সৈন্যবাহিনীও সাজ-সরঞ্জামের সাথে যদি তোমাদের মধ্যে লড়াই করার মতো আবেগ ও চেতনা থেকে থাকে তাহলে তোমাদের বাহিনীকে ঠেকানোর মতো বাহাদুর সেনা এ অঞ্চলে নেই। আর যদি তোমার চাচা হাজ্জাজ ও খলিফাকে খুশী করার জন্য তোমরা যুদ্ধে এসে থাকো, তাহলে রাজা দাহিরের বাহিনীকে তোমাদের মোকাবেলায় বেশী শক্তিশালী দেখতে পাবে, আর পরাজয়ই হবে তোমাদের বিধিলিপি।

✪ ✪ ✪

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানে হারেস আলাফী ও বিন কাসিমের সাক্ষাতটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। সেদিন যদি বিন কাসিম আলাফীকে তাদের সহযোগিতার প্রশ্নে সম্মত ও রাজা দাহিরের পক্ষাবলম্বন না করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ না করতে পারতেন, আর হারেস আলাফীর নেতৃত্বে পাঁচ ছয়শ বিদ্রোহী আরব রাজা দাহিরের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো, তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারত।, ইতিহাস হতে পারতো অন্য রকম। আলাফীকে রাজার পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখার কূটনৈতিক আলোচনা পর্বটি ছিল বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাফল্যের অন্যতম একটি দিক। কারণ তিনি একটি পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ শত্রুবাহিনীকে মায়া ও মমতা দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবশ্য মাকরানের শাসক বিন হারুন আলাফীর প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থাবান ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন আলাফীর কথা সঠিক নাও হতে পারে; অতএব তাকে বিরোধী শিবিরে রেখেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলাফীর সাক্ষাতের পর আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন বটে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক সরঞ্জাম জাহাজে পৌঁছার জন্য অন্তত আরো মাস খানিক মাকরানে তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো। গুরুত্বপূর্ণ এসব সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে অন্যতম ছিল মিনজানিক। বিন কাসিমের এ অভিযানে কয়েকটি মিনজানিক ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বড় ছিল "উরুস" নামের মিনজানিক।

অবশেষে প্রায় মাসখানিক পর মিনজানিক বহনকারী জাহাজও পৌঁছে গেল। এসব সামরিক সরঞ্জাম জাহাজ থেকে নামানোর পরই বিন কাসিম তাঁর সেনাদের অভিযানের নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যে দিন মাকরান থেকে ডাভেলের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন তখন তিনি দেখলেন মাকরানের শাসক বিন হারুনও অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে এগুচ্ছেন। তিনি মাকরানের শাসককে আসতে দেখে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিন হারুন ছিলেন খুবই অসুস্থ।

"আমীরে মাকরান! আপনি অসুস্থ। এখন আপনি গিয়ে আরাম করুন। তিনি আমীরে মাকরানের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনি আমার ও সেনাবাহিনীর জন্য দোয়া করুন।

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না আমি কোন পোশাকে এসেছি?" তোমাকে একাকী বিদায় করে আমি আরাম করতে পারি না।" বললেন আমীরে মাকরান মুহাম্মদ বিন হারুন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন বয়সে আমীরে মাকরানের ছেলের বয়সী। বহুবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমীরে মাকরান যখন বাড়িতে ফিরে যেতে সম্মত হলেন না, তখন বিন কাসিম তাকে সাথে নিয়েই রওয়ানা করলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের গন্তব্য ছিল ডাভেল। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে কন্নৌজ পেরিয়ে যেতে হবে। কন্নৌজপুর ছিল রাজা দাহিরের একটি শক্ত ঘাঁটি। শহরটির পুরোটাই ছিল দুর্গ ঘেরা। দুর্গপ্রাচীর ছিল যথেষ্ট মজবুত। ইচ্ছা করলে বিন কাসিম কন্নৌজ এড়িয়ে ডাভেল যেতে পারতেন কিন্তু দুর্গম এ শহরে রাজা দাহিরের যথেষ্ট সেনা সমাবেশ করার আশঙ্কা ছিল। যার ফলে বিন কাসিম এ শহরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করেন নি। তাই কন্নৌজ দুর্গকে শত্রু মুক্ত করার জন্য দুর্গ অবরোধ করা হলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্দেশে তার এক ঘোষক কন্নৌজ দুর্গের সদর দরজার কাছে গিয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করলো, "দুর্গ আমাদের

কব্জায় ছেড়ে দাও, তাহলে শহরের বাসিন্দাদের জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হবে। আমাদের যদি দুর্গ কব্জা করতে হয়, তাহলে কারো জীবন সম্পদের নিরাপত্তার কোন দায় দায়িত্ব আমাদের ওপর থাকবে না। তখন আমাদেরকে কর দিতে হবে।”

বিন কাসিমের ঘোষকের এ ঘোষণার জবাবে দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলো। এর অর্থ হলো, শক্তি থাকলে দুর্গ দখল করে নিতে পারো, আমরা দুর্গ তোমাদের হাতে ছেড়ে দেবো না।”

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনারা অবরোধ অক্ষুণ্ন রেখে দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হলে দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে বিপুল পরিমাণ তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করা হলো। যারা প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হয়েছিল তাদের কিছুসংখ্যক নিহত হলো। আর অধিকাংশই মারাত্মকভাবে আহত হলো। কয়েকবার দুর্গপ্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা হলো, কিন্তু প্রতিবারই মারাত্মক প্রতিরোধের মুখে পড়ে অধিকাংশ সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত কিংবা নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় মিনজানিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো।

সবচেয়ে বড় মিনজানিকটির ব্যবহার মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তাই ছোট ছোট মিনজানিক দিয়ে দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত হলো।

ঠিক করা হলো মিনজানিক। পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। কিন্তু দুর্গরক্ষীরা খুবই সাহসিকতার পরিচয় দিলো। মিনজানিক চালকদের বেকার করে দেয়ার জন্য প্রধান ফটক খুলে ঝড়ের মতো কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে দ্রুতগতিতে মিনজানিক পরিচালকদের ওপর তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার ঝড়ের বেগে কেল্লায় ফিরে যেতো। মুসলমান সৈন্যরা তাদের তাড়া করেও নাগাল পেতো না।

এভাবে টানা কয়েকদিন ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া চললো। দুর্গপ্রাচীরে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। দুর্গবাসীদের মধ্যে তেমন কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। মুহাম্মদ বিন হারুন অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দুর্গপ্রাচীরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। বিন কাসিম প্রতিবারই তাকে তার তাঁবুতে বিশ্রাম নেয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। কিন্তু বিন হারুন তাঁকে এই বলে নীরব করে দিতেন, “বাবা! তুমি আমার ছেলের বয়সী। আমি এ অবস্থায় তোমাকে ঠেলে দিয়ে আরাম করতে পারি না।”

দীর্ঘ একমাস কন্নৌজ দুর্গ অবরোধ করে রাখার পরও দুর্গবাসীদের মধ্যে পরাজয় বরণ করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কন্নৌজে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস ছিল পানি। খোঁজ নিয়ে বিন কাসিম জানতে পারলেন দুর্গের ভিতরে পানিরও কোন সমস্যা এ যাবত দেখা দেয়নি। তার অর্থ ছিল দুর্গবাসীরা দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার প্রস্তুতি আগেভাগেই সেরে নিয়েছিল।

একদিন মুহাম্মদ বিন হারুন মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বললেন, “বিন কাসিম! আমার মনে হয় এ দুর্গ সহজে জয় করা যাবে না। আমার মতে দুর্গপ্রাচীরে আংটা লাগিয়ে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা করা উচিত। নয়তো প্রচণ্ড আঘাত করে প্রধান ফটক খোলার উদ্যোগ নেয়া দরকার। এখানে আর কতদিন বসে থাকা যায়।”

“সম্মানিত আমীর! আমি অল্প সময়ের মধ্যেই এ দুর্গ জয় করতে পারি। কিন্তু এখানে আমি শক্তিক্ষয় করতে চাই না। কারণ সামনে আমার আরো কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। দেখা যাক না, এরা আর কতদিন অবরুদ্ধ জীবন কাটাতে পারে। দুর্গের রক্ষিত খাবার ও পানি এক সময় অবশ্যই শেষ হবে। আমি চাই, দুর্গবাসীরা পানি ও খাবারের অভাবে সৈন্যদের জন্য মুসীবত হয়ে উঠুক। ততোদিন আমি আমার সেনাদের সুরক্ষিত ও নিরাপদে সংরক্ষণ করতে চাই।

✪ ✪ ✪

আরো একমাস বিন কাসিম কন্নৌজ দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। এক পর্যায়ে দেখা গেল দুর্গপ্রাচীর থেকে আগে যে মাত্রায় তীর বৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতো, তাতে কিছুটা ভাটা পড়েছে।

একদিন খুব সকালে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুততার সাথে আগের রাতের বিন কাসিমের দেয়া নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে গেল। তারা দুর্গফটকের কাছেই অশ্বারোহণ করে পূর্ণ প্রস্তুতিতে রইলো, যাতে দুর্গ থেকে কোন সৈন্য বের হলেই ওদের তাড়া করা যায়। ওদিকে মিনজানিক গুলোকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং মিনজানিক গুলোর নিরাপত্তার জন্য মিনজানিকের আগে বসানো হলো তীরন্দাজ ইউনিট।

সূর্য ওঠার আগেই শুরু হলো দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপ। মিনজানিক এগিয়ে আনার কারণে মিনজানিক থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর এখন সরাসরি দুর্গের ভিতরে আঘাত হানতে শুরু করল। প্রধান ফটক পেরিয়ে হিন্দু তীরন্দাজরা

মিনজানিক চালকদের বেকার করে দেয়ার চেষ্টা করতেই অশ্বারোহী বাহিনীর তাড়া খেয়ে আবার দুর্গের ভিতরে চলে গেল। দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে মিনজানিক চালকদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ শুরু হলেও ওদের জবাবে মুসলিম তীরন্দাজরা ওদের দিকে তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। এর ফলে হিন্দুরা আর মিনজানিককে বাধা দিতে পারল না।

মিনজানিকগুলো অবিরাম দুর্গপ্রাচীরের ওপর দিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, এমনিতেই তখন দুর্গের ভিতরে পানির ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। পানির জন্য মানুষ ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল। এর ওপর টানা কয়েক দিনের অবিরাম পাথর নিক্ষেপের ফলে দুর্গের অনেক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গেল, শীলা বৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত হতে লাগল পাথর।

এমতাবস্থায় পাঁচদিন চলার পর দুর্গবাসীরা পরাজয় মেনে নিয়ে সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়ার জন্য সেনাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। দিন যেতে না যেতেই দুর্গের ভিতরে দেখা দিলো সেনাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ। সেনাবাহিনীও ততোদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় দুর্গশাসককে না জানিয়েই কিছু সৈনিক ও সাধারণ প্রজা মিলে দুর্গের প্রধান ফটকের ওপরে সাদা পতাকা উড়িয়ে দিলো এবং ফটক খুলে দিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সৈন্যরা বিজয়ী বেশে দুর্গে প্রবেশ করল। বিন কাসিম দুর্গশাসককে নির্দেশ দিলেন, "যা কর নির্ধারণ করা হবে, নাগরিকদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র বিজয়ী বাহিনীর হাতে পৌছাতে হবে।"

দুর্গের সকল সৈন্য ও পুরুষকে যুদ্ধবন্দি করা হলো এবং দুর্গ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে ওখানে কিছু সৈন্য রেখে একজনকে দুর্গের শাসক নিযুক্ত করে বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

✪ ✪ ✪

কন্নৌজের পরবর্তী শহর ছিল আরমান ভিলা। এবার মুহাম্মদ বিন কাসিম সামরিক যুদ্ধের পাশাপাশি কূটনৈতিক যুদ্ধের প্রতিও মনোযোগী হলেন। তিনি কন্নৌজের কয়েকজন বন্দিকে মুক্তি দিয়ে আরমান ভিলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা আরমান ভিলায় গিয়ে বলবে, মুসলিম

বাহিনী আসছে, তোমরা কিছুতেই দুর্গ রক্ষা করতে পারবে না। দুর্গ বাঁচানোর চেষ্টা করলে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্দেশে কন্নৌজের কিছু বাসিন্দা মুসলিম বাহিনী আরমান ভিলায় পৌঁছার আগে ওখানে গিয়ে ভীতিকর খবর ছড়িয়ে দিলো। ওরা বলল, "মুসলিম বাহিনী ভয়ানক শক্তিশালী। ওরা জিনের মতো শহরে বড় বড় পাথর দিয়ে ঢিল ছুড়ে ওদের সাথে কুলিয়ে ওঠা কোন মানুষের সাধ্য নেই। তবে এরা যতোটা ভয়ানক ততোটা হিংস্র নয়। আচার ব্যবহারে খুবই মায়াবী। তারা সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে কর নেয়ার বিনিময়ে জান-মাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা দেয়। কারো ব্যক্তিগত সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানে আঘাত করে না। মানুষকে খুবই ইজ্জত করে। এরা বিজয়ী হলেও শহরে লুটতরাজ করে না।"

এর ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন দুর্গপ্রাচীরে ঘেরা দুর্গম শহর আরমান ভিলা অবরোধ করলেন, তখন দুর্গরক্ষীরা খুবই সামান্য প্রতিরোধ চেষ্টা করল বটে, কিন্তু এই প্রতিরোধ জোরালো ছিল না। বস্তুতঃ কয়েকদিন অবরোধ করে রেখে মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ শুরু করলেই দুর্গবাসীরা ফটক খুলে দিল। সহজেই এই দুর্গও বিন কাসিমের দখলে চলে এলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর সেনা বাহিনীকে শক্তিক্ষয় থেকে রক্ষা করে কঠিন যুদ্ধের মোকাবেলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। আরমান ভিলা ছিল সেনাদের বিশ্রামের খুবই উপযোগী; তাই কিছুদিন এখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অবশ্য আরমান ভিলায় অবস্থানের অপর কারণ মাকরান শাসক মুহাম্মদ বিন হারুণের অসুখ বৃদ্ধি। সামরিক চিকিৎসকগণ শত চেষ্টা করেও মাকরান শাসকের জ্বর কমাতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আরমান ভিলাতেই তাকে দাফন করা হয়।

✪✪✪

বর্তমানের বিখ্যাত হায়দারাবাদ শহর তখন ছিল নিরূন নামে খ্যাত। রাসূল সা.-এর হিজরত ও নবুয়তের মাঝামাঝি সময়ে এই নিরূন শহরের গোড়া পত্তন হয়। পরবর্তীতে মোগল বিজয়ীরা নিরূনের নামকরণ করেন হায়দারাবাদ। কারণ হায়দারকুলী খান এটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন কন্নৌজ জয় করেন, তখন নিরূনে একদল হিন্দু প্রবেশ করল। গায়ে তাদের গেরুয়া বর্ণের আলখেল্লা। এলোমেলো

উস্কো-খুশকো দীর্ঘ চুল। তাদের পা থেকে গলা পর্যন্ত কাঠ ও পুঁথির মালা প্যাঁচানো। এক হাতে তামার চুড়ি আর এক হাতে ত্রিশূল। তাদের পিছনে রয়েছে অনুরূপ বেশধারী কয়েকজন অনুচর। হিন্দু সাধু দলের গুরু আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাত উঁচিয়ে চিৎকার করছে "লোক সকল! অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করো! বিপদ ধেয়ে আসছে!!"

মানুষ তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতো, থামাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু কারো কথা তার কানে যায় বলে মনো হতো না। সে তার দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কতগুলো হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করে আপন মনে হাঁটতে থাকতো আর বলতো, "হে শহরবাসী! পালাও, শহর ছেড়ে চলে যাও! আগুন, আগুন আসছে। পাথর...। আসমান থেকে পাথর পড়বে।"...

তার বলার ভঙ্গিটাই এমন ছিল, যেই তার কথা শুনতো, তার মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হতো। সাধারণ লোকেরা তার অনুসারীদের জিজ্ঞেস করতো, এই সাধু বাবাজী কোত্থেকে এসেছেন? তিনি কি বলেন? এ সবের অর্থ কি?"

তার অনুসারীরা লোকজনকে বলছিল, "বাবাজী তিন চার মাস যাবত চুপচাপ ছিলেন। কোন কথাই বলতেন না। হঠাৎ আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "আসমান থেকে পাথর পড়বে... আগুন আসছে... ভগবানের বাহিনী আসছে!! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো, শহর ছেড়ে দাও।"

নিরূন শহর রাজা দাহিরের অধীনে থাকলেও এখানকার শাসক ছিলেন একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রাজা দাহির কট্টর ব্রাহ্মণাবাদী ছিল। সে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দীরগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও সেখানে প্রচুর সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বসবাস করতো এবং তাদের মতো করে ইবাদত উপাসনা করতো। এমন জায়গার মধ্যে নিরূন ছিল একটি। এখানে ছিল যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধের বসবাস।

দিনে দিনে সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সাধু সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী। লোকজনের মধ্যে দেখা দিলো ভয়ংকর ভীতি। সাধুর প্রচারিত কথা নিরূনের শাসককে জানানো হলো। সন্ন্যাসী সাধুর প্রচারিত শঙ্কাবাণীতেও সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। একথা শুনে নিরূনের শাসক সন্ন্যাসীকে তার সকাশে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। তার সৈন্যরা সন্ন্যাসীকে তার দরবারে নিয়ে গেল।

শাসক সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আশঙ্কা বাণী প্রচার করছো সন্ন্যাসী!"

"এসব কথা আমার নয়। আসমানী কথা। আসমান থেকে পাথর পড়বে, সাগরের তীর থেকে এক শক্তিশালী রাজা আসবে। আগুনের মতো সব তছনছ করে তারা অগ্রসর হবে। কেউ তাদের মোকাবেলায় টিকতে পারবে না। তার পথ রোধ করলে আসমান থেকে পাথর নিক্ষিপ্ত হবে...।"

"সন্ন্যাসী! তুমি কি আরব বাহিনীর কথা বলছো? যে বাহিনী কন্নৌজ দখল করে নিয়েছে?"

"আমি কন্নৌজ যাইনি। আমি দুনিয়ার কোন খবর রাখি না। আমরা জঙ্গলে থাকি। জঙ্গলের মধ্যে আমি আসমানী আওয়াজ শুনেছি।"

"সন্ন্যাসী মহারাজ! বললেন, নিরূনের শাসক সুন্দরশ্রী। আমার শহরের প্রতি আপনি কেন এতোটা দরদী হয়ে উঠলেন? আপনি কি অন্য শহরেও গিয়েছিলেন? অন্য কোন শহরেও কি আপনি এ সতর্কবাণী প্রচার করেছেন?"

"হায়! সব পাগল। রাজাও পাগল। শোন বোকা! আমি এ শহরে এসেছি এখানকার রাজা বৌদ্ধ বলে। বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির ধর্ম। শ্রী গৌতম বুদ্ধ সাম্যের বাণী প্রচার করতেন, কোন সংঘাত সংঘর্ষে যেতেন না। তোমার মনে যদি শান্তি প্রত্যাশা থাকে, তাহলে আসমানী গযব থেকে প্রভুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আমাদের কথা না মানলে নিজেও ধ্বংস হবে, শহরের বাসিন্দা এবং সকল সৃষ্টিকেও ধ্বংস করবে। তোমার মেয়েদেরকে জালেমরা কব্জা করে নেবে, শহরের কোন যুবতী নিরাপদ থাকবে না। খুনাখুনি হবে, লুটতরাজ হবে, আগুন জ্বলবে, আসমান থেকে পাথর পড়বে। শুভ কাজ করো, আসমানী গযব থেকে প্রভুর সৃষ্টিকে বাঁচাও, নিজেও শান্তিতে থাকো।"

বৌদ্ধরা শান্তি প্রিয়। যুদ্ধ বিগ্রহ, খুনোখুনিতে গৌতম বুদ্ধের ভক্তরা মোটেও আগ্রহী নয়। রাজা দাহির যেমন কট্টর ব্রাহ্মণবাদী ছিল, নিরূনের শাসক সুন্দরশ্রী ততোটাই ছিলেন বৌদ্ধমতের প্রতি বিশ্বাসী। দাহিরের বৌদ্ধ পীড়ন এবং বৌদ্ধদের ধর্মালয় বিনাসের কারণে নিরূনের শাসক সুন্দরশ্রী রাজার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। সন্ন্যাসী সুন্দরশ্রীর দরবার থেকে বিদায় হওয়ার পরই নিরূনে প্রবেশ করলো কয়েকজন হিন্দু বেশধারী উষ্ট্রারোহী। খুবই ছন্নছাড়া অবস্থা তাদের। এই উষ্ট্রারোহীরা লোকজনকে জানালো, "তারা কন্নৌজের বাসিন্দা। জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে ওখান থেকে। তারা লোকজনকে মুসলিম সেনাদের ভয়াবহ আক্রমণের কথা শোনালো। জানালো এরা যখন কেল্লা অবরোধ করে, তখন আসমান থেকে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হয়, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়।"

মুসাফিরদের এই ভয়াবহ কাহিনী আগ্নেয়গিরির মতো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। এমনকি শাসক সুন্দরশ্রীর কানেও গেল এদের কথা। অবশ্য এর আগেই রাজা দাহির নিরূনে দূতের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে, "মাকরানে আরব সৈন্য অবতরণ করেছে। এই সৈন্য আগের মতো নয় অনেক বেশী সাহসী এবং খুব শক্তিশালী।"

কন্নৌজ যখন বিন কাসিম দখল করে নিলেন, তখন দেশের সকল দুর্গে রাজা দাহির এই বলে পয়গাম পাঠালো, মুসলমানরা কন্নৌজ দখল করে নিয়েছে। তাদের কাছে দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র রয়েছে। অবশ্য এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবাই কেল্লাবন্দি হয়ে থাকবে। কেল্লার বাইরে গিয়ে কেউ যুদ্ধ করার চিন্তা করবে না।"

নিরূনের শাসক যখন চতুর্দিক থেকে ধ্বংস মারদাঙ্গা ও খুনোখুনির আভাস পেতে থাকলেন, তখন তার মধ্যে গৌতম বুদ্ধের শান্তিবাদী চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তার বিবেক বলতে লাগল, কেন আমি ওদের বিরোধিতা করে অর্থহীন রক্ত ঝরাবো। খুনোখুনি মহাপাপ। তিনি মানসিকভাবে মুসলিম বাহিনীর সাথে কোন ধরনের মোকাবেলা করার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন এবং সব ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলায় অবস্থান করে ডাভেল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তিনি এটাও বুঝে নিতে পারলেন, ডাভেল যুদ্ধেই জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেনাবাহিনী এখানে বিশ্রাম নেয়ার পাশাপাশি দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গার ট্রেনিংও নিতে শুরু করল। তিনি সেনাদের প্রশিক্ষণ ভাষণে একথা বুঝাতে চেষ্টা করলেন, "আমাদের এ যুদ্ধ কোন সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার ফসল নয়, একান্তই ধর্মীয় জিহাদ। মজলুম মা বোনদের উদ্ধার করে পৌত্তলিকদের নাগপাশ থেকে অগণিত বনি আদমকে মুক্তিদানের পবিত্র জিহাদ।"

ট্রেনিং চলার সময় একদিন বিন কাসিমকে খবর দেয়া হলো, "দু'জন হিন্দু সাধু আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়।" তিনি উভয়কেই ডেকে পাঠালেন। সাধু দু'জন ছিল সিন্ধী হিন্দু সাধুদের মতো পোশাকে আবৃত। কপালে তিলক ও মাথায় সিঁদুর পরিহিত। উভয়েই বিন কাসিমের কাছে পৌছে পরিষ্কার আরবী শব্দে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিলো।

"আচ্ছা! আমাকে খুশী করার জন্য তোমরা আমার ধর্মের রীতিতে অভিবাদন জানিয়েছ?" বললেন' বিন কাসিম। এটা যদি তোমাদের অন্তরের

বিশ্বাস হতো তাহলে কতোই না শান্তি পেতে। যে শব্দ তোমরা উচ্চারণ করেছ এর অর্থ জানো?"

"হ্যাঁ, জানি। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক" জবাব দিলো একজন।

"কে তোমাদের এই অর্থ শিখিয়েছে?" জানতে চাইলেন বিন কাসিম।

"মুহতারাম সেনাপতি! এটা আমাদের নিজ ধর্মের ভাষা। স্মীত হেসে বলল অপরজন। আমরা হিন্দু নই মুসলমান। আমরা সিন্ধি নই আরব। আমাদেরকে সর্দার হারেস আলাফী পাঠিয়েছেন।"

"তিনি কি পয়গাম দিয়েছেন?"

"ঠিক পয়গাম নয় সংবাদ, সম্মানিত সেনাপতি! বলল একজন। এখান থেকে সামনে যে শহর পড়বে সেটির নাম নিরূন। রাজা দাহিরের অধীনে হলেও এই শহরের শাসক সুন্দরশ্রী একজন বৌদ্ধ। তিনি শান্তিবাদী লোক। রাজা দাহিরকে না জানিয়ে তিনি বসরায় দু'জন লোক পাঠিয়ে আমীর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে কর দেয়ার প্রস্তাব করেছেন এবং মুসলিম কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার পয়গাম পাঠিয়েছেন। শুনেছি, হাজ্জাজ তার মৈত্রী প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কর কতো ধার্য করা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে এতটুকু জানা গেছে, হাজ্জাজ নিরূন শাসককে তার শহরের নাগরিকদের জান-মাল ইজ্জত আব্রু রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলিম সেনারা তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবে।"

"আরে এতো দেখছি অলৌকিক ব্যাপার! বললেন বিন কাসিম। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, রাজা দাহিরের একজন শাসক মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করার আগেই নিজ থেকে দুর্গ আমাদের কর্তৃত্বে দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছে। আমার কাছে সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠ মনে হচ্ছে না। আলাফী সাহেব কোন কূটচাল করেননি তো?"

"না, না, সম্মানিত সেনাপতি। আলাফী কোন কূটচালের মানুষ নন। এটাকে আপনি অস্বাভাবিক ঘটনা মনে করবেন না। কারণ এর পিছনে কার্যকারণ রয়েছে। সুন্দরশ্রীর আত্মসমর্পণের পিছনে ভূমিকা রয়েছে। আমরা সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ওদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে খুনোখুনির প্রতি ঘৃণা জন্মে দিয়েছি। আমাদের অন্য একটি দল কন্নৌজের অধিবাসী সেজে ওদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যার ফলে বৌদ্ধ সুন্দরশ্রী আত্মসমর্পণ ও মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে।"

“তোমরা কি এ ধরনের মিশন অন্য শহরেও চালাতে পারো না?”

“না, সম্মানিত সেনাপতি! অন্য সব শহর বিশেষ করে রাজধানী ও ডাভেল শহরে রাজা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ওখানে কোন অপরিচিত লোক কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এবং কেল্লা থেকে বাইরে যেতে পারে না। ওই শহরগুলোতে এ মিশন চালাতে গেলে গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবুও আমরা আপনার পথ পরিষ্কার করার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টার কোন ত্রুটি করবো না। আমাদের সর্দার আলাফী জানিয়েছেন, এসব শুনে আপনি যেন এ সবের ওপর কোন ভরসা না করেন। সেনাদের মধ্যে যেন যুদ্ধের ব্যাপারে আবেগের কোন ঘাটতি সৃষ্টি না হয়।”

“আমার পরবর্তী মঞ্জিল ডাভেল। সেখানকার অবস্থা কি? ওখানে কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে? সেনাদের মধ্যে লড়াইয়ের যোগ্যতা কতটুকু? এসব প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। তোমরা যোদ্ধা, তোমরা ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানো, তোমাদের পক্ষে ডাভেলের বাস্তব পরিস্থিতি বলা সম্ভব।”

“আপনার এসব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব দেয়ার চেষ্টা আমরা করবো।” বলল একজন।

“রাজা দাহির কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

“সে রাজধানীতে” বলল একজন। অবশ্য একথা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, সে ডাভেলে আসবে কি-না।”

“আমরা এ ব্যাপারটি বলতে পারি সম্মানিত সেনাপতি! মোকাবেলা খুবই কঠিন হবে।” বলল একজন। আমার তো মনে হয় রাজা দাহির রাজধানী উরুঢ়েই থাকবে। সে তখনই আপনার মোকাবেলায় আসবে, যখন আপনার সৈন্য সংখ্যা কমে যাবে এবং সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে পড়বে। এখন আপনাকেই বুঝতে হবে সেই পরিস্থিতি আপনি কিভাবে সামলাবেন?”

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলাফীর দুই সাথীকে সসম্মানে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় করলেন। এরপর থেকে তিনি এ বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, আলাফী তাঁর বিরুদ্ধে নয় তার পক্ষেই নেপথ্যে ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করছে।”

✪ ✪ ✪

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অভিযান ও সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ প্রতিদিনই নির্দিষ্ট দূতের মাধ্যমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠাচ্ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফও বিন কাসিমকে নিয়মিত নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনামূলক পয়গাম প্রেরণ করছিলেন। সিন্ধু থেকে বসরা পর্যন্ত সংবাদবাহকেরা এক সপ্তাহের মধ্যে উভয়ের পয়গাম প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিতো—

পরদিন হাজ্জাজের পক্ষ থেকে বিন কাসিম পয়গাম পেলেন, ডাভেলের আগে নিরূন নামের একটি শহর আছে। ওখানকার লোকজন আমাদের কাছে নিরাপত্তার দরখাস্ত করেছে এবং আমাদের কর দেয়ার প্রস্তাব করেছে।" আমরা তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।" হাজ্জাজ যে পয়গাম লিখেছিলেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ হুবহু তা উদ্ধৃত করেছেন॥

...অতঃপর তুমি যখন সিন্ধু সীমানায় প্রবেশ করবে, তখন তাঁবুর নিরাপত্তার দিকে খুব খেয়াল রাখবে। ডাভেলের যতো নিকটবর্তী হতে থাকবে তাঁবু ও আসবাবপত্রের নিরাপত্তার প্রতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় আরো বেশী যত্নবান হবে। যেখানে শিবির স্থাপন করবে, সেখানে চারপাশে প্রতিরক্ষা খাল খনন করবে। রাতের বেশী সময় জেগে থাকবে, কম সময় ঘুমাবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারে, তাদেরকে রাতের বেলায় তেলাওয়াতের নির্দেশ দেবে, আর যারা তেলাওয়াত জানে না, তারা রাতের বেলা দোয়া ও যিকির করবে। তোমাদের সবাই আল্লাহর যিকির সব সময় করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার কাছে বিজয় ও সাফল্যের জন্যে একান্ত মনে দোয়া করবে। সুযোগ পেলেই 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ-এর তসবীহ জপে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।...

আর ডাভেলের কাছাকাছি গিয়ে থামবে এবং তাঁবুর চারপাশে ১২ গজ চওড়া ও ৫ গজ গভীর পরিখা খনন করে শিবিরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবে। এমতাবস্থায় শত্রুরা তোমাদের উস্কানী দিলেও তোমরা কোন জবাব দেবে না। শত্রুরা তোমাদের গালমন্দ করলেও তোমরা এসব গায়ে মাখবে না। শত্রুরা যদি তোমাদের উত্তেজিত করতে উস্কানী দেয়, তবুও ধৈর্য্যধারণ করে স্থির থাকবে। আমার পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না। আমার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালনের চেষ্টা করবে। আল্লাহর রহমতে আশা করি বিজয় তোমাদের হবেই।"

✪ ✪ ✪

ডাভেল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া মুহাম্মদ বিন কাসিমের গোয়েন্দারা এসে খবর দিতে লাগল কেল্লার দরজা বন্ধ। কেল্লার বাইরে কোন সৈন্য ও সামরিক তৎপরতা নেই।

এসব খবর থেকে বিন কাসিমের বুঝতে অসুবিধা হলো না, রাজা দাহির মুখোমুখি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।

ঘটনাক্রমে এমন সময় রাজা দাহিরের আশ্রিত আরব বসতিতে ঘটে গেল একটা গোলযোগ। আশ্রিত আরবদের বসতি ছিল মাকরান ও সিন্ধু-এর সীমান্ত এলাকায়। মুহাম্মদ বিন কাসিম যেসব বিজিত এলাকায় সেনা চৌকি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল আশ্রিত আরবদের বসতির নিকটবর্তী। প্রতিটি সেনা চৌকি থেকে চারজন করে অশ্বারোহী কিংবা উষ্ট্রারোহী পালা করে নিজ নিজ এলাকায় টহল দিতো।

আরব বিদ্রোহীদের বসতির কাছে যে চৌকিটি তৈরী করা হয়েছিল এলাকাটি ছিল ঘন সবুজ গাছপালায় ভরা। সবুজ বন-বনানীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি সরু নদী। এ অঞ্চলে সবুজ শ্যামল অনেক মাঠ ছিল, ছিল গাছপালা আচ্ছাদিত ছোট বড় অসংখ্য টিলা, ঝোপ ঝাড়। নদীর পাশের ঘন সবুজ এলাকায় মাঝে মধ্যে আশ্রিত আরবদের ছেলেমেয়ে ও কিশোরী-তরুণীরা ঘুরতে যেতো। অবশ্য নদীর তীরবর্তী এলাকাটি বসতির খুব কাছে ছিল না যে, প্রতিদিন এখানে আরব কিশোরী তরুণীরা বেড়াতে আসতো। মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎই তরুণীরা দলবেঁধে এ জায়গাটিতে ঘুরতে আসতো।

একদিন আরব বসতি থেকে বিবাহিতা তিন তরুণী এই জায়গাটিতে ঘুরতে গেল। কিছুক্ষণ পর তিনজনের দু'জন সেখান থেকে চিৎকার করে ও কান্নাকাটি করতে করতে বস্তিতে ফিরলো। তৃতীয় তরুণী ওদের দু'জনের সাথে ছিল না। তরুণীদের আর্তচিৎকার শুনে বসতির সব লোকজন বেরিয়ে এলো। তরুণীরা জানাল, "তারা নদীর তীরবর্তী এলাকায় পৌঁছলে আরব সেনাদের চার অশ্বারোহী সেখানে আসে এবং ঘোড়া থেকে নেমে তরুণীদের ওপর হামলে পড়ে। তারা দু'জন কোন মতে ওদের পাঞ্জা থেকে পালিয়ে এসেছে কিন্তু তৃতীয়জনকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।"

একথা শোনা মাত্রই তিন তরুণীর স্বামী ও আরো কয়েকজন যুবক তরবারী ও বর্শা নিয়ে নদীর দিকে দৌড়ালো। তারা তৃতীয় তরুণীকে পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে বসতির দিকে ফিরে আসতে দেখতে পেল। তার কাপড় চোপড় ছেড়া এবং মাথা

খালি। ওড়না নেই। মাথার চুল এলোমেলো, সে কেঁদে কেঁদে বাড়ির দিকে ফিরছে। তার স্বামী দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলে সে স্বামীর কোলে লুটিয়ে পড়লো। তার অবস্থাই বলে দিচ্ছিল তার সাথে ভয়ংকর আচরণ করা হয়েছে। অতএব আর কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না। তরুণী স্বামীর কোলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যারা তাৎক্ষণিকভাবে ওই তরুণীর অবস্থা দেখতে পেলো, তারা এতোটাই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে গেল যে, এ মুহূর্তে তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সকল সৈন্যকে পেলে খুন করেই শান্ত হবে।

"এরা কি সেই সেনাবাহিনী, আমাদের সর্দার হারেস আলাফী যাদের সহযোগিতা করছে?"

"আল্লাহর কসম! আরবরা কখনো এমন ছিল না। এসব পাষণ্ড বনী উমাইয়ার।"

"চলো, এখনই ঐ চৌকিতে চলো। একটা জানোয়ারকেও জিন্দা রাখবো না।"

"চলো, চলো, দেখতে দেখতে গোল জমে গেল। সবাই বলতে লাগল। ওখানে লোক দশ বারোজনের বেশী হবে না, সবগুলোকে সাফ করে ফেলো।"

উত্তেজনা ছিল ঘূর্ণিঝড়ের মতো। মুহূর্তের মধ্যে সারা আরব বসতিতে তুফান ছড়িয়ে পড়লো। ছেলে বুড়ো সবাই উত্তেজিত, সবার হাতেই অস্ত্র। এরা সবাই আরব বংশজাত। কাজেই নারীর সম্ভ্রমহানি এদের সহ্যের বাইরে। সবাই চৌকির সেনাদের খুন করতে প্রস্তুত। আবার কেউ কেউ বলছিল, এদের সবাইকে ধরে এনে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আবার কেউ কেউ বলছিল, এদেরকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে যতোক্ষণ পর্যন্ত ওদের শরীরের চামড়া খসে না পড়ে, ততোক্ষণ ঘোড়া দৌড়াতে হবে।"

উত্তেজিত বস্তিবাসী চৌকির দিকে রওয়ানা হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে গোত্র সর্দার হারেস আলাফী ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে পৌছলেন। তার সাথে ছিল আরো বয়স্ক তিনজন লোক। তারা উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। আলাফীকে দেখে গোত্রের সকল মানুষ সর্বনাশ হয়ে গেছে, সব ধ্বংস হয়ে গেছে মাতম ও চিৎকার শুরু করে দিলো।"

আলাফী তাদের শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

"আপনি আমাদের সর্দার! আপনার হুকুম পালন করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আজ এই চৌকির সব পাষণ্ডকে হত্যার নির্দেশ ছাড়া আপনার আর কোন নির্দেশ পালন করবো না।" বলল এক যুবক।

"আপনি বলেছিলেন, আরব সৈন্যদেরকে আমরা যেনো আপন মনে করি। কিন্তু এখন আমরা এই পাষণ্ডদের সেনাপতিকেও জীবিত ছাড়বো না।" বলল ক্ষুব্ধ আরেক যুবক।

"চুপ করে আছেন কেন সর্দার?" চিৎকার করে বলল আক্রান্ত এক তরুণীর স্বামী। এখন কোন লজ্জা করার সময় নয়। একটা কিছু বলুন, আমাদের নির্দেশ দিন।"

"এই চার সৈন্যের শাস্তি অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু শাস্তি কার্যকর করার আগে আমাকে ওদের সেনাপতির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দাও!"

"কোন্ সেনাপতির কথা বলছো তুমি? বলল এক অর্ধ বয়স্ক লোক। ঐ সেনাপতির কথা বলছো, যে হাজ্জাজের ভাতিজা! যে হাজ্জাজের কারণে আমাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়েছে! বনী উমাইয়ার নূন রুটি খেয়ে বেঁচে থাকা হাজ্জাজ আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওর পালিত ভাতিজার সাথে তুমি কি কথা বলবে? সে তো কিছু না শুনেই বলে দেবে এটা ডাহা মিথ্যা ঘটনা।"

"এটা ভুলে যেয়ো না আমরা আরব। আমাদের একটা রীতি আছে। আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে কিছু বিষয়ে ওয়াদা করেছি। সেও আমাকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।"

এমতাবস্থায় আলাফীর আওয়াজ বেড়ে গেল, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "তোমরা শুনে রাখো, হাজ্জাজের ভাতিজা যদি আমার কথা শুনে বলে, "এটা মিথ্যা ঘটনা, তাহলে এই তরবারীতে তোমরা তার রক্ত দেখবে! আমি জানি এ ঘটনা ঘটার সাথে সাথে তার প্রহরীরা আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে দেবে। তবুও আমাকে তার কাছে যেতে দাও, তোমরা স্থির হও। সে যদি কোনকিছু যাচাই না করে তার সৈন্যদের বাঁচাতে চেষ্টা করে, তাহলে তার জীবন থেকেই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। আমি তোমাদের কাছে ওয়াদা করছি, আমি যা বলেছি তা করে দেখিয়ে দেবো।"

দৃশ্যত পরিস্থিতি এতোটাই উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে, নিয়ন্ত্রণে আনার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু দেশত্যাগী এসব আরব ছিল খুবই সুশৃঙ্খল। তারা সর্দারের কথায় নিজেদের ক্ষোভ আপাত দৃষ্টিতে সামলে নিলো এবং

তরুণীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বস্তিতে নিয়ে এলো। ততোক্ষণে রাত অনেক হয়ে গেছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলায় সেনাদের প্রস্তুতি কাজে ব্যস্ত। হারেস আলাফী অর্ধরাতের একটু আগে আর দু'জন সঙ্গী নিয়ে বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

আলাফী ও সঙ্গীরা ফজরের নামাযের আযান শুনে ঘোড়াকে আরো তাড়া করলেন যাতে নামাযের সময় থাকতেই সেখানে পৌছতে পারেন। তারা যখন দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে পৌছলেন, তখন ফটকের দরজা বন্ধ। কারো জন্য এতো সকালে দরজা খোলা হয় না। কিন্তু বিন কাসিম প্রহরীদের বলে রেখেছিলেন, হারেস আলাফী যখনই আসবেন, তার জন্য যেন দরজা খুলে দেয়া হয়। বস্তুতঃ তার পরিচয় পেয়ে দরজা খুলে দেয়া হলো। তিনি ঠিক এমন সময় বিন কাসিমের সকাশে পৌছলেন, যখন জামাত দাঁড়াচ্ছে। তারা তিনজন শেষের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন।

নামায শেষ হতেই হারেস আলাফী অন্যদের ডিঙিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌছলেন। বিন কাসিম এতো ভোরে আলাফীকে এখানে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন।

"আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সর্দার! নিশ্চয় আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর এনেছেন? বললেন বিন কাসিম।

"হ্যাঁ, বিন কাসিম! খবর খুবই বড় এবং খুবই ভয়ানক! আলাফীর বলার ভঙ্গি শুনেই বিন কাসিমের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি কোন মন্তব্য না করে আলাফী ও তার দুই সঙ্গীকে তার একান্ত কক্ষে নিয়ে গেলেন।

কক্ষে যাওয়ার পর আলাফী বললেন, "বিন কাসিম! তুমি যদি আলাফীর সাথে সত্যিকারের বন্ধুত্ব করে থাকো, তাহলে আজ বন্ধুত্বের হক আদায় করো।"

"হক অবশ্যই আদায় করবো। আপনি যদি উপকার করে এর প্রতিদান পেতে চান, তাহলে বলুন, কি প্রতিদান দিতে হবে?"

হারেস আলাফী তাকে পুরো ঘটনা জানালেন, যা তাদের বসতির পাশের চৌকিতে ঘটেছে এবং পরিস্থিতি কতোটা বিস্ফোরন্মুখ হয়ে রয়েছে। ঘটনা শুনে বিন কাসিম স্থবির হয়ে গেলেন।

হারেস আলাফী বললেন, "প্রিয় বিন কাসিম! তোমরা যাদেরকে বিদ্রোহী বলো, আমি অনেক কষ্টে তাদেরকে তোমাদের জন্যে নেপথ্যে সহযোগিতা করার জন্যে সম্মত করেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, এ মুহূর্তে তুমি যদি ওখানে যাও, তবে জানি না, তোমার দেহে কতগুলো বর্শা ও তরবারী আঘাত হানবে। আমি উত্তপ্ত পরিস্থিতি একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠাণ্ডা করে এসেছি। আমি যদি তাদের ধারণার চেয়ে বেশী সময় এখানে কাটিয়ে ফিরে যাই, তাহলে আমাকে পথেই তারা পাবে এবং খুন করে ফেলবে।"

"ঠিকই বলেছেন সর্দার! এমন ঘটনায় তাদের এরচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ ঘটনাটা এমন নয় যে, কথায় তাদের ঠাণ্ডা করা যাবে।"

"আমাকে বলো বিন কাসিম! তুমি এখন কি করবে? যদি কিছু করার না থাকে, তাহলে আমাকে বলো, আমি কি করতে পারি?"

"এ মুহূর্তে আমার কাজ ডাভেল আক্রমণ করা। কিন্তু এর আগে অবশ্যই আমি এ ব্যাপারটি সুরাহা করবো।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম তখনই তার ঘোড়া আনতে নির্দেশ দিলেন এবং গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে সঙ্গে নিলেন। তার দেহরক্ষীরা তার রওয়ানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানা হলো। বলা হয়, যে কোন জটিল ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন শা'বান ছাকাফী।

✪ ✪ ✪

হারেস আলাফী তার দুই সঙ্গীসহ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে রওয়ানা হলেন। তারা ভেবেছিলেন অন্তত দ্বি'প্রহরের দিকে বসতিতে পৌছে যেতে পারবেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলা থেকে বের হয়েই এভাবে ঘোড়া ছুটালেন যেন তিনি উড়াল দিয়ে সেখানে চলে যাবেন। তিনি ছিলেন সবার আগে এবং গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী ছিলেন তাঁর পাশাপাশি। তিনি শা'বান ছাকাফীর সাথে ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

দ্বিপ্রহরের অনেক আগেই তাঁরা দুর্ঘটনা স্থলে পৌছে গেলেন। সেনাপতিদের আসতে দেখে চৌকির সব সিপাহী চৌকি থেকে বেরিয়ে এলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম চৌকির কাছে গিয়ে পিছনে চলে এলেন আর

শা'বান ছাকাফী চৌকির সৈন্যদের কাছে চলে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-গতকাল বিকেল বেলার টহলে কে কে ডিউটিতে ছিল?"

চার সিপাহী হাত উঁচিয়ে নিজেদের ডিউটিতে থাকার কথা জানালো।

"তোমরা চারজনই কি তিন তরুণীর ওপর হামলা করেছিলে? না তোমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল, যে চায়নি এ কাজে শরীক হতে?"

একথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শা'বান ছাকাফীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তোমরা দেখতেই পাচ্ছো, প্রধান সেনাপতি নিজে এসেছেন। তা থেকেই বুঝতে পারছো ব্যাপারটি কতো জটিল। আর এ ক্ষেত্রে তোমাদের অপরাধ পরিষ্কার। লুকানোর কোন অবকাশ নেই।"

"শত্রু ভূমিতে দাঁড়িয়ে যা তা বলবেন না সেনাপতি।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল চার অভিযুক্তের একজন। জন্মভূমি থেকে দূরে এনে এভাবে আমাদের অপমান করার কোন অধিকার আপনার নেই।"

"এক সিপাহীর কথা শেষ না হতেই বিন কাসিমের দিকে হাত প্রসারিত করে চার অভিযুক্তের অপর একজন বলল, "সম্মানিত সেনাপতি! সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যে আল্লাহর নামে আমরা আপনার সাথে এখানে জিহাদ করতে এসেছি। আপনার কাছে জানতে চাই, এ লোক আমাদের ওপর কেন অপবাদ দিচ্ছে? আমরা কি আপনার বাহিনীর সৈনিক নই?"

"সিপাহীর প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মদ বিন কাসিম কিছুই বললেন না। কারণ অনুসন্ধানের কাজটি তিনি শা'বান ছাকাফীর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছিলেন। আসলেও এটি ছিল শা'বান ছাকাফীর কাজ। অভিযুক্ত হওয়ার পর চার সিপাহী হা-হুতাশ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করল। আলাফী ও তার দুই সঙ্গী দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে এসব দেখছিলেন।

শা'বান ছাকাফী হারেস আলাফীকে বললেন, "সর্দার! আক্রান্ত তিন তরুণীকে বসতি থেকে এখানে নিয়ে আসুন এবং তাদের সাথে যতো লোক আসতে চায় আসতে বলুন।"

হারেস আলাফী বসতির উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পর চৌকির কমান্ডারকে গোয়েন্দা প্রধান ছাকাফী বললেন, এ মুহূর্তে যারা টহলে রয়েছে তাদেরকেও নিয়ে এসো। কমান্ডার সেনাপতির নির্দেশ পালনে চলে গেল। এমন সময় চৌকি থেকে একটু দূরে গিয়ে বিন কাসিম ও গোয়েন্দা প্রধান ছাকাফী পরস্পর কথা বললেন।

শুরুতে শুধু অভিযুক্ত চার সিপাহী নিজেদের ওপর মিথ্যা অভিযোগের জন্যে হা-হুতাশ করেছিল, কমান্ডার ও আলাফী চলে যাওয়ার পর সবাই চেচামেচি শুরু করে দিলো এবং সেনাপতিদের সম্পর্কে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের কানে এসব কথা গেলেও তিনি নীরবে সিপাহীদের গালমন্দ সহ্য করলেন। অথচ এসব কটুবাক্য সাধারণ সৈনিকও সহ্য করত কি-না সন্দেহ। এক পর্যায়ে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা শান্ত হও। এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো, তোমাদের ওপর কোন ধরনের বে-ইনসাফী করা হবে না।"

একজন বয়স্ক সিপাহী বলল, "সম্মানিত সেনাপতি! দেখেতো মনে হলো যে তিনজন লোক আপনার সাথে এসেছিল এরা সেই লোক; যারা আরব থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে রাজার আশ্রয় নিয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় এরা আমাদের বিরুদ্ধে রাজার নিমক হালালী করছে। আমি বলি, হিন্দুদের আগে এদের পরিষ্কার করা জরুরী। এরা আমাদের ঘোরতর শত্রু।"

"কি ব্যাপার! তোমরা কি মুখ বন্ধ করবে না? ধমকের স্বরে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন গোয়েন্দা প্রধান। আমি তো তোমাদের বলেছি, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। সত্যিকার অর্থে যে অপরাধী তারই বিচার হবে।"

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল চৌকির সকল সিপাহীর মধ্যে বিদ্রোহী আরবদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ উপচে পড়ছে। এরা যেন গোটা বসতি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে স্বস্তি পায়।"

দূর থেকেই দেখা গেল তিন তরুণীকে নিয়ে আলাফী বসতি থেকে চৌকির দিকে আসছেন। তার পিছনে বসতির কিছু লোকও আসছে। শা'বান ছাকাফী দেখে তাদের দিকে ঘোড়া হাঁকালেন এবং তাদেরকে চৌকি থেকে দূরেই থামিয়ে দিলেন।

শা'বান ছাকাফীর অনুরোধে সেই তরুণীকে তার সামনে আনা হলো যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তাকে সৈন্যরা ধর্ষণ করেছে।

নদী কাছেই ছিল। শা'বান ছাকাফী ভিকটিম তরুণীকে গাছ গাছালী ও টিলার আড়ালে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে তার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, সিপাহীরা কোথায় তোমাকে ও তোমার বান্ধবীদেরকে জাপটে ধরেছিল?"

তরুণী শা'বানের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। উত্তর না বলার কারণে শা'বান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তোমাকে ও তোমার বান্ধবীদেরকে সিপাহীরা আঘাত করেছিল? জায়গাটি কোথায়?"

এবার তরুণী ডানে বামে ঘাড় হেলিয়ে দু'টি জায়গা দেখিয়ে দিলো।

"আমরা সুবিচার করতে এসেছি। যারা তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাদেরকে তোমাদের সামনে হত্যা করা হবে। কাজেই তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারপর তরুণী আর কিছু বলল না।

শা'বান সেই তরুণীকে ওখানেই রেখে টিলার এপাশে এসে উচ্চ আওয়াজে বললেন, এই তরুণীটি কি বোবা?

শা'বানকে দেখে আলাফী তার কাছে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "শা'বান! তুমি হয়তো এর সাথে আরবীতে কথা বলেছো। ঐ তরুণী আরবী জানে না। এ ছিল হিন্দু। এক বছর আগে আমাদের এক তরুণকে বিয়ে করার জন্য মুসলমান হয়েছে।"

"ওর সাথে অন্য যে দুই তরুণী ছিল এরা কি তোমাদের কবিলার মেয়ে?" জিজ্ঞেস করলেন ছাকাফী।

"না, এরাও এখানকার অধিবাসী। এরাও কিছুদিন আগে মুসলমান হয়ে আমাদের গোত্রের তরুণের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।"

শা'বান ছাকাফী কবিলার একজন এমন লোককে সঙ্গে নিলেন, যে সিন্ধী ও আরবী ভাষা বলতে ও বুঝতে পারত। শা'বান তাঁর মাধ্যমে তরুণীকে জিজ্ঞেস করলেন, তার ওপরে যে জায়গাটিতে সিপাহীরা আক্রমণ করেছিল, সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিতে।

তরুণী একটি জায়গা দেখিয়ে বলল, এইখানে। শা'বান তাকে পুরো ঘটনা বলার নির্দেশ দিলেন। তরুণী ঘটনা বলতে শুরু করল এবং গোত্রের লোকটি তা আরবীতে তাকে বুঝাতে লাগল। তরুণীর বর্ণনা শুনে শা'বান তরুণীকে বললেন, "সেই জায়গাটি দেখাও তো, যে জায়গাটিতে সিপাহীরা তোমাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল? তরুণী একটি জায়গা দেখালো। শা'বান তরুণীকে একটি টিলার আড়ালে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর শা'বান অপর দুই তরুণীর একজনকে টিলার আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এর স্বামীও এর সাথে আসুন।

আরবদের অনুসন্ধানী ক্ষমতা ছিল বিশ্বখ্যাত। আরব্য গল্প কাহিনীতেও তাদের অনুসন্ধানী প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। শা'বান ছাকাফী ছিলেন স্বভাবজাত অস্বাভাবিক অনুসন্ধানী প্রতিভার অধিকারী।

✪✪✪

দ্বিতীয় তরুণীকে শা'বান ছাকাফী দুভাষী ও তার স্বামীর সাথে অপর টিলার আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সিপাহীরা তার ওপর কোথায় আক্রমণ করেছিল? তরুণী হাত দিয়ে একটি জায়গা দেখিয়ে দিলো। শা'বান ছাকাফীর নির্দেশে পুরো ঘটনার একটা বর্ণনা দিলো তরুণী।

দ্বিতীয় তরুণীকে অপর একটি টিলার আড়ালে দাঁড় করিয়ে তৃতীয় তরুণীকে তার স্বামীসহ ডাকলেন। শা'বান তাকেও অপর একটি টিলার আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তোমার ওপর সিপাহীরা হামলে পড়েছিল?"

তরুণী একটি জায়গার প্রতি ইশারা করল এবং শা'বানের নির্দেশে সেও ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দিলো।

তৃতীয় তরুণীকে অপর একটি টিলার আড়ালে দাঁড় করিয়ে প্রথম তরুণীকে আবার ডেকে আনলেন শা'বান এবং তার স্বামীকেও ডাকলেন। এই তরুণীর স্বামী এতোই ক্ষুব্ধ ছিল যে, তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, চোখ কোঠর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। যেন সে শা'বানকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবে এমন তার অবস্থা। ক্ষোভে রাগে সে ফোঁস ফোঁস করছিল। শা'বান এসবকে গায়ে না মেখে একান্ত মনে তার কাজ করে যাচ্ছিলেন।

শা'বানের জিজ্ঞাসায় তরুণী বলল, সে চার সিপাহীকেই চিনতে পারবে।

চৌকির বারোজন সিপাহীকে একটি আলাদা জায়গায় দাঁড় করানো হলো এবং এই তরুণীকে স্বামীসহ তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কোন চারজনকে চিনো?"

তরুণী দ্রুততার সাথে চারজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করল। তরুণীর নির্দেশিত চার সিপাহীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়া হলো এবং এই তরুণীকে তার স্বামীর সাথে আলাদা জায়গায় রাখা হলো।

এরপর শা'বানের নির্দেশে স্বামীসহ দ্বিতীয় তরুণীকে ডাকা হলো। এ তরুণী বলল, একজন সিপাহীকে সে ভালোভাবেই চিনতে পারবে। তাকে সিপাহীদের কাছে নিয়ে গেলে মাঝখান থেকে একজনের প্রতি সে ইশারা করে দেখালো। এই সিপাহীকেও অন্যদের থেকে আলাদা করে নেয়া হলো। অতঃপর তৃতীয় তরুণীকে স্বামীসহ ডাকা হলে সেও জানালো; এক সিপাহীকে সেও চিনতে পারবে সিপাহীদের সামনে নিয়ে যাওয়ার পর সেও একজনের প্রতি ইঙ্গিত করল।

শা'বান আলাফী ও তিন তরুণীর স্বামীকে তার কাছে ডেকে আনলেন এবং বললেন, এই চার সিপাহী গতকাল বিকেলে টহল কাজে নিয়োজিত ছিল। যাদেরকে তোমরা এখানে দেখছো। আর তোমাদের তরুণীরা যাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, এরা তখন চৌকিতে অবস্থান করছিল। শা'বান তিন তরুণীকে ডেকে এনে তাদের স্বামীদের সাথে দাঁড় করালো।

অতঃপর সমবেত সবার উদ্দেশে শা'বান ছাকাফী বললেন, বন্ধুগণ! এ তিন তরুণী ভিন্ন ভিন্ন জায়গার কথা বলেছে। তোমরা মরু ভূমিতে জন্ম নিয়েছ এবং মরুতেই বড় হয়েছ। তোমরা জানো, মরুর ধুলিকণাও কথা বলে। চৌকির সৈনিক ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। যে জায়গায় আক্রান্ত হওয়ার কথা এই তরুণীরা বলেছে, এই জায়গায় চারটি ঘোড়ার কোন চিহ্ন আছে কি-না আমাকে দেখিয়ে দাও। ঘটনাটি গত সন্ধ্যার। এরপর না কোন মরুঝড় হয়েছে, না বৃষ্টি হয়েছে। এই তরুণী আমাকে জানিয়েছে তাকে মাটিতে ফেলে সম্ভ্রম হরণ করেছে। আমার সাথে তোমরা এসো এবং সেই জায়গাটি একটু দেখে নাও। শা'বান তাদেরকে তরুণীর দেখানো জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখাও তো এখানে এমন কোন চিহ্ন খুঁজে পাও কি-না?

প্রিয় স্বদেশী বন্ধুরা! আশ্রিত আরব বস্তিবাসীদের উদ্দেশে বললেন শা'বান। এই তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জায়গার কথা বলেছে। তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, তাদের ভাষায় সৈনিকরা ছিল অশ্বারোহী। অশ্বারোহী সৈনিকদের কাছ থেকে এই তরুণী দু'জন পালিয়ে গেল? এরা কি ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াতে পারে? আর তিন তরুণী সেখানে আক্রমণকারী হিসাবে যাদের চিহ্নিত করেছে, তাদের কেউই সেখানে যায়নি। যারা তখন ডিউটিতে ছিল এরা তোমাদের সামনে দাঁড়ানো। শা'বান তরুণীদের উপস্থিতিতে সিন্ধী ভাষায় তরুণীদের বর্ণনা শোনালেন এবং বললেন, তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, তারা কি একথা বলেনি?"

সম্মানিত হারেস আলাফী! বললেন ছাকাফী। বনী ছাকীফের রক্তে এখনো কোন মিশ্রণ ঘটেনি। বনী উসামা যদি গোত্রীয় শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়ায়, তাহলে বনী ছাকীফের সেনাপতি জীবন দিয়ে বন্ধুত্বের হক আদায় করবে। তোমরা এ ঘটনার ব্যাপারে কেন একটু চিন্তা করোনি, এই তরুণীরা কিছুদিন আগেও ছিল পৌত্তলিক ঘরের সন্তান। এরা শৈশব থেকে মূর্তিকে পূজা করে করে বড় হয়েছে। এরপর যৌবনে তিন আরব তরুণ এদের কাছে ভালো লাগায় এরা তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের রক্তে রয়েছে পৌত্তলিক মানসিকতা। পৌত্তলিক এক প্রকার

মিথ্যাচারিতা। এরা যদি আরব বংশোদ্ভূত হতো, তাহলে আমি এতোকিছু করতাম না। শুধু জিজ্ঞেস করতাম, বলো, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? আমি নিশ্চিত, তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য এটা একটা চক্রান্ত।

আলাফী এতটা উঁচু চিন্তার অধিকারী ছিলেন না, তাছাড়া দীর্ঘদিন এখানে থাকার কারণে মাকরান ও হিন্দু অঞ্চলের চিন্তা চেতনা তার আরব সাথীদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

ছাকাফী বললেন, তোমরা দেশে থাকতে বিদ্রোহ করেছিলে। আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি তোমাদের বিদ্রোহ ছিল সঠিক। কিন্তু আজ তোমাদের সেই সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা কোথায় গেল?...তোমরা সবাই বিশেষ করে এদের স্বামীরা যদি আমাকে অনুমতি দাও, তাহলে এ ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্য ও মিথ্যাকে আমি আলাদা করে দেখিয়ে দেবো।

হঠাৎ কথিত সম্ভ্রমহানির শিকার হওয়া তরুণীর স্বামী তরুণীর ওপর হামলে পড়লো। চিতাবাঘ যেভাবে শিকারের ওপর হামলে পড়ে ঠিক সেভাবে তরুণীর চুল ধরে ওকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে মাটির ওপর আঁচড়ে ফেলল তার স্বামী। তরুণী চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। স্বামী ওর বুকে পা রেখে ওর গলার উপরে তরবারী ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "বাঁচতে চাস তো সত্য কথা বল হিন্দুর বাচ্চা!"

অপর দিকে আলাফী নিজে তরবারী বের করে অপর দুই তরুণীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বললেন, বাঁচতে চাস্ তো সত্য কথা বল। অতঃপর সবার দিকে সম্বোধন করে আলাফী বললেন, "এদের চুলের সাথে রশি বেঁধে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দাও।"

একথা শোনার পর এক তরুণীর মুখে উচ্চারিত হলো ভয়ার্ত আর্তনাদ। "না, আমি এভাবে মরতে চাই না! তোমরা যদি সত্য কথা শুনতে চাও, তবে শোনো।"

অপর দিকে যে তরুণীর গলায় তার স্বামী তরবারী ধরে রেখেছিল সেও সত্য কথা বলার জন্য সম্মত হলো।

অবশেষে তিন তরুণীর বক্তব্যে যা বেরিয়ে এলো এর সার কথা হলো, এদের তিনজনকে রাজা দাহিরের বোন ও স্ত্রী মায়ারাণী ফুসলিয়ে রাজী করায়

যে, এরা তিন আরব যুবককে বিয়ে করে যেন এদের ওপর যাদুকরী প্রভাব সৃষ্টি করে। মায়ারাণী এ কাজ করেছিল, হাজ্জাজের পাঠানো দ্বিতীয় সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের মৃত্যুর পর।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মাকরানে আসার পর রাজা দাহিরের উজির বুদ্ধিমান তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, রণ ক্ষেত্রের পাশাপাশি কূটনৈতিক চালে মুসলমানদের দুর্বল করার জন্য এ দায়িত্ব উজির বুদ্ধিমান নিজের কাঁধে নিয়েছিল।

বুদ্ধিমানের জানা ছিল, মায়ারাণী এ অস্ত্র প্রয়োগের হাতিয়ার অনেক পূর্বেই প্রয়োগ করে রেখেছে। অতঃপর বুদ্ধিমান মায়ার সাথে যোগাযোগ করে এটিকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলো। নারী গোয়েন্দা পাঠিয়ে এই তরুণী তিনজনকে পরামর্শ দিলো, "আলাফী ও আরব আশ্রিতরা শত্রুদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছে। অতএব এদের মাঝে যে করেই হোক কঠিন শত্রুতার জন্ম দিতে হবে। বসতির পাশে বিন কাসিমের সেনা চৌকি স্থাপিত হলে এ তিন তরুণীকে ব্যবহার করে দু'পক্ষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। কারণ আরবরা নারীর সম্ভ্রমহানির অপরাধকে কখনও ক্ষমা করে না। নারীর ইজ্জত রক্ষায় অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সেই সাথে নারীর অসম্মানকারীকে আরব মুসলমানরা প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

এ তিন শয়তানীর ভাগ্যের সিদ্ধান্ত আমাদের সর্দার দেবেন? চিৎকার করে বলল এক তরুণীর স্বামী।

"হ্যাঁ, এদের সবাইকে হত্যা করে ফেলো" বললেন আলাফী।

হত্যার কথা শুনে তরুণী তিনজন চিৎকার শুরু করে দিলো। তারা বলতে লাগল, এ কাজ তারা নিজেদের ইচ্ছায় করেনি। মায়ারাণী ও উজির বুদ্ধিমানের চক্রান্তে পড়ে করেছে। তারা কান্নাকাটি করে জীবন ভিক্ষা চাইলো। কিন্তু আলাফী আবারো ঘোষণা করলেন, না এদের ক্ষমা করা হবে না।"

"থামো আলাফী, বজ্র নির্ঘোষ আওয়াজে বললেন, সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। এতক্ষণ পর্যন্তই তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর গোয়েন্দ তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি আলাফীর উদ্দেশে বললেন—

"এদের নিরপরাধ মনে করো। রাজা দাহিরকে আমি একটি পয়গাম পাঠাতে চাই।" তিনি তরুণীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদেরকে আমার সৈন্যরা রাজধানীর পথে কোন বসতিতে রেখে আসবে। তোমরা রাজধানীতে

গিয়ে রাজা দাহির ও উজির বুদ্ধিমানকে বলবে, যুদ্ধ রণাঙ্গনে পুরুষে পুরুষে হয়ে থাকে, নারীকে যুদ্ধে ব্যবহার করা কোন বাহাদুরী নয়। যারা নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে যুদ্ধ জিততে চেষ্টা করে, তারা কাপুরুষ, তারা রণাঙ্গনে মোকাবেলা করার যোগ্যতা রাখে না। রাজাকে বলো, আপন বোনকে স্ত্রী বানিয়ে রাখার মতো অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ অনেক হয়ে গেছে। তাকে তার কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এজন্য সে যেন প্রস্তুত থাকে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রাণ ভরে আল্লাহর শোকর আদায় করে চৌকির কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ঘোড়ার ওপরে বসিয়ে দু'জন সিপাহী দিয়ে রাজধানীর পথের কোন বসতিতে দায়িত্ববান কোন ব্যক্তির কাছে দিয়ে এসো। যাতে এদেরকে রাজধানীতে পৌঁছে দিতে পারে।

সেই সময় মহাভারতের হিন্দুদের কূটকৌশল ছিল বিশ্বখ্যাত। তখন ভারতে মন্দির ও ব্রাহ্মণদের রাম রাজত্ব। মন্দিরগুলোই পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে এবং রাজাদের ওপর রাজত্ব করে। তখন মন্দিরগুলো ছিল রাজনীতি ও কূটনীতির আখড়া। এরা যে কোন শত্রুতায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো নারী অস্ত্র। পক্ষান্তরে মুসলমান সংস্কৃতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিরোধী। মুসলমানরা নারীর সম্মান ও ইজ্জতকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বলেই বিশ্বাস করতো। ফলে পরস্পর এই দু'টি চেতনা ও সংস্কৃতির মধ্যে যখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন জন্ম নেয় বহু বিস্ময় সৃষ্টিকারী ঘটনা। যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এবং আজো পাঠককে করে শিহরিত।

ডাভেলের চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরুর আগে এ ঘটনায় বিন কাসিম আন্দাজ করতে পারলেন, তার প্রতিপক্ষ তাকে কতোভাবে আঘাতের ব্যবস্থা নিয়েছে।

বিন কাসিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চৌকি থেকে আরমান ভিলায় ফিরে গেলেন এবং পরদিনই ডাভেলের দিকে রওয়ানা হলেন।

পর্ব পাঁচ

মেঘের গর্জনের মতো বজ্র কণ্ঠে তকবীর ধ্বনীতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে এগিয়ে চলল বিন কাসিমের কাফেলা।

"ঐ বুদ্ধুটা কি এখনো এসে পৌছেনি?" ক্ষোভ ও হতাশা মিশ্রিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল রাজা দাহির।

"হয়তো আসছে মহারাজ!" জবাব দিলো মন্ত্রী।

"নিরূন তো এতোটা দূর নয় যে, তিন দিনেও সে পৌঁছতে পারবে না।" হয়তো আরবদের আনুগত্য স্বীকার করে আমরা যে ওকে প্রশাসক নিযুক্ত করে কিছু দায়িত্বভার দিয়েছি সেকথা ভুলে গেছে। ওকি জানে না, প্রশাসকের পদ যে কোন সময় আমরা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি।" বলল রাজা দাহির।

দাহিরের কাছে আগেই খবর পৌছে গিয়েছিল আবর থেকে এবার বিপুল সংখ্যক সৈন্য বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে। তার কাছে এখবরও পৌছে গিয়েছিল কন্নৌজ ও আরমান ভিলা আরবরা দখল করে নিয়েছে। গত রাতে মায়ারাণী তাকে খবর দিয়েছিল তার নিয়োগকৃত তিন তরুণী ফিরে এসেছে এবং তার পরিকল্পনা বেকার হয়ে গেছে।

মায়ারাণীর প্রেরিত তরুণীদেরকে মুহাম্মদ বিন কাসিম হত্যা না করে সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিন কাসিমের সৈন্যরা যে পল্লীতে তরুণীদের রেখে গিয়েছিল পল্লীবাসীদের ওরা বলেছিল, তারা রাজার নিজস্ব লোক, তাদেরকে যেন খুব তাড়াতাড়ি রাজধানীতে পৌছার ব্যবস্থা করা হয়। দ্রুতগামী উটের ওপর বসিয়ে বারজন লোকের প্রহরাধীন দুই হিন্দু তরুণীকে উরুর পৌছানোর ব্যবস্থা করল গ্রামবাসী। গত রাতেই তরুণীদ্বয় রাজধানীতে পৌছে গিয়েছিল। মায়ারাণী রাতেই রাজা দাহিরের কাছে তাদের পৌছে দিয়েছিল। রাজা দাহির নিজে তরুণীদের কাছ থেকে তাদের চক্রান্ত ভণ্ডুল

হওয়ার কাহিনী শুনেছিল। রাজা দাহিরকে এক তরুণী বলল, "আমরা নিরপরাধ মহারাজ! আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতোই কাজ করেছিলাম কিন্তু আমাদের জানা ছিল না আরবের লোকেরা মাটির নীচের খবরও বেমালুম জেনে নিতে পারে। আমরা ভেবেছিলাম মাকরানের আরব অধিবাসীরা যেভাবে আরব সৈন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল, তারা আরব চৌকির সৈন্যদের ওপর হামলে পড়বে। আর তাতে আরব সৈন্যদের সাথে তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হবে এবং সর্দার আলাফী তার দলবল নিয়ে মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করবে কিন্তু হঠাৎ আরব সেনাপতি সেখানে উপস্থিত হলো। তার সাথে বহু লোকজনও ছিল।

হ্যাঁ, এর পর যা ঘটেছে সে খবর আমি শুনেছি। বলল রাজা দাহির। আচ্ছা, তুমি কি আরব সেনাপতিকে নিজ চোখে দেখেছ?

হ্যাঁ, মহারাজ। আমরা আগেই জেনে নিয়েছিলাম, আরব থেকে যে সেনাদল এসেছে সেই সেনাবাহিনীর সেনাপতি কে? তার নাম কি? তিনি কেমন লোক ইত্যাদি। আমার স্বামী আমাকে বলেছিল।

তার নাম কাসিম! অনুচ্চ শব্দে উচ্চারণ করল দাহির। তোমরা ভুল নাম শোননিতো? হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তো নয়?

না, মহারাজ! আমরা ঠিকই শুনেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই মহারাজ! আরব সেনাপতির নাম মুহাম্মদ বিন কাসিম। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নয়!

মহারাজ! সে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নয় তবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা। বয়সে আমাদের চেয়েও ছোট।

"সে একেবারেই বালক মহারাজ।" বলল অপর তরুণী। কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। তাঁকে দেখে মনেই হয় না সে সেনাপতি। কিন্তু তাঁর যেসব নিরাপত্তা রক্ষী এসেছিল, তারা কথায় কথায় "সালারে মুহতারাম" বলে সম্বোধন করত। সেই আমাদেরকে আমাদের স্বামী ও হারেস আলাফীর হাতে নিহত হওয়া থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেই তাদের সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল, নিকটবর্তী কোন পল্লীতে ওদের দিয়ে এসো। তা থেকে তাঁর সেনাপতি হওয়ার বিষয়টি আরো সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

রাজা দাহির অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।

শুনেছি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খুব বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু বোকার মতো কাজ করেছে। সে এই বালকটিকে কেন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলো। সে মনে হয় এই

আত্মশ্লাগা অনুভব করতে চায় যে, অভিজ্ঞ সেনাপতিদের ব্যর্থতার পর অল্প বয়সী ভাতিজার হাতে বিজয় মাল্য পড়বে। আচ্ছা! রাণী বলল, সেই বালক সেনাপতি নাকি মহা রাজার কাছে বলার জন্য তোমাদের কাছে কি পয়গামও দিয়েছে?"

রাণীর এ কথায় তিন তরুণী পরস্পর চোখাচোখি করল। ওদের মনোভাব এমন যে, মহারাজার সামনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পয়গাম মুখে নিতে তারা ভয় পাচ্ছে এবং লজ্জাবোধ করছে। তারা সবাই মায়ারাণীর দিকে তাকাল।

কি হলো, মহারাজকে বলো, আরব সেনাপতি মহারাজকে বলার জন্য কি পয়গাম দিয়েছে? বলল মায়ারাণী।

"সে বলেছিল' থমকে থমকে আড়ষ্ঠ কণ্ঠে বলল এক তরুণী। সে বলেছিল, লড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আর লড়াই হয় পুরুষে পুরুষে, আপনি যেন নারীদেরকে যুদ্ধে ব্যবহার না করেন...। সে আরো বলেছে, আপন বোনকে স্ত্রী করে ঘরে রাখার শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। সে যেন কঠিন শাস্তির জন্য তৈরী থাকে।...

"ও, সে তো শুধু বালকই নয়, বহুত বড় কথা বলেছে?"

তরুণীদের বের করে দিয়ে রাজা দাহির মায়ারাণীকে বলল, এসব তরুণীদের ব্যাপারে এখন কি করা উচিত? "এরা এখন আর কোন হিন্দুর সংসার করার যোগ্য নয়" বলল মায়ারাণী। এরা মুসলমানের সাথে সংসার করে এসেছে। এদেরকে যে কোন মন্দিরে সেবিকা করে দেবো তাও সম্ভব নয়। আসার পর থেকেই আমি ওদের হাড়ি পাতিল আলাদা করে দিয়েছি। আমি এদেরকে আমার কাছেই রাখব। আমি ওদের পাঠিয়েছিলাম, আমি ওদের সাথে বেঈমানী করতে পারি না। কারণ ওরা আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

"একথা ভুলে যেয়ো না মায়া। এই অস্বতী মেয়েগুলো আমাদের দেশের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। ওদেরকে বেশী দিন তোমার কাছে রাখা ঠিক হবে না।"

✪ ✪ ✪

সেই রাত শেষে দিনের প্রত্যুষে রাজ দরবারে বসে রাজা দাহির মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, সেই বৌদ্ধ কি এখনো পৌছেনি? রাজা দাহির জিজ্ঞেস করছিল নিরূনের শাসক সুন্দরশ্রীর কথা।

নিরূনের শাসক ছিল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তার নাম ছিল সুন্দরশ্রী। রাজা দাহির গোপনসূত্রে জানতে পেরেছিল সুন্দরশ্রী আরবদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু এনিয়ে সে শাসক সুন্দরশ্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। কারণ এতে বিভিন্ন রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। দাহিরের প্রতি অসন্তুষ্ট শাসকরা একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। সাধারণত হিন্দুস্থানে এমন হয় না। কিন্তু বিলাসী ও আরাম প্রিয় শাসকরা বিদেশী আক্রমণে ভীত হয়ে লড়াই না করে আগাম বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল। দাহির ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও কপট। বিদেশী আক্রমণ মুহূর্তে সে কোন সামন্ত শাসকের ওপর অত্যাচার চালানোর পক্ষপাতি ছিলনা। এতে রাজধানী থেকে বহু দূরে অবস্থিত কোন রাজ্যের শাসককে বাগে রাখার বিষয়টি যথেষ্ট কঠিন হয়ে যেত। দাহিরের বিশ্বাস ছিল, পূর্ববর্তী দুই আরব বাহিনীর মতোই তার সৈন্যরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীকেও ডাভেল অতিক্রমের সুযোগ দেবে না। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি ভিন্নতর হয়ে উঠল। এ কারণে সে সুন্দরশ্রীকে উরুঢ় ডেকে পাঠিয়েছিল। কথা মতো সেদিন থেকে দুই তিন দিন আগেই সুন্দরশ্রীর উরুঢ় পৌঁছে যাওয়ার কথা কিন্তু অতিরিক্ত তিনদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও নিরূনের শাসক সুন্দরশ্রীর দেখা পাওয়া গেল না। সুন্দরশ্রীর অবস্থা দৃষ্টে রাজা দাহিরের দূত মারফত খবর পাওয়ার পরও তা তামিল করা জরুরী মনে করেনি। এদিকে নিরূনের শাসকের অনুপস্থিতিতে রাজা দাহির দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সে তার উজির বুদ্ধিমানকে ডেকে পাঠালো।

"উজির! বৌদ্ধতো এখনো এলো না। এতে কি মনে হয় না সে আরবদের সাথে হাত মিলিয়েছে?"

"শত্রুদের সাথে হাত মিলাক বা না মিলাক। তবে সে যে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। ...তবে চিন্তার কারণ নেই মহারাজ! সে অবশ্যই আসবে।"

"তোমার বিবেক বুদ্ধি কি বলে? ওর সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?" জিজ্ঞেস করল রাজা দাহির। আমার বিরুদ্ধাচরণ কখনো আমি বরদাশ্‌ত করব না।"

"এ মুহূর্তে বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করা উচিত মহারাজ! সে যদি আসে, তাহলে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ না করা ঠিক হবে যে, সে কেন আসতে বিলম্ব করল। তার সাথে আপনার এমন মনোভাব দেখানো উচিত, যেন সেও

আপনার মতোই একজন রাজা। কারণ আপনি তাকে বলতে চান সে যেন শত্রুদের সাথে হাত না মেলায়।"

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ উজির। আমি তাকে ডেকে একথাই বলতে চাই।"

"আপনি তাকে একথাও বলে দিবেন, সে যেন মুসলমানদেরকে আনুগত্যের প্রতারনায় ফেলে দেয়। শত্রুদের জন্য যেন শহরের দরজা খুলে দেয় এবং শহরে শত্রুদের স্বাগত জানায়। সকল শত্রু সৈন্য শহরে প্রবেশ করলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার সেনাদের নিয়ে শত্রুদের ওপর হামলা করে। দুর্গ হাতে পাওয়ার কারণে মুসলিম সৈন্যরা লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে চাইবে না। সুন্দরশ্রীর যাতে শহরের বাসিন্দাদের বলে দেয়, প্রত্যেকেই যেন বাড়ীর ছাদে বড় বড় পাথর জমা করে রাখে। মুসলমান সৈন্যরা অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যখন দিক-বিদিক ছুটে অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়বে, তখন অধিবাসীরা ছাদের ওপর থেকে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে।"

"সে যদি আমার প্রস্তাব মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমি কি করব?"

মহারাজ! আপনি কি বিষাক্ত নাগিনীকে ঘরে পুষতে চান? আগুন আর নাগকে নিয়ে খেলার পরিণতি আপনি জানেন। আগুন সময় মতো পানি দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে হয় আর কালনাগের মাথা সময় মতো কেটে ফেলতে হয়।

রাজধানীতে হবে না মহারাজ! সে যখন ফিরে যেতে চাইবে পথেই সাপের মাথা কেট দেবো। আর প্রচার করবো, ওকে মুসলিম গুপ্ত ঘাতকরা হত্যা করেছে।

এ কাজটি রাজধানীতে করা ঠিক হবেনা, উজির।

"তার সাথে তো নিরাপত্তা রক্ষী থাকতে পারে।"

"নিরাপত্তারক্ষী থাকুক। গোটা সেনাবাহিনীতো আর নিয়ে আসবে না। হয়তো বারোজন নিরাপত্তা রক্ষী থাকবে। ওদের কোন বিশ্রাম শিবিরে হামলা হবে। ওরা যখন তাঁবু ফেলে রাস্তায় ঘুমাবে তখন আমার লোকেরা ওদের হত্যা করবে। সে ব্যবস্থা আমি করবো মহারাজ। আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি মনে করবেন এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না।"

সেই সন্ধ্যায় সুন্দরশ্রী উরুঢ় পৌছল। রাজা দাহিরের কাছে যখন সংবাদ পৌছল নিরূনের শাসক আসছেন, তখন সে তাকে অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গেল। নিরূনের শাসকের সাথে ছিল মাত্র ছয়জন নিরাপত্তারক্ষী। তাঁর

আসবাবপত্র ছিল আটটি উটে বোঝাই করা। রাজা দাহির অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, সুন্দরশ্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা এভাবে তাদের মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে যে তাদের অর্ধেক চেহারাও ঢেকে গেছে। তাদের চোখগুলো শুধু নজরে পড়ছে।

এরা চেহারা ঢেকে রেখেছে কেন? দাহির সুন্দরশ্রীকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার কাছে এদের এভাবে পাগড়ী পরাটাই ভালো লাগে। এজন্য এভাবে পাগড়ী পরতে বলেছি। জবাব দিলো নিরূন শাসক। এভাবে পাগড়ী পরলে বেশী ভীতিপ্রদ মনে হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের পোষাক এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের দেখলে ভীতিপ্রদ মনে হয়।

"দাহির তার কথায় হেসে হালকা ভাবেই গ্রহণ করল। কারণ তার সামনে এর চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে। তাই রাজা নিরূন শাসককে তার খাস কামরায় নিয়ে গেল।

"একথা কি সত্য যে তুমি মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছ।" দাহির জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, মহারাজ। কথা সম্পূর্ণ সত্য।

"তুমি কি কর দিতেও সম্মতি দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, মহারাজ। আমি যে শহরের অধিবাসীদের শাসক, তাদের জানমালের নিরাপত্তার জন্য আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"না সুন্দরশ্রী! এটা হতে পারে না। তুমি আমার মর্যাদা, সম্মান, তোমার ইজ্জত সম্মান আর শহরের অধিবাসী ও দেশের সম্মান শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছ।"

সেই সাথে খাজাঞ্চীখানার বিপুল সম্পদও শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছ। তুমি কি ভাবনি এরা বিধর্মী। আমাদেরকে গোলাম বাদী বানাতেই এরা আমাদের দেশে আক্রমণ করেছে?"

"মহারাজ! আমি একথাও ভেবেছি যে, এই বিধর্মীদেরকে আপনিই এদেশে ডেকে এনেছেন। এরা শুধু শুধু আমাদের দেশে সেনাভিযান চালায়নি।"

"সুন্দরশ্রী! তুমি আরবদের কোন দূত নও। তুমি আমার নিযুক্ত একটি অঞ্চলের শাসক। নিজের দেশের শাসকের মতো কথা বলো। তোমার তো উচিত নিজ দেশের জন্য লড়াই করে জীবন দেয়া।"

"আমার ধর্ম আমাকে লড়াই থেকে বিরত রেখেছে মহারাজ! তা ছাড়া আমরা নিজেরাই যেহেতু জালেম এমতাবস্থায় লড়াই করার শক্তি আমি পাইনি। মহারাজ কি বলবেন, নিজ দেশের গমনেচ্ছু আরবদের কোন্ অপরাধে কেন জেলখানায় বন্দি করে রেখেছেন?

"এদের সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। ওদেরকে হয়তো ওরা লুট করেছে, যাদের ওপর আমার কোন শাসন নিয়ন্ত্রণ নেই।"

"আরব বন্দিরা ডাভেলের বন্দিশালায় রয়েছে মহারাজ! এখনও সময় আছে আপনি আরব বন্দিদের মুক্ত করে দিন।"

"আমি তোমার নির্দেশ মানতে বাধ্য নই, বরং তোমার উচিত আমার নির্দেশ মেনে চলা।"

"আমি মহাত্মা বৌদ্ধের হুকুম মানতে বাধ্য মহারাজ!"

"তাই যদি হয়, তাহলে তুমি নিরূন ছেড়ে রাজধানীতে এসে পড়ো।"

"তাহলে আপনি নিরূনবাসীদের বলুন, তারা যেন আমাকে বিদায় করে দেয়। নিরূনের একটি অবোধ শিশুও যদি বলে সুন্দরশ্রীকে এখান থেকে প্রত্যাহার করে নিন, তাহলে আমি আরব সাগরের ঢেউয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দেবো। আমাকে যদি মহারাজ ওখান থেকে সরাতে চান, তাহলে নিরূনের জনগণ আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।"

"কাদের কথা বলছো তুমি? এসব লোক আমার প্রজা, আমি ইচ্ছা করলে ওদের না খাইয়ে মারতে পারি, ইচ্ছা করলে তাদের প্রচুর সম্পদ দিয়ে প্রাচুর্য এনে দিতে পারি।"

"অহংকারে মত্ত হয়ে যাবেন না মহারাজ! এরা সেই সব লোক, যারা সৃষ্টিকর্তার প্রিয়। আপনি সৃষ্টিকর্তার ক্ষোভকে ভয় করুন। তাদেরকে অন্যায় যুদ্ধে ঠেলে দেবেন না। কারণ এমনটা যেন না হয় যে, মহারাজের রাজ্য দুই অপরাধের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। প্রভু তাঁর সৃষ্ট মানুষের আবেদন শুনেন। প্রভুর কাছে তার সৃষ্টির শান্তি নিরাপত্তা পছন্দনীয়। বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির ধর্ম। ইসলামও সাধারণ মানুষের ধর্ম, যে ধর্ম মানুষে মানুষে প্রেম ভালোবাসার শিক্ষা দেয়।"

"হু, তুমি কি সেই ইসলামের কথা বলছো, যে ধর্মের লোকেরা আমাদের পল্লীগুলোকে উজার করার জন্যে এসেছে?"

"তারা আমার শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। তারা শান্তি ও নিরাপত্তার জবাবে ভালোবাসা ও হৃদ্যতাই প্রদর্শন করে থাকে। আপনি

তাদের পক্ষ থেকে সদাচরণের আশা করতে পারেন না। কারণ আপনার আগে আপনার পিতা, পিতামহ আরবদের পরাজিত করার জন্য পারস্য সম্রাটকে সামরিক সহযোগিতা করেছিল। অথচ পারস্য শাসকরা হিন্দুস্তানের সিন্ধু ও মাকরান অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে সব সময়ই অস্থির করে রাখতো। সিন্ধু অধিবাসী কয়েক হাজার জাটকে পারস্য বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়ে গোলামে পরিণত করেছিল। পারস্য শাসকরা ছিল আপনার বংশের শত্রু। কিন্তু আপনার পিতামহ মুসলমানদের শত্রুতার কারণে পারস্য শাসকদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিল। সেই সাথে মাকরানের অধিবাসী মুসলমানদের সাথেও আপনার দাদা শত্রুতা শুরু করেন। তাদেরকে অস্থিতিশীল করার জন্য হিন্দু গোয়েন্দা ও লুটেরাদের সহযোগিতা দিতে শুরু করেন। আপনি নানা ভাবে আরব মুসলমানদের উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছেন। আরব শাসকদের সাথে বিদ্রোহ করে যেসব মুসলমান হিন্দুস্তানে পালিয়ে এসেছিল আপনার পিতা ও পিতামহ তাদেরকে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে আরব শাসকদের সাথে শত্রুতাকে আরো শক্তিশালী করেন। বিদ্রোহীদেরকে আরব শাসকের বিরুদ্ধে সবসময়ই প্ররোচিত করেন। আপনার সময়ে আপনার অধীনস্থ লোকেরা আরবদের জাহাজ লুট করে তাদের মেয়ে শিশুসহ অধিবাসীদের কয়েদখানায় বন্দি করে রাখে। এতো সব করার পরও কি আপনার একথা বলা ঠিক যে, আরব সৈন্যরা আমাদের অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে এসেছে?

"হু, বুঝতে পেরেছি সুন্দর! তোমার ওপর মুসলমানদের ভূত সওয়ার হয়েছে।" বলল রাজা দাহির।

"মহারাজ বলছিলেন, আমি যেন নিরূনের শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে চলে আসি। এই সিদ্ধান্ত জনগণকে করতে দিন। আপনি যদি শক্তি প্রয়োগ করে আমাকে নিরূনের ক্ষমতাচ্যুত করেন, তাহলে নিরূনের অধিবাসীরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এমনটাও হতে পারে যে, সৈন্যরাও জনতার কাতারে গিয়ে শামিল হবে।"

"রাজা দাহির সুন্দরশ্রীকে মুসলমানদের কর না দেয়ার জন্য সম্মত করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করল এবং অনুরোধ করল, তিনি যেন মুসলমানদের আনুগত্য গ্রহণ না করেন। এক পর্যায়ে দাহির তার প্রধান উজির বুদ্ধিমানকে তলব করলেন।

"নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী আজ রাতেই নিরূন ফিরে যাচ্ছে, তাকে সসম্মানে বিদায়ের ব্যবস্থা করো।

রাজার নির্দেশে উজির বুদ্ধিমান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাজা দাহির নিরূন শাসককে তার ভোজন কক্ষে নিয়ে গিয়ে খাবার টেবিলে বসে আলাপ চারিতায় দীর্ঘক্ষণ কাঁটিয়ে দিলো। খাবার সময় রাজা দাহির নিরূন শাসককে এ প্রস্তাবও দিলো সে যদি মুসলমানদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে নিরূনের স্বাধীন শাসক করে দেয়া হবে। কিন্তু সুন্দরশ্রী রাজার এ প্রস্তাব হাসি মুখে ফিরিয়ে দিলেন। ঠিক এ মুহূর্তে উজির বুদ্ধিমান ঘরে প্রবেশ করল।

রাজা দাহিরের দীর্ঘক্ষণ খাবার টেবিলে কালক্ষেপণের লক্ষ্য ছিল, সুন্দরশ্রীকে রাতেই বিদায় করে দিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণের প্রতিশোধের ব্যবস্থা করা। সুন্দরশ্রী রাতেই ফিরে যাওয়ার কথা উত্থাপন করেন নি, কিন্তু রাজা আগ বাড়িয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় করার মধ্যে উজির বুদ্ধিমানের সাথে আগের দিনের চক্রান্ত বাস্তবায়নের ইঙ্গিত ছিল।

"উজির কক্ষে প্রবেশ করেই জানতে চাইলো, সম্মানিত নিরূন শাসক কি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?

"সুন্দরশ্রী জবাব দিলো, হ্যাঁ' বুদ্ধিমান, আমি প্রস্তুত।"

কিছুক্ষণ পর রাজ প্রাসাদ থেকে সুন্দরশ্রী তার মুখ ঢাকা ছয়জন নিরাপত্তা রক্ষীসহ বের হলেন। তাদের আগে রাজার নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল যাচ্ছিল। উজির বুদ্ধিমান অশ্বারোহণ করে নিরূন শাসকের পাশাপাশি যাচ্ছিল। সময়টা ছিল রাতের প্রথম প্রহর। চাঁদনী রাতের চাঁদের জ্যোৎস্না স্নাত শান্ত নিবিড় প্রকৃতি। রাজা দাহির নিরূন শাসককে বিদায় করার জন্য তার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের একটি দলকে পাঠিয়েছিল।

"নীরবে অভিযাত্রী দল এগুচ্ছিল। রাতের নীরবতা ভাঙছিল অশ্বখুরের আওয়াজে। দুর্গ থেকে কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর উজির বুদ্ধিমান নিরূন শাসককে থামতে অনুরোধ করল। সে হাতজোড় করে নিরূন শাসককে প্রণাম করে বিদায় আরজ করল। দাহিরের নিরাপত্তারক্ষীরা ডানে বামে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। নিরূন শাসকের ছয় নিরাপত্তারক্ষী তাদের মাঝ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে অগ্রসর হলো। অতঃপর উজির বুদ্ধিমান নিরাপত্তারক্ষীদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজের ঘোড়া দুর্গের দিকে হাঁকালো। বুদ্ধিমানের পদাঙ্ক অনুস্মরণ করে দাহিরের নিরাপত্তা রক্ষীরা অশ্ব ছুটালো।

দুর্গে প্রবেশ করে প্রথমেই উজির বুদ্ধিমান রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করল।

"তোমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না তো বুদ্ধিমান?" আশঙ্কা মাখা কণ্ঠে বলল রাজা দাহির।

"সকালে ঐ বৌদ্ধ আর তার নিরাপত্তা রক্ষীদের মরদেহ দুর্গে প্রবেশ করবে মহারাজ! আমি নির্বাচিত বিশজন সৈন্যকে পাঠিয়েছি। এরা সেনাবাহিনীর পরীক্ষিত বীর যোদ্ধা। ওরা উটে সওয়ার হয়ে গেছে। কেউ যাতে সেনাবাহিনী হিসেবে সন্দেহ করতে না পারে এজন্য মুসাফিরের বেশে তাদের সাথে কয়েকজন নারীকেও দিয়েছি। বেলা ওঠার আগেই সুন্দরশ্রী কোন জায়গায় অবশ্যই তাঁবু ফেলবে। যেখানেই ওরা তাবু ফেলুক, সেখানে কিছুক্ষণ ঘুমাবে। আর তখন ওদের প্রহরীরাও ঘুমাবে সেটাই হবে ওদের শেষ ঘুম। সেই ঘুম থেকে আর উঠতে পারবে না।"

"এ বৌদ্ধকে জীবিত নিরূন যেতে দেয়া ঠিক হবে না।" বলল রাজা দাহির।

"নিরূন যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না মহারাজ! আপনি নিরূনের জন্যে নতুন করে কাউকে প্রশাসক নিযুক্ত করুন।"

"নিরূনের এখনকার শাসক হবে আমার ছেলে জেসিয়া।

মহারাজ। সুন্দরশ্রীর সাথে যেসব প্রহরী এসেছিল এদেরকে দেখে এ দেশের অধিবাসী বলে মনে হয়নি। ওদের নাক, কপাল, মাথা, চেহারা সবই ঢাকা ছিল। শুধু চোখগুলো দেখা গেছে। সুন্দরশ্রীকে নিয়ে আপনি যখন বৈঠক করছিলেন তখন ওরা সারা দুর্গ জুড়ে পায়চারি করেছে আর ফিসফিস করে পরস্পর কথা বলতে দেখা গেছে। ওদের হাভভাবও আমার কাছে ভিন্ন রকম মনে হয়েছে। আমি ওদের ঘোড়ার জিনগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি এগুলো এদেশের তৈরী নয়।

"হ্যাঁ, এজন্যইতো ওরা চেহারা ঢেকে রেখেছিল।" বলল দাহির। তার মানে এরা আরব? তাহলে ও বৌদ্ধ এরই মধ্যে আরবদের সাথে দোস্তি করে ফেলেছে এবং নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে আরব লোক নিয়োগ করেছে।"

"যাই হোক। আজ রাত শেষে সেও আর থাকবে না, তার প্রহরীদেরও কোন পাত্তা থাকবে না।" বলল উজির বুদ্ধিমান।

"উজির বুদ্ধিমান যখন রাজা দাহিরের সাথে সুন্দরশ্রীর জীবনাবসান নিয়ে কথা বলছে সুন্দরশ্রী তখন তার ছয় আরব প্রহরীকে নিয়ে নিরূনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নিরূন থেকে উরুঢ় যাতায়াতের জন্য মরুবিজন পথে একটি

পায়ে হাটার রাস্তা তৈরী হয়েছিল। এ পথেই সামরিক বাহিনীর লোকেরা যাতায়াত করত। পথিমধ্যে একটি জায়গা ছিল সবুজ শ্যামল। ওখানে পানির উৎস ছিল।

সুন্দরশ্রীর ছয় প্রহরীর সবাই ছিল আরব। তন্মধ্যে একজন ছিল হারেস আলাফীর নিজস্ব লোক। সে এখানকার পথঘাট জায়গা ও ভাষা জানতো। আর অন্য পাঁচজন ছিল মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী একদিন মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে একদূত মারফত খবর পাঠিয়েছিল, রাজা দাহিরের পক্ষ থেকে সে জীবননাশের আশঙ্কা করছে। তাই তার জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি উদ্বিগ্ন। এদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। সেই সাথে তার শহরের অধিবাসীদের জীবন সম্পদের নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

সুন্দরশ্রীর চাহিদা পূর্ণ করা তখনো মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ এক সাথে তার সকল সৈন্যকে নিরূন নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাকে ধীরে ধীরে চতুর্দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সামনে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর সেনা বাহিনীর বার জন চৌকস গোয়েন্দাকে হারেস আলাফীর দেয়া পথ প্রদর্শকের সাথে নিরূন পাঠিয়ে দিলেন। এদের পাঠানোর আগে তিনি এ ব্যাপারে আলাফীর সাথে অতি সঙ্গোপনে পরামর্শ করে নিলেন।

আলাফী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বললেন, নিরূনে আপনার গোয়েন্দার অবস্থান খুব জরুরী। আপনি কয়েকজন লোক দিন তাদের সাথে আমিও একজনকে দিচ্ছি। সে নিরূন শাসককে বলবে, তিনি যেন এদের সবাইকে নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে নিয়োগ দেন। যেহেতু সুন্দরশ্রীর সাথে শান্তিচুক্তি হয়ে গেছে, সে চুক্তি মেনে চলবে। আপনার ও আমার লোকেরা শহরের লোকদের গতিবিধি যেমন পর্যবেক্ষণ করবে তারা সুন্দরশ্রীকেও পর্যবেক্ষণ করবে, সে চুক্তিপত্র করে আমাদের সাথে কোন ধোকাবাজী করছে কিনা।

এই উসিলায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের চার গোয়েন্দা সুন্দরশ্রীর একান্ত নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে নিয়োগ লাভ করে। এদের পাঠানোর আগে বিন কাসিমের গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী তাদের বিশেষভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

উরুঢ়ের রাজার পক্ষ থকে যখন সুন্দরশ্রীকে রাজধানীতে তলব করা হলো, তখনই সুন্দরশ্রী বুঝতে পেরেছিলেন, সেখানে কি ঘটতে পারে। কিন্তু রাজা দাহিরকে তখন তিনি মোটেও ভয় করেননি। তিনি ছিলেন যেমন বাস্তবদর্শী তেমনই সাহসী। তিনি তার সাবেক নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে নিয়েই উরুঢ় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু আলাফীর লোক তাকে বোঝালেন এরা সবাই হিন্দু। রাজা দাহিরের সাথে বিরোধ প্রশ্নে হিন্দু বিধায় ওরা দাহিরের পক্ষাবলম্বন করবে। তাই ওদের বাদ দিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে চলুন। আরব গোয়েন্দারাই তাকে বুঝিয়েছিল, তারা চেহারা ঢেকে যাবে, যাতে তাদেরকে দেখে কেউ আরব হিসাবে চিনতে না পারে। এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পাঠানো গোয়েন্দাদেরকে সুন্দরশ্রী নিরাপত্তা বাহিনীতে নিযুক্ত করে তার সভাসদ ও প্রজাদের কাছে প্রচার করেছিলেন, এরা সবাই মাকরানে বসবাসকারী আমাদের সহযোগী মুসলমান।

সেই রাত পেরিয়ে ভোরের আলো দেখা দিলো কিন্তু নিরূন শাসকের ছোট্ট কাফেলা কোথাও একদণ্ড যাত্রা বিরতি করল না। মরুভূমিতে সূর্য উঠে চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে দিয়ে বেলা বাড়তে লাগল, কিন্তু সুন্দরশ্রীর কাফেলা বিরতিহীন ভাবে অগ্রসর হতেই লাগল। এদিকে সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগেই রাজা প্রহরীদের জিজ্ঞেস করল উজির বুদ্ধিমান এসেছে কি? প্রহরীরা তাকে জবাব দিলো, না মহারাজ! উজির আসেননি!

“যখনই আসবে ভিতরে পাঠিয়ে দেবে” বেলা প্রায় মাথার ওপরে উঠে গেলেও বুদ্ধিমানের দেখা না পেয়ে রাজা দাহির আবারও জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার! বুদ্ধিমান এখনো আসেনি? তখন সে প্রহরীদের নির্দেশ দিলো তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রহরীরা উজিরের বাড়ীতে গিয়ে তাকে পেলো না। এদিক সেদিক খোঁজা খোঁজির পর দুর্গপ্রাচীরের ওপরে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলো প্রহরীরা।

উজির বুদ্ধিমান দুর্গপ্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে নিরূনের পথের দিকে তার পাঠানো সেনাদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। বেলা ওপরে উঠে যাওয়ায় মাঠের ধু ধু বালিকারাশি চমকাচ্ছিল, দূর দরাজ পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছিল তাতে বুদ্ধিমানের পাঠানো লোকদের দেখা যাচ্ছিল না। সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পাঠানো উষ্ট্রারোহীর আগমন প্রতীক্ষা করছিল, কারণ এতক্ষণে তাদের ফিরে আসার কথা কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোন উষ্ট্রারোহীকেই এ পথে দেখতে পেলনা বুদ্ধিমান।

তাকে প্রহরীরা খবর দিলো, আপনাকে মহারাজ তলব করেছেন। আমরা আপনার খোঁজে দুর্গময় খোঁজ করেছি।

"হতাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে উজির বুদ্ধিমান দুর্গপ্রাচীর থেকে নেমে রাজার সকাশে হাজির হলো।

"তুমি তো বুঝতেই পারছ, কিসের জন্য আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বুদ্ধিমান"

"আমিও আপনার খবরের জন্যই দুর্গপ্রাচীরে অপেক্ষা করছিলাম মহারাজ! আমি তাদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মনে হয় ওরা অনেক দূরে চলে গেছে। মনে হয় রাতে সুন্দরশ্রী কোথাও থামেনি। রাতে না থামলেও দিনের বেলায় কোথাও না কোথাও সে অবশ্যই থামবে। দিনের বেলায় কোথাও তাবু ফেলে যদি ওর প্রহরীরা শুয়ে পড়ে তখনই ওদের খতম করে ফেলবে আমার সৈন্যরা। আজ রাত না থামলেও আগামী রাতে তো অবশ্যই সে কোথাও না কোথাও তাঁবু ফেলবে। তখনই তার জীবনাবসান করে দেবে আমার লোকেরা। আশা করি আজ রাতে না হলেও আগামী দিনের বেলায় ওরা ফিরে আসবে মহারাজ!

সেই দিন চলে গেল, রাত পেরিয়ে পরে দিনের বেলাও ওপরে উঠে গেল, বুদ্ধিমান আগের দিনের মতো সেদিনও দুর্গপ্রাচীরে গিয়ে তার পাঠানো সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু কোন উষ্ট্রারোহীর কাফেলা এদিকে আসতে দেখতে পেলো না বুদ্ধিমান। উজির বুদ্ধিমানের চেয়ে রাজা দাহির ছিল আরো বেশি পেরেশান। তৃতীয় দিনও পেরিয়ে গেল। চতুর্থ দিন বুদ্ধিমানের পাঠানো লোকেরা ফিরে এলো। বুদ্ধিমানের পাঠানো সেনাদলের কমান্ডার নতশীরে বুদ্ধিমানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মিশন সফল হয়নি মাননীয় উজির"।

"কেন সফল হয়নি" গর্জে উঠলো উজির। তোমরা কি এই সুন্দরীদের নিয়ে যেতে উঠেছিলে? যাদেরকে তোমাদের সাথে পাঠিয়েছিলাম?"

না মাননীয় উজির। আমরা কোথাও একদণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস নেইনি। আমরাতো একেবারে নিরূনের কাছ থেকে ফিরে এসেছি। কিন্তু পথের কোথাও আমরা ওদের দেখা-ই পাইনি। মনে হয় তারা রাস্তা বদল করে অন্য কোন পথে চলে গেছে।

"ব্যর্থতার খবর শুনে উজির বুদ্ধিমানের জিহ্বা শুকিয়ে এলো। সে শুষ্ক কণ্ঠে রাজাকে জানালো, শিকার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে মহারাজ!

"শিকার যায়নি বলতে পারো নিরূন হাত ছাড়া হয়ে গেছে" উজিরের উদ্দেশে বলল রাজা দাহির।

"ঠিক আছে। এখন অন্য কিছু ভাবো। যা হয়ে গেছে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা আর অনুশোচনা করে সময় নষ্ট করো না।"

"তাই ভাবছি মহারাজ! বৌদ্ধটা গেল কোন পথে? তাহলে কি ওর মনে কোন আশঙ্কা ছিল?

"সাপ পালিয়ে গেছে। সাপকে বধ করতে না পেরে ওর গমণপথের চিহ্ন দেখে দেখে আফসোস করার মধ্যে মঙ্গল নেই। এখন চিন্তা করো নিরূনের লোকদেরকে কিভাবে ওর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। ওখানকার মানুষ এখন শান্তিবাদী হয়ে গেছে। সবাই শান্তি চায়। বুঝতে পারিনা, সুন্দরশ্রী নিরূনের অধিবাসীদের মধ্যে কি মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। ওখানকার সব অধিবাসীই কাপুরুষ হয়ে গেছে। ওরা সবাই একবাক্যে ওর কথাই শোনে, ওরই আনুগত্য করে।" বলল রাজা দাহির।

"সুন্দরশ্রীর আনুগত্য দূর করতে একটা কিছু করতেই হবে মহারাজ!"

আর কবে করবে? আমারতো মনে হয় তোমার বুদ্ধিজ্ঞান এখন লোপ পেয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি যদি সুন্দশ্রীকে শাসকের পদ থেকে বরখাস্ত করি তাহলে সেখানে অগ্নোৎপাৎ শুরু হবে। আমি তাকে নিজের ঘরের মধ্যেই খুন করাবো। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তাকে ছলেবলে রাজধানীতে নিয়ে আসবো। যদি সে নিরূন ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে সেনাভিযান করব।"

"আপনাকে কিছুই করতে হবে না মহারাজ! বলল উজির। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে নয়। শত্রু বাহিনী ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় আপনার সামান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও বিক্ষুব্ধদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। এখন যে কোন পদক্ষেপ আমাদেরকে ভেবে চিন্তে নিতে হবে। মহারাজ! নিরূনের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমরাই দায়ী। আমরা বৌদ্ধদের উপাসনালয়গুলো গুড়িয়ে দিয়েছি। তাদের ওপর নানা জুলুম চালিয়েছি। তদুপরি মহারাজ এক বৌদ্ধকেই সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেছেন। শুধু সুন্দরশ্রীইতো নয়, বহু বৌদ্ধকে মহারাজ উচু ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছেন। বহু শহরের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক। সবাই যদি সুন্দরশ্রীর মতো পর্দার আড়ালে মুসলমানদের সাথে আঁতাত করে ফেলে তাহলে পরিস্থিতি সামলানো আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

এতবেশি চিন্তার দরকার নেই। তুমি নিরূনের কথা বলো। আমি ভাবছি, আরব সৈন্যরা যদি ডাবেল থেকে আরো সামনে অগ্রসর হয়, তাহলে তারা নিরূন (হায়দারাবাদ) কেই তাদের সেনা ছাউনিতে পরিণত করবে।

রাজার কথায় গভীর চিন্তায় পড়ে গেল উজীর বুদ্ধিমান। রাজা দাহির এক নাগাড়ে কথা বলেই যাচ্ছিল কিন্তু উজিরের কানে সেসব কথা প্রবেশ করছে বলে মনে হচ্ছিল না। সে কিভাবে হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া নিরূনকে কজা করা যায় সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল।

রাজা দাহির আর উজির বুদ্ধিমান যখন নিরূনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তামগ্ন, সে সময় নিরূন শাসক নিরাপদে তার অনুগত প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় নিরূনের রাজাসনে উপবিষ্ট। নিরাপদে তিনি মৃত্যু এড়িয়ে হায়দারাবাদ পৌঁছতে পেরেছিলেন মুসলমান রক্ষীদের বুদ্ধিমত্তায়।

রাজা দাহিরের উজীর বুদ্ধিমান তার সৈন্যদের নিয়ে নিরূন শাসককে বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে সামরিক কায়দায় তরবারী নীচু করে তাকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নেয়। এরপর কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নিরূন শাসকের ছয় নিরাপত্তা রক্ষীর কমান্ডার সবাইকে থামিয়ে দেয়। তার নাম ছিল ইবনে ইয়াসির। সে ছিল গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর একান্ত লোক।

ইবনে ইয়াসির মাকরানবাসী নিরাপত্তা রক্ষীর মাধ্যমে সুন্দরশ্রীর কাছে জানতে চাইলো, "সম্মানিত নিরূন শাসক! রাজা কি প্রায়ই এভাবে আপনাকে ডেকে পাঠায়? আপনি কি প্রায়ই রাজধানীতে আসেন?"

"মাঝে মধ্যে রাজা ডেকে পাঠায়, আবার কখনো কখনো গভর্নররা নিজ থেকেও রাজার সাথে দেখা করতে আসেন।"

"কখনো কি এমন হয়েছে যে, আপনি সন্ধ্যায় এখানে এসেছেন আর রাতেই আপনাকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে?"

"না, এমনটি আর কখনো হয়নি।" বললেন সুন্দরশ্রী। এই প্রথম আমার সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে। সাধারণত যেসব গভর্নর এখানে আসে, তাদেরকে দুই তিন দিন রাজ প্রাসাদে রেখে খুব খাতির যত্ন করা হয়।

"আপনি কি রাতেই ফিরে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন?"

"না, রাজা নিজেই তার উজিরকে ডেকে বললেন, সুন্দরশ্রী রাতেই ফিরে যাবে, তার ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক।"

"প্রতিবারই কি আপনাকে এমন সামরিক সম্মানের সাথে বিদায় জানানো হতো?"

"না, এমনটি আর কখনো করা হয়নি।" কিছুটা বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিলেন নিরূন শাসক। আমি নিজেও কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। আজ আমাকে এতোটা সম্মান করা হচ্ছে কেন? আমি মনে করেছি রাজা আমাকে তোমাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উদ্দেশ্য অর্জনে হয়তো রাজা আমার মন জয় করার জন্য একটু বেশী সম্মান দেখাচ্ছেন।"

"তার অনুরোধে আপনি কি বলেছেন?"

"আমি রাজাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, মুসলমানদের সাথে আমি যে মৈত্রী চুক্তি করেছি, তা থেকে আমি বিচ্যুত হবো না। আমি তাকে একথাও বলে এসেছি, আমি আমার শহরের নাগরিকদের বিবি বাচ্চার, জীবন সম্পদ আর মান-সম্মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি।"

"তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এপথ ত্যাগ করে অন্য পথে নিরূন ফিরতে হবে।"

"কেন! রাস্তা বদল করতে হবে কেন?" জিজ্ঞেস করলেন নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী।

"রাতে কোন না কোন জায়গায় আপনার ওপর হামলা করা হবে। আপনাকে কোন অবস্থাতেই নিরূন ফিরে যেতে দেয়া হবে না।"

"আমারতো মনে হয় রাজা দাহির এসময় এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না।" এটা হয়তো তোমার একটা আশঙ্কা মাত্র।" বললেন নিরূন শাসক।"

"সম্মানিত শাসক! আমরা আপনাদের দেশের ধোকা প্রতারণার বহু কাহিনী শোনেছি। কিন্তু আপনি আরবদের দূরদর্শিতা, তীক্ষ্ণধী ও প্রচার কাহিনী তেমন শুনেনি। আপনি যখন রাজ মহলে রাজার সাথে বৈঠক করছিলেন, তখন আমরা দুর্গময় চষে বেড়িয়েছি। আমি শাহি খান্দানের এক ব্যক্তিকে দেখেছি খুবই ব্যস্ততার সাথে দৌড়াদৌড়ি করতে। পরে জানতে পারি এই লোকটিই রাজার উজির বুদ্ধিমান। আমি দেখেছি আপনি রওয়ানা হওয়ার কয়েকঘন্টা আগে তিনি উষ্ট্রারোহী একটি কাফেলাকে দুর্গফটক পর্যন্ত এগিয়ে এসে বিদায় দিয়েছেন, সেই কাফেলায় কয়েকজন মহিলাও ছিল। আমি দেখেছি, উজির কাফেলার লোকদের অনেকক্ষণ কি যেন বলেছে এবং কাফেলার একজনকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে একাকীত্বে অনেক কথা বলেছে। উষ্ট্রারোহী কাফেলা যখন দুর্গফটক পেরিয়ে গেল উজিরও তাদের সাথে বেরিয়ে গেল। আমি তখন দুর্গফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাফেলার যাত্রা ভঙ্গিটাই দেখে মনে হচ্ছিলো এই কাফেলা কোন সাধারণ

কাফেলা নয়। এজন্য আমি এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম উজির দুর্গে ফিরে এসে রাজার বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্রিফিং দিচ্ছে এবং তাদেরকে প্রস্তুত করছে। এই নিরাপত্তারক্ষীরাই পরবর্তীতে আপনাকে বিদায়ী সম্মান জানিয়েছে। এতে আমার সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে যে, যে উষ্ট্রারোহী কাফেলা আগে বিদায় করা হয়েছে, সেই কাফেলা সাধারণ কোন মুসাফির কাফেলা নয়, অবশ্যই তারা সেনাবাহিনীর লোক এবং রাতের কোন না কোন প্রহরে তারা আমাদের ওপর আঘাত হানতে পারে!

"তোমার ধারণা অমূলক নয়।" বললেন সুন্দরশ্রী। আমাকে কোন না কোনদিন খুন করা হবে তা প্রায় নিশ্চিত। ঠিক আছে তুমি রাস্তা বদল করে নিতে পারো।"

"আমরাতো এখানকার পথঘাট ঠিকমতো চিনি না, কোন পথে গেলে আমরা নিরাপদে নিরূন পৌছাতে পারব, তা আপনিই ভালো বলতে পারবেন।" বললেন ইবনে ইয়াসির।

"বিকল্প পথ অবশ্য একটা আছে কিন্তু পথটা খুবই জটিল এবং কন্টকাকীর্ণ। টিলা, জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ে ভরা। এমন হতে পারে যে, আমরা ঘুরে ফিরে একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি।"

হোক না ঝুকিপূর্ণ, আপনি সে পথেই চলুন।

"শা'বান ছাকাফীর পরীক্ষিত গোয়েন্দা ইবনে ইয়াসির ছিল এ ধরনের জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ পথেও লক্ষ ও সুনির্দিষ্ট দিক নির্ণয়ে পারদর্শী। সে নতুন অজানা পথেই সুন্দরশ্রীকে নিরূন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

এর কিছু দিন পরের ঘটনা। হঠাৎ এক রাতে নিরূনবাসী এক তরুণীর বিকট আর্তচিৎকার শুনতে পেল। নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে কয়েকজন লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, কিন্তু তাদের পক্ষে ঠাহর করা সম্ভব হচ্ছিল না কোত্থেকে আসছে এই আর্তচিৎকার। লোকজন নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে এদিক ওদিক দৌড়াতে লাগল, কোত্থেকে চিৎকারটা আসছে তাকে দেখার জন্য। এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ এলো ওপরের দিকে তাকাও। লোকজন যখন ওপরের দিকে তাকালো তখন দেখতে পেল, বাতাসের মতো একটা আগুনের শিখা শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার বয়ে গেছে। আগুনের শিখার ঘূর্ণনে শহরের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। অধিকাংশ লোক ঘরের দরজা বন্ধ করে ভয়ে আতঙ্কে জড়সড় হয়ে থাকল, আর কিছু লোক ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে শহরের বাইরে পালাতে লাগল।

শোরগোলের আওয়াজে গভর্নর সুন্দরশ্রীও ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি নিজ চোখে আকাশে আগুন শিখার ঘুর্ণন দেখতে পেলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন শাসক এবং শহরের লোকদের নিরাপত্তা দানের কাজটি তিনি নিজের কর্তব্য মনে করতেন, তাই তিনি ভয়ে ঘরের ভিতরে না গিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়লেন এবং আকাশে ঘুর্ণমান আগুন প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। আগুনের একটি শিখা শহরের আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল, আর আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। পরিস্থিতি এমন হয়ে পড়েছিল যে, ভীত সন্ত্রস্ত লোকজন বিষয়টাকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, যে যেদিকে পারলো ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। আকাশে আগুন শিখার ঘুর্ণনের সাথে সাথে শহরের মন্দির ঘরগুলোতে বিপজ্জনক ঘন্টা অবিরাম বাঁজতে লাগল। সেই সাথে মন্দিরের পুরোহিতরা বিশেষ শিঙ্গা বাজাতে শুরু করল। মন্দিরের ঘন্টা আর পুরোহিতদের শিঙ্গার বেসুরো আওয়াজ আর আকাশের আর্তনাদ মিলে সত্যিকার অর্থেই রাতের নিস্তব্ধ শহরে একটা ভূতুড়ে পরিস্থিতির জন্ম দিল। সারা শহর কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়।

এই ভয়ানক পরিস্থিতি কয়েক ঘন্টা অব্যাহত থাকল। হিন্দু অধিবাসীরা তাদের ঘরে ঘরে পূঁজা অর্চনায় লেগে গেল, বৌদ্ধরা তাদের মতো করে ঘরে ঘরে উপাসনায় লিপ্ত হয়ে গেল। সুন্দরশ্রী পরিস্থিতি অবলোকন করে তার প্রাসাদের দিকে ফিরে এলেন। তিনি প্রাসাদের কাছে এসে দেখতে পেলেন, তার আরব নিরাপত্তারক্ষীরা প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে অবস্থা অবলোকন করছে।

নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশ্যে সুন্দরশ্রী বললেন, "বন্ধুরা! উপস্থিত দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধরা পূজা অর্চনা ও উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে, তোমরা এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের ইবাদতে লেগে যাও।

বুঝতে পারছি না, কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে! ভয় হচ্ছে, যেসব আগুনের কুণ্ডলী আকাশে দেখেছি, এসবের একটিও যদি জমিনে নেমে আসে, তাহলে সারা শহরে আগুন লেগে যাবে।"

"সম্মানিত শাসক! আমাদের প্রভু আমাদেরকে এ ধরনের বিপদ দিয়ে কখনো আতঙ্কিত করেন না।" বলল এক আরব নিরাপত্তারক্ষী।

"আরে! তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, এই বিপদ আসমান থেকে আসছে?"

"সম্মানিত গভর্নর। আপনি ভিতরে চলে যান। বিপদ না ছাই আমরা দেখছি।" বলল ইবনে ইয়াসীর।

সুন্দরশ্রী ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই তরুণীর আর্তচিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। সেই সাথে আকাশে অগ্নিকুণ্ডের দাপাদাপিও বন্ধ হয়ে গেল। কিছু লোক রাতেই শহরের প্রধান মন্দিরে চলে গেল। যারা রাতে যেতে পারল না তারা ভোরেই প্রধান মন্দিরে গিয়ে জড় হতে লাগল। শহরের প্রধান মন্দিরটি ছিল বিশাল জায়গা জুড়ে আর অপেক্ষাকৃত উচু জায়গায়। মন্দিরটির চারপাশে ছিল খোলা আঙ্গিনা। টিলার মতো উঁচু মন্দিরে উঠতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সকাল বেলায় মন্দিরে এতো লোক জমায়েত হলো যে মন্দিরের ভিতরে বাইরে মন্দিরের আঙ্গিনায় ও সিঁড়ির কোথাও তিলধারনের জায়গা খালি ছিল না। ছেলে বুড়ো নারী শিশু সব বয়সের মানুষে লোকে লোকারণ্য মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিরের ভিতরে পুরোহিতরা মূর্তির সামনে হাত জোড় করে আর্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করছে। আর মন্দিরের বাইরে সমবেত লোকজনও পুরোহিতদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে করজোড়ে দেবদেবীদের কাছে মিনতি করছে।

প্রার্থনা শেষে মন্দির আঙ্গিনায় সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে প্রধান পুরোহিত বলল, "হে লোকসকল! এই শহরের ওপর কঠিন মুসিবত নেমে আসতে পারে। মনে হচ্ছে, এই শহরে এমন কোন মানুষ এসেছে, যাদের উপস্থিতি আমাদের দেবদেবী পছন্দ করেন না। দৃশ্যত মুসিবত সমুদ্রের দিক থেকে আসছে। এই শত্রুদের মোকাবেলার জন্য তৈরী হয়ে যাও। তোমরা যদি এই ম্লেচ্ছাদের জন্য শহরের দরজা বিনা প্রতিরোধে খুলে দাও, তাহলে দেবতা এই শহর আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবেন।"

প্রধান পুরোহিতের সতর্কবাণী শুনে ভীত বিহ্বল অবস্থায় লোকজন বাড়ী ঘরে ফিরে এলো। সারা দিন শহরময় রাতের ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডলী নিয়েই সবাই পরস্পর আলাপ আলোচনা করল! আর ভয় আতঙ্ক সারা শহরবাসীকে আরো ভীত সন্ত্রস্থ করে তুলল।

পরদিন মধ্যরাতে ঠিক পূর্বরাতের মতোই এক তরুণীর আর্তনাদ শোনা গেল। আজকের আর্তনাদ ছিল গতরাতের চেয়েও আরো ভয়ার্ত। সেই সাথে আগুনের কুণ্ডলী সারা শহরের ওপর চক্কর দিতে লাগল। লোকজন ভয়ে আতঙ্কে নিজ নিজ ঘরে জড়সড় হয়ে বসে রইল আর মন্দিরগুলোতে বিশেষ ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনী বাজতে শুরু করল।

রাতটা কোনমতে ভয় আতঙ্কের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ার পর সকাল হতেই লোকজন শহরের প্রধান মন্দিরে ভীড় জমালো। বিপুল হিন্দু জনগোষ্ঠির মধ্যে যেসব লোক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল তারা বৌদ্ধ মঠে

জমায়েত হলো। সারা শহরজুড়ে একটা কথা চাওর হয়ে গেল যে, অবশ্যই এই শহরে এমন কোন অভিশপ্ত লোক এসেছে, যাদের উপস্থিতির কারণে এই মুসিবত নেমে আসছে। সেই সাথে একথাও আলোচিত হতে লাগল যে, গভর্নর সুন্দরশ্রী মুসলমানদের সাথে যে অহিংস নীতি অবলম্বন করেছে তা ঠিক নয়। এজন্যই দেবতা শহরবাসীকে সতর্ক করছেন।

এর পরদিন দিনের বেলায় লোকজন যখন কাজ-কামে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় হঠাৎ রাতের তরুণীর আর্তনাদ ভেসে এলো। শহরের মাঝখানে কিছুটা জায়গা ছিল খালি, জনশুন্য এবং বসতিহীন। সেই পরিত্যক্ত জনবসতিহীন জায়গা থেকে আগুনের কুণ্ডলী উঠে আকাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মানুষ ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে যে যেভাবে পারল কাজকর্ম ছেড়ে নিজেদের ঘরবাড়িতে পালাতে লাগল। শহরের পরিস্থিতি এতোটাই ভয়ানক হয়ে উঠল যে, মা তার কোলের সন্তানের খেয়াল করার অবকাশ পেল না। কেউ একবার এতটুকু ভাবার চিন্তা করেনি যে, এই আর্তনাদ কোত্থেকে আসছে আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ কোত্থেকে আসছে?

দিনটি এভাবে শেষ হলে রাতের বেলায় যখন সারা শহরের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ঠিক অর্ধরাতে আবার শুরু হলো সেই অজানা তরুণীর আর্তনাদ। রাতের চিৎকার অনেকের কাছে মনে হলো কোন একজন চিৎকার করছে আর আর্তনাদকারিণী বাতাসে উড়ছে। অন্য রাতের মতো আকাশে সেই আগুনের কুণ্ডলীও ভেসে বেড়াতে লাগল কিন্তু এ রাতে জমিনের কয়েক জায়গা থেকেও আকাশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উঠতে দেখা গেল।

অন্যান্য রাতের মতোই কয়েক ঘন্টা চলল এমন অগ্নোৎপাত আর চিৎকারের তাণ্ডব। রাত পোহালে সকাল বেলায় বড় মন্দিরের প্রধান দুই পুরোহিত নিরূন শাসক সুন্দরশ্রীর সাথে সাক্ষাত করতে এলো।

প্রধান পুরোহিত নিরূন শাসক সুন্দরশ্রীকে বলল, "মহারাজ! গত তিনরাত ধরে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারিনি। পরিস্থিতি জানার জন্য আমরা দু'জন অভিজ্ঞ জ্যোতিষীকে ডেকে এনেছিলাম, তারা হিসাব কিতাব করে দেখেছে, আমরাও ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, এসব হচ্ছে আমাদের দেবদেবীদের সতর্ক সংকেত। তার মর্মার্থ হলো, আমরা যেনো নিজেদের ধর্ম-কর্ম, মান-সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিই। আমরা এই গায়েবী ইঙ্গিতও পেয়েছি যে, এই শহরের জমিনে হাজারো মহামনীষী ও ঋষি সাধু মহাত্মার দেহাবশেষ মিশে রয়েছে। আমরা শুনেছি,

আপনি নাকি এই শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভিনধর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। জানি না, আপনার ধর্ম কি বলে, তবে আমরা যতোটুকু জানি, আপনার ধর্মও এই শহরের নিরাপত্তার দ্বায়িত্ব পর ধর্মের কারো হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করবে না।

যে ধর্ম আমাদের ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী তাদের হাতে এই শহর তোলে দেয়া কোন মতেই সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। জ্যোতিষী ও গণকরা বলছেন, শাসক সুন্দরশ্রী যদি এই শহরের নিয়ন্ত্রণ বিধর্মীদের হাতে তুলে দেয় তাহলে এই শহরের পতন অবশ্যম্ভাবী। এই শহরকে কেউ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। মহারাজ! ইতোমধ্যে বহু লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে এবং আরো কিছু সংখ্যক লোক শহর ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"হ্যাঁ, আমাকে ভাবতে দাও পণ্ডিত, আমাকে চিন্তা-ভাবনা করতে দাও।"। বললেন সুন্দরশ্রী।

"পুরোহিতদ্বয় চলে যাওয়ার পর সুন্দরশ্রী ইবনে ইয়াসীরকে ডেকে বললেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মন্দিরের প্রধান দুই পণ্ডিত তাকে কি বলে গেছে এবং এ ব্যাপারে তিনি কি ভাবছেন।"

"আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, তোমরা সবাই এখান থেকে চলে যাও, তাহলে তোমরা এ ব্যাপারে কি বলবে?" কারণ আমার কাছে শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড়। আমি এই শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই তোমাদের সেনাপতির কাছে আত্মসমপর্নের প্রস্তাব করেছিলাম। তাছাড়া আমার ধর্মও খুনোখুনি, যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করে না। কিন্তু যে মুসিবত এখন আমার মাথার ওপর পড়েছে, তাতে আমি কি-ইবা করতে পারি?"

"বেশি নয় মাত্র তিনটা দিন আমাদের সময় দিন সম্মানিত গভর্নর!" বলল ইবনে ইয়াসির। আমার বিশ্বাস এই মুসিবতকে আমরাই দূরীভূত করতে পারব।

"তোমরা দূর করবে এই মুসিবত?" বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন সুন্দরশ্রী। যে শক্তিকে দেখা যায় না, অদৃশ্য শক্তিকে তোমরা কিভাবে মোকাবেলা করবে?"

"মাত্র তিনটি দিন আমরা আপনার কাছে সময় চাচ্ছি সম্মানিত গভর্নর। তিনদিনের মধ্যেই আশা করি আমরা আপনাকে তা করেই দেখিয়ে দেবো।"

বিন কাসিমের গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর অন্যতম সহযোদ্ধা অভিজ্ঞ গোয়েন্দা ইবনে ইয়াসিরের ওপর দায়িত্ব ছিল সে যেন সুন্দরশ্রী ও

বিন কাসিমের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পানাহার সামগ্রী সাথে নিয়ে ইবনে ইয়াসির বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলায় অবস্থান করে ডাভেলের দিকে অগ্রাভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন।

নিরূন থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের অবস্থান আরমান ভিলার দূরত্ব একশ মাইল। ইবনে ইয়াসিরের হাতে সময় মাত্র তিন দিন। সে গুরু শা'বান ছাকাফীকে নিরূনের অবস্থা জানিয়ে তার দিক নির্দেশনার প্রয়োজন বোধ করল। ইবনে ইয়াসির কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না নিরূনের ওপর দেবতাদের অভিশাপ পড়েছে। কারণ মুসলমানরা দেবদেবীর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না। তারা জানে দেবদেবীদের ওপর বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবাস্তব ভিত্তিহীন এবং মানুষের মনগড়া ধারণা মাত্র।

দিনের দ্বিপ্রহরের একটু আগে নিরূন থেকে রওয়ানা করে অর্ধরাতের কিছুক্ষণ পরেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল ইয়াসির। কারণ তার গন্তব্য তার দিকেই এগিয়ে আসছিল। সেই রাতের শেষ প্রহরেই ডাভেলের দিকে অগ্রাভিযান করার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিন কাসিম।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সব কিছু না বুঝে কোন পদক্ষেপ নিতেন না। তিনি ছদ্মবেশে কিছু সৈনিক আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যারা ভিনদেশী এই এলাকার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে প্রতিনিয়ত তাকে খবর দিতো, সেই মোতাবেক তিনি সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন। কারণ ইতিমধ্যে দুই'টি দুর্গ তিনি দখল করে নিয়েছিলেন। ডাভেল ছিল তাঁর তৃতীয় টার্গেট। তাই প্রতিপক্ষ তাঁদের আগমন অপেক্ষা নির্বিকার দুর্গে বসে থাকবে এমনটি ভাবার কোনই অবকাশ ছিল না। বরং সম্ভাবনা ছিল শত্রু বাহিনী পথে পথে ওৎপেতে থাকবে এবং রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা চালাবে।

এই আশঙ্কা মাথায় রেখে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কিছু সৈন্য রাতের প্রথম প্রহরেই ডাভেলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এলাকাটি যেহেতু সামরিক দিক থেকে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল এজন্য অগ্রগামী দলের সাথে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী নিজেই গিয়েছিলেন। আরমান ভিলা থেকে কয়েক মাইল অগ্রসর হলেই তাদের কানে ভেসে এলো অশ্বখুরের আওয়াজ। শা'বান ছাকাফী তার সাথীদেরকে রাস্তা থেকে নামিয়ে বসিয়ে দিলেন এবং আগন্তুকের আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আগন্তুকের ঘোড়া দ্রুত বেগে ছুটছিল। শা'বান ছাকাফী রাস্তায় এসে ধাবমান ঘোড়ার মুখোমুখি হয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তার সহযোদ্ধারা এসে আগন্তুককে ঘিরে ফেলল।

"কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ? দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন শা'বান ছাকাফী।

"আমি ইবনে ইয়াসির। এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে বলল আগন্তুক। আমি আপনার আওয়াজ চিনতে পেরেছি। কেমন আছেন আপনি? বাকী সাথীরা কেমন আছে? সার্বিক অবস্থা কেমন?

ফজরের সাথে সাথেই সেনাবাহিনী ডাভেল অভিযান শুরু করবে। তুমি কি বুঝতে পারছো আমরা কেন এগিয়ে এসেছি?"

অগ্রগামী দল হিসাবে আমরা চলে এসেছি। তুমি এতোদূর কি করে এলে? বিশেষ কোন খবর আছে নাকি? ইবনে ইয়াসিরকে জিজ্ঞেস করলেন শা'বান।

ইবনে ইয়াসির গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে নিরূনের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালো এবং নিরূন শাসকের উরুঢ় গমণ, সেখানে রাজার সাথে তার কথোপকথন ও রাজার প্রস্তাব সুন্দরশ্রীর প্রত্যাখ্যানের কথা সবিস্তারে জানালো। সবশেষে বলল, এ মুহূর্তে আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরূনের আকাশে ঘূর্ণমান আগুনের কুণ্ডলী আর অজানা নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। আমরা বুঝতে পারছি না, এই আগুন কি হতে পারে? এ ক্ষেত্রে আমাদেরই বা করণীয় কি? আগামী দু'দিনের মধ্যে যদি আমরা এ ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা না নিতে পারি, তাহলে নিরূন আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

"এসো ইবনে ইয়াসির" গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী ইবনে ইয়াসিরকে রাস্তা থেকে নামিয়ে সুবিধামতো একটি জায়গায় বসিয়ে বললেন—

"এই আগুনের রহস্য তোমাকে বলে দিচ্ছি।" আগুনের অন্তরালে কি কারসাজী রয়েছে এবং সাথীদের নিয়ে তোমাকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে, গোয়েন্দা প্রধান পরিষ্কার ভাবে সবকিছু ইবনে ইয়াসিরকে বুঝিয়ে দিলেন।

"আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে সম্মানিত অধিপতি! আমার ঘোড়াটা বদলে দিতে হবে, আমি এটাকে বিশ্রাম দেয়ার অবকাশ পাইনি।" ক্লান্ত শ্রান্ত অনুচ্চ আওয়াজে বলল ইবনে ইয়াসির।

"তোমারও বিশ্রামের প্রয়োজন ইবনে ইয়াসির! কিন্তু তোমরা যদি অশ্বপৃষ্ঠ ছেড়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়, তাহলে আমাদের ইতিহাস এবং জাতির ভাগ্যও ঘুমিয়ে পড়বে। জাতি ও মিল্লাত আমাদের ত্যাগের প্রত্যাশা করে। আমাদের এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করা খুব জরুরী...। যাও বন্ধু.. আল্লাহ তোমার সাহায্য করবেন।"

তাজা তাগড়া একটি আরবীয় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ইবনে ইয়াসির পায়ের গোড়ালী দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করল, উর্ধ্বঃশ্বাসে ছুটে চলছে ঘোড়া। মরুময় এলাকায় নিস্তব্ধ রাতে কিছুক্ষণ ইবনে ইয়াসিরের অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। এরপর রাতের প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

পরদিনের শেষ প্রহরে ইবনে ইয়াসির নিরূন পৌঁছল। অতিরিক্ত ক্লান্তি ও শ্রান্তির কারণে সহকর্মীদের কাছে পৌঁছে চৌকিতে বসে দু'পা সোজা করে সটান শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার ঘোড়ার শরীর থেকে এভাবে ঘাম ঝরছিল যেন ঘোড়াটি মাত্র কোন জলাশয় সাতরে এসেছে।

দিন শেষে অর্ধরাতের পর আবার শুরু হলো সেই নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার। ইবনে ইয়াসিরের সাথীরা শোরগোলে ঘুম থেকে জেগে উঠল। ইতিমধ্যে ইবনে ইয়াসিরও বেশ সময় ঘুমিয়েছে। শোরগোলে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চিৎকারের সাথে সাথে আকাশে কান্নার আওয়াজও শোনা গেল।

ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে উঠল ইবনে ইয়াসির এবং তরবারি কোষমুক্ত করে বলল, বন্ধুরা! এসো আমার সাথে। আজকের পর আর কোন দিন এ ধরণের আগুনের কুণ্ডলী আকাশে ভেসে বেড়াতে তোমরা দেখবে না।

নির্দেশ মতো পাঁচসঙ্গী তরবারী কোষমুক্ত করে তাকে অনুসরণ করল। তখনো মন্দিরে ঘন্টা ধ্বনী আর পণ্ডিতদের শিঙ্গার বাজনা অবিরাম বেজেই চলছে। মন্দিরের ওপর থেকেই আগুনের কুণ্ডলী আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। সারা শহর জন শুন্য। কোন একটা লোকও নেই ঘরের বাইরে। একাদশী চাঁদ তখনও আকাশে জোৎস্না ছড়াচ্ছে। চাঁদের আলোয় বেশ দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ইবনে ইয়াসিরের দু'দিন অনুপস্থিতির সময়েও এই ভয়ানক অবস্থা অব্যাহত ছিল। সেই সাথে দিনের বেলায় কিছু সময় মাটি থেকে আকাশের দিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উঠে যেতো আর ফোয়ারার পানির মতো ছড়িয়ে পড়তো চতুর্দিকে। শহরের বহু ঘরবাড়ি এই কয়েক দিনে খালি হয়ে গেছে। প্রথমে যখন এ ভয়ানক দৃশ্য দেখা যেতো মানুষ তা প্রত্যক্ষ করার জন্য ঘর ছেড়ে

বাইরে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এ কয়েক দিনে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে, ভীত সন্ত্রস্থ লোকজন এখন আর ঘর ছেড়ে বাইরে আসার সাহস করে না।

ইবনে ইয়াসির শহরের প্রধান মন্দিরের দিকে যেতে যেতে তার সহকর্মীদেরকে এ সম্পর্কে শা'বান ছাকাফীর নির্দেশনার কথা ব্যক্ত করল। তারা যতোই মন্দিরের নিকটবর্তী হচ্ছিল নারীকণ্ঠের চিৎকার ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।"

মন্দিরের কিছুটা কাছে গিয়ে ইবনে ইয়াসির সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করল, "বন্ধুরা! বলো তো এই চিৎকার কি মন্দিরের ভিতর থেকে আসছে, না মন্দিরের বাইরে খালি আঙ্গিনা থেকে এ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসছে? সঙ্গীদের কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে ইবনে ইয়াসির তাদের জানালো, এই চিৎকার হিন্দুদের কোন দেবদেবী কিংবা জিন ভূতের নয়। এই আর্তনাদকারিণী জ্যান্ত মানুষ। এই নারী শয়তানীকেই আমাদের ধরতে হবে।"

"ইবনে ইয়াসির! বিস্মিত কণ্ঠে বলল তার এক সহকর্মী। গায়েবী কোন জিনিসকে তুমি ধরতে চাচ্ছো না তো? আমারতো ভয় হচ্ছে! আসমানী আগুনকে কিভাবে নিভাবে তুমি?"

"তোমাদের কারো মনে যদি কোন ধরনের ভয়ের উদ্রেক হয় তাহলে মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকো। কুরআনের সামনে কোন জ্বিন-ভূতই টিকতে পারে না, সেই সাথে সূরা ফাতিহা পড়ে "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন" "আমরা তোমারই ইবাদতকারি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই"। বারবার পড়তে থাকো। সাথীদের উদ্দেশে বলল কমান্ডার ইবনে ইয়াসির।

কমান্ডারের কথায় তার সাথীরা তাই করতে লাগল আর ইবনে ইয়াসির সাথীদের নিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

অবশেষে শহরের প্রধান সড়কের শেষ প্রান্তে যেখানে প্রধান মন্দির অবস্থিত সেখানে সাথীদের নিয়ে পৌঁছে গেল ইবনে ইয়াসির। একাদশী চাঁদ তখন পূর্ণ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিচ্ছে। চাঁদের কিরণে চারদিকে ঝিকমিক করছে। রাস্তা পেরিয়ে মন্দির আঙ্গিনা থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই সে দেখতে পেল, এক নারীমূর্তি মন্দির প্রাঙ্গনের সিঁড়ি ভাঙ্গছে আর আর্তচিৎকার করছে। মন্দিরের প্রধান ফটকের কাছে একবার এসে সেই নারীমূর্তি মন্দিরের ভিতরের দিকে দৌড়ালো। এমন সময় মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন শক্ত সামর্থবান পুরুষ। তারা নারীটিকে ধরে টেনে হেঁচড়ে আবার

মন্দির প্রাঙ্গনের সিঁড়িতে নিয়ে এলো, এমতাবস্থায় নারীকণ্ঠের আওয়াজ আরো ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল এবং নারীমূর্তিটি আবারো এলোপাতাড়ি সিঁড়িতে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল।

মন্দির থেকে যখন দু'জন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল, তখন ইবনে ইয়াসির তার সাথীদেরকে নিয়ে একটি গাছের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে ফেলল। নারীমূর্তি এলোপাতাড়ি সিঁড়ি ভাঙ্গছিল আর চিৎকার করছিল, কিন্তু হঠাৎ করে সে পা পিছলে সিঁড়ির নীচে এসে পড়ল। ঠিক এই মুহূর্তে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের কুণ্ডলী। এমন একটা ভীতিকর পরিস্থিতি যে কোন মানুষের মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ঘটনার আকস্মিকতা আরব যুবকদের মধ্যেও কিছুটা ভীতির সঞ্চার করল। তারা সবাই সূরা ফাতিহা পড়তে লাগল।

নারীমূর্তির নড়াচড়া থেকে ইবনে ইয়াসিরের বুঝতে অসুবিধা হলো না, এ কোন যুবতী বা বয়স্কা নারী নয়, একান্তই বারো তেরো বছরের কিশোরী। সে আবারো আর্তনাদ করে সিঁড়ি ভাঙ্গতে শুরু করল। এক পর্যায়ে মেয়েটি মন্দিরের দিকে রওয়ানা হলে চিৎকার থেমে গেল এবং মেয়েটিও পড়ে গেল এবং সাথে সাথে আকাশে ভাসমান আগুনের কুণ্ডলীও গায়েব হয়ে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল নিরূনের রাত। ইবনে ইয়াসিরের সাথীদের কাছে মনে হলো, তারা যেন দুনিয়াতে নয় কোন কবরস্থানে অবস্থান করছে। এমন সময় মন্দির থেকে আবার দু'জন বেরিয়ে এলো এবং মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেল। ইবনে ইয়াসির মন্দিরের প্রধান ফটকের সরাসরি সামনে দিয়ে মন্দির আঙ্গিনায় না গিয়ে অপর পাশের ছোট গেট দিয়ে প্রবেশ করল এবং মন্দিরের প্রধান দরজায় উকি দিলো। উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, এখান থেকে একটি সুড়ং পথের মতো সামনে চলে গেছে এবং সুড়ং পথের শেষ প্রান্তে আলো দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে পরস্পর কথা বলার আওয়াজ। ইবনে ইয়াসির সাথীদের কাছে ডেকে কানে কানে বলল, কোন শব্দ করা যাবে না, খুব সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগুতে হবে। তারা সবাই সারি বেঁধে পা টিপে টিপে অগ্রসর হতে লাগল। এক পর্যায়ে সুড়ং পথ শেষ হয়ে দু'দিকে চলে গেল এবং এক প্রান্ত থেকে মানুষের কথা বলার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল তারা।

ইবনে ইয়াসির একপ্রান্তের দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখল শেষ প্রান্তের দরজার ওপাশে বড়সড় কক্ষে একটি মঞ্চের মতো জায়গায় একটি বিবস্ত্র নারীমূর্তি। কক্ষের চার পাশের দেয়াল গাত্রে প্রদীপ জ্বলছে। দেয়ালেও রয়েছে অনেকগুলো বিবস্ত্র পাথরের নারীমূর্তি।

ইবনে ইয়াসির ওখান থেকে সরে অপর দিকে অগ্রসর হলে দেখতে পেল আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট কক্ষ। সেই কক্ষেও প্রদীপ জ্বলছে। সেখানে বসে আছে চার পুরোহিত আর দুই সুন্দরী তরুণী। এরা সবাই বৃত্তাকারে বসা। তাদের বৃত্তের ভিতরে বারো তেরো বছরের এক কিশোরী উপবিষ্ট। তার ভয়ার্ত দৃষ্টি আর পাণ্ডুর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তাকে কোন জায়গা থেকে জোর করে তুলে আনা হয়েছে এবং তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। এক পুরোহিত হাত বাড়িয়ে তার মাথা কাছে নিলো এবং কিশোরীর কপালে চুমু খেলো। দেখে মনে হবে যেন সে তার আপন কন্যাকেই আদর করছে।

সুন্দরী তরুণীদের একজন একটি পেয়ালা তুলে ধরল কিশোরীর দিকে। কিশোরী এক নিঃশ্বাসে পেয়ালার পানীয়দ্রব্য নিঃশেষ করল এবং বিকট আওয়াজে কাঁদতে শুরু করল। কিশোরী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, আমার শরীরে আগুন ধরে গেছে।"

প্রদীপের আবছা আলোয় ঘরের ভিতরের লোকগুলোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না ইবনে ইয়াসির। কারণ সে দরজার আড়ালে থেকে দেখছিল, যাতে ভিতরে তার ছায়া না পড়ে। আর ভিতরের লোকগুলো কিশোরীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল তাই দরজার পাশে কেউ রয়েছে বা থাকতে পারে এটা ঘূর্ণাক্ষরেও তারা ভাবতে পারিনি। এমন সময় ইবনে ইয়াসির হাতের ইশারায় সাথীদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে উচ্চ আওয়াজে নারা লাগাল। তারা নারার প্রতিউত্তরে পাঁচ সঙ্গী একই সাথে তকবীর ধ্বনি দিয়ে একযোগে ভিতরে প্রবেশ করে বসা সবাইকে ঘিরে ফেলল। হঠাৎ তাদের সম্মিলিত তাকবীর ধ্বনী মন্দিরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে মন্দিরের ভিতরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল আর আকস্মিক এই তকবীর ধ্বনীতে হিন্দু পুরোহিত ও তরুণীরা সবাই নির্বাক হয়ে গেল। ইবনে ইয়াসির সকলের উদ্দেশ্যে নির্দেশের সুরে বলল, "জীবন বাঁচাতে চাইলে সবাই দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে যাও"।

নির্দেশ মতো সবাই দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে গেল। এদের মধ্যে তিনজনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এরা মন্দিরের পুরোহিত কিন্তু চতুর্থ পুরুষটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার আর দু'জন ছিল সুন্দরী তরুণী আর সেই ভীত বিহ্বল কিশোরী। ইবনে ইয়াসির মাকরানবাসী সঙ্গীকে কাছে ডেকে বলল, তুমি স্থানীয় ভাষায় আমার সাথে এদের কথা বলতে সাহায্য করো। মাকরানবাসী সঙ্গী ইবনে ইয়াসিরের দুভাষী হিসাবে কথা বলতে শুরু করল।

এমতাবস্থায় কিশোরী মেয়েটি দৌড়ে এসে ইবনে ইয়াসীরের পা জড়িয়ে ধরে বলল, "আমাকে ওরা ঘর থেকে জোর করে উঠিয়ে এনেছে। আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিন, প্রাণে রক্ষা করুন।"

এরা তোমাকে কি বলে? দুভাষী সহকর্মীর মাধ্যমে কিশোরী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল ইবনে ইয়াসির।

কিশোরী মেয়েটি ওই লোকটির দিকে তাকালো যার অবয়ব পুরোহিতের মতো ছিল না। এরপর সে দু'হাত প্রসারিত করে ওই বীভৎস চেহারাওয়ালা লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে আবার ইবনে ইয়াসিরকে জড়িয়ে ধরল, যেন সে খুবই ভয় পাচ্ছে। লোকটির চেহারা সুরত এতোটাই বীভৎস ছিল যে, যে কোন মানুষই তাকে দেখলে ভয় পেতো। বিশাল বপুধারী লোকটির চুল ছিল লম্বা, সেই সাথে সাদাকালো দীর্ঘ দাঁড়ি। আর গোঁফগুলো পেচিয়ে কানের সাথে বাঁধা। চোখ টকটকে লাল। তার মাথা লাল কাপড়ের পাগড়ীর মতো পেঁচানো। কানে বড়বড় রিং আর গলায় দীর্ঘ হাজার দানার মালা পেঁচানো। দেখে মনে হচ্ছিল সে কোন ধর্মীয় গুরু। অবে তার চেহারা সুরত ছিল পুরোহিতদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইবনে ইয়াসির কিশোরীকে একহাতে টেনে বুকের সাথে মিশিয়ে তাকে অভয় দিলো এবং দুভাষীকে বলতে বলল, "তুমি ভয় করো না। এরা তোমার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বলো এরা তোমার সাথে কি আচরণ করেছে?"

কিশোরী বললো, এই জটাধারী লোকটি আমাকে সামনে বসিয়ে এক হাতে আমার মাথা ধরে রাখতো আর অন্য হাতে আমার শরীরে হাত বুলাতো। আর আমার চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এমতাবস্থায় আমার শরীরে আগুনের মতো জ্বালা শুরু হয়ে যেত। আমি বেহুঁশের মতো হয়ে যেতাম। আর কণ্ঠ থেকে বিকট চিৎকার বেরিয়ে আসত। এমতাবস্থায় এই পুরোহিতরা আমাকে মন্দিরের আঙ্গিনায় সিঁড়িতে ফেল আসত। আমি ভয়ে আতঙ্কে মন্দিরের দিকে পালিয়ে আসতে চাইতাম, কিন্তু এদিকে এলেই এরা আমাকে আবার টেনে হেঁচড়ে মন্দিরের সিঁড়িতে রেখে আসতো। আমি চিৎকার করতে করতে বেহুঁশ হয়ে যেতাম। বেহুঁশ হয়ে গেলে আমার শরীরের জ্বালা কিছুটা কমে যেত। এরা আমাকে এনে শরবতের মতো কি যেনো পান করাতো আর আমার সাথে অশ্লীল আচরণ করত। দয়া করে আপনারা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। এরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

বন্ধুরা! সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলল ইবনে ইয়াসির। উস্তাদ শা'বান ছাকাফী আমাকে একথাই বলে দিয়েছেন। তিনি আমাকে একথাও বলে দিয়েছিলেন, কিছুতেই ভয় পেয়ো না। এটা হচ্ছে এদেশের হিন্দুদের ধোঁকাবাজি। মনে সাহস করে রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করো, সফল হবে। তিনি আরো বলেছিলেন, তোমরা মুজাহিদ। দুনিয়ার সবচেয়ে সত্য শান্তির অধিকারী তোমরা, তোমাদের বুকের ভিতর আছে পবিত্র কুরআন। তোমাদেরকে কোন কুফরী যাদুই পরাস্ত করতে পারবে না। এই বদসুরত লোকটি পৌত্তলিক যাদুকর।

ইবনে ইয়াসির আরবী ভাষায় তার সহকর্মীদের সাথে কথা বলছিল। যার ফলে হিন্দু পুরোহিত ও যুবতীদের তা বোঝার উপায় ছিল না। ইবনে ইয়াসির হিন্দু দুই যুবতী, যাদুকর ও দুই পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বলল, সবাই মাথা নিচের দিকে করো। তোমাদের হত্যা করা হবে। ভয়ে সবাই মাথা নীচের দিকে করল। এমন সময় যাদুকর ভিড়ভিড় করে কোন মন্ত্র চালান দিতে চাচ্ছিল। যাদুকর দু'হাত ওপরের দিকে করে যাদু করার চেষ্টা করছিল।

ইবনে ইয়াসির তার হাতের তরবারীর পিঠ দিয়ে যাদুকরের এক হাতে জোরে আঘাত করল এবং অপর হাতে তার মুখে কষে একটা ঘুসি মারল। যাদুকর গিয়ে আঁছড়ে পড়ল দেয়ালে। ইবনে ইয়াসিরের দুই সাথী ওকে ধরে মেঝের ওপর ফেলে দিলো এবং ওর পিঠের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে তরবারীর আগা ওর ঘাড়ের ওপর রেখে বলল, "সত্যিকথা বল, তুই কি যাদুকর? নয়তো তোর মাথা এখনই আলাদা করে ফেলব"।

"বীভৎস চেহারার লোকটি হাত জোড় করে মাথা ঝাকাল।" সে যে যাদুকর নীরব সম্মতি দিয়ে তা বোঝাতে চেষ্টা করল।

দুই পণ্ডিত একটু দূরে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আর প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছিল। ইবনে ইয়াসির তার সহকর্মী দুভাষীর মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলল, "ওদের বলো, ওদের হত্যা করে মরুভূমিতে ফেলে দেয়া হবে। যাতে শিয়াল কুকুর ও বন্যপশুরা ওদের দেহ চিঁবিয়ে খেতে পারে।"

ইবনে ইয়াসিরের সাথী যখন তার কথা স্থানীয় ভাষায় পুরোহিতদের জানাল, তখন প্রায় ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল তিন পুরোহিত। আর দু'হাত প্রসারিত করে প্রণাম করল। এমতাবস্থায় ইবনে ইয়াসিরের সাথীকে ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে বড় পুরোহিত বলল, তোমার সাথীকে বলো, তোমরা এই দুই যুবতীকে

নিয়ে যাও, সেই সাথে তোমরা যত নিতে পারো আমরা তোমাদের সেই পরিমাণ সোনা দানা দেবো, এর প্রতিদান স্বরূপ আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও। ইবনে ইয়াসিরের দুভাষী সাথী হাসতে হাসতে পুরোহিতের কথা তাকে জানালে ইবনে ইয়াসির বলল, "আরে বেঈমানের দল, আমরা নারী ও মুদ্রার বদলে ঈমান বিক্রি করি না।"

যাদুকর যাদুর কথা স্বীকার করায় ইবনে ইয়াসির তাকে বলল, তোমাকে বলতেই হবে কিভাবে তুমি এসব করেছ। যাদুকর তার ভাষায় জানালো, অবশ্যই সে সব বলবে, শুধু বলবেই না করে দেখাবে।

"ঠিক আছে তাহলে এখানে নয়, ওদের সবাইকে সুন্দরশ্রীর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে বলবে, কেনো কিভাবে এরা এই তেলেসমাতি করেছে, কি উদ্দেশ্যে করেছে?"

তিন পুরোহিতকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ইবনে ইয়াসির ও সাথীরা নিরূন শাসকের কাছে নিয়ে এলো। সুন্দরশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ইবনে ইয়াসির বলল, গায়েবী আগুনের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

ইবনে ইয়াসির নিরূন শাসককে একথাও জানালো যে, গত দু'দিনে সে কি কারণে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। সবিস্তারে ব্যক্ত করল, কি ভাবে সে সাথীদের নিয়ে এই ভয়ানক রহস্যের জট খুলেছে এবং এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কিভাবে সে মন্দিরে প্রবেশ করেছে। কিশোরী মেয়েটির সাথে পুরোহিত ও যাদুকর কি ব্যবহার করেছে তাও সে ব্যক্ত করল। সব শুনে সুন্দরশ্রী যাদুকর ও পুরোহিতের উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "তোরা যদি একটুও মিথ্যা কথা বলিস তাহলে তোদের সবার দু'হাত কেটে দেয়া হবে এবং মরুভূমিতে ফেলে আসা হবে।"

সুন্দরশ্রীর হুমকিতে যাদুকর তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা সবিস্তারে জানালো এবং কি কারণে, কার নির্দেশে সে এসব করেছে তাও ব্যক্ত করল। যাদুকর একথাও জানালো যে, সারা হিন্দুস্তানে এধরনের যাদুকর মাত্র তিনজন আছে।

যাদুকর বলল, যে আগুনের কুণ্ডলী আপনারা আকাশে উড়তে দেখেছেন তা কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। এটা নিতান্তই একটা চোখের ভেলকি মাত্র। কিন্তু এটা সাধারণ কোন কাজ নয়। এ ধরণের ক্ষমতা অর্জন করতে কঠিন সাধনা করতে হয়। জমিন থেকে পানির ফোয়ারার মতো যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ আপনারা আকাশে উঠতে দেখেছেন, তাও কোন ক্ষতি করতে পারে

না। এটাও নিতান্তই দৃষ্টি বিভ্রম। যে পানির ফোয়ারা আপনারা ভূমি থেকে আকাশে উঠতে দেখেছেন তাতে বিন্দুমাত্র পানি ছিল না, এই পানিতে হাত রাখলে আপনারা গায়ে মোটেও পানির কোন ছোঁয়া পেতেন না।

কেন তোমরা আমার রাজ্যে এসে এ ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে? জিজ্ঞেস করলেন সুন্দরশ্রী।

"সম্পদের লোভে করেছি মহারাজ! মহাজারা দাহির তার এক বন্ধু রাজার মাধ্যমে আমাকে ডেকে এনেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, নিরূনের অধিবাসী ও শাসকের মধ্যে ভীতি, চরম ভীতি সৃষ্টি করতে হবে। দাহির আমার সাথে আরো এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, সে এসে এই পুরোহিতদের বলে গেছে, আমি যখন যাদু দেখাতে শুরু করবো, তখন পুরোহিতরা ভীতিকর আওয়াজের জন্য কি কি করবে। এরপর আপনার কাছে এসে কি কি বলবে তাও সেই ব্যক্তি ওদের বলে গেছে। মহারাজ! রাজা দাহির আমাকে এতো বিপুল পরিমাণ সম্পদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা আমার সাত পুরুষও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

"এ নিরপরাধ অবোধ বালিকাটিকে তোমরা কেন এমন কষ্ট দিলে" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুন্দরশ্রী জিজ্ঞেস করলেন?"

"এই বালিকাটি তার মায়ের সাথে মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিল। হঠাৎ আমি ওকে দেখে পুরোহিতদের বললাম, এই মেয়েটি আমাদের কাজের উপযোগী। মেয়েটি তখন তার মায়ের সাথে পূজা দিয়ে চলে গেল। জানিনা, সন্ধ্যায় এক পুরোহিত কিভাবে যেন এই বালিকাকে মন্দিরে নিয়ে এলো।

মহারাজ! এটা আমাদের একটা পেশা। আপনাকে আমি বুঝাতে পারবো না কিভাবে মানুষের সাহায্যে এ ধরনের কাজ হয়ে থাকে। তবে একথা ঠিক মানুষের সহায়তা ছাড়া এ ধরনের যাদু দেখানো সম্ভব নয়। কোন জনগোষ্ঠিকে যদি এভাবে ভয় দেখাতে হয়, তাহলে সেই জনগোষ্ঠীর কোন লোকের ওপর এই যাদু প্রয়োগ করতে হয়। আগে সেই বাসিন্দাদের ওপর কিছু কাজ করতে হয়, এরপর যাদুকর সেখানে যদি পাথর নিক্ষেপ করতে চায়, আগুনের বৃষ্টি বর্ষণ করতে চায় তাই করতে পারে। আমি বলে আপনাকে তা বোঝাতে পারব না, যদি অনুমতি দেন, তাহলে করে দেখাতে পারব।"

"আমরা যা দেখতে চেয়েছি তা দেখেছি। তোমরা সবাই এক্ষুনি এ শহর ত্যাগ করে চলে যাবে, কিন্তু নিজের দেশের দিকে যাবে, ভুলেও উরুঢ়ের দিকে পা বাড়াবে না।"

"সম্মানিত গভর্নর। আপনি এখনই এদের যেতে দেবেন না। শহরের লোকদেরকে এদের প্রতারণার কথা বোঝাতে হবে। তাদের বিশ্বাস করাতে হবে এটা কোন আসমানী গযব ছিল না। আপনি শহর জুড়ে ঢোল পিটিয়ে দিন, সকালে যেন শহরের সব লোক এক জায়গায় জড়ো হয়, সেখানে এদের ধোকাবাজির কথা তারা নিজেদের কানে শুনবে এবং ধোকাবাজি প্রত্যক্ষ করবে। বলল ইবনে ইয়াসির।

নিরূন শাসক তখনি নির্দেশ দিলেন, বাদক দলকে তলব করো, শহরের লোকজনকে ওমুক মাঠে জমায়েত হতে বলো।

সূর্য ওঠার সাথে সাথে নিরূনের ছোট বড় সকল অধিবাসী একটি মাঠে জমায়েত হলো। সুন্দরশ্রী শাসকের জাকজমক নিয়ে ময়দানে পদার্পণ করলেন। তার সাথে এলো তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী ইবনে ইয়াসিরের সঙ্গীরা, সেই সাথে ধৃত পুরোহিত ও যাদুকরকেও নিয়ে আসা হলো।

সুন্দরশ্রীর নির্দেশে এক ঘোষক ঘোষণা করল, একটানা কয়েকদিন ধরে নিরূনের আকাশে আপনারা যে গায়েবী আগুনের কুণ্ডলী আর নারীর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন, সেটি আসলে কোন আসমানী গযবের ইঙ্গিত ছিল না, সেটি ছিল এক যাদুকরের শয়তানী যাদু। সেই যাদু এখন আপনাদের সামনে দেখানো হবে। নিরূনের শাসক ও অধিবাসীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে যুদ্ধে ফাঁসানোর জন্য এই চক্রান্ত করা হয়েছিল। আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। স্থির ধীরভাবে এখন এই যাদুর প্রতারণা আপনারা প্রত্যক্ষ করুন।"

"যাদুকর ও পণ্ডিতকে নির্দেশ দেয়া হলো, তোমরা এখন তোমাদের যাদু দেখাও।"

যাদুকর একহাত কিশোরীর মাথার ওপর রেখে অপর হাতে তার মাথাসহ সারা শরীরে বুলাতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তরুণী চিৎকার শুরু করল এবং আকাশে আগুনের কুণ্ডলী ভেসে বেড়াতে শুরু করল। অবস্থা দেখে মানুষ ভয়ে দূরে সরে যেতে শুরু করলে তাদেরকে বলা হলো, ভয়ের কিছু নেই সবাই স্থির হয়ে দাঁড়াও।"

যাদুকর দুই হাত প্রসারিত করে আকাশের দিকে তুলে কি যেনো বিড়বিড় করে বললো, তখন আকাশের আগুন গায়েব হয়ে গেল এবং জমিন থেকে ফোয়ারার মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ আকাশে উঠতে শুরু করল, একটু পরে অন্য একটি জায়গা থেকে পানির ফোয়ার উঠতে শুরু করল। জমিন

থেকে আগুন ও পানি আকাশের দিকে উঠে আসার জায়গার মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র পনের বিশ হাত। সবই সাধারণ লোকের দৃষ্টি সীমার ভিতরে ছিল এবং সবাই তা প্রত্যক্ষ করছিল।

ইবনে ইয়াসির শাসকের মঞ্চে থেকে নেমে প্রথমে আগুনের ফোয়ারার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে আবার ফিরে এলো। একটু পরে আবার পানির ফোয়ারার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ফিরে এসে সুন্দরশ্রীকে জানালো, "আমিতো আপনাদের সামনেই আগুন ও পানির মধ্য দিয়ে হেটে গেলাম, আমার গায়ে আমি না কোন আগুনের তাপ পেলাম না পানির ছোঁয়া।"

এদিকে বালিকা তখনো চিৎকার করছিল। ওর বাবা মা চিৎকার করে বালিকার কাছে পৌছানোর জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু যাদুকর তাদেরকে বালিকার কাছে ঘেষতে দিলো না। যাদুকর বালিকার দেহ থেকে হাত সরিয়ে নিতেই চিৎকার থেমে গেল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল কিশোরী। সেই সাথে জমিন থেকে আগুন ও পানির ফোয়ারা বন্ধ হয়ে গেল।

শহরের অধিবাসীদেরকে এই যাদুকর এবং পুরোহিতদের অপকর্মের উদ্দেশ্যের কথা আবারো জানানো হলো। বলা হলো কে তাদের বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত করেছে। যাদুকরকে শহর থেকে বের করে দেয়া হলো। আর নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী পুরোহিতদের বললেন, যে ধর্ম যাদুর সাহায্যে ধোঁকাবাজি করে টিকে থাকতে চায় মানুষের মনের মধ্যে সেই ধর্মের কোন প্রভাব থাকে না, বরং মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করে। এবার আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন তৎপরতা চালালে ক্ষমা পাবে না।"

✪ ✪ ✪

৯২ হিজরী সন মোতাবেক ৭১২ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম তার সেনাদের নিয়ে ডাভেলের কাছাকাছি ময়দানে পদার্পণ করলেন। শা'বান ছাকাফী তাঁকে রিপোর্ট দিলেন, পথ পরিষ্কার। পথের কোথাও রাজা দাহিরের কোন সেনার অস্তিত্ব দেখা যায়নি। কোন বাঁধা বিপত্তির মুখোমুখি না হয়ে নির্বিবাদে বিন কাসিমের সৈন্যরা ডাভেল পৌছে গেল। রাজা দাহির আগেই তার অধীনস্থ সকল দুর্গশাসকদের বলে রেখেছিল, সকল সেনাকে দুর্গের ভিতরে রাখবে। বাইরের উন্মুক্ত ময়দানে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। যদ্দরুন সকল শত্রু বাহিনী দুর্গের ভিতরে রণ সজ্জার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বিন কাসিম আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, অমুক দিন আমি ডাভেলের উদ্দেশে রওয়ানা করব। প্রত্যুত্তরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, আমার নির্দেশ পাওয়ার আগে তুমি আক্রমণ করবে না। হাজ্জাজ আরো লিখেছিলেন, শত্রু বাহিনী যদি তোমাকে নানা ভাবে উস্কানীও দেয় তবুও আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, হাজ্জাজ বসরায় থেকেও সিন্ধু অভিযান নিয়ন্ত্রণের ভার নিজের হাতেই রেখেছিলেন।

শুক্রবার দিনের জুমআর নামাযের আগেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের সকল সৈন্য ডাভেল ময়দানে পৌঁছে গেল। বিন কাসিমের নির্দেশে এক দরাজ কণ্ঠের লোক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আযান দিলো। সম্ভবতঃ ডাভেলের জমিনে সেটিই ছিল প্রথম আযান। আযানের পর সকল সৈন্য নামাযের জন্য সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী সেনাপতি নিজেই জুমআর নামাযের ইমামতি করলেন। জুমআর খুতবায় মুহাম্মদ বিন কাসিম বললেন-

আল্লাহ তাআলার সাথে তোমরা এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করো, এই জমিনে আজকের এ জুমআর নামায যেন শেষ জুমআ না হয়ে সূচনার জুমআ হয়। আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন আমাদের এই রুকু ও সিজদা কবুল করেন। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ! আমরা জীবন নিয়ে ফিরে যেতে এ অভিযানে আসিনি। আমরা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এই দেশে এসেছি। এদেশের শেষ সীমানা পর্যন্ত আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিতে হবে। আমরা নিরপরাধ স্বজাতীয় বন্দিদের মুক্ত করতে এসেছি। রাজা দাহির বারবার ইসলামের প্রহরীদের হুমকি দিয়েছে। এ পাপী জানে না, মুসলিম বাহিনী যদি কোথাও আসে তারা সাথে করে ইসলামের মহানত্বও নিয়ে আসে। মুসলিম সেনারা পালিয়ে যাওয়ার জন্য যুদ্ধে আসে না।

বন্ধুগণ! সেইসব বীর মুজাহিদদের কথা স্মরণ করো, যাদের কবরের মাটি এখনো শুকিয়ে যায়নি। তারা পারস্য সম্রাটের মতো অহংকারী শক্তিকে পরাজিত করে তাদের স্বর্গরাজ্যের সীমানা সংকোচিত করে দিয়েছিলেন। মাদায়েনে কেসরার রাজ প্রাসাদ আমাদের পূর্ব পুরুষদের তকবীর ধ্বনীতে আজো কাঁপে। রোম পারস্যের অজেয় শক্তির দিকে তাকিয়ে দেখো, আমাদের পূর্ব পুরুষরা ওদের বিশাল শক্তিকে খর্ব করে রাজত্ব দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিলেন। গভীর ভাবে চিন্তা করো সেই অজেয় শক্তির দাপট আমাদের পূর্ব পুরুষরা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন...।

আজ যে রাজা আমাদেরকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে, সে রোম পারস্যের কায়সার কিসরার মতো শক্তিধর হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এতো পারস্য শক্তির এক দশমাংশও হবে না। আল্লাহর কসম! আমি অহংকার দেখাচ্ছি না তোমরা যাদের ছেলে সন্তান, নাতিপুতি তাঁরা ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বীর বাহাদুর নির্ভিক।

আমি বসরার শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পয়গাম তোমাদের শোনাচ্ছি। তোমরা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করো। আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয়ের আবেদন করতে থাকো। অবসর পেলেই "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" জপতে থাকো। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মদদ করবেন।"

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশ মতো বিন কাসিম ডাভেল দুর্গের অদূরে তাঁর সৈন্যদের তাঁবু ফেললেন। তিনি তাঁবুর চার দিকে চওড়া আর ছয় হাত গভীর খাল খনন করালেন। হাজ্জাজ নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাতের বেলায় খুব সতর্ক থাকবে যাতে রাতের আধারে তোমাদের অজ্ঞাতে শত্রু বাহিনী অতর্কিতে তোমাদের ওপর হামলা চালাতে না পারে। বিশেষ করে যেসব সৈন্য হাফেযে কুরআন তাদেরকে রাত জেগে তেলাওয়াত করতে বলবে। আর যারা কুরআন পড়তে না পারে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবে। আর একদল সৈন্যকে রাতের বেলায় নফল নামাযে লিপ্ত রাখবে আর কিছু সৈন্যকে প্রদক্ষিণরত প্রহরায় নিযুক্ত রাখবে। মুহাম্মদ বিন কাসিম রাতের এই ইবাদতের কার্যক্রমের সূচনা করে দিয়েছিলেন। প্রতি রাতেই বিন কাসিমের তাঁবু থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সিন্ধের বাতাসে ভেসে ভেসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। সেই সাথে সাধারণ সিপাহী থেকে সেনাপতি সবাই নফল নামাযে লিপ্ত থাকতেন। রাতের সেনা শিবির থাকতো মশালের আলোয় আলোকিত। সেই সাথে মুজাহিদদের ইবাদত বন্দেগীর রৌশনীতে প্রৌজ্জ্বল। আলোময় প্রভা শুধু তারাই অনুভব করতে পারতো, মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে এসে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে যারা নির্ঘুম নিশি যাপন করে। আর স্বজাতির মজলুম বন্দিদের মুক্ত করতে আসে। তারা জগৎবাসীকে জানাতে এসেছিল, সত্যের পতাকাবাহী বীর যোদ্ধাদের পদানত করতে পারে এ শক্তি কারো নেই।

কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ডাভেল দুর্গ থেকে দু'একটি সৈন্যদল বেরিয়ে এসে দূর থেকেই তীর বর্ষণ করে আবার দ্রুত গতিতে

দুর্গে প্রবেশ করতো। বিন কাসিমের তাঁবুর চতুর্দিকের প্রতিরক্ষা খালের জন্য ওরা বেশী অগ্রসর হতে পারতো না। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে কোন জবাবী আক্রমণ চালানোর প্রতি হাজ্জাজের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু শত্রু বাহিনীর তীরন্দাজদের হটিয়ে দেয়ার জন্য জবাবী তীর বর্ষণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল মুসলিম বাহিনী। হাজ্জাজ চাচ্ছিলেন, ছোট ছোট সংঘর্ষে যেন মুসলিম বাহিনীর শক্তি ক্ষয় না হয়। পক্ষান্তরে শত্রু বাহিনী দুর্গের বাইরেই মুসলিম বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রাখার কৌশল নিয়েছিল। শত্রুবাহিনীর অব্যাহত উস্কানীর মুখেও বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের প্রতি আক্রমণ থেকে নিবৃত রাখলেন। অপেক্ষার পর একদিন হাজ্জাজের পক্ষ থেকে পয়গাম এলো, ডাভেল দুর্গকে ঘেরাও করে নাও। আর দুর্গ জয় করার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন বাজী রেখো।"

এ নির্দেশের জন্যই বিন কাসিম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি হুকুম দিলেন, আজ রাতেই ডাভেল দুর্গ ঘেরাও করতে হবে। দাভেল দুর্গ থেকে বিন কাসিমের সেনা শিবির দেখা যেতো। তাই দিনের বেলায় তারা তাঁবু উঠানোর কাজ থেকে বিরত থাকলেন। যাতে শত্রুরা তাদের তাঁবু উঠানোর বিষয়টি বুঝতে না পারে? বেলা ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই কাসিমের সেনা শিবিরে কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেল এবং সবাই তাঁবু গুটিয়ে পরিষ্কার এক জায়গায় পারাপারের জন্য অখননকৃত জায়গা দিয়ে সবাই বেরিয়ে যেতে লাগল।

ছোট ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে বিন কাসিমের সৈন্যরা পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্বে ঘেরাও বেষ্টনী রচনা করতে শুরু করল। অর্ধরাতের মধ্যেই ঘেরাও কাজ সমাপ্ত করা হলো। ছোট ছোট মিনজানিকগুলো দুর্গের সদর দরজা বরাবর রাখা হলো, যাতে প্রধান ফটকে এগুলো থেকে পাথর নিক্ষেপ করা যায়।

ভোরেই দুর্গের প্রহরীরা চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, শত্রু বাহিনী আমাদের দুর্গ ঘেরাও করেছে। সবাই সতর্ক হয়ে যাও। কেউ দুর্গের বাইরে যাবেনা। দুর্গফটকের প্রহরা মজবুত করো।

বিন কাসিম বাহিনীর ঘেরাও এর খবরে সারা দুর্গে হৈচৈ পড়ে গেল। ঘোষণা শোনা মাত্রই হিন্দু তীরন্দাজ ইউনিট দুর্গপ্রাচীরে এসে অবস্থান নিলো। শহরের যেসব বেসামরিক লোক লড়াই করার মতো ছিল তারাও বর্শা হাতে নিয়ে দুর্গপ্রাচীরে এসে অবস্থান নিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম দুর্গের চতুর্দিকে অশ্ব হাঁকিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং দুর্গপ্রাচীরের অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গাটি চিহ্নিত করার চেষ্টা করছিলেন। দুর্গের সার্বিক অবস্থা দখে বিন কাসিম কিছুটা আশ্বস্থ হলো এই ভেবে যে, দুর্গপ্রাচীরের আগে কোন প্রতিরক্ষা খাল নেই। অবশ্য তাতে এটাও তিনি বুঝতে পারলেন যে, দুর্গ রক্ষার জন্য খাল খননের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি শত্রু বাহিনী। কারণ দুর্গপ্রাচীর খুব মজবুত। তিনি আরো প্রত্যক্ষ করলেন, দুর্গপ্রাচীরটি খাড়া নয় কিছুটা ঢালু। এতে এ বিষয়টিও তিনি বুঝে নিলেন, দুর্গপ্রাচীরের গঠনই বলে দিচ্ছে তা খুব শক্ত এবং অনমনীয় এবং চওড়া। এ ধরনের দেয়ালে সাধারণত কোন ছিদ্র থাকে না।

বিন কাসিম ছোট ছোট মিনজানিক থেকে দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশের সাথে সাথেই দুর্গাভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। যেসব তীরন্দাজ দুর্গপ্রাচীরের ওপর অবস্থান নিয়েছিল তারা মিনজানিক উৎক্ষেপণকারী মুসলিম সেনাদের ওপর তীব্র তীর বর্ষণ শুরু করল। তাতে কয়েকজন মিনজানিক পরিচালনাকারী সেনা আহত হলো। ফলে মিনজানিক আরো পিছিয়ে আনা হলো। কিন্তু মিনজানিক দূরে সরিয়ে আনায় নিক্ষিপ্ত পাথর আর দুর্গাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

হিন্দু যোদ্ধারা দারুন সাহসিকতার সাথে দুর্গের একটি ছোট গেট খুলে দ্রুত গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে মুসলিম সৈন্যদের উপর তীর বর্ষণ করে আবার তড়িৎবেগে দুর্গের ভিতরে চলে যাচ্ছিল। মুসলিম যোদ্ধারাও তাদের ধাওয়া করত। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে এই আক্রমণ প্রতি আক্রমণে মুসলিম বাহিনীই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগলো।

বিন কাসিম সকল সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, এমন কিছু সংখ্যক যোদ্ধা বাছাই করতে যারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের জন্যে আক্রমণে অবতীর্ণ হবে। তিনি বললেন, যখনই শত্রু বাহিনী দুর্গের দরজা খুলবে তখনই যাতে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও তাতে সফলতা এলো না। কারণ দুর্গফটক খোলার পরক্ষণেই আবার হিন্দুরা বন্ধ করে দিতো। অনেকবার হিন্দু আক্রমণকারীদেরকে মুসলিম যোদ্ধারা বেষ্টনীর মধ্যে আটকাতেও চেষ্টা করেছে কিন্তু আটকানোর জন্যে তাদের দুর্গপ্রাচীরের কাছে চলে যেতে হতো, আর সেই সময় দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর শত্রুরা পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করত।

রাতের বেলায় কিছু সংখ্যক সৈন্য দুর্গপ্রাচীরে আঘাত করে প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করল, কিন্তু তাতেও ফলোদয় হলো না। বরং মুসলিম বাহিনীর

ক্ষয়ক্ষতিই বৃদ্ধি পেতে থাকল। এভাবে আক্রমণ প্রতি আক্রমণে কেটে গেল কয়েক দিন।

অতঃপর নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো। প্রতিটি মিনজানিকের সাথে বহু সংখ্যক তীরন্দাজ সৈন্য প্রেরণ করা হলো। তীরন্দাজ সেনারা মিনজানিকের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দুর্গপ্রাচীরের ওপরে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের উপর তীব্র তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো, যাতে শত্রু সেনারা মাথা তুলে মিনজানিক পরিচালনাকারী সেন্যদের বাধাগ্রস্ত না করতে পারে। তাতে সুফল এই যে, শহরের ভিতরে মূহুর্মূহু পাথর বর্ষিত হতে লাগল এবং শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে ভীতি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। শুরু হলো দৌড় ঝাপ। তদুপরি শত্রুবাহিনী শহরের বাসিন্দাদের অভয় দিয়ে তাদের হৈচৈ দমাতে চেষ্টা করতে লাগলো। যোদ্ধা ও সৈন্যরাও বিপুল উদ্যমে প্রতিরোধ করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল।

এই শহরের প্রধান মন্দিরের নাম ছিল ডাভেল। মন্দিরের নামেই শহরের নামকরণ করা হয়। মন্দিরটি ছিল একটি উচু স্থানে অবস্থিত। কয়েকটি গম্বুজ বিশিষ্ট এই মন্দিরের কাঠামো ছিল চৌকোনা। মন্দিরের প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা এতোটাই বিশাল ছিল যে, কয়েক মাইল দূর থেকে তা দেখা যেতো। কোন কোন ঐতিহাসিক এই মন্দির গম্বুজের উচ্চতা এক'শ ষাট গজের কথা উল্লেখ করেছেন। উঁচু মন্দির গম্বুজের ওপর একটি দীর্ঘ বাঁশের মধ্যে সবুজ পতাকা উড্ডীন ছিল।

ডাভেল মন্দিরের পতাকার ব্যাপারে সেই অঞ্চলে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, যে সফরকারী দল যতো বেশী দূর থেকে মন্দিরের পতাকা দেখতে পেতো, তাদের ভ্রমন হতো ততোটাই নিরাপদ। হিন্দুরা বিশ্বাস করত, মন্দিরের সেই পতাকা এক দেবতা নিজের হাতে উড্ডীন করে রেখেছে। হিন্দুরা একথাও বিশ্বাস করতো যে, এই মর্যাদাজনক পতাকা ধারণকারী মন্দির ও শহরকে যেই আক্রমণ করতে আসবে সে বা তারা আর জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। তাদের সকল যুদ্ধশক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আগে প্রেরিত দুই সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন মাবহান ও বুদাইল বিন তোফায়েল দুর্গ থেকে অনেক দূরে থাকাবস্থায়ই শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এতে হিন্দুদের এই বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়েছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করতে শুরু করে ডাভেল শহর কারো পক্ষেই পদানত করা সম্ভব নয়, কারণ ডাভেলের হেফাযত খোদ দেবতা নিজে করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দুদের এসব ধারণা বিশ্বাস সম্পর্কিত কিছুই জানতেন না। তিনি ডাভেলকে একটি মন্দির ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর পক্ষে দুর্গপ্রাচীরের কোথাও ভাঙ্গন সৃষ্টি করা সম্ভব হলো না। দুর্গপ্রাচীরে নীচের দিকে ছিল দশবারো হাত চওড়া আর ওপরে ছয় সাত হাত চওড়া। অনায়াসে দুর্গপ্রাচীরের ওপর দিয়ে সৈন্যরা ঘোড়া দৌড়াতে পারত।

এভাবে আরো কয়েক দিন চলে যাওয়ার পর নিজেদের অজেয় ভেবে হিন্দু সৈন্যরা মুসলমান সেনাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক অঙ্গভঙ্গি দেখাতে শুরু করল। এক হিন্দু সেনা দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়িয়ে বলল, "ম্লেচ্ছের বাচ্চারা। যেদিক থেকে এসেছো সে দিকেই ফিরে যাও। আগের দুই সেনাপতি ও সৈন্যদের পরিণতির কথা স্মরণ করো। এটা দেবতাদের শহর। দেবদেবীদের আক্রোশ থেকে জীবন নিয়ে পালাও।" আরো নানা ধরনের উত্তেজক ও বিদ্রূপাত্মক কথা মুসলিম বাহিনীকে শোনাতে লাগল হিন্দুরা।

তাতে মুসলিম সৈন্যরা হতোদ্যম না হলেও তাদের এ বিষয়টি বুঝে আসলো যে, বড় ধরনের আত্মত্যাগ ছাড়া এই দুর্গ জয় সম্ভব নয়।

দিন শেষে এলো রাত। নিশুতি নিস্তব্ধ রাত। সবখানে নীরব নিস্তব্ধতা। এর মধ্যে আহত কোন সৈন্যের হু, হা রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল। সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী বিন কাসিম বাহিনীর কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্ত্রী সন্তানদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের অবস্থান ছিল তাঁবুর ভিতরের দিকে। মহিলারা আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষা করত। দিনের বেলা সংঘর্ষে যেসব সৈন্য আহত হতো, সহকর্মী সৈন্যরা তাদেরকে সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত তাঁবুতে রেখে আসত, আর মহিলারা তাদের ক্ষতস্থানে পট্টি বেধে দিতো, সেবা করত।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সব সেনাপতিদেরকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন। সবাইকে নিয়ে দুর্গ জয়ের প্লান নির্ধারনে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় এক প্রহরী তাঁবুতে প্রবেশ করে বিন কাসিমকে জানালো, এক হিন্দু ঋষিকে পাকড়াও করে আনা হয়েছে। হিন্দু ঋষি আমাদের অবরোধ বেষ্টনীর আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, তখন তাকে পাকড়াও করা হয়। ধৃত ঋষি এরপর জানায়, সে সম্মানিত সেনাপতির সাথে দেখা করতে চায়। সম্ভবতঃ সে গোয়েন্দা হয়ে থাকবে, বলল প্রহরী।

"ওকে ভিতরে নিয়ে এসো।" নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। দুভাষীকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।" ধৃত লোকটিকে যখন তাঁবুর ভিতরে নিয়ে আসা হলো, তাকে দেখেও ঋষী বা সন্ন্যাসীই মনে হলো।

বিন কাসম দুভাষীকে বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করো সে এখানে কি করছিল?"

"আপনাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করুন" একথা আরবী ভাষায় বলে হেসে দিলো ঋষি। সাথে সাথেই জানালো, আমি মুসলমান। হারেস আলাফী আমাকে পাঠিয়েছেন।

"আচ্ছা, তাহলে এই ছদ্মবেশ ধারণ করলে কেন?

"ছদ্মবেশ ধারণ করার কারণ হলো, আমি দিনের বেলায় এদিকে এসেছি। আমাকে আসল সুরতে এদিকে আসতে দেখলে রাজা দাহিরের গোয়েন্দাদের নজর পড়তো, আর রাজার কাছে খবর পৌছে যেতো যে, রাজার আশ্রিত মুসলমানরা পর্দার আড়ালে মুসলমান সেনাদের যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আর এই অভিযোগে আমাদের বসতিতে আক্রমণ চালানোর অজুহাত খাড়া করত।"

"ঠিক আছে, তবে বিশেষ কোন খবর আছে না-কি?"

"হ্যাঁ, সম্মানিত সেনাপতি! আলাফী বলেছেন, মন্দিরের প্রধান গম্বুজের ওপর যে পতাকা উড়ছে সেটিকে শীঘ্রই ভূলুণ্ঠিত করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি শুনেছেন, আপনার কাছে নাকি একটা বড় ধরনের মিনজানিক আছে। সেটি দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করলে মন্দিরের প্রধান গম্বুজে আঘাত হানা সম্ভব। তবে মন্দিরের গম্বুজ ভাঙ্গা সহজ ব্যাপার না। খুবই শক্ত মন্দিরের কাঠামো। তবুও আপনি অবিরাম পাথর বর্ষণ করতে থাকুন। এই পতাকা ধুলিস্যাত হলেই বুঝবেন, দুর্গ আপনার দখলে চলে এসেছে।" এই বলে সংবাদ বাহক ঋষীরূপী লোকটি দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি এখন আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।"

সকাল বেলায় বিন কাসিম জাউনা সালমী নামের এক সেনাকে তলব করল। সে নির্ভুল লক্ষ বস্তুতে মিনজানিকের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপে পটু ছিল। সে তাঁবুতে প্রবেশ করতেই বিন কাসিম তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে মন্দিরের ওপর উড্ডীন পতাকা দেখিয়ে বললেন, জাউনা সালমী! মন্দিরের

ওপরে উড্ডীন পতাকা দেখতে পাচ্ছো? এই পতাকাটি ধুলিস্যাত করতে হবে। আমি জানি, পতাকা নামাতে হলে মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গতে হবে কিন্তু আমি জানি না, তুমি ঠিক লক্ষ্যে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে কি-না।"

"প্রধান সেনাপতিকে আল্লাহ রহম করুন এবং আপনার হায়াত দরাজ করুন।" সম্মানিত সেনাপতি! আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি সহায় হোন, তাহলে আপনাকে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে, মাত্র তিনবার পাথর উৎক্ষেপণেই আমি মন্দির চূড়া ধ্বংস করে দেবো।"

"তুমি যদি পাথর নিক্ষেপ করে মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পতাকা ফেলে দিতে পারো তাহলে আমি তোমাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেবো" বললেন বিন কাসিম।

"আর আমি যদি তিনবার মিনজানিক উৎক্ষেপণের দ্বারা এই মন্দির চূড়া ধ্বংস করতে না পারি তাহলে প্রধান সেনাপতি আমার দু'হাত কেটে দেবেন।" স্বীকারোক্তি করল সালমী।

"আল্লাহর কসম! তোমার মতো সাহসী যোদ্ধাই আমার দরকার জাউনা সালমী! তিনবার উৎক্ষেপণের কোন শর্তারোপের প্রয়োজন নেই। তুমি যেভাবে পারো মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পতাকাটি ফেলে দাও, আর পুরস্কার জিতে নাও।" বললেন বিন কাসিম।

বিন কাসিমের নির্দেশে প্রধান মিনজানিক উরুসকে দুর্গের পূর্ব পাশে নিয়ে আসা হলো। কারণ তখন সূর্য উদিত হচ্ছিল মাত্র। পূর্ব দিক থেকেই মন্দির চূড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সৈন্যরা বিশালাকার পাথর জড়ো করল।

জাউনা সালমী আল্লাহর নাম নিয়ে মিনজানিকের নিশানা ঠিক করল। দূরত্বের পরিমাণ আন্দাজ করে মিনজানিকের পিছনের দিকে একটু জায়গার মাটি খুঁড়ে মিনজানিকের সম্মুখ ভাগ ওপরে তুলে নিলো। তাতে নিক্ষিপ্ত পাথর বেশী দূরে এবং ওপরে গিয়ে পড়বে। সিরিয়ার সেই অধিবাসী জাউনা সালমী হয়তো জানতো না, তার সেই নিক্ষিপ্ত পাথর ইতিহাস বদলে দেবে এবং সময়ের গতিকে ঘুরিয়ে দেবে।"

মিনজানিক উৎক্ষেপণকারী জাউনা সালমীর নির্দেশ মতো সৈন্যরা বড় বড় পাথর এনে মিনজানিকে স্থাপন করল, আর তার কথা মতো পাঁচশ'রও বেশী সৈন্য একসাথে মিনজানিকের রশি টানলো। মিনজানিকের পাথর উৎক্ষেপক

অংশ রশির টানে শেষপ্রান্ত স্পর্শ করলে জাউনা সালমী সৈন্যদেরকে ইশারা করতেই সবাই রশি ছেড়ে দিলো। বিশাল বিশাল পাথর মাটির ঢিলের মতো উড়ে উড়ে দুর্গপ্রাচীরের বহু উপর দিকে মন্দিরের প্রধান গম্বুজে আঘাত হানলো। বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল চতুর্দিক, সেই সাথে মুসলিম সৈন্যরা সমকণ্ঠে তাকবীর দিলেন।

এরপর জাউনা সালমীর নির্দেশে সৈন্যরা দ্বিতীয়বার মিনজানিকের মধ্যে পাথর স্থাপন করল। পাথর স্থাপনের সময়ই সালমী বলল, এবার আর মন্দির চূড়া দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। দ্বিতীয় বারের আঘাতে নিক্ষিপ্ত পাথর আর গম্বুজে আঘাত করে প্রতিধ্বনীত হলো না বরং গম্বুজ ভেঙ্গে পাথর ভিতরে প্রবেশ করলো। আর মন্দির চূড়ার পতাকা দণ্ড হেলে গেল।

তৃতীয়বারের উৎক্ষেপণের সময় জাউনা সালমী মিনজানিকের নিশানা একটু বদল করে নিলো। সেই সাথে মিনজানিকে পাথর স্থাপন করে যখন নিক্ষেপ করল, পাথরের গমণ পথের দিকে তাকিয়ে জাউনা সালমী তাকবীর দিলো, নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বিতীয় আঘাতের একটু ওপর মন্দির চূড়ায় আঘাত হানলো। তাতে মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পতাকাদণ্ডসহ লুটিয়ে পড়ল মন্দিরের ভিতরে। পতাকা পড়তে দেখে বিন কাসিমের সৈন্যরা তাকবীর ধ্বনীতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ফেলল।

মন্দিরে প্রথম পাথর নিক্ষেপের আওয়াজে শহরের সকল বেসামরিক হিন্দু মন্দিরে গিয়ে জড়ো হলো, আর পূজাপাঠ করতে শুরু করল। এমতাবস্থায় কিছুক্ষণ পর যখন দ্বিতীয়বার মিনজানিকের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে মন্দির গম্বুজের একাংশ ভেঙ্গে পড়ল, তখন মন্দিরের ভিতরে থাকা পূজারী ও মন্দিরের পুরোহিতরা ভয়ে আতঙ্কে বেরিয়ে এলো। তৃতীয়বারের প্রস্তরাঘাতে যখন মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পতাকা ভূলুণ্ঠিত হলো তখন হিন্দুরা আতঙ্কে আর্তনাদ শুরু করে দিলো। সারা শহর জুড়ে দেখা দিলো চিৎকার চেচামেচি। তাদের দৃষ্টিতে মন্দিরচূড়া ভেঙ্গে পড়া ছিল ধ্বংসের আলামত। হিন্দু নারী শিশুদের আর্তচিৎকারে দুর্গাভ্যন্তরে কেয়ামত সৃষ্টি হয়ে গেল।

মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পড়তে দেখে সৈন্যরা দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিলো। সকল হিন্দু সৈন্য ও সামর্থবান পুরুষরা দুর্গের বাইরে চলে এলো জীবনের শেষ মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হতে। হিন্দুরা সব একসাথে মুসলিম সৈন্যদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল।

মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল, তারা কিছুটা পশ্চাৎপদ হয়ে হিন্দুদের অগ্রসর হতে দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করল।

হিন্দুরা ছিল আক্রোশে উন্মাদ। আবেগ উন্মাদনায় হিন্দুদের মধ্যে কোন সামরিক শৃঙ্খলা ছিলনা। তাই মুসলিম সৈন্যদের সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণে ওরা কচুকাটা হতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে হিন্দু আক্রমণ কারীরা পিছু হটে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্গফটক বন্ধ করে দিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তখন সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন সবগুলো মিনজানিক থেকে দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকো। তখন দুর্গপ্রাচীরের ওপরে আর কোন হিন্দু সৈন্য ছিল না। মন্দির চূড়ার পতাকা ভেঙ্গে পড়া দেখেই ওদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গপ্রাচীর শত্রু মুক্ত দেখে মুসলিম সৈন্যরা রশিতে বাধা আংটা নিক্ষেপ করে রশি বেয়ে দুর্গপ্রাচীরের ওপরে উঠতে শুরু করল। সবার আগে দুর্গপ্রাচীরে উঠার মতো সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সাদী বিন খুজাইনা ইতিহাসের পাতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী। দুর্গপ্রাচীরে আরোহণকারী দ্বিতীয় সৈনিক ছিলেন বসরার অধিবাসী আজাল বিন আব্দুল মালিক।

দুর্গে অনবরত পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তাতে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন প্রাণ ভয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিল। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা কয়েকটি আংটা দিয়ে দ্রুতগতিতে দুর্গপ্রাচীরে উঠতে লাগল। কিছু সংখ্যক সৈন্য দুর্গপ্রাচীর থেকে নীচে নেমে দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিলে প্লাবনের মতো বিন কাসিমের বাহিনী দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করল।

দুর্গে প্রবেশ করে প্রথমেই বিন কাসিম এক সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন আগে আমাদের বন্দিদের খোঁজ করো। তাদের যদি এই দুর্গে বন্দি করা হয়ে থাকে তাহলে আক্রোশে হিন্দুরা হত্যায় মেতে উঠতে পারে।

ডাভেল দুর্গে মুসলিম বাহিনী প্রবেশের পর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর সামনে হিন্দু সৈন্যরা প্রতিরোধ তো দূরে থাক কচুকাটা হতে লাগল। বিন কাসিম উচ্চ আওয়াজে হুংকার দিয়ে বললেন, কোন-শত্রু সেনাকেই রেহাই দেবো না।" এই দুর্গের কোন পুরুষ ক্ষমার যোগ্য নয়। বিন কাসিমের এতোটা ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ছিল এরা আগে দুইজন সেনাপতিসহ অসংখ্য মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করেছিল। তাছাড়া নিরপরাধ মুসলিম নারী পুরুষ ও শিশুদের আটকে রেখেছিল। সর্বোপরি বিন কাসিমের সহযোদ্ধাদের প্রতি নানা ভাবে বিদ্রূপ তাচ্ছিল্য করেছিল। বিন কাসিমের যোদ্ধারা হুংকার দিয়ে বলছিল, হে মূর্তি পূজারীরা! কোথায় গেল

তোমাদের গর্ব। এখন তোমাদের দেব-দেবীদের ডাকোনা কেন। তারা কেন তোমাদের রক্ষায় শক্তির মহড়া দেখায় না। ওদের বলো, পারলে দেবদেবীরা তোমাদের রক্ষা করুক। বিন কাসিম তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে শহরের কয়েদখানার দিকে ঘোড়া ছুটালেন। আসলে হিন্দু জাতিও ইহুদিদের মতো। ওদের মধ্যে কোন গভীর বুদ্ধি বিবেক কাজ করেনা। আসলে সত্যে উপণীত হওয়ার মতো ওদের বিবেক বুদ্ধিই নেই। ওরা অনেকটা জড়বস্তুর মতো।

পর্ব ছয়

আল্লাহর কসম! ছাকীফ সম্প্রদায়ের মায়েরা আর এমন ছেলে জন্ম দেবেনা...

মুহাম্মদ বিন কাসিম নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে বন্দিশালার দিকে যাচ্ছিলেন। বিন কাসিমের নিরাপত্তারক্ষীরা দুর্গের এক বাসিন্দাকে পথ দেখানোর জন্য সাথে নিয়ে ছিল। সেই লোকটিই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জেলখানার দিকে। পথ প্রদর্শকের ঘোড়া তাদের আগে আগে দৌড়াচ্ছিল। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বিন কাসিমের সামনে পড়ল, দুই মুসলিম সেনা এক তরুণীকে টেনে হেঁচড়ে একটি বাড়ি থেকে বের করছে, আর ওদের ছেড়ে দেয়ার জন্যে এক বৃদ্ধ কড়জোরে অনুরোধ করছে।

বিন কাসিম এই দৃশ্য দেখে ঘোড়া থামিয়ে দিলেন। বাধাগ্রস্ত হয়ে সৈনিক বাধাদানকারী বৃদ্ধের প্রতি ক্ষেপে গেল এবং তাকে হত্যা করার জন্য তরবারী উত্তোলন করল।

হঠাৎ করে সেই সৈন্যের কানে ভেসে এলো হুংকার "থামো, তরবারী নামিয়ে ফেলো" সৈনিক তরবারী নামিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো প্রধান সেনাপতি বিন কাসিম।

বিন কাসিম সৈনিকের মুখোমুখি ঘোড়া দাড় করিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমরা কি আরব নও?

"জী হ্যাঁ, প্রধান সেনাপতি! আমরা অবশ্যই আরব।" বিনয়ের সাথে জবাব দিলো সৈনিক।

'তোমরা কি মুসলমান নও?

"আলহামদুলিল্লাহ' অবশ্যই আমরা মুসলমান," মাননীয় সেনাপতি।

"তোমাদের রক্তে কি রোম-পারস্যের রক্তের কোন মিশ্রন ঘটেছে? আল্লাহর কসম! আমার প্রিয় রাসূল বেসামরিক নিরপরাধ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর কখনো হাত তুলেননি। ছেড়ে দাও ওদের।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম তরুণী ও বৃদ্ধকে ইশারায় ঘরের ভিতরে চলে যেতে বললেন এবং তাঁর দুভাষীদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা সারা শহরে ঘোষণা করে দাও, বেসামরিক নারী, শিশু, বৃদ্ধদের ওপরে যদি কোন মুসলিম সেনা হাত তুলে তাহলে তাদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। কোন মুসলিম সেনা যেন বেসামরিক লোকের বিরুদ্ধে কোন ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ না নেয়।

খুব দ্রুততার সাথে বিন কাসিম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে জরুরী নির্দেশ দিয়ে বন্দিদের মুক্ত করার জন্য তাড়াতাড়ি কয়েদখানায় পৌছানোর জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কারণ শত্রুরা পরাজয়ের প্রতিহিংসায় বন্দিদের হত্যা করার প্রবল আশঙ্কা করছিলেন তিনি।

শহরের মতো কয়েদখানার মধ্যেও হিন্দু কারারক্ষীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। কারারক্ষীরা মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পতাকা নীচে পড়তে দেখেই প্রাণ ভয়ে কারাগারে দিকবিদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করে। আর চিৎকার করতে থাকে, ডাভেল ভেঙ্গে পড়ছে, দেবীর গযব ধেয়ে আসছে, শহরের সব মানুষ পালাচ্ছে।

শহরের আতঙ্ক কারাভ্যন্তরেও আছড়ে পড়ল। কারারক্ষীরা প্রধান ফটক খুলে দিল। কয়েদখানার সকল প্রহরী ও কর্মচারী প্রাণভয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেল। কারাগারের ভিতরে যেসব বন্দি বিভিন্ন কক্ষে আটক ছিল তাদের বের হওয়ার পথ বন্ধ থাকায় মুক্তির জন্য দরজায় করাঘাত করতে লাগল।

বাইরের অবস্থা একপর্যায়ে কারাগারের পাতাল কক্ষেও ছড়িয়ে পড়ল। ওখানেই বন্দি করে রাখা হয়েছিল আরবদেরকে। সংবাদ শুনে সকল আরব বন্দি মুক্তির আশ্বাসে আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হলো। তারা তখনও জানেনা মুসলিম সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করেছে। এমনটি তাদের ধারণার বাইরে। বন্দি আরবদের প্রতিটি দিনের সূর্য উদিত হতো জীবনের শেষ দিবস হিসাবে এবং প্রতিদিনের সূর্য অস্ত যেতো জীবনের শেষ রাত হিসাবে। তারা প্রতিটি মুহূর্তকেই মনে করতো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আরবদেরকে কোন প্রহরী উপহাসচ্ছলে বলেছিল, দু'বার তোমাদের বাহিনীকে সেনাপতিসহ আমরা কচুকাটা করে ফেরত পাঠিয়েছি কিন্তু কাপুরুষগুলো আবারো আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে।

ওরা আমাদের দুর্গ অবরোধ করেছে। দেখবে এবার মজা। কয় দিন ওরা এভাবে অবরোধ বহাল রাখতে পারবে। আরব সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করলেও বিজয়ী হয়ে তাদের মুক্ত করতে পারবে এ আশাবাদ খুব একটা জোরালো হতে পারছিল না এর আগের দু'টি অভিযানের পরাজয়ের সংবাদে। তাই নিত্যদিনের মতো আল্লাহর দরবারে আকুতি জানানো ছাড়া এহেন পরিস্থিতিতে তাদের আর কিছুই করার ছিলনা। তাদের সবগুলো কক্ষ যেমন ছিল মজবুত তেমনই শক্ত শিকলের দরজায় তালাবদ্ধ।

আরব কয়েদীরা ইসলামী রীতি অনুযায়ী তাদের মধ্য থেকে ওমর বিন আওয়ানাকে দলনেতা মনোনীত করেছিল। দলনেতা হিসাবে কয়েদখানার বাইরে মানুষের ছুটাছুটির সংবাদ শুনে সে আরব বন্দিদের চিৎকার করে জানিয়ে দিলো, আরব বন্দিগণ! আমাদের মুক্তি নয়তো মৃত্যু সেই কাঙ্ক্ষিত দিন সমাগত। সবাই দোয়া করো, বন্দিশালার প্রহরীরা আমাদের কাছে পৌঁছার আগে যেন স্বদেশী যোদ্ধারা আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে। কোন হিন্দু প্রহরী যদি তোমাদের জোর করে বাইরে নিয়ে যেতে চায় তাহলে ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে চেষ্টা করো। মরতেই যদি হয়, তাহলে লড়াই করেই মরতে চেষ্টা করবে। আমাদের সবাইকে যদি একসাথে বের করতে চায় তাহলে পাতাল কক্ষেই আমরা ওদের উপর হামলে পড়বো। সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করো। আল্লাহর দয়া ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই।" সর্দারের কথায় সবাই একমত পোষণ করল। নারী শিশুরা পর্যন্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

পাতাল কক্ষে যাওয়ার জন্য ওপর থেকে যে সিঁড়ি পথ নেমেছে হঠাৎ আরব সর্দার সেপথে বহুলোকের পদধ্বনী শুনতে পেল। সিঁড়ির কাছের কক্ষ থেকে আওয়াজ হলো, "সবাই হুঁশিয়ার হয়ে যাও। দরজা খোলার সাথে সাথেই শত্রুদের ভিতরে টেনে নেবে।"

সকল আরব বন্দি প্রস্তুত হয়ে গেল। নিস্তব্ধ নীরবতা। আরব বন্দিরা প্রথমে দেখতে পেল কয়েদখানার দারোগাকে। তার নাম কুবলা। তার হাতে ছিল এক গোছা চাবী। কয়েদীরা দেখল দারোগা কুবলার সাথে সাথে যে লোকটি আসছে সে কয়েদখানার কোন প্রহরী নয়। দেখতে দেখতে ত্রিশ চল্লিশ জন আরব সেনা পাতাল কক্ষে প্রবেশ করল। ওদের দেখে পাতাল বন্দিশালার প্রথম কক্ষের একবন্দি চিৎকার করে বলে উঠল, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই আরব মুজাহিদ। তোমাদের শরীর থেকে আরব মুজাহিদের গন্ধ পাচ্ছি! একথা ধ্বনিত

হওয়ার সাথে সাথেই মাটির নীচের বন্দিশালার পরিবেশ বদলে গেল। কয়েদীরা মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বদেশী যোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরল। ওরা ছিল বিন কাসিমের একান্ত নিরাপত্তা ইউনিটের সৈনিক।

সিঁড়ির কাছ থেকে এক কমান্ডার উচ্চ আওয়াজে হাঁক দিলো। "সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে চলে এসো। সিপাহ সালার ওপরে অপেক্ষা করছেন।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম কয়েদখানার মাঝখানের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি বন্দিশালার পাতাল পথের প্রবেশ মুখের দিকে এক পলকে তাকিয়ে রয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি নারী বন্দিদেরকে ওপরে উঠে আসতে দেখতে পেলেন। তারা দিনের আলোয় এসেই দু'হাতে চোখ বন্ধ করে ফেলল। দীর্ঘ দিন সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদের চোখ হঠাৎ করে প্রখর সূর্যালোক সহ্য করতে পারছিলনা। সবাই চোখে অন্ধকার দেখছিল। সেনাপতি বিন কাসিম লক্ষ্য করলেন নারী শিশুদের পিছনে পুরুষরাও ওপরে ওঠা মাত্রই চোখ দু'হাতে বন্ধ করে ফেলছে।

"আরে বোকার দল। চোখ খোলো। চেহারা থেকে হাত সরাও। মুক্তি ত্রাতা হিসেবে আগত বীর সেনাপতিকে দেখো।" আবেগের আতিশয্যে কম্পিত কণ্ঠে বলল বন্দিদের দলনেতা আমর বিন আওয়ানা।

বন্দিদের ওপরে আসতে দেখে এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন সেনাপতি বিন কাসিম! সবার আগে যে নারী দলটি পাতাল কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিল ততোক্ষণে তাদের দৃষ্টি শক্তি দিনের আলোকে সহ্য করে নিয়েছে। তারা দেখতে পেল, পরম সুশ্রী এক নওজোয়ান মাটিতে হাটু ভেঙ্গে দু'হাত প্রসারিত করে তাদের স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে বলছে- "আমি কি ওয়াদা পূরণ করেছি? তোমরা কি কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবেনা, যে এই ছেলে আমাদেরকে বেঈমানদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে উদ্ধার করেছিল?"

নারীদের দলটি আগেই ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিন কাসিমের আবেদন শুনে এক অর্ধবয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমুই চুমুই ভরিয়ে দিতে দিতে বলল, "আল্লাহর কসম! সাকীফ গোত্রের আর কোন মা এমন বীর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না।

যারই দৃষ্টি একটু ধাতস্থ হয়ে আসছিল, সেই বন্দিই মুহাম্মদ বিন কাসিমকে জড়িয়ে আবেগে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর বিন কাসিম মুক্ত বন্দিদের নিয়ে জেলখানার দফতরে প্রবেশ করলেন। দফতরে দাঁড়িয়ে তিনি জেলখানার বদ্ধ কুঠিরে মুক্তিকামী বন্দিদের দরজায় কড়াঘাত করার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। যেসব বন্দির হাত মুক্ত ছিল কিন্তু হাত পায়ে বেড়ি ছিল, তারা শিকল ছিড়ে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। ওদের শিকল ভাঙ্গার আওয়াজ ভেসে আসছিল বিন কাসিমের কানে। সব বন্দিই যেন পিঞ্জিরে আবদ্ধ পাখির মতো মুক্ত স্বজাতিদের সাথে উন্মুক্ত আকাশে উড়ার জন্য তড়পাচ্ছিল।

"দারোগাকে ধরে নিয়ে এসো এবং ওকে হত্যা করো।" নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম।

"নির্দেশ পেয়ে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী পাতাল বন্দিশালার দিকে দৌড়ে গেল। তারা নীচের সব জায়গায় দারোগা কুবলাকে তালাশ করল কিন্তু কোথাও দারোগাকে খুঁজে পেল না। বন্দিদের কাছেও দারোগার কথা জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউ দারোগার সন্ধ্যান দিতে পারল না।

অবশেষে বুঝা গেল বিন কাসিম যখন মুক্ত আরব বন্দিদের মুক্তির আবেগঘন পরিবেশে সাফল্য ও কৃতজ্ঞতার আবেশে সিক্ত ছিলেন, আরব বন্দিরা তাকে ঘিরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছিল এবং তাকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতায় চুমুই চুমুই ভরিয়ে দিচ্ছিল, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি ও সৈন্যদের এই মগ্নতার সুযোগে দারোগা কুবলা জেলখানা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়।

বিন কাসিম কয়েদখানায় প্রবেশ করেই দারোগার সাক্ষাত পেয়ে যান। দারোগা কুবলা বিনাবাক্য ব্যয় ও কালক্ষেপণ না করে আরব বন্দিদের অবস্থানের কথা বিজয়ী সেনাপতিকে জানিয়ে দেয় এবং নিজে পাতাল কক্ষের চাবী নিয়ে দরজা খুলে দেয় এবং বন্দিদের মুক্ত করে দেয়।

বিন কাসিমের নিরাপত্তারক্ষীরা দারোগার খুঁজে সারা কয়েদখানায় তল্লাশী করে প্রধান ফটকের কাছে গেলে তারা দুই কয়েদীকে দেখতে পেল, হাত পায়ে বেড়ী নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ওরা কয়েদখানার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওদের জিজ্ঞেস করে নিরাপত্তা কর্মীরা জানতে পারল তারা দারোগাকে প্রধান গেট পেরিয়ে যেতে দেখেছে। এ খবর পেয়ে দুই নিরাপত্তারক্ষী দারোগাকে ধরে আনার জন্য ঘোড়া দৌড়াল। এরা কয়েদখানায় প্রবেশ করেই দারোগাকে দেখেছিল। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তারা দারোগাকে

পেয়ে গেল। তারা দারোগাকে পাকড়াও করে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে এলো।

"তুমি কি ডাভেল দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করেছিলে? দু'ভাষীর মাধ্যমে ধৃত দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

"সম্মানিত বিজয়ী সেনাপতি! আমার যদি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালানোর ইচ্ছা থাকত, তাহলে এতো সহজে আপনার লোকেরা আমাকে ধরতে পারত না।"

"জীবন বাঁচানোর জন্য পালানোর কোন ইচ্ছাই কি তোমার ছিলনা?" জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম। তুমি নিহত হতে চাও।"

"না, আমি মৃত্যুবরণ করতে চাই না। বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে প্রতিপক্ষের সৈনিক হিসাবে আমাকে হত্যা করা ছাড়া, হত্যার আর কোন কারণ আপনি আমার বেলায় পাবেন না।

"এসব নিরপরাধ লোকগুলোকে এতো দিন পর্যন্ত বন্দি করে রাখা কি তোমার অপরাধের জন্য যথেষ্ট নয়? এই অপরাধ কি ক্ষমা যোগ্য মনে কর তুমি?"

"নিরপরাধ এই লোকগুলোকে এতোদিন বাচিয়ে রাখা কি অপরাধ? বলল দারোগা। এদেরকে আমাদের রাজার হুকুমে বন্দি করা হয়েছে কিন্তু আমার হুকুমে বন্দিদশাতেও এদেরকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাদের বন্দি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে সেটির অপরাধে অপরাধী আমাদের রাজা। বন্দি অবস্থায় যদি এদের বিশেষ কোন কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এজন্য আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। সম্মানিত সেনাপতি! আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার আগে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমি তাদের কোন কষ্ট দিয়েছি কি-না?

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরব বন্দিদের কাছে দারোগা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সবাই একবাক্যে জানালো, এই দারোগা তাদের ওপর কোন জুলুম করেনি। বরং সে প্রতিদিন পাতাল কক্ষে গিয়ে তাদের প্রয়োজনাদির খোঁজ খবর নিতো। তাদের দেখা শোনা করতো। সবাই দারোগা কুবলার প্রশংসা করল।

"সম্মানিত সেনাপতি! আপনি জানেন না, এই বন্দিদের মধ্যে যে দু'জন তরুণী ছিল তাদেরকে আমি ডাভেল শাসকের কুদৃষ্টি থেকে বহু কষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছি। ডাভেল শাসক যখন কারাবন্দিদের দেখতে আসতো, আমাকে খবর দিতো আমি খবর পেয়েই ওই দুই তরুণীকে ডাভেল শাসকের

দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখতাম। শুধু তাই নয় সম্মানীত সেনাপতি! উরুঢ় থেকে রাজা দাহির নির্দেশ পাঠিয়েছিল, ডাভেল অবরোধে শত্রু বাহিনী যদি বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে মুসলমান সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করার আগেই আরব বন্দিদের হত্যা করে ফেলবে। রাজার সেই নির্দেশ প্রয়োগের সময় আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি রাজার হুকুম বাস্তবায়ন করিনি।"

তুমি ইচ্ছা করলেও তা পারতেনা। জেলখানার সকল প্রহরীইতো পালিয়ে গিয়েছে। রাজা দাহিরের শাসনতো তখন খতম হয়ে গিয়েছিল, তবুও তুমি বন্দিদের মুক্ত করে দিলেনা কেন? জানতে চাইলেন বিন কাসিম।

"তাদের আমি মুক্ত করে দিলে সবাই জানতো এই বন্দিদের মুক্ত করার জন্যই এসেছে আরব সৈন্য। ডাভেল মন্দিরের ওপর পাথর নিক্ষেপ ও মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পড়তে দেখেই ওরা প্রতিহিংসার আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। অবস্থা আন্দাজ করে আমি পাতাল বন্দিশালার প্রধান গেট বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং জেলখানার সকল প্রহরী পালিয়ে যাওয়ার পরও আমিই শুধু এখানে অপেক্ষা করছিলাম। আমি মনে মনে প্রতীজ্ঞা করেছিলাম, নিরপরাধ এই বন্দিদেরকে মুসলিম বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে আমি এখান থেকে যাবো। আমি নিজের প্রতীজ্ঞা পূরণ করার পর এখান থেকে বের হয়েছি, জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাইনি।"

"এদের প্রতি তোমার এতোটা দয়া দেখানোর কারণ কি?" জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

"এদের কোন অপরাধ ছিলনা। নিরপরাধ লোকগুলোকে বন্দি করে রাখার কারণে আমি এদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়েছি। এই অপরাধে যদি আপনি আমাকে হত্যা করতে চান তাহলে তাদের কারো হাতে তরবারী দিয়ে বলুন, তাদের কেউ আমাকে হত্যা করে ফেলুক।"

আরব বন্দিরা আগেই বিন কাসিমকে বলেছিল, দারোগা কুবলা তাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেনি, বরং সদাচরণ করেছে।

বিন কাসিম দারোগার উদ্দেশে বললেন, "তোমার মতো মানুষের ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। তোমার এই মহানুভবতার মর্যাদা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। আমি তোমাকে বাধ্য করবো না, তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি মাত্র। ইসলাম গ্রহণ করলে তুমিই বুঝতে পারবে কেন আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছি।"

বিন কাসিমের মূল্যায়ণ ও সদাচরণে মুগ্ধ হয়ে দারোগা কুবলা ইসলাম গ্রহণ করল। দারোগা কুবলা ডাভেলের অধিবাসী ছিল না। সে ছিল তৎকালীন হিন্দুস্তানের দাহির শাসিত রাজ্যের একজন জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তি। বিন কাসিম হুমাইদ নজদীকে ডাভেলের শাসক নিযুক্ত করে তার অধীনে দারোগাকে জেলখানার দারোগা পদে বহাল রেখেছিলেন এবং কুবলাকে হুমাইদের উপদেষ্টার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন।

কুবলাকে দারোগা পদে বহাল করে বিন কাসিম তার কাছে জানতে চান, আরব বন্দিদের মতো আরো কোন নিরপরাধ লোক কি বন্দিশালায় আছে?

"যে দেশের শাসক সত্য শুনতে পছন্দ করে না, সে দেশের কারাগারগুলো সত্যনিষ্ঠদের আবাসস্থলে পরিণত হয়। এই কারাগারে এদের মতো নিরপরাধ বহু বন্দি রয়েছে।" বলল কুবলা।

"কে অপরাধী আর কে অপরাধী নয় কয়েদখানায় যারা রয়েছে এদের ব্যাপারে তুমিই ফয়সালা করবে।" বললেন বিন কাসিম। যারা নিরপরাধ তাদের ছেড়ে দেবে, আর অপরাধের তুলনায় যারা বেশী শাস্তি ভোগ করেছে তাদেরও মুক্ত করে দেবে। এখন থেকে সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মতো ইনসাফ করা হবে। কারো প্রতি জুলুম করা চলবেনা।"

বিন কাসিম মুক্তিপ্রাপ্ত আরব বন্দিদের সাথে অনেকক্ষণ কথা বললেন। পরিশেষে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, যতো শীঘ্র সম্ভব তাদেরকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।

বিন কাসিম মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের উদ্দেশে বললেন, যে বন্দিশালা থেকে কোন দিন কোন বন্দির জীবিত বের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেই কঠিন বন্দিদশা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছ, শুধু এজন্যই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনা। এজন্যও আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার, তোমরা এখানে বন্দি না হলে আমাকে এখানে পাঠানো হতোনা। যেহেতু আমাকে এখানে আসতে হয়েছে, এজন্য আমার ওপর কর্তব্য হয়ে গেছে এই কুফরিস্তানের প্রতিটি জনপদে ইসলামের আলো পৌঁছে দেয়ার। তোমাদের বন্দিত্ব শুধু আমার জন্যই নয় হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রচারের একটা কার্যকর পথ তৈরী করে দিয়েছে।

হিন্দুস্তানে ইসলামের আগমনের ইতিহাস যখন লিখা হবে তখন ইসলামের আগমনের আগে তোমাদের বন্দিত্বের কথা উল্লেখ করা হবে। সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাসের পাশাপাশি তোমাদের বন্দিজীবনের কষ্ট দুর্ভোগের কথাও সগর্বে উল্লেখ করা হবে। তোমরা যে কষ্ট অত্যাচার সহ্য করেছ, আল্লাহ এর প্রতিদান

দেবেন। দোয়া করো, আমি যে সংকল্প নিয়ে এসেছি তা যাতে সফল করতে পারি। তোমাদের মুক্ত করার মধ্যেই আমার মিশন শেষ হয়ে যায়নি, আমার মূলকাজ শুরু হয়েছে মাত্র। অতঃপর বন্দিরা দেশের পথে রওয়ানা হলো।

ডাভেলের পৌত্তলিক শাসক দুর্গ পতনের সাথে সাথেই সুযোগ মতো পালিয়ে গেল। দুর্গের ভিতরের প্রতিটি বাড়ি তল্লাশী করেও তাকে পাওয়া গেল না। ডাভেল থেকে পালিয়ে দুর্গশাসক নিরূন আশ্রয় নিলো। কারণ নিরূন ছাড়া তার পক্ষে রাজধানীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। রাজধানী উরুঢ় গেলে রাজা দাহির পরাজয় ও সৈন্যদের ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো। তাই নিরূন শাসক শান্তিকামী সুন্দরশ্রীর কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হলো সে।

রাজা দাহিরের কাছে যখন খবর পৌছলো, ডাভেল দুর্গের পতন ঘটেছে, মুসলমান বাহিনী দুর্গ দখল করে নিয়েছে, তখন রাগে ক্ষোভে আগুন হয়ে গেল দাহির। কেউ তখন রাজার মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু তার বুদ্ধিমান উজির সাহস করে রাজার একান্ত কক্ষে প্রবেশ করল।

কিসের জন্য এখানে এসেছো? সিংহের মতো গর্জে ওঠলো রাজা। তোমার এতো বুদ্ধি চাতুরী কোথায় গেল উজির?

মহারাজ! আমাদের সৈন্যরা দু'বার আরব বাহিনীকে পরাজিত করেছে। এর ফলে তারা মনে করেছিল আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সৈন্যরা ছিল বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত, এজন্য মুসলিম সেনাদের সতর্ক ও কৌশলী আক্রমণ এরা প্রতিরোধ করতে পারেনি।

“আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, ওরা নাকি আগে ডাভেলের মন্দির চূড়া ধ্বংস করে পতাকা ভূলুণ্ঠিত করেছে” বলল রাজা।

আপনাকে ঠিকই বলা হয়েছে মহারাজ। শত্রুবাহিনী আগে মন্দির চূড়া ভাঙ্গার জন্য পাথর নিক্ষেপ করেছে। মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পড়ার কারণে পতাকা দণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের ভাগ্য ডাভেল পতাকা দণ্ডের সাথেই যুক্ত ছিল। পতাকা দণ্ড ভেঙ্গে পড়ার কারণে আমাদের সৈন্য সংখ্যা আরো চার গুণ বেশী হলেও পরাজিত হতে হতো।

মহারাজ! মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পড়ার বিষয়টি মুখ্য নয়, আসল বিষয় হচ্ছে, আপনার রাজভাগ্য। বলল বুদ্ধিমান। মুসলিম বাহিনী যদি এভাবে একের পর এক দুর্গ জয় করতে থাকে তাহলে আপনার রাজধানী এবং শাসন ক্ষমতাও

সংকীর্ণ হয়ে আসবে। আপনি সব সময় আমাকে বিশ্বাস করেছেন এবং সতর্ক বুদ্ধিমান মনে করেছেন। আমার ওপর যদি এখনো আপনার আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থেকে থাকে তাহলে আমি কিছু কথা বলতে চাই, আশা করি আপনি তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না।

"ঠিক আছে আমি রাগ করবনা। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো উজির। ডাভেল শত্রুরা কব্জা করে নিয়েছে। মনে করো শত্রুদের হাত আমার গলা পর্যন্ত এসে গেছে।

"আমরা এজন্য পরাজিত হচ্ছি মহারাজ, আমরা আমাদের ভাগ্যকে কিছু মাটির তৈরী পুতুলের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছি। একটি পতাকা দণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে তো কি হয়েছে? এটিতো একটুকরো কাপড় আর একপ্রস্ত বাঁশ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। অথচ মন্দিরের পুরোহিতেরা আমাদের সমাজে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, এই পতাকাদণ্ড দেবতারা নিজ হাতে ধরে রেখেছে। তারা মানুষকে বুঝিয়েছে, এই পতাকা দণ্ড ভেঙ্গে পড়লে মনে করবে তোমরাও ভেঙ্গে পড়েছ, দেবতাদের অভিশাপে পতিত হচ্ছো তোমরা। অথচ আমাদের প্রজা ও সৈন্যদের যদি বোঝানো হতো এই পতাকা আমাদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক। এই পতাকা পর্যন্ত যেনো শত্রুরা কখনো আসতে না পারে। এভাবে লোকজনকে বোঝাতে পারলে পতাকার মান রক্ষার জন্য এরা জীবন বিলিয়ে দিতো।"

"জীবন দিতে তারা কসুর করেনি। মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পরার পর তখনকার সকল সৈন্য ও প্রজারা দুর্গফটক খুলে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল।"

সে কথা আমি জানি মহারাজ! ডাভেল থেকে আসা লোকের কাছ থেকে আমি সব খবর নিয়েছি। আমাদের সৈন্য ও ডাভেলের অধিবাসীরা মুসলিম সৈন্যদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেটি আক্রমণ ছিলনা মহারাজ! সেটিকে আত্মহত্যাই বলা উচিৎ। কারণ তারা সেই বিশ্বাস থেকেই শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল, পতাকা যেহেতু ভেঙ্গে পড়েছে, এখন আর শত্রুদের ঠেকানো যাবে না, তাই শত্রুদের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ো এবং মৃত্যু বরণ করো।"

"হ্যাঁ, ওরা মৃত্যুইতো বরণ করেছে। কিন্তু এই গণহত্যার জন্য আমি ডাভেলের শাসক ও সেনাপতিদের জীবিত থাকতে দেবোনা। জানিনা ওরা এখন কোথায় আছে?

"এ ধরনের ভুল মহারাজের করা উচিৎ হবেনা" বলল বুদ্ধিমান। তাদের জীবিত থাকতে দিন তবে তাদেরকে তিরস্কার করুন। তাহলে দেখবেন ভবিষ্যত যুদ্ধে এই অপমানের কালিমা দূর করার জন্য এরা জীবন বিলিয়ে দেবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে মহারাজ! তাদের মধ্যে যদি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়ে থাকে যে, পতাকা দণ্ড ভেঙ্গে পড়ার কারণে তাদের ওপর দেবতাদের অভিশাপ পড়েছে, তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা পরাজিত হতে থাকবে।"

"তাহলে আমি কি ওদের বলবো যে, তোমরা ধর্মান্তরিত হয়ে যাও।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল রাজা দাহির। আমি কি ওদের বলবো, মুসলমানদের ধর্ম সত্য, তাই তারা আমাদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করেছে। সত্য ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণেই তারা আমাদের দেবদেবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে?...বুদ্ধিমান! তুমি জ্ঞানী লোক। জ্ঞান-বুদ্ধি আমার চেয়ে তোমার বেশী হতে পারে কিন্তু জেনে রেখো, সিন্ধুতে আমি কখনো ইসলাম প্রবেশ করতে দেবো না।"

"আসতে আর না দেবেন কিভাবে, ইসলাম তো সিন্ধুতে এদের আগেই এসে গেছে মহারাজ! মহারাজ নিজেইতো ইসলামকে নিজের আঁচলে ঠাঁই দিয়ে রেখেছেন। যেসব আরবকে মহারাজ পরম আদর যত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, ওরা আমাদের হিতাকাঙ্খী নয় নিজ ধর্মের লোকদেরই হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই যদি না হবে তাহলে কে মুসলিম সেনাপতিকে বলল, মন্দিরের পতাকা ভেঙ্গে ফেলো, তাহলেই ডাভেলবাসীর পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাবে? কারণ শহরের দরজা বন্ধ ছিল। দুর্গের ভিতর থেকে কেউ বাইরে যায়নি, আরব সৈন্যদের পক্ষে এই রহস্য জানার কথা নয় যে, মন্দির চূড়ার পতাকা ফেলে দিলেই হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। এই রহস্য মাকরানে আশ্রিতরাই তাদের জানিয়েছে।

"ওদের বিরুদ্ধে এখন আমি কি ব্যবস্থা নিতে পারি?"

"কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয় মহারাজ! এখন ওদেরকে আপনার আরো কাছে টেনে নিতে হবে। ওদের সাথে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে জেনে নিতে হবে, মিনজানিক তৈরীর ফর্মুলা। তাদের মধ্যেও মিনজানিক তৈরী করার মত কারিগর থাকতে পারে। এ মুহূর্তে যদি আমরা দু'চার দশটি মিনজানিক তৈরী করে নিতে পারি, তাহলে মুসলিম সৈন্যদের ওপর রাতের অন্ধকারেও আমরা পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে পারবো। মুসলিম বাহিনী জায়গা

দখল করতে চাইলেও আমরা ওদের নতুন শিবির স্থাপনে বাধা দিতে পারবো।"

"এই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে দাও। মাকরাণী মুসলমানদের মধ্যে যদি মিনজানিক তৈরীর কারিগর না থাকে তবে তাদের মধ্যে বিশ্বস্ত কাউকে মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে মিনজানিক তৈরীর কৌশল শিখে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তুমি ওর মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করো, মিনজানিকের গঠনটা কেমন এবং কি কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। মিনজানিক তৈরীর কাজ শিখে আমাদের জানালে আমি তাকে এমন উপঢৌকন দেবো যে সাতপুরুষ খেয়েও শেষ করতে পারবে না।"

ডাভেল দুর্গের পতন ছিল রাজা দাহিরের জন্য অশনি সংকেত। রাজা দাহির উজিরের পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল কোন আনাড়ী লোক ছিলনা। দাহির নিজেও ছিল খুব ধূর্ত, চতুর চালবাজ। উজিরকে সে বাজিয়ে দেখতো। অবশ্য একথাও ঠিক উজির বুদ্ধিমান ছিল যথার্থই একজন বাস্তববাদী মানুষ। কিন্তু রাজা দাহির যেমন ছিল আত্মগর্বে বিভোর তেমনই অহংকারী ও অত্যাচারী। হিন্দু ধর্মের একনিষ্ঠ পূজারী ছিল দাহির। নিজ ধর্ম ও নিজের শাসন কাজে কারো নাক গলানোকে মোটেই সহ্য করতে পারত না। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হলে যে কাউকে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হতে চাইত না এই ক্ষমতা লিপ্সু রাজা। রাজা দাহিরের চাল ছিল খুবই জটিল। কখন কার ওপর সে খড়গ চালাবে কারো পক্ষে বলা সম্ভব হতো না। তার মুচকি হাসি, তিরস্কার ও বাঁকা চাউনির মধ্যে লুকিয়ে থাকতো অপার রহস্য। যার ফলে উজির, সেনাপতি শীর্ষ আমলা সবাই রাজাকে জমদূতের মতো ভয় করত। কোন পরাজিত সেনাপতিকে ক্ষমা করতো না দাহির।

উজির বুদ্ধিমানকে বিদায় করে দিয়ে প্রহরীকে কক্ষের দরজা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলো রাজা। একাকী বসে গেল চিন্তা ভাবনায়। তার রাজন্যবর্গ মন্ত্রী উজিরগণ খাস কামরার বাইরে মহা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমাণ। তারা একে অন্যের দিকে তাকানোরও যেনো সাহস পাচ্ছে না। তারা শঙ্কিত রাজা জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরিতে পরিণত হয়েছে, জানা নেই কখন কার ওপর এই আগুনের লাভা উদগীরণ করে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর রাজার খাস কামরার দরজা খোলার নির্দেশ শোনা গেল। দরজা খুলতেই রাজা নির্দেশ দিলো-জয়সেনাকে জলদি ডেকে পাঠানো হোক।

জয়সেনা ছিল রাজার অপর এক স্ত্রীর সন্তান। বহু পত্নী উপপত্নী ছিল রাজা দাহিরের। অবশেষে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য নিজ বোন মায়ারাণীকেও বিয়ে করে কিন্তু তার সাথে কোন দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেনি।

জয়সেনা ছিল দাহিরের সেনাবাহিনীর সিন্ধু ইউনিটের সেনাপতি। দাহির যখন জয়সেনাকে ডেকে পাঠালো তখন সে সিন্ধু অঞ্চলের নিরূনের একটি ময়দানে অবস্থান করছিল। রাজার নির্দেশে জয়সেনার উদ্দেশে তখনি রওয়ানা হয়ে গেল দূত।

মাঝ রাতের পর রাজধানীতে পৌছলো জয়সেনা। রাজা দাহির জয়সেনার অপেক্ষায় জেগে ছিল। সে ছেলেকে কোন বিশ্রামের অবকাশ না দিয়েই তার কক্ষে ডাকলো। কক্ষে এলে পরম মমতায় নিজের কাছে বসিয়ে বলল,

"প্রিয় বৎস! আমাদের মাথার উপর কেমন বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে তা কি তুমি আন্দাজ করতে পারছ?"

"আমি পুরোপুরি জ্ঞাত মহারাজ! আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি। এখনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে আপনাকে ভাবনার মধ্যে দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আমি এক্ষনই ডাভেল আক্রমণের কথা ভাবছি মহারাজ।

"শোন! যুবক আর প্রবীণের মধ্যে এইতো পার্থক্য। যুবকরা করে ভাবে আর প্রবীণরা ভেবে চিন্তে কাজ করে। তোমার জানা আছে, নিরূনও আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ঘটনাটা বিষের বড়ির মতো আমার গলায় আটকে গেছে।"

বাবা মহারাজ! আপনার কি জানা নেই, আরব সেনাপতি আমার চেয়েও কমবয়সী। আমার বয়স কম, আমি তরুণ এজন্য আমাকে বোকা মনে করবেন না মহারাজ!

তোমাকে আমি বোকা মনে করছিনা। তাছাড়া তোমার আর মুসলিম সেনাপতির মধ্যে আমি তুলনাও করছিনা। বর্তমান পরিস্থিতিটা আমি তোমাকে বুঝাতে চাচ্ছি। আমি যা বলতে চাই তা বুঝতে চেষ্টা করো, সেই সাথে এটাও অনুধাবন করতে চেষ্টা করো পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যুদ্ধটা এখন আর দু'জন শাসক আর দু'টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যুদ্ধ এখন দুটি ধর্মের সংঘাতে রূপ নিয়েছে। মুসলমানরা ডাভেল মন্দির চূড়ার পতাকা ভূপাতিত করে আমাদের দেবী ও ধর্মকে মিথ্যা করেছে। এখন আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে দেবদেবীদের অসম্মাণকারীরা তাদের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এ বিষয়টাও মাথায় রেখো।

মুসলমানদের যদি রোধ করতে না পারি তাহলে আমাদের বংশের নামে এই বদনাম ইতিহাস হয়ে থাকবে যে, আমরাই হিন্দুস্তানে মুসলমানদের আগমনের পথ খুলে দিয়েছি। যাক বেশী দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার সময় নেই। আরমান ভিলা ও ডাভেল হাতছাড়া হওয়াটা খুব মারাত্মক কিছু ছিলনা, কিন্তু রণকৌশলের দিক থেকে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শত্রুবাহিনী এখন দু'টি মজবুত দুর্গ কব্জা করে নিয়েছে। ডাভেল সিন্ধু অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দর। শত্রুরা এখন অনায়াসে সমুদ্র পথে সব ধরনের সামরিক সরঞ্জাম আমদানী করতে পারবে। এদিকে নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী যুদ্ধের আগেই শত্রুদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছে।"

"পিতৃ মহারাজ! আমার সেনাবাহিনীকে নিরূনে চড়াও করে দিয়ে সুন্দরশ্রীকে ঘরে নজরবন্দি করে আমরা নিরূনকে কব্জায় রাখতে পারি।"

"না, তাতে নিরূনের লোকেরা তোমাদের বৈরী হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, তোমাদের সেনাভিযানের কারণে নিরূনবাসী তোমাদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হবে। তুমি কি জানো না, উজির বুদ্ধিমান সুন্দরশ্রীর শাসনের বিরুদ্ধে ওখানকার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য যাদু টোনার আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতার মূলে ছিল আরব বাহিনী। হয়তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুন্দরশ্রী ওদের এনেছিল, নয়তো ওরাই এগিয়ে এসেছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে, আরবদের সাথে সুন্দরশ্রী তলে তলে মৈত্রী গড়ে তুলেছে।

"পিতৃ মহারাজ! আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি অকৃতজ্ঞ বৌদ্ধটাকে চিরদিনের জন্য গায়েব করে দিতে পারি।" বলল জয়সেনা।

না, তাও করা যাবেনা। এ ধরনের কিছু করতে চাইলে অনেক আগেই আমি তা করতে পারতাম। কিন্তু এ মুহূর্তে এ ধরনের কোন কাজ করা ঠিক হবেনা। কারণ শত্রুদের গোয়েন্দা এখন আমাদের প্রতিটি মহল্লায় রয়েছে, আমাদের দু'টি দুর্গ শত্রুদের দখলে চলে গেছে, এ মুহূর্তে ওই বৌদ্ধটাকে গায়েব করে দিলে নিরূনের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিদ্রোহ করতে পারে। আর সেই বিদ্রোহে শত্রু বাহিনীই লাভবান হবে। আমি ভাবছি, ডাভেল থেকে যখন মুসলিম বাহিনী আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য রওয়ানা হবে, তখন নানা ছলাকলায় সুন্দরশ্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসবো। আমার মনে হয় ডাভেল ত্যাগ করে শত্রু বাহিনী নিরূনের দিকেই অগ্রসর হবে। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমার সৈন্যদের নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ চলে যাও। নদী পেরিয়ে তোমাদের

ওপারে চলে যেতে হবে। যাতে নদী তোমাদের পিছনে থাকে। এতে সুবিধা এই হবে যে, শত্রু বাহিনী তোমাদের অজ্ঞাতে পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারবে না। নিরূনে আমাদের যে সেনাধ্যক্ষ আছে তার সাথে গোপনে সাক্ষাত করবে। তাকে বুঝাবে সে যেন কিছুতেই নিরূন হাতছাড়া হতে না দেয়।

"ওখানকার লোকেরা যদি আমাদের বাহিনীর জন্যেই কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে কি করতে হবে?"

"পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। যদি আমার কাছে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয়, তাহলে আমাকে দ্রুত বিষয়টি জানাবে। তাতে আমি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়ক্ষেপনের চেষ্টা করব।

আমি শত্রুবাহিনীর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে চিঠি লিখছি। তাতে আমি ওকে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করছি। আমি জানি দেশ ছেড়ে যে এতো দূর পর্যন্ত এসে আক্রমণ করার সাহস রাখে তাকে কোন কথায় ভয় দেখানো যাবে না, তবুও এতে আমি হাতে কিছুটা সময় পাবো আমার সেনাদের এই ফাঁকে সুবিধা মতো জায়গায় স্থানান্তরিত করে নেবো।" বলল রাজা দাহির।

জয়সেনা কোন বিশ্রাম না করে সেই বৈঠক থেকে উঠেই তার সেনা শিবিরের দিকে রওয়ানা করল।

ডাভেল দুর্গে আটকে যাওয়া হিন্দু সৈন্যদের বন্দি করা হলো। যেসব হিন্দু সৈন্য সশস্ত্র মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল ওদের অধিকাংশই মারা পড়ল। ডাভেলের সক্ষম নাগরিকদের মধ্যেও অধিকাংশ মন্দির চূড়া ভেঙ্গে পড়ার পর মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণে যোগ দিয়েছিল, ফলে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক লোকও মারা যায়। দুর্গ জয়ের পর বিন কাসিম বেসামরিক লোকদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে প্রাণ ভয়ে যেসব হিন্দু অধিবাসী দুর্গের বাইরে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও দুর্গে ফিরে এলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধলব্ধ পণ্যসামগ্রী ও ধন-সম্পদ সৈন্যদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে দিলেন, আর রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অংশ এবং বন্দিদেরকে জাহাজে তুলে ইরাক পাঠিয়ে দিলেন। আর হামিদ-বিন বিদায় নজদীকে ডাভেলের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন।

ডাভেলকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত শহরে পরিণত করার জন্য বিন কাসিম শহরের মাঝখানে একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং নিজ হাতে বিন কাসিম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন।

বর্তমানে বিন কাসিমের নির্মিত সেই মসজিদ যেমন দেখা যায় না, ডাভেল দুর্গও অবশিষ্ট নেই। সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাসে ডাভেল দুর্গ ও বিন কাসিমের অভিযান অক্ষয় অম্লান হয়ে আছে। সম্ভবতঃ হিন্দুস্তানের বুকে সেটিই ছিল প্রথম মসজিদ।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সদাচরণে দুর্গের হিন্দু অধিবাসীরা এতোটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা শ্রদ্ধাভক্তির আতিশয্যে বিন কাসিমের মূর্তি তৈরী করে তাঁকেই পূজা করতে শুরু করে দিয়েছিল। অবশ্য একথাটির পক্ষে মজবুত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক যে অধিবাসীরা ছিল মুসলিম শাসনে প্রীত ও মুগ্ধ।

বিন কাসিমকে আরো সামনে অগ্রভিযান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা তাড়া করছিল, কিন্তু শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় না করে তাঁর পক্ষে অগ্রাভিযান শুরু করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ তিনি শুধু দেশ জয় করা ও ধনরত্ন কব্জা করার জন্য হিন্দুস্তানে অভিযান করেন নি। তাঁর সামনে ছিল সুনির্দিষ্ট মিশন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম খালিদ বিন ওয়ালীদের মতোই জোরদার গোয়েন্দা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এ লক্ষ্যেই তিনি বিখ্যাত গোয়েন্দা বিশেষত্ব শা'বান ছাকাফীকে তার গোয়েন্দা প্রধান হিসাবে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি ডাভেল দুর্গে অবস্থান করলেও গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তিনি উরুঢ় ও নিরূনকেও তাঁর নখদর্পনের আওতায় নিয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন ডাভেল দুর্গের প্রধান ফটকের বাইরে আটজন শাহী অশ্বারোহী এসে থামল। তারা ফটকের প্রহরীদের জানালো তারা রাজা দাহিরের পক্ষ থেকে বিন কাসিমের জন্য জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমকে পয়গামবাহীদের খবর দেয়া হলো।

"গেট খুলে ওদের ভিতরে নিয়ে এসো এবং ওদের দূতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আর সৈন্যদের সরকারী মেহমানের মর্যাদায় আপ্যায়ন করো।" নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম।

রাজা দাহিরের দূত বিন কাসিমের সামনে গিয়ে মাথা ঝুকিয়ে কুর্নিশ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্য বলতে শুরু করলে, বিন কাসিমের দুভাষী তাঁর ভাষান্তরিত করে আরবীতে বলতে শুরু করল। বিন কাসিম দুভাষীকে বললেন, "ওকে বলো, এখানে উপস্থিতিই যথেষ্ট, আমরা মানুষের সামনে কোন মানুষকে মাথা ঝুকিয়ে কুর্নিশ করা পছন্দ করিনা, আমাদের ধর্মও তা

অনুমোদন করে না। তুমি ওর কাছ থেকে পয়গাম নিয়ে নাও, আর ওকে কক্ষের বাইরে অন্য কক্ষে বসিয়ে দাও।"

রাজা দাহিরের দূত প্রথম কোন আরব সেনাপতিকে দেখেছিল। সে বিন কাসিমের কথাবার্তা ও তার নীতিবোধ দেখে বিস্মিত হলো। আরো অবাক হলো এতো অল্প বয়সী এই তরুণ একজন গর্বিত বিজয়ী সেনাপতি। তদুপরি তাঁর আখলাক, ভাবভঙ্গি কত মার্জিত। দূত পয়গাম বিন কাসিমের হাতে দিয়ে পুনরায় অভ্যাস বশতঃ তাঁকে কুর্নিশ করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

দূত বেরিয়ে গেলে বিন কাসিম পয়গাম খুলে দেখলেন দাহির স্থানীয় ভাষায় পয়গাম লিখেছে। তিনি পয়গামটি দুভাষীর দিকে এগিয়ে দিলেন। দুভাষী পয়গাম পড়তে শুরু করল। ইতিহাস সেই পয়গামটি হুবহু সংরক্ষণ করেছে। রাজা দাহিরের পয়গামের বক্তব্য ছিল—

"এ পয়গাম রাজা চন্দ এর পুত্র দাহিরের পক্ষ থেকে যিনি সিন্ধু অঞ্চলের বাদশা আর হিন্দুস্তানের একজন রাজা। এটি সেই মহান রাজার পয়গাম সাগর, নদী পাহাড় জঙ্গল সর্বত্র যার নির্দেশে প্রতিপালিত হয়। আরবের এক অখ্যাত অল্প বয়স্ক অনভিজ্ঞ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি এ পয়গাম লিখা হচ্ছে, যে নরহত্যায় অত্যন্ত নির্মম আর যুদ্ধলব্ধ মালে গণীমতের লিপ্সু। যে অনভিজ্ঞ সেনাপতি তার সৈন্যদেরকে ধ্বংস আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার মতো বোকামীতে লিপ্ত।

হে অনভিজ্ঞ বালক, তোমার আগে আরো দু'জন সেনাপতি এমন অবাস্তব মানসিকতা নিয়ে এসেছিল যে, তারা সিন্ধুসহ গোটা হিন্দুস্তান জয় করে ফেলবে। তুমি কি ওদের করুণ পরিণতির কথা শোননি বা জানোনা? এই ডাভেল শহরের অধিবাসীরাই তাদেরকে এভাবে নাজেহাল করেছিল যে, তারা জীবন নিয়ে পালানোর অবকাশও পায়নি। ওরা আমাদের দুর্গ জয় করবে তো দূরে থাক, দুর্গপ্রাচীরের ধারে কাছেও ঘেষতে পারেনি। কিন্তু তুমিও সেই অবাস্তব কল্পনা নিয়েই এসেছ। ডাভেল দুর্গজয় করে তুমি মনে হয় খুবই আত্মশ্লাঘা অনুভব করছ, কিন্তু আমি তোমাকে সতর্ক করে বলছি, ডাভেল বিজয়ের ফলে তোমার গর্ব করার কিছু নেই। কারণ এটি আমার বিশাল রাজত্বের ছোট একটি দুর্গ মাত্র। যেখানে কিছু ব্যবসায়ী, বণিক ও দোকানী বসবাস করে। এরা লড়াই করতে জানেনা। কখনো তাদের লড়াই করার প্রয়োজন পড়েনি। এদের ওপরে তোমরা কিছু পাথর নিক্ষেপ করাতেই ওরা ভয় পেয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। তা ছাড়া ডাভেল দুর্গে আমাদের

উল্লেখযোগ্য কোন সৈন্যও ছিলনা। এটাকে তুমি বড় বিজয় কিংবা আমাদের পরাজয় মনে করার মতো বিষয় নয়।

আমাদের অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষদের একজনও যদি সেখানে থাকতো, তাহলে তোমাদের পরিণতিও আগের দুই সেনাপতির মতোই হতো।

তোমার তারুণ্যের প্রতি আমার মায়া হচ্ছে। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আর একপাও সামনে অগ্রসর হবে না। যতটুকু অগ্রসর হয়েছো সেখান থেকেই দেশে ফিরে যাও। আরো সামনে অগ্রসর হলে আমার ছেলে জয়সেনার মুখোমুখি হতে হবে তোমার। তুমি জানোনা, বড় বড় পরাক্রমশালী রাজা বাদশারাও তার ক্ষোভ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা পর্যন্ত তাকে ভক্তি করে। আমার ছেলে জয়সেনা সিন্ধু, মাকরান ও তুরানের শাসক। তার কাছে একশ জঙ্গি হাতি রয়েছে, যেগুলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে উম্মাদের মতো যুদ্ধ করে এবং শত্রু বাহিনীকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে। জয়সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সাদা হাতিতে আরোহণ করে, সে হাতি পর্যন্ত কোন অশ্বারোহী কিংবা বর্শাধারী সৈন্য যেতে পারেনা।

সামান্য একটু বিজয়ে তুমি এতোটাই গর্বিত হয়ে গেছ যে, তোমার বিবেকের ওপর পর্দা পড়ে গেছে। আমার হুঁশিয়ারি লঙ্ঘন করলে তোমাকেও সেনাপতি বুদাইলের পরিণতি বরণ করতে হবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম পয়গামের বক্তব্য শুনে মুচকি হাসলেন। তিনি সকল সেনাধ্যক্ষ, ডেপুটি সেনাধ্যক্ষ ও ডাভেলের শাসক হুমাইদ বিন বিদায়কে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে দুভাষীকে তাদের সামনে দাহিরের পয়গাম পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিলেন। দুভাষী আবারো পয়গাম সবার সামনে পড়ে শোনালে সবাই হাসতে লাগলেন।

"রাজা আমাকে অহংকারী মনে করেছে।" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন বিন কাসিম। অথচ সে নিজে কি একটা নির্বোধ ও পাষণ্ড নয়।...যাক, আমি এখন এর জবাবে যা লিখতে চাচ্ছি তা আপনারা সবাই শুনুন এবং মন্তব্য করুন।"

বিন কাসিম রাজা দাহিরের পয়গামের জবাবে কি লিখবেন তা জানালেন। শুনে সবাই বলল, এমন একজন অহংকারীর পত্রের জবাব এতোটা ভদ্রোচিত ভাষায় দেয়া উচিত হবেনা। অবশেষে সবার পরামর্শের ভিত্তিতে একটি জবাবী পয়গাম রচিত হলো। বিন কাসিম দাহিরকে যে পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন, ইতিহাস সেটাকেও সংরক্ষণ করেছে।

"এ পয়গাম সেই মুহাম্মদ বিন কাসিম ছাকাফীর পক্ষ থেকে লিখা হচ্ছে, যিনি অহংকারী রাজা মহারাজা ও বাদশাদের মাথা নীচু করার সামর্থ রাখেন। আর যিনি যে কোন মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নিতে সিদ্ধহস্ত। এই পয়গাম লিখা হচ্ছে, সেই অহংকারী, উন্মাদ দাহিরের কাছে যে একজন নির্বোধ, বেঈমান, চরিত্রহীন ও আপন বোনকে বিবাহকারী। যার এতটুকু বোধ নেই যে, পরিস্থিতি বদলাতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং পরিস্থিতি অহংকারী ও আত্মম্ভরিতাকারীদের গর্বকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়।

হে আহমক! তুমি উম্মাদের মতো মুর্খতা বশতঃ যা লিখেছ তা আমি পড়েছি। তাতে তো গর্ব অহংকার আর নীচুতা ছাড়া কিছু নেই। তোমার পয়গাম পড়ে আমি জানতে পারলাম, তোমার কাছে জঙ্গি হাতি, যাদু, অস্ত্র শস্ত্র ও সামরিক শক্তি রয়েছে। বুঝতে পেরেছি, এসব জিনিসের ওপর নির্ভর করেই তুমি গর্ব করছ। জেনে রেখো, আমার কাছে এতো শক্তি নেই কিন্তু আল্লাহর দয়া আর মেহেরবাণীই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।

হে কাপুরুষ! হাতি ঘোড়া আর সৈন্যবাহিনী নিয়ে কেন গর্ব করো। হাতিতো একটা মানুষের চেয়েও অক্ষম প্রাণী। যে নিজের শরীর থেকে একটা মাছিও তাড়াতে পারেনা। আমার যেসব সৈন্যকে তোমার দেশে অভিযান চালাতে দেখে তুমি বিস্মিত হচ্ছো, এরা সবাই আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহ এদের ভাগ্যেই বিজয় লিখে রেখেছেন। দেখবে এরাই বিজয়ী হবে কারণ এরা যে আল্লাহর প্রিয়।

শুনে রাখো, আমরা তোমার দেশে কখনো অভিযান চালাতাম না কিন্তু তোমার দুশ্চরিত্র, শত্রুতা আর মাত্রাতিরিক্ত অহংকার আমাদেরকে তোমার দেশে অভিযান চালাতে বাধ্য করেছে। সন্দ্বিপ থেকে আরবগামী আমাদের মুসাফিরদের জাহাজ তুমি লুট করেছ, তদুপরি তাদের বন্দি করেছ। অথচ তুমি জানতে, মুসলিম খলিফাকে সারা দুনিয়ার শাসকরা শ্রদ্ধা করে তাঁর শক্তিকে সবাই সম্মান করে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তুমিই এমন এক শাসক যে আমাদের শক্তিকে হেয় করেছ, আর গায়ে পড়ে আমাদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করেছ। তুমি ভুলে গেছ, তোমার বাপ-দাদা আমাদের খেলাফতকে কর দিতো। তুমি ক্ষমতায় বসে কর দেয়া তো বন্ধ করেই দিয়েছ, সেই সাথে মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু করে দিয়েছ। এজন্য খেলাফত থেকে তোমাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, যেখানেই তোমার ও আমার মধ্যে মোকাবেলা হোক না কেনো, আমরাই বিজয়ী হবো। তোমাকে অবশ্যই পরাজয়ের গ্লানী পোহাতে হবে। আমি হয় তোমার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ইরাক পাঠাবো নয়তো নিজের জীবন বিলিয়ে দেবো।

তুমি যেটাকে তোমার দেশে সেনাভিযান বলছো, এটা আমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর পথে জিহাদ। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা এযুদ্ধে এসেছি। আমরা কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই, তারই সাহায্য কামনা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের নিষ্প্রাণ মূর্তির বিপরীতে সদা জাগ্রত আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন।"

বিন কাসিমের এই পয়গাম দাহিরের দূতের হাতে দিয়ে বিদায় করা হলো।

আজ থেকে সাড়ে বারো'শ বছর আগে সিন্ধু অঞ্চলের যে অবস্থা ছিল, তা এখন আর নেই। সিন্ধু নদী বহুবার তার গতিপথ বদল করেছে। এখন আর একথা কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় বিন কাসিমের অভিযানের সময় সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশের মূল রাস্তা কোনটি ছিল। সিন্ধু তীরের কোন জায়গায় কোন ধরনের লোকজনের বসতি ছিল। সেই যুগের কোন চিহ্নই আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সিন্ধু নদের সাথে যুক্ত ছিল আরো বহু শাখা প্রশাখা, অসংখ্য খাল নালা। যেগুলো সিন্ধু নদীতে এসে পতিত হয়েছিল। এখন আর সেই সব শাখা প্রশাখা নেই। অধিকাংশই শুকিয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। প্রবাহ বন্ধ হয়ে খাল-নালা ঝর্ণাগুলোও জমিনের সাথে মিশে গেছে।

সেই সময় ব্রহ্মণ্যবাদে ছিল সিন্ধু অঞ্চলের একটি বড় শহর। রাজা দাহিরের ছেলে জয়সেনা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্রহ্মণ্যবাদে অবস্থান নিল। যে সময় রাজা দাহির তার ছেলেকে ডাভেল থেকে প্রায় আড়াই'শ মাইল দূরের রাজধানী উরুঢ়ে বলছিল, এই যুদ্ধ এখন আর দু'জন শাসক আর রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়, "এই যুদ্ধ এখন দু'টি ধর্মের আদর্শিক সংঘাতে পরিণত হয়েছে।" ঠিক সেই দিন ডাভেলে মুহাম্মদ বিন কাসিম জুমার খুতবায় সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "এই অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের অর্জিত হয়েছে, আমরা বন্দিদের মুক্ত করেছি, হিন্দুদের পরাজিত করে শাস্তি সরূপ কিছু সংখ্যককে ইরাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি। গণীমতের মাল এবং করও আদায় করেছি কিন্তু বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের ওপর আরো কর্তব্য রয়ে গেছে।"

বিন কাসিম বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা দেখেছ, মন্দির চূড়ায় উড্ডীন পতাকা লুটিয়ে পড়তেই হিন্দুরা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। ওদের বিশ্বাস ছিল মন্দির চূড়ার পতাকা যতোক্ষণ অবিচল থাকবে ততোক্ষণ তাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এরা মাটি পাথরের মূর্তি পূজা করে, কাল্পনিক দেবদেবীকে এরা মাবুদ মনে করে, আল্লাহর সাথে এদের কোন পরিচয় নেই। এরা জানেই না, আল্লাহ সব চেয়ে ক্ষমতাবান, তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক সমকক্ষ নেই। একমাত্র আল্লাহই মানুষের ইবাদতের যোগ্য। তোমরা কি দেখনি, আল্লাহ মানুষের ইবাদতের যোগ্য। তোমরা কি দেখনি, আল্লাহর সৃষ্ট মাখলুক হয়েও এরা আল্লাহকেই জানেনা। আল্লাহর পবিত্র নামের সাথেও এদের পরিচয় নেই। ওদের প্রভু হলো পতাকা, পুতুল, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। এদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। রাজা দাহির তার ছেলেকে যখন বলছিল, আমাদের একথা প্রমাণ করতে হবে দেবদেবীদের অসম্মানকারী দেবদেবীদের অভিশাপ থেকে কখনো রেহাই পায় না। ঠিকই সেই সময় বিন কাসিম তাঁর সহযোদ্ধাদের বলছিলেন, আমাদের ওপর কর্তব্য হলো, এদেরকে বুঝিয়ে দেয়া যেসব দেবদেবীর কাল্পনিক মূর্তি বানিয়ে তোমরা পূজা-অর্চনা করো, এরাতো নিজেদের গায়ে বসে থাকা একটা মাছি তাড়ানোর ক্ষমতাও রাখেনা।

বিন কাসিম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এদেশের যে কোন মানুষের সাথে তোমাদের দেখা হয় তাহলে সম্মান ও ইজ্জতের সাথে তাদের সাথে কথা বলবে, তাদের মর্যাদা মমতা ও মায়া দিয়ে মন জয় করতে চেষ্টা করবে। তাদের একথা বুঝাতে চেষ্টা করবে, আরব অনারব সবাইকে এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু অযৌক্তিক ভাবে তোমরা নিজেরা মাটি পাথর দিয়ে প্রভু তৈরী করেছ। তোমরা যদি এখানকার মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে আমরা আল্লাহর সেই নির্দেশ অমান্যের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবো, যে নির্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমরা যদি কাউকে গোমরাহীর পথে চলতে দেখো তবে তাদের সঠিক পথ দেখাও।" একাজটি এমন যে, কোন দৃষ্টিহীন মানুষকে আছাড় খেতে খেতে পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখে তার হাত ধরে সঠিকপথে উঠিয়ে দেয়ার মতো।

রাজা দাহির বিন কাসিমের অগ্রাভিযানকে দু'টি ধর্মের সংঘাত বলে অভিহিত করে আর বিন কাসিম সেটিকে হক ও বাতিল, সত্য এবং মিথ্যার

সংঘাত বলে চিহ্নিত করেন। বিন কাসিম দুর্গ জয়ের পর পরই হাজ্জাজকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফও যথা সময়ে করণীয় সম্পর্কে পয়গাম বিন কাসিমকে জানিয়ে দিলেন। হাজ্জাজ বললেন, সঠিক সময়ে সমুদ্রপথে তোমার রসদ পৌঁছে যাবে। আমি প্রয়োজন মতো সব ধরনের জিনিসই পাঠিয়েছি।

মুহাম্মদ বিন কাসিম গোয়েন্দা বিভাগকে খুবই সক্রিয় রেখেছিলেন। তাঁর একান্ত গোয়েন্দাদের সাথে আরো যোগ হয়েছিল স্থানীয় কিছু সংখ্যক সামরিক কর্মী। এরা বিন কাসিমের সৎব্যবহারে মুগ্ধ ও ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে সর্বান্তকরণে বিন কাসিমকে সহযোগিতা করছিল। এছাড়া আলাফী চারজন চৌকস যুবককে বিন কাসিমের সহযোগিতার জন্য পাঠিয়েছিলেন, এরা এই এলাকার ভাষা ও পথঘাট সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। তা ছাড়া গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী নিজেই তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ছদ্মবেশে নিরূন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে আসেন। বাকী সব গোয়েন্দা সদস্য ছদ্মবেশে সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুদের অবস্থা ও সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত করছিল।

গোয়েন্দা রিপোর্টে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, রাজা দাহির দুর্গের বাইরে এসে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হবেনা। এ থেকে এই সমীকরণ করা সম্ভব ছিলনা যে, রাজা দাহির সম্মুখ মোকাবেলার সাহস রাখেনা। মুহাম্মদ বিন কাসিম গোয়েন্দা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বুঝতে পেরেছিলেন, রাজা দাহির এমন কোন ময়দানে সম্মুখ সমরে মোকাবেলা করতে চায় যখন মুসলিম বাহিনীর সমরশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে, তারা দীর্ঘ সফরের ধকল সইতে না পেরে ক্লান্ত ও অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়বে। বিন কাসিম বুঝতে পারলেন, রাজা দাহির মুসলিম সৈন্যদেরকে বিভিন্ন দুর্গ জয় করে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিতে চায়। পরপর জয়ের আগ্রহে বিন কাসিমের বাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা যখন বেড়ে যাবে, রসদ কমে আসবে, সক্ষম যোদ্ধারা হয়ে পড়বে ক্লান্ত তখন ডাভেল বন্দর থেকে রসদ পৌঁছার পথ বন্ধ করে দেবে দাহির এবং বন্দর থেকে দূরের কোন সুবিধা জনক ময়দানে বিন কাসিমের সৈন্যদের চ্যালেঞ্জ করবে দাহির বাহিনী।

বিন কাসিম দাহিরের সম্ভাব্য রণকৌশল সম্পর্কে সেনাধ্যক্ষদের অবহিত করলেন।

তিনি সেনাপতিদের বললেন, আপনারা সবাই অভিজ্ঞ যোদ্ধা। বন্দর থেকে রসদ ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত রাখতে আমাদের উচিত দাহিরের রাজধানী পর্যন্ত যে কয়টি দুর্গ আছে সবগুলো কব্জা করে নেয়া। পথে কিছু বসতি রয়েছে এগুলোকেও কব্জা করে নিয়ে ওখানে আমাদের কিছু সৈন্য মোতায়েন করতে হবে। তারা ঝটিকা টহল দিয়ে রসদ সাপ্লাই পথ উন্মুক্ত রাখবে।

অগ্রবর্তী গোয়েন্দারা যে সব রিপোর্ট দিয়েছিল, তা থেকে বিন কাসিম জানতে পারেন, সামনে সবার আগে রয়েছে সিসিম নামের একটি ছোট ধরনের দুর্গ। এর পরই নিরূন (হায়দারাবাদ) অবস্থিত। বিন কাসিমের টার্গেট হলো হায়দারাবাদ। ডাভেল থেকে তখনকার হায়দারাবাদের পথ সোয়াশ মাইলের কম ছিলনা।

হায়দারাবাদ এলাকা থেকে সাকিরা নামের একটি ছোট্ট নদী ডাভেল দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। নদী ছোট হলেও গভীর এবং স্রোতস্বীণী। বিন কাসিম সবগুলো মিনজানিক মাঝারী নৌকাতে বোঝাই করে নদী পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে নৌকা বোঝাই করে আরো প্রচুর রসদ সামগ্রীও নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

কয়েকদিন পর নৌকার একটি বহর নদী পথে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। নৌকা বহরে পালতোলা নৌকা যেমন ছিল, দাড়টানা মাঝি মাল্লা চালিত নৌকাও ছিল। নৌকার রসদপত্র রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক তীরান্দাজকে নৌকা বহরের আশেপাশে নিয়োগ করা হলো। যাতে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করতে চাইলেও নৌকার ধারে কাছে যেতে না পারে। তা ছাড়াও নদীর উভয় তীরে মোতায়েন করা হলো অশ্বারোহী ইউনিট। এরা নৌবহরকে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

নৌবহর রওয়ানা করিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট মতো ছক আঁকা পথ ধরে অবশিষ্ট সৈন্যরা স্থলপথে অগ্রসর হচ্ছিল। শা'বান ছাকাফী ডানে বামে ও সামনে গোয়েন্দা দল নিযুক্ত করে রেখেছিলেন সন্দেহজনক কোন লোককে দেখতে পেলেই তাকে পাকড়াও করার জন্য। তাদের চেষ্টা ছিল রাজার বাহিনীর অজ্ঞাতে নিরূন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু এমনটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। কারণ নদীর উভয় তীরে বহু বসতি পল্লী ছিল। এসব পল্লীর লোকেরা নৌবহর পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া অশ্বারোহীদের দেখে বিদেশী সৈন্য বলে চিনতে পেরেছিল। তাছাড়া নদীতেও বিচরণকারী বহু সাধারণ মানুষেরও দেখা পেয়েছিল মুসলিম নৌবহর।

তখন শ্রাবন মাস। প্রচণ্ড গরম। আরব দেশের মানুষের জন্য গরম কোন অসহ্যকর বিষয় নয়। তারা মরুভূমির লু'হাওয়ায় বেড়ে ওঠে, তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে মরুভূমিতে ঘোড়া দৌড়াতে অভ্যস্ত কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলের গরম তাদের কাছে অচেনা, এ যেন শরীরের সব পানি শুষে নেয়।

এক পর্যায়ে সিসিম দুর্গের কাছে নৌবহর পৌছে যাত্রা বিরতি করল। দু'দিনপর পদাতিক সৈন্যরাও সেখানে পৌছাল। বিন কাসিম সবাইকে ক্যাম্পিং এর নির্দেশ দিলেন। সেই রাতে বসরা থেকে এক দূত পয়গাম নিয়ে এলো। ডাভেল দুর্গ হয়ে স্থলপথে সে সিসিম পৌছল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পয়গাম নিয়ে এসেছে দূত। হাজ্জাজ লিখেছেন-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পক্ষ থেকে সেনাপতি বিন কাসিমের নামে...। আমরা কায়মনো বাক্যে তোমাদের বিজয়ের জন্য দোয়া করছি। আশা করি বিজয়ী বেশেই তুমি ফিরে আসবে। আল্লাহ পাকের রহমত ও নুসরতে আমাদের শত্রুরা দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করবে এবং চিরদিনের জন্য পরকালের আযাবে নিপতিত হবে। শত্রুদের হাতি, ঘোড়া, ধনদৌলত তোমাদের কব্জায় যাবে মনের মধ্যে এ ধরনের কোন লিপ্সা জায়গা দিওনা। ধনসম্পদ প্রাপ্তির চেয়ে এটা কি বেশী সুখকর নয় যে, সকল সহযোদ্ধাদের নিয়ে তুমি দুনিয়াতে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করবে। সম্পদের লোভ যদি না করো তাহলে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে...। তোমাদের নিয়ে আমরাও গর্ব করতে পারবো।

বিজিত এলাকার ছোট বড় প্রতিটি লোকের সাথে তোমাদের আচরণ হবে প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। শত্রুদেশে বিজয় লাভের পরও ওখানকার মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করবে যে, দেশটি তাদেরই। কোন দুর্গ বিজয়ের পর প্রাপ্তধন সম্পদ কখনো নিজের কব্জায় রাখবেনা। সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। কোন সৈনিক যদি খাবার মতো জিনিস বেশীও নিজের কাছে রাখে তবে তা ছিনিয়ে নিও না, তাকে তিরস্কারও করোনা। বিজিত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পর জরুরী পণ্য সামগ্রীর দাম নির্ধারণ করে দেবে। যেসব পণ্য ডাভেল দুর্গে পড়ে রয়েছে, সৈন্যদের প্রয়োজনে সেগুলো ব্যয় করবে। ডাভেল দুর্গের কোষাগারে পড়ে থেকে অব্যবহারের কারণে যাতে কোন পণ্য নষ্ট না হয়। কোন দুর্গ বা অঞ্চল জয় করার পর সেখানকার দুর্গকে আগে সুরক্ষিত করবে এবং খেয়াল করবে লোকজন যাতে নির্ভয়ে জীবনযাপন করতে পারে।

বিজিত এলাকার মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করবে এবং সেখানকার কৃষক, ব্যবসায়ী ও সকল পেশার লোকজন যাতে সুখে শান্তিতে নিজ নিজ কাজ করতে পারে তা লক্ষ্য রাখবে। ওখানকার কৃষি জমিগুলো যাতে অনাবাদি না থাকে। আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করুন। ২০ রজব ৯৩ হি. ৯১২ খৃ.।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের এই পয়গাম বিন কাসিমকে আরো উজ্জীবিত করল। তিনি সেনাবাহিনীর সকল সেনাধ্যক্ষ ও কমান্ডারদের তলব করে এ চিঠি পড়ে শোনালেন এবং বললেন, সকল সৈন্যকেই পয়গাম পৌছে দিতে।

দু'দিন সিসিমে অবস্থান করেই বিন কাসিম (নিরুন) হায়দারাবাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। নৌকা বহরও নৌপথে এগিয়ে চলল। সাতদিন এক নাগাড়ে পথ চলার পর বিন কাসিমের বাহিনী নিরুনের নিকটবর্তী বলহার নামক স্থানে পৌছল।

বলহার এসে বিন কাসিমের বাহিনী পানি সংকটের সম্মুখীন হলো। এলাকাটি ছিল পানি শুন্য। ধারে কাছে কোথাও সামান্যতম পানির উৎস পাওয়া গেল না। মনে হচ্ছিল এখানে কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। সৈন্যদের গমন পথ আর নদীর মধ্যে দূরত্ব অনেক। সেনাবহরে পর্যাপ্ত পানি ছিলনা। দীর্ঘক্ষণ পানি পান না করায় তৃষ্ণায় ঘোড়া ও উটগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিল। যতোটুকু পানি সেনা বহরে সংরক্ষিত ছিল এ দিয়ে বড়জোড় একদিন পাড়ি দেয়া সম্ভব। এমন অবস্থায় আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ঝুকি বাড়ানোর বিষয়টি সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

ভরদুপুরে সূর্যের তাপে পরিস্থিতি আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠল। বিন কাসিম ভরদুপুরে সকল সৈন্যকে একত্রিত করে বৃষ্টির জন্য বিশেষ (ইস্তিসকার) নামাযের মাধ্যমে মোনাজাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সকল সৈন্য এক জায়গায় জমায়েত হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাড়ালো। সবাই বিন কাসিমের ইমামতিতে দু'রাকাত নামায আদায় করল। নামায শেষে সেনাপতি বিন কাসিম আবেগপূর্ণ ভাষায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। সেই ঐতিহাসিক দোয়ার কথাগুলোও ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে। বিন কাসিম মোনাজাতে বললেন-

"হে পথভ্রষ্ট পথহারা বিপন্ন বান্দাদের পথ প্রদর্শক প্রভু! হে ফরিয়াদির ফরিয়াদ শ্রবণকারী রব! তোমার ভাষা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর বরকতে আমাদের আবেদন কবুল করো...।"

ইতিহাস লিখেছে সেই দিন বিন কাসিমের মুখে আর কোন কথা উচ্চারিত হচ্ছিল না, ভাবাবেগে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, আর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মোনাজাত শেষ করতে না করতেই চারিদিক অন্ধকার করে এমন মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হলো যে, মরুভূমিতেও পানি জমে সাগর সদৃস্য রূপ ধারণ করল। বৃষ্টিতে বিন কাসিমের সৈন্যরা পরম তৃপ্তির সাথে পানি পান করল এবং বহণযোগ্য পরিমাণ পানি সংগ্রহ করে নিলো। সেই স্থানে একদিন অবস্থান করে বিন কাসিম পর দিনই নিরূনের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন।

নিরূন থেকে সেনাবাহিনী কিছুটা দূরে থাকতেই তাদের দিকে এক উষ্ট্রারোহীকে আসতে দেখা গেল। লোকটি সোজা চলমান সেনাবাহিনীর সেই অংশের দিকে অগ্রসর হলো যে অংশে বিন কাসিম অশ্বারোহণ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সে ছিল মুসলিম গোয়েন্দা। ছদ্মবেশে নিরূন থেকে সে গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে এসেছিল। আরোহী সোজা বিন কাসিমের সামনে গিয়ে থেমে গেল।

" কি খবর এনেছ? গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

"সম্মানিত সেনাপতি! নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী হঠাৎ নিরূন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।"

"কোথায় গিয়েছেন তিনি? তার কি হদীস নেই?

"তিনি জরুরী তলবে রাজধানীতে গেছেন বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।"

"শহরের লোকদের মনোভাব কি?

"শহরের লোকজন লড়াই করতে চায়না। কিন্তু রাজা নিরূনের সেনাপ্রধান পরিবর্তন করেছে। নতুন সেনাপতির নির্দেশে সেনারা লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছে। মুসলিম বাহিনী শহরে ঢুকতে পারলে পাইকারী লুটতরাজ করবে, নারী শিশুদের ধরে নিয়ে যাবে। কারো ঘরের কিছুই থাকবেনা। শহরের সকল খাদ্য পণ্য ওরা নিয়ে যাবে।"

"এর মানে হলো সেনাবাহিনী মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত?"

"জী হ্যাঁ' সেনাপতি। সেনারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।"

বিন কাসিম সেনাদের চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত নিরূন দুর্গ অবরোধ করলেন। সেই সাথে ঘোষণা করে দিলেন, নিরুনের সৈন্যরা যদি বিনা যুদ্ধে দুর্গ আমাদের কাছে হস্তান্তর না করে আমাদেরকে যদি দুর্গ দখল করতে হয় তাহলে কোন সামরিক যোদ্ধার প্রাণ রক্ষা হবে না।

নিরূন শাসক সুন্দরশ্রীকে রাজধানীতে ডেকে পাঠানো ছিল একটা চক্রান্তের অংশ। মুসলিম বাহিনী নিরূনের দিকে অগ্রাভিযান করছে এ সংবাদ পেয়ে রাজা দাহির জরুরী পরামর্শের কথা বলে নিরূন শাসক সুন্দরশ্রীকে রাজধানীতে আসার খবর পাঠায়। কারণ নিরূন শাসক মুসলমানদের সাথে আগেই মৈত্রী চুক্তি করেছিল এবং মুসলিম সুলতানকে কর দিতেও সম্মত হয়েছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন কাসিমকে এক পয়গামে বলেছিলেন, তিনি নিরূন পৌঁছলে নিরূন শহরের প্রবেশপথ উন্মুক্ত পাবেন, তাকে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থাও থাকবে। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য নিরূন দুর্গের প্রবেশপথ খোলা ছিল না। শহরের প্রবেশ পথ বন্ধ হলেও তিনি শহরের ওপর মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ তাতে বেসামরিক বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ তাঁর গোয়েন্দারা খবর দিয়েছে শহরের লোকজন মোকাবেলা করতে অনিচ্ছুক। হিন্দু সৈন্যরা শহরবাসীকে নানাভাবে উস্কাতে চেষ্টা করছে।

রাজা দাহির রাজধানীতে নিরূন শাসক সুন্দরশ্রীকে বিনা প্রয়োজনে আটকে রাখে। রাজা ভেবেছিল নিরূনে তার পাঠানো নতুন সেনা প্রধান শহরবাসীদের সঙ্গী করে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

এভাবে কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন সকালে রাজা দাহির সুন্দরশ্রীকে তার একান্ত কক্ষে ডেকে পাঠালেন। রাজার কাছে খবর গেল নিরূন শাসকের জন্য অতিথিশালার যে কক্ষ বরাদ্ধ ছিল তাতে তিনি নেই। সম্ভাব্য সব জায়গায় তাকে তালাশ করা হলো কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। আসলে পাওয়ার কথাও নয়। সুন্দরশ্রী ততোক্ষণে রাজধানী ত্যাগ করে বহু দূর চলে গেছেন। তীব্র বেগে ঘোড়া দৌড়িয়ে নিরূনের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন সুন্দরশ্রী। তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীরাও রাজধানী থেকে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। আসলে তারাও নিরূন শাসকের সাথেই ফিরে যাচ্ছিল।

কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিম শহরে প্রবেশ করতে না পেরে নিরূন অবরোধ করলেন। কিন্তু শহর দখলে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে তিনি দ্বিধান্বিত হয়ে অনুগত স্থানীয় এক চৌকস গোয়েন্দাকে এই বলে রাজধানীতে সুন্দরশ্রীর কাছে পয়গাম পাঠালেন, "শহরের প্রবেশ পথ বন্ধ। আমাদের প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না, অথচ আপনার সাথে রয়েছে আমাদের মৈত্রী চুক্তি। আপনিও শহরে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় আমি কি করব? দ্রুত আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

সুন্দরশ্রীর কাছে যথারীতি পৌঁছে গেল বিন কাসিমের গোয়েন্দা। খবর পেয়েই সুন্দরশ্রী বিচলিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, আরে এ জন্যই তো

টালবাহানা করে রাজা আমাকে এখানে আটকে রেখেছে, অথচ কোন জরুরী কথা হচ্ছে না আমার সাথে। তিনি একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের বললেন, আমাদের এক্ষুণই নিরূন ফিরে যেতে হবে। দুর্গ থেকে এভাবে ঘোড়াগুলোকে বাইরে নেবে যে, আমরা চলে যাচ্ছি এমন সন্দেহ যাতে কেউ করতে না পারে। কারো সন্দেহ হোক বা না হোক রাজধানী ত্যাগ করে নিরূন রওয়ানা তারা করবেনই এমন পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরূন শাসক কৌশলে দুর্গ থেকে বেরিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে নিরূনের পথ ধরলেন। রাত পেরিয়ে তারা যখন নিরূন পৌঁছলেন তখন বেলা অনেক ওপরে ওঠে গেছে। সুন্দরশ্রী অবরোধ ডিঙ্গিয়ে শহরের প্রধান ফটক দিয়ে শহরে এলেন। অবরোধ তখনো নিষ্ক্রিয়। অবরোধকারীরা কোন আক্রমনাত্মক তৎপরতা তখনও করেনি। সেদিন শেষে রাত নেমে এলো।

নিরূন শাসককে দেখে অবরোধ প্রতিরোধকারী সৈন্যরা প্রধান ফটক খুলে দিল। সুন্দরশ্রী শহরে প্রবেশ করে ফটক আর বন্ধ না করার নির্দেশ দিলেন। তিনি একান্ত একজন নিরাপত্তা রক্ষীকে দিয়ে বিন কাসিমের কাছে পয়গাম পাঠালেন, "আপনি আসুন, শহরে প্রবেশ করুন। এ শহর আপনি ও আপনার সহযোদ্ধাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।"

অবাক করার মতো কাণ্ড ছিল বিন কাসিমের জন্য। নিরূন শাসক অতিপুরনো বন্ধুত্বের মতো বিন কাসিমকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানালেন। মূল্যবান উপহার উপঢৌকন দিলেন এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গোটা মুসলিম বাহিনীকে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আরো ঘোষণা করলেন, নিরূনের অধিবাসীরা বিন কাসিমের যোদ্ধাদের বিশ্বস্ত থাকবে।"

বিন কাসিম ভেবেছিলেন নিরূনের হিন্দু সৈন্যরা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীকে নিরূনের অধিবাসীরা এতোটাই আনন্দচিত্তে বরণ করে নিলো যে, হিন্দু বাহিনীর আশঙ্কা হলো, তারা কোন ধরনের বিরূপতা দেখালে মুসলিম বাহিনীর আগে নিরূনের অধিবাসীরাই তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

পর্ব সাত

হে নির্বোধ আরববাহিনী! তোমরা এ অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে দিতে পারবে বটে কিন্তু পৌত্তলিকতা এদেশের মানুষের রক্তের সাথে মিশে গেছে। পৌত্তলিকতার প্রেতাত্মাদের এ দেশ থেকে নির্মূল করতে পারবে না।

নিরূন হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ছিল রাজা দাহিরের জন্য খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু আরমান ভিলা বেদখল হয়ে যাওয়ার পর দাহিরের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিরূনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গশহর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় রাজা দাহিরের প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নিরূন বেদখল হয়ে যাওয়ার পর রাজা দাহিরের প্রাসাদে তার সকল পরিষদ ও মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ এবং উপদেষ্টারা সমবেত হলো।

একজন সামরিক উপদেষ্টা বলল, "মহারাজ! আরববাহিনীকে নিরূন থেকে আর সামনে অগ্রসর হতে দেয়া যাবে না।"

আমাদের নির্দেশ দিন মহারাজ! আমরা অকৃতজ্ঞ সুন্দরশ্রীকে গোষ্ঠীসহ নিপাত করে দেই। আর ওর শরীর থেকে মাথা দ্বিখণ্ডিত করে আপনার পায়ের কাছে এনে ফেলে দেই, বলল অপর একজন সামরিক কর্তকর্তা।

শুনতে পেলাম আরব বাহিনীর সেনাপতি একটা বালক। কিন্তু ওর চাল চলন খুবই তেজস্বী। আমাদের সামরিক কৌশল পরিবর্তন করা দরকার, মহারাজ! বলল অপর একজন।

"ওকে রাজধানী পর্যন্ত আসতে দেয়া ঠিক হবেনা মহারাজ! আমরা ওদের নিরূনেই শেষ করে দিতে পারি, বলল অপর এক সেনাধ্যক্ষ।

'মহারাজ! আমরা নিরূন অবরোধ করতে পারি। ওদের মিনজানিকগুলো এখনো বহুদূরে নদীতে রয়ে গেছে।" বলল আর একজন সামরিক উপদেষ্টা।

রাজা দাহির পিছনে হাত বেধে তার কক্ষে পায়চারি করছিল। তার দৃষ্টি অবনত। যখন তার উদ্দেশ্যে কেউ উপদেশ দিতো, রাজা এক পলক

আড়চোখে কড়া দৃষ্টিতে তাকে একটু দেখে নিতো। প্রত্যেকের পরামর্শ শুনে রাজা দাহির রহস্যজনক ভঙ্গিতে একটু শুষ্ক হাসির ভাব করতো। যতোলোক রাজার দরবারে হাজির ছিল, প্রত্যেকেই কোন না কোন কথায় রাজাকে উপদেশ দিল। সবার কথা বলা শেষ হলে কক্ষে নেমে এলো নীরবতা। রাজা দাহিরের পায়চারির সামান্য আওয়াজ ছাড়া কক্ষে কারো নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল না।

এক পর্যায়ে পায়চারিরত রাজা থেমে গেল। রাজা দাহিরের অভ্যাস এই ছিল যে, সে যখন কোন কথা বলতো, তখন পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন শব্দে উচ্চ আওয়াজে বলতো। ঘুমন্ত মানুষও তার আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠত। আর সে যখন কোন শাহী ফরমান জারী করতো, তখন তার সিংহাসনে বসে রত্নখচিত হীরের তরবারীর হাতলে মুষ্টিবদ্ধ করে এমন এক ধরনের গাম্ভীর্য কণ্ঠে ঘোষণা দিতো যে, দেখে মনে হতো সে শুধু সিন্ধু অঞ্চলের নয় যেন গোটা মহাভারতের মহারাজা।

তখন তার সকল দরবারী রাজা দাহিরের দিকে এক পলকে তাকিয়ে থেকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যেতো।

সকল উপদেষ্টা ও সেনাকর্মকর্তাদের পরামর্শ শোনার পর রাজা দাহির তার সিংহাসনে আরোহণ করে সকলের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। অতঃপর মহারাজার মতো ভাবগাম্ভীর্য কণ্ঠে বলল, "আমি ওদেরকে এখানে আসতে দেবো, কিন্তু ওরা আসবে বটে তবে আমাদের পায়ের নীচে ওদের গর্ব অহংকার মিটিয়ে দেয়ার জন্যে আসবে। কোন আরব মায়ের নির্বোধ শিশুটি হয়তো এখন নিজেকে জঙ্গলের বাঘ ভাবছে। আমরা তাকে একথাই বলে দিতে চাই, সেই মূর্খ বাঘ বটে কিন্তু রাজধানী এসে সেই বাঘ দেয়ালের দূরে বসে নিজের ক্ষতস্থানগুলো চাটবে। তোমরা কি জানোনা, সিন্ধু অঞ্চলের সিংহ জয়সেনা ওর পথে পাহাড়ের মতো প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা জেনে রেখো, ব্রাহ্মণাবাদে এক আরব বালক ও এক সিন্ধি যুবকের মোকাবেলা হবে। এরপরই নির্ধারিত হবে এদেশে হিন্দুত্ববাদ থাকবে না ইসলাম। তোমরা হৃদয়ে একথা ভালো ভাবে লিখে নাও যে, আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনা বাহিনীকে প্রতিরোধ করছিনা, ইসলামকে প্রতিরোধ করছি যা অতি অল্প সময়ে বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

তোমরা কেউ জানো, কেন এতো অল্প সময়ে চারদিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে? শহরের প্রধান হিন্দু পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে দাহির বলল, ঋষি মহারাজ! এখন আপনি ওদের সেই কারণটি জানিয়ে দিন।

'ইসলাম প্রসার লাভ করার কারণ হলো, এ পর্যন্ত ইসলামের মোকাবেলা হয়েছে যেসব ধর্মের সাথে সেই সব ধর্ম সত্য ছিলনা।" বলল পণ্ডিত। এক দিকে ছিল অগ্নিপূজারী পারসিক আর অপর দিকে ছিল যীশুখৃস্টের পূজারী খৃস্টান। এসব ধর্মের নিজস্ব কোন শক্তি ছিলনা। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম দেবদেবীদের ধর্ম। আমাদের দেবদেবীরা ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে আগুন বর্ষণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে একটি পাহাড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে বসিয়ে দিতে পারে। ইচ্ছা করলে শত্রুদের ওপর পাহাড় চাপিয়ে দিতে পারে। এসব মুসলমান হিন্দুদেরকে অগ্নিপূজারী আর খৃস্টানদের মতো মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের দেশে চলে এসেছে।

"আমাদের ধর্ম এমন এক ধর্ম আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত যে ধর্মের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে পারে।" বলল রাজা। ধর্ম ও দেশের জন্য আত্মদানকারী নারীকে দেবতারা মাটি থেকে উঠিয়ে আকাশে তুলে নেন এবং তাদেরকে দেবতাদের সান্নিধ্যে রাখেন।"

"মহারাজের জয় হোক! আমাদের নারী সমাজ তখনই কেবল আত্মদান করবে যখন আমরা সবাই মরে যাবো" বলল এক প্রবীণ যোদ্ধা।

'আরে আমি যা বলেছি, তুমি তা বুঝতে পারনি। আমাদের তরুণী মেয়েরা ইতিমধ্যে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে।

কি যেন নাম... ছেলেটার! বলল পণ্ডিত। হ্যাঁ, বিন কাসিম। সে তরবারী আর যুদ্ধটাকে একটা খেলা মনে করছে। সে বুঝতে পারছেনা, দেবদেবীদের আগুন নিয়ে খেলছে সে। আমাদের কোন সুন্দরী তরুণী যদি ওর সামনে চলে যায় তাহলে ওর হাত থেকে তরবারী পড়ে যাবে। কোন বোকা শিশুকে যদি সামান্য একটা খেলনা দেখাও তাহলে হাতের দামি খেলনাটাও সে ফেলে ওইটার প্রতি ঝুঁকবে এমনটা কি তোমরা কখনো দেখেছ? সবাইকে জিজ্ঞেস করল পণ্ডিত।

"কিন্তু এসব ম্লেচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা এখন সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করিনি।" বলল রাজা। ওকে যখন উন্মুক্ত ময়দানে আমাদের মুখোমুখি আসতে বাধ্য করব, তখন সে সব মারপ্যাচ ভুলে যাবে। আমরা তাকে এমন খারাপ অবস্থায় আমাদের সামনে আনবো যে, হাত জোড় করে আমাকে বলবে, মহারাজ! ভগবানের দোহাই, আপনি আমাকে আপনার কাছে আশ্রয় দিন। বলল রাজা দাহির।

রাজা দাহিরের সেই দিনের বৈঠকে উজির বুদ্ধিমান ছিলনা। উজির বুদ্ধিমান রাজ মহলেরই অপর একটি কক্ষে রাজার স্ত্রীরূপী বোন মায়ারাণীর

সাথে বৈঠক করছিল। যে সুন্দরী অস্ত্র প্রয়োগের কথা রাজা বৈঠকে সামরিক উপদেষ্টাদের জানালো, সেই কৌশল প্রয়োগের নানা বিষয় নিয়ে বুদ্ধিমান মায়ারাণীর সাথে কথা বলছিল। মায়ারাণী ও বুদ্ধিমান এই কৌশল প্রয়োগের দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়েছিল।

ইতিহাস সাক্ষী, দু'টি জাতি ধোঁকা প্রতারণা এবং কাপুরুষতাকে অস্ত্রের চেয়েও বেশী মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত করেছে, তন্মধ্যে একটি হলো ইহুদি আর অপরটি পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দু। ইহুদিরা কখনো প্রকাশ্য রণাঙ্গনে মুসলমানদের মোকাবলায় অবতীর্ণ হয়না। ইহুদিরা সব যুগেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। ওদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার সম্পদ আর প্রশিক্ষিত সুন্দরী নারী। হিন্দুদের ইতিহাসও কাপুরুষতা, দুর্নীতি ও চক্রান্তের বেড়াজালে ভরপুর। হিন্দুরা যখনই রণাঙ্গনে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে তখন ওদের সুন্দরী ললনাদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে। পরবর্তীতে এই নারীদের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের শিকড় কেটেছে। হিন্দুদের নারী অস্ত্র প্রয়োগের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুগল শাসক আকবর। যে জন্য এখনো হিন্দুরা আকবরকে মোগলে আযমের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। মোগল সম্রাট আকবরের হেরেম হিন্দু চক্রান্তকারীরা প্রশিক্ষিত ও ধোকাবাজ রমণীদের দিয়ে ভরে ফেলেছিল। হিন্দু রমণীদের ফাঁদে পড়ে মোগল শাসক আকবর এতোটাই বিভ্রান্ত হয়েছিল যে, পৌত্তলিকতা, খৃস্টবাদ ও তৌহিদের মিশ্রণ ঘটিয়ে সে 'দীনে ইলাহী' নামে একটি কুফরী মতাদর্শের জন্ম দিয়েছিল।

যে জাতি মেয়েদের এক রাতের স্বামীর স্পর্শ পাওয়ার পর বিধবা হলে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে সেই জাতির পক্ষে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কন্যা জায়েদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দেয়া নিন্দনীয় না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

নিরূনবাসী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে এভাবেই তাদের শহরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল যেন কোন অবতার আসমান থেকে জমিনে অবতরণ করেছে। বিন কাসিম নিরূন শাসক সুন্দরশ্রীকে স্বাধীন শাসকের মর্যাদায় অভিসিক্ত করলেন। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি জাহিল বাসরী নামে এক সহযোদ্ধাকে নিরূনের কোতোয়াল নিযুক্ত করলেন। অতঃপর শহর শাসন সম্পর্কে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানে এটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল তখনকার নিরূন আর বর্তমানের হায়দারাবাদের কোন মসজিদটির ভিত্তি মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজ

হাতে করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম নিরূন শহরের কব্জা পূর্ণ করলেও অগ্রাভিযান শুরু করা সম্ভব ছিলনা। কারণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশনা মতো সাহায্যকারী রসদপত্র পৌঁছা এবং সামানপত্র পরিবহণের পথ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার আগে অগ্রাভিযান ছিল অসম্ভব। বিন কাসিম এ বিষয়টা যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, রাজা দাহিরের লক্ষ আরব সৈন্যদের ডাভেল বন্দর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া; যাতে তাদের রসদ সরবরাহ পথ দীর্ঘ হয় আর সরবরাহ লাইন নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

রাস্তা নিরাপদ রাখার পাশাপাশি গোয়েন্দাদের অগ্রিম অনুসন্ধানী তৎপরতাও জটিল হয়ে উঠল। আরব সৈন্যরা সিন্ধু অঞ্চলের যতোই ভিতরে প্রবেশ করছিল তাদের জন্যে পথ ঘাট, শত্রু পক্ষের অবস্থান ও স্থানীয় ভাষা ইত্যাকার সমস্যাবলী তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠল।

এদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল সিন্ধু অভিযানের দিকে। তিনি রীতিমত সরবরাহ পাঠাচ্ছিলেন। সরবরাহ পাঠাতে ডাভেল বন্দর প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হলো।

মুহম্মদ বিন কাসিম কোন সামরিক সংঘর্ষ ছাড়াই নিরূন শহর দখল করেন। নিরূনের পরিবর্তিত সেনাধ্যক্ষ বিন কাসিমের শহরে পদার্পণের সময়েই কয়েকজন জুনিয়রকে নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে শহর ত্যাগ করেছিল। অথচ বিন কাসিমের কাছে গোয়েন্দারা খবর দিয়েছিল, নিরূনের সেনাবাহিনী এখন মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কিন্তু নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী যখন দাহিরের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিরূন পৌঁছলেন এবং শহরে প্রবেশ করেই প্রহরীদেরকে প্রধান গেট খুলে দিয়ে আরব বাহিনীকে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করলেন, তখন শহরের বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মুসলিম সৈন্যদের স্বাগত জানায় এবং সেনা বাহিনীকেও প্রতিরোধ থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেয়।

নিরূনবাসীর প্রতিক্রিয়া ও গোয়েন্দাদের পূর্ব রিপোর্টের ভিত্তিতে বিন কাসিম এই সিদ্ধান্তে উপণীত হলেন, হিন্দু সৈন্যরা যে কোন সময় আমাদের জন্য হুমকি হতে পারে। সেই ধারণা থেকে শহর দখলে আসার পর তিনি হিন্দুদেরকে একটা ময়দানে সমবেত করে দুভাষীর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

"হিন্দু রাজের সৈন্যরা শোনো, তোমাদের মধ্যে এখনো হয়তো এই ভয় রয়েছে যে, আমরা তোমাদের হত্যা করব। অবশ্য তোমাদের বেলায় তাই

হওয়া স্বাভাবিক ছিল। দুনিয়া জুড়ে এই রীতিই চলে এসেছে যে, বিজিত রাজ্যের সৈন্যদেরকে বিজয়ী বাহিনী হত্যা করে কিন্তু এই নীতি সেই শাসকের সৈন্যরাই করে থাকে যারা রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করে। এরা পরাজিত সৈন্যদের বিপদের ঝুঁকি মনে করে হত্যা করে। আমরা সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন করার লিপ্সা নিয়ে এদেশে আসিনি। আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্র পয়গাম নিয়ে হিন্দুস্তানে এসেছি। তোমরা পরাজিত হয়েছ বলে তোমাদের ওপর আমরা আমাদের ধর্ম-চাপিয়ে দেবোনা। আমরা তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছি অবশ্য সেই সাথে তোমাদেরকে আহ্বান করছি তোমরা আমাদের ধর্মকে দেখো, যদি তোমাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম সত্য মনে হয় তাহলে তা গ্রহণ করো; সেই সাথে একথাও ভেবে দেখার কথা বলব, তোমাদের কথিত দেবদেবীর যেসব মূর্তি আমাদেরকে শহরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, ওরা তোমাদের কি উপকার করতে পারবে। ওরাতো নিজেদের শরীর থেকে একটা মাছিও দূর করতে পারে না। এসব মানুষের তৈরী প্রভু। আসলে ইবাদতের উপযুক্ত মাত্র একজন, যিনি নিরাকার অদ্বিতীয় যিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

মনে রাখবে, তোমাদের ক্ষমা করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, তোমরা স্বাধীনতা পেয়ে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে উঠবে। এমন তৎপরতায় লিপ্ত হলে মনে রেখো, তোমাদের কোন তৎপরতাই আমাদের অজানা থাকবেনা। মনে রাখবে, তোমাদের প্রতিটি কথা আমাদের কানে পৌঁছবে। তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই তোমাদের কেউ যদি শহর থেকে চলে যেতে চাও তবে যেতে পারো, কিন্তু সে আর এই শহরে আসার অনুমতি পাবে না।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তাৎক্ষণিত ভাবেই কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের ইসলাম গ্রহণের প্রধান কারণ হয়তো ছিল জীবনাশঙ্কা। কারণ সামরিক সদস্যদেরকেও সাধারণ ক্ষমার আওতায় ক্ষমা করে দেয়া হবে এটা অনেকের বিশ্বাস হচ্ছিল না। জীবন রক্ষার জন্য এদের কেউ তাৎক্ষণিক রক্ষাকবচ হিসাবে ইসলাম গ্রহণকেই যৌক্তিক মনে করেছিল। কিন্তু সকল সৈন্যকেই যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো, তখন অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে এরা "আরব শাহজাদার জয়" 'শ্লোগানে ময়দান মুখরিত করে তুললো।

শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে চরম ভীতি বিরাজ করছিল। কারণ আরমান ভিলা মুসলিম বাহিনী কব্জা করার পর থেকেই

শহরের মন্দিরগুলোতে পুরোহিত পূজারীদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছিল, মুসলিম মানে অত্যাচারি জালেম। ওরা কোন শহর দখল করলে সেখানকার কোন ঘরের জিনিসপত্র অক্ষুন্ন রাখেনা এবং যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে শ্লীলতাহানি ঘটায়।

কিন্তু নিরূনের অধিবাসীরা দেখলো হিন্দু পুরোহিতদের সব প্রচারণাই অবাস্তব। বিজয়ী মুসলিম সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে লুটতরাজ তো দূরের কথা কোন ঘরে উঁকি দিয়েও দেখেনি। শহর জুড়ে সুশৃঙ্খল নিরাপত্তা বিরাজমান। পণ্ডিত পুরোহিতদের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এবং মুসলিম বাহিনীর অভাবনীয় সদাচার শহরের অধিবাসীদের এতোটাই মুগ্ধ করেছিল যে, বিন কাসিম শহরের কেন্দ্রস্থলে যে মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করেন স্থানীয় অধিবাসীরা স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে সেই মসজিদ নির্মাণে সৈন্যদের সাথে সহযোগিতা করেছিল।

শহরের নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনে বিন কাসিমের কয়েক দিন ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে। তিন চার দিন পর এশার নামাযান্তে সারা দিনের ক্লান্তি ও পরিশ্রমে কারণে নিজের জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষে তিনি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় প্রহরীরা তাকে খবর দিলো, স্থানীয় কিছু সংখ্যক মহিলা প্রধান সেনাপতির সাথে সাক্ষাত করতে চায়। বিন কাসিম সাথে সাথেই তাদেরকে ভিতরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন।

সাক্ষাত প্রার্থীদের মধ্যে সাত আটজন ছিল যুবতী আর একজন অর্ধবয়স্কা মহিলা। তারা সবাই ছিল হিন্দু এবং একজনের চেয়ে অপরজন সুন্দরী।

ভিতরে প্রবেশ করেই তারা সবাই হিন্দু রীতি অনুযায়ী বিন কাসিমকে হাত প্রসারিত করে প্রণাম করল। অর্ধবয়স্কা মহিলা সামনে অগ্রসর হয়ে বিন কাসিমের পায়ে সিজদা করল। বিন কাসিম মহিলাকে সিজদা করতে দেখে পিছনে সরে গেলেন। এরপর যুবতীরা অগ্রসর হয়ে কেউ তাঁর হাতে চুমু খেতে লাগল, আর কেউ তাঁর জামা ধরে চোখে লাগাল সেই সাথে প্রাণখোলা আবেগপূর্ণ ভাষায় তাঁর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করতে লাগল। বিন কাসিম সাথে সাথে তাঁর দুভাষীকে ডেকে তার মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন।

তিনি জানতে চাইলেন, রাতের বেলায় তোমরা এখানে কেন এসেছ?

বয়স্কা মহিলা বলল, এসব তরুণীকে বেশ কিছু দিন ধরে মাটির নীচে গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই লুকানো অবস্থা থেকে এদেরকে বের করে আনা হয়েছে। আমাদের লোকজন এদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল।"

'লুকিয়ে রেখেছিল কেন?'

"আমাদেরকে বলা হয়েছিল মুসলিম সৈন্যরা যে শহর জয় করে প্রথমেই সেই শহরের যুবতী তরুণীদের ধরে এনে সৈন্যরা ভাগাভাগি করে নেয়।" বলল অর্ধবয়স্কা মহিলা। আমাদের আরো বলা হয়েছিল, মুসলমান খুবই হিংস্র জাতি, এদের আচার ব্যবহার হিংস্র জন্তুর মতো। মুসলিম সৈন্যরা যখন শহরে প্রবেশ করছিল, তখন শহরের সকল হিন্দু তরুণী যুবতীদেরকে যে যেখানে পেরেছে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমাদের যেমনটা বলা হয়েছিল মোটেও তেমন কিছু হয়নি। গতকাল আমরা জানতে পেরেছি, আপনি সামরিক বেসামরিক সবার জন্যই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আমাদের যে ধরনের ভয় দেখানো হয়েছিল, আপনার সৈন্যরা যদি তেমনই হতো তাহলে ইতিমধ্যে তেমন কিছু ঘটত। কিন্তু আপনার সৈন্যদের সদাচার, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা দেয়ার কথা শুনে সকল তরুণী যুবতীদেরকেই লুকানো অবস্থা থেকে বের করে আনা হয়। কোন বিরূপতা না দেখে সবাই অবাধে শহর জুড়ে ঘোরা-ফেরা করে কিন্তু আপনার কোন সৈন্য অত্যাচার উৎপীড়ন করবে তো দূরে থাক কোন তরুণীর প্রতি তাকিয়েও দেখেনি।"

"তোমারতো কোন ভয় ছিল না, তুমিতো বার্ধ্যকে উপনীত হয়েছো।"

'এরা আমাকে নিয়ে এসেছে। আপনার মহানুভবতা, মমতা ও দয়ার কথা শুনে এরা আপনাকে দেখার জন্য, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এরা আপনার দয়ার জন্য আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। কেন এরা আপনার কৃতজ্ঞতা জানাবে না, চেয়ে দেখুন, এদের মতো সুন্দরী রূপসীদের প্রতি কোন বিজয়ী সৈন্যরা হাত না বাড়িয়ে থাকতে পারে? এদের আগ্রহকে সম্মান দিয়ে আমি তাদের এখানে নিয়ে আসতে রাজি হয়েছি।"

'তোমরা যেটাকে বিস্ময়কর মনে করেছ, এটা আমাদের কাছে মোটেও বিস্ময়কর নয়, আমরা এতো দূর থেকে আনন্দ স্ফূর্তি করতে আসিনি। আমরা তোমাদেরকে বাদী দাসী বানাতেও আসিনি। তোমাদের ইজ্জত সম্মান ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। এটা আমাদের ধর্মের নির্দেশ। তোমরা এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।'

"তরুণীদের মনোভাব এমন ছিল যে, তারা কেউ এখান থেকে ফিরে যেতে চায়না। একতো এরা প্রত্যেকেই ছিল সুন্দরী রূপসী, তদুপরি এদের অঙ্গভঙ্গিও ছিল যে কোন পুরুষের মধ্যে কামনা জাগানোর মতো উত্তেজক। কিছুক্ষণ পর আবারো বিন কাসিম তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ

করিয়ে দিলে তরুণীরা ঘর ছেড়ে যেতে উঠল কিন্তু তরুণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রূপসী তরুণী তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। সে বলল,

'আমি আরো কিছু সময় আপনার সামনে একান্তে থাকতে চাই।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে তুমি?'

'আপনাকে মানুষ নয় দেবতা মনে হয়। আমি আপনাকে জানতে চাই, আপনাকে বুঝতে চাই।"

অর্ধবয়স্কা মহিলা অন্যদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সে ভিতরে থাকা তরুণীর জন্য অপেক্ষা করে অন্যদের নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দুভাষীও বেরিয়ে গেল। শুধু সেই তরুণী বিন কাসিমের কক্ষে রয়ে গেল।

পরদিন সকাল বেলায় শোনা গেল শহরের প্রধান পুরোহিতকে মন্দিরের ভিতরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই খবর দিনের আলো বেড়ে ওঠার সাথে সাথে শহরব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। মুহাম্মদ বিন কাসিম অমুসলিমদেরকেও ধর্মীয়, স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ যার যার মতো নিজ নিজ ধর্মালয়ে উপাসনা করছিল। এমতাবস্থায় শহরের সুরক্ষিত প্রধান মন্দিরের গ্রান্ডপুরোহিতের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটি কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। খবরের নানা ডালপালা গজিয়ে শহরময় নানা গুঞ্জনের জন্ম দিল। প্রধান সেনাপতি বিন কাসিমের কানেও গেল সেই খবর। তিনি যথাসম্ভব দ্রুত মৃত্যুর কারণ উদঘাটনের জন্যে গোয়েন্দা বিভাগকে নির্দেশ দিলেন। গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী সাথে সাথে ছুটে গেলেন অকুস্থলে। শা'বান ছাকাফী মন্দিরের ভিতরে শয়ন কক্ষে পুরোহিতের মৃতদেহ দেখেই বলে ফেললেন, একে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বিন কাসিমের কাছে বিষ প্রয়োগে হত্যার রিপোর্ট দিলেন।

বিন কাসিম রিপোর্ট শুনে বললেন, এটা উদঘাটনের চেষ্টা করুন, বিষ প্রয়োগের সাথে কোন মুসলমান জড়িত কি না।

শা'বান ছাকাফী মন্দিরের অন্যান্য পুরোহিত ও সেখানে অবস্থানকারী দেবপুত্রদের (যেসব ছেলেদেরকে শৈশবেই দেবতার নামে মন্দিরে উৎসর্গ করা হয় অথবা মন্দিরে অবস্থানকারী দেবদাসীদের পাপাচারে যেসব ছেলে সন্তান জন্ম নেয় তাদেরকে দেবপুত্র বলে) প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করেন, জানতে চাইলেন, প্রধান পুরোহিতেব সাথে কারো কোন ধরনের শত্রুতা ছিল কি-না। ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, গভীর রাতে একজন সুন্দরী তরুণী

মন্দিরে এসে প্রধান পুরোহিতের কক্ষে প্রবেশ করে কিন্তু সে কখন মন্দির থেকে বেরিয়ে গেছে এ সম্পর্কে কেউ কিছুই জানাতে পারলো না।

আচ্ছা! সেই তরুণীর নাম শিমুরাণী? এক পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন শা'বান। হ্যাঁ ওর নাম শিমুরাণী, বলল এক পুরোহিত।

শা'বান ছাকাফী শিমুরাণীর কথা শুনে নিহত পুরোহিতের কক্ষে গিয়ে কক্ষটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন, কক্ষে একটি পানপাত্র পড়ে আছে এবং সেই পাত্রে এক দুই ঢোক খাবার পাণীয়ও অবশিষ্ট রয়েছে। শাবান ছাকাফী পানপাত্রটি তুলে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এসে একটা কুকুর কিংবা বিড়াল ধরে আনার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যে একটি কুকুর ধরে নিয়ে এলো। শা'বান ছাকাফী কুকুরের মুখ হ্যাঁ করিয়ে পানপাত্রের অবশিষ্ট পাণীয়টুকু কুকুরের গলায় ঢেলে দিলেন এবং কুকুরটিকে ছেড়ে দিতে বললেন। কুকুরটি ছাড়া পেয়ে দৌড় দিলো কিন্তু সামান্য এগিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সেই সাথে কয়েকটা ঝাকুনি দিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল কুকুরটি। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল কুকুরটি প্রাণ ত্যাগ করেছে।

শিমুরাণী এখন কোথায়? মন্দিরের পুরোহিত ও দেবপুত্রদের জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা প্রধান।

সবাই অজ্ঞতা সূচক জবাব দিল। শাবান ছাকাফী সবাইকে মন্দিরের দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। এরা ছিল সংখ্যায় ১২ জন। ১২ জন তীরন্দাজকে ওদের থেকে আট দশ গজ দূরে দাঁড় করিয়ে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেকেই ওদের দিকে একটা করে তীর তাক করো।

গোয়েন্দা প্রধান নির্দেশ দিলেন, শিমুরাণী কোথায় আছে যে সেই কথা বলবে তাকে প্রাণে বাঁচানো হবে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। গোয়েন্দা প্রধানের নির্দেশে তীরন্দাজরা কামানের ধনুক দিয়ে তীর ছোঁড়ার জন্য উদ্যত হলো এমন সময় হঠাৎ এক পুরোহিত বলে উঠল 'আমি বলব'। সাথে সাথে শা'বান ছাকাফী তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেললেন। পুরোহিত গোয়েন্দা প্রধানের কাছে ব্যক্ত করল, রাতেই সে জানতে পারে শিমুরাণী বড় পুরোহিতকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। রাতের বেলায় অপর এক পুরোহিত বড় পুরোহিতের কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল শিমুরাণী তখন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বড় পণ্ডিত তখন বহুকষ্টে শুধু এতটুকুই বলতে পেরেছিল, "ওকে ধরো আমাকে বিষ খাইয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।" বড় পুরোহিতের কথা অন্য লোকেরা তাড়াতাড়ি শিমুকে পাকড়াও করে এবং সকাল বেলায় শহরের

দরজা খোলা হলে পুরুষের পোষাক পরিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

'কোথায় নিয়ে গেছে? জিজ্ঞেস করলেন ছাকাফী।

'এতক্ষণে সে হয়তো উরুঢ়ের অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে।" বলল পুরোহিত। উরুঢ় পৌঁছলেই ওকে হত্যা করে ফেলা হবে।

"ওকে হত্যা করাই উচিত, প্রধান পুরোহিতের হত্যা কোন সাধারণ অপরাধ নয়" বললেন ছাকাফী।

শিমুকে হয়তো কিছুদিন শাস্তি দেয়া হবে বলল, পুরোহিত। অপরাধ শুধু এই নয় যে, সে প্রধান পুরোহিতকে খুন করেছে। তার বড় অপরাধ হলো যাকে খুন করানোর জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল তাকে বিষ পান না করিয়ে সে পণ্ডিতের জীবন নিয়েছে।

'কাকে বিষ খাওয়ানোর জন্যে পাঠানো হয়েছিল?

'আপনার প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে?

'শিমু হয়তো মন্দিরে এসে বলেছিল কেন সে আমাদের সিপাহসালারকে বিষ পাণ করায়নি।'

'না সে এসেই বড় পণ্ডিতের কক্ষে ঢুকে পড়েছিল।'

বল এই মন্দিরে আর কি কি চক্রান্ত হয়? তোরা অসুস্থ কুকুরের মতো যদি ধুঁকে ধুঁকে মরতে না চাস, তাহলে বল, এখন তোদের সবার জীবন মরণ আমার হাতে' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে বললেন গোয়েন্দা প্রধান।

'মিথ্যা নয় সত্যই বলব,' প্রতিশ্রুতি দিলো পুরোহিত। সে বলল, গত রাতে এক মহিলা কয়েকজন তরুণীকে নিয়ে আপনার সিপাহসালারের কাছে গিয়েছিল। সেটি হলো একটা চক্রান্ত। আমরা খবর পেয়েছিলাম, মুসলিম সৈন্যরা সুন্দরী মেয়েদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আমাদের রাজার প্রধান উজির বুদ্ধিমান খুবই জ্ঞানী লোক। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার তরুণ লোক। সুন্দরীদের ফাঁদে সে অবশ্যই ধরা দেবে এবং ভোগ বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে অগ্রাভিযান বন্ধ করে দেবে। শিমুর প্রতি নির্দেশ ছিল সে সিপাহসালারের কাছে থেকে যাবে এবং তার রূপের যাদু ও ছলনা দিয়ে তাঁকে ভুলিয়ে রাখবে। এমতাবস্থায় আমাদের রাজা একদিন মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ করবে ঠিক সেই সময় শিমু সিপাহসালারের পানিতে বিষ প্রয়োগ করবে।

"কি ভাবে বিষ দেয়ার কথা ছিল?

"শিমুর হাতে যে আংটিটি ছিল সেটির টোপটি ছিল ঢাকনা ওয়ালা। কাছ থেকে দেখেও কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলনা এর মধ্যে ঢাকনা আছে।" বলল পুরোহিত। ঢাকনার ভিতরে বিষ মাখানো তুলা ভরা ছিল। এই বিষ এতোটাই ভয়াবহ যে, মুহূর্তের মধ্যে একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। তরুণীর পক্ষে আপনার সেনাপতির পাণীয়দ্রব্যে বিষ প্রয়োগ করা মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিলনা। কিন্তু বলা যাচ্ছে না এই পরিকল্পনা কি করে উল্টো হয়ে গেল। আপনি আমার জীবন ভিক্ষা দেয়ার ওয়াদা দিয়েছেন, আমি আপনার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জানাতে চাই, আপনার সিপাহসালারকে বাঁচিয়ে রাখুন। এটা হিন্দুস্তান। রহস্যময়ী, যাদুটোনা আর তিলিসমাতির জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত। আপনি দুর্গের পর দুর্গ জয় করতে পারেন, লড়াইয়ের ময়দানে বিজয়ী হতে পারেন, কিন্তু একদিন না একদিন এই চক্রান্তের ফাঁদে আপনাকে অবশ্যই আটকে ফেলা হবে।"

টার্গেট ব্যর্থ হওয়ার পর হিন্দু চক্রান্তকারীরা অর্ধবয়স্কা মহিলা ও তরুণীদেরকে অস্বাভাবিক কৌশল ও দ্রুততায় নিরূন থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল। চক্রান্তের উৎস উদঘাটিত হওয়ার পর গোয়েন্দা প্রধান মন্দিরের সকল পুরোহিত ও বাসিন্দাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। পুরোহিতরা স্বীকার করে নিয়েছিল বিন কাসিমকে হত্যার চক্রান্তে তারাও জড়িত ছিল। তারা একথাও জানালো এর চক্রান্তের মূল হোতা রাজা দাহিরের প্রধান উজির বুদ্ধিমান ও মায়ারাণী।

'আমরা তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলাম।' বললেন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তোমাদের ওপর আমরা কোন চাপ সৃষ্টি করিনি। তোমরা আমাদের এই উদারতার প্রতিদান হিসাবে আমাদের সিপাহসালারকেই হত্যা করার চক্রান্ত ফেঁদেছ। এর অর্থ হলো তোমরা নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছ।"

'হে দখলদার আরব! আমি জীবন ত্যাগ করতে পারি কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে বলল পুরোহিত। আমরা শুধু তোমার সেনাপতিকেই হত্যা করতে চাইনি, হত্যা তালিকায় তুমিও ছিলে। তোমার সেনাবাহিনীর ছোট বড় সকল সেনাধ্যক্ষ ও কমান্ডারকেও হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

তোমাদের সাথে আমাদের কোন বৈষয়িক শত্রুতা নেই, শত্রুতার মূল কারণ ধর্ম। আমরা ধরা পড়লে নির্ঘাৎ নিহত হবো এই আশঙ্কা থাকার পরও

জেনে শুনেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিলাম। তোমরা তোমাদের ধর্মের জন্য যেভাবে জীবন ত্যাগ করতে পারো, আমরাও ধর্মের জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

'খুবই নির্বোধ তোমরা। বাতিলের অনুসারীদের অবস্থা এমনটাই হয়ে থাকে, প্রকৃত বাস্তবতা এরা অনুধাবন করতে পারে না।'

'হে নির্বোধ আরব সৈনিক! আমি তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হবনা' তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে বলল পুরোহিত। আমার জীবনটাতো তোমাদের তরবারীর আঘাতের জন্য অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

শোনো, তোমাকে একথা বলে দিচ্ছি। তোমরা এই অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে দিতে পারবে বটে কিন্তু হিন্দুত্ববাদ মানুষের রক্তের সাথে বিষের মতো মিশে থাকবে এবং ধীরে ধীরে সনাতন ধর্মের প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমাদের আত্মাগুলো প্রেতাত্মা হয়ে এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবে। পুরোহিত দু'হাত প্রসারিত করে ওপরে উঠিয়ে বলল, আমি তোমাকে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি, শুনে রেখো–তোমাদের সিপাহসালার মুহাম্মদ বিন কাসিম শেষ পর্যন্ত নিহত হবে। হিন্দুদের হাতে যদি সে নিহত নাও হয় তবে আপনজনদের হাতে হলেও সে নিহত হবে।'

'কেন সে নিহত হবে? জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা প্রধান। আমার দৃষ্টি বহুদূর দেখতে পারে। বলল পুরোহিত। হে সৈনিক, আমি জ্যোতিষী বা গণক নই, কিন্তু দিব্য দৃষ্টিতে আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাই তোমাকে বললাম।'

"তোমরা হয়তো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নয়তো জ্ঞানান্ধ পুরোহিত? সত্য উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান তোমাদের নেই নয়তো সত্যকে সত্য জেনেও তোমরা তা স্বীকার করো না।" বললেন গোয়েন্দা প্রধান। অতঃপর পুরোহিতকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

সে দিনই মুহাম্মদ বিন কাসিম নিরূনের সকল মন্দির বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং হিন্দুদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে পূজা অর্চনা করার হুকুমজারী করলেন। সেই সাথে মন্দিরের চক্রান্তে জড়িত সকল পুরোহিতের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।

নিরূনে যখন চক্রান্তকারী পুরোহিতদের মৃতুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় রাজা দাহিরের রাজধানীতে হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধের

অপরাধী হিসেবে অবনত মস্তকে মায়ারাণী ও উজির বুদ্ধিমানের সামনে শিমু দণ্ডায়মান। পথিমধ্যে শিমুকে কোন পানাহার করতে দেয়া হয়নি। তার হাত পা রশিতে বাধা ছিল। দীর্ঘ ভ্রমণে রশিতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পানাহার বঞ্চিত থাকার কারণে শিমুর শারীরিক অবস্থা এতোটাই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে, সে ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছিল না। এমতাবস্থায় মায়ারাণী তাকে জেরা করছিল, বিন কাসিমের পরিবর্তে তুমি পুরোহিতকে কেন বিষ পান করালে?

কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও সে শুধু এতটুকুই বলতে পারছিল আমাকে এক গ্লাস পানি দিন...। কিন্তু শিমুকে একফোঁটা পানিও পান করতে দেয়া হলো না।

এক পর্যায়ে শিমু অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, পিপাসায় যদি আমি মারা যাই তাহলে আপনারা আমার কাছ থেকে তো কিছুই জানতে পারবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে পানি পান করান, আমি কোন সত্যই গোপন করবো না। পানি না খাইয়ে মেরে ফেললে আপনারা সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন না।

অতঃপর তাকে সামান্য খাবার ও পানি পান করতে দেয়া হলো। সামান্য পানাহারের পর শরীরে কিছুটা শক্তি ও সতেজতা ফিরে পেলে শিমু চক্রান্ত সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছিল, তা ছিল এমন- আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতো একজন অর্ধবয়স্কা মহিলার নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণী মুহাম্মদ বিন কাসিমের আবাসগৃহে পৌঁছি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে গিয়ে আমাদের দলনেত্রী বিন কাসিমকে মোবারকবাদ জানায় এবং তাঁর সৈন্যরা শহরের নারী শিশুদের ইজ্জত আব্রুর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতঃপর পরিকল্পনা মতো শিমু বিন কাসিমের পাশে বসে পড়ে। অন্যান্য তরুণীরা বয়স্কা মহিলার সাথে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গন্তব্যে ফিরে যায়। তারা সবাই যেহেতু চক্রান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল তাই শিমুর জন্য তারা আর অপেক্ষা করেনি। শিমু বিন কাসিমের কক্ষেই অবস্থান নেয়।

এক পর্যায়ে শিমুকে কক্ষে থাকতে দেখে বিন কাসিম তাকে বললেন, তুমিও চলে যাও। তোমার সাথীরা হয়তো তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। জবাবে শিমু বলল—আপনি কি আর কিছুটা সময় আপনার পবিত্র সান্নিধ্যে আমাকে থাকার অনুমতি দিতে পারেন না? আরবী ভাষায় আবেগাপ্লু কণ্ঠে মিনতি করলো শিমু।

হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত তরুণীর কণ্ঠে আরবী কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বিন কাসিম জিজ্ঞেস করলেন, আরে! তুমিতো আরব কন্যা নও, আরবী কোত্থেকে শিখলে?

মাত্র দেড় বছরে মারকানের এক আরবের কাছ থেকে আমি আরবী শিখেছি। আরবের লোকজনকে আমার খুব ভালো লাগে। তাই বলছিলাম, আপনার পবিত্র সান্নিধ্যে আর কিছুটা সময় আমাকে দয়া করে একান্তে বসতে দিন।

আমার কাছে একান্তে বসে তুমি কি করবে? আমি জানি, আপনার পক্ষেই এ ধরনের নির্দেশ জারী করা সম্ভব যে, বিজিত এলাকায় কোন নারীপুরুষের ওপর যে বিজয়ী সৈন্য কোন ধরনের অত্যাচার নির্যাতন না করে। এতেই প্রমাণিত হয় আপনি দেবতাতুল্য। দেবতাদের চেয়ে আপনি কোন অংশেই কম নয়। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম, আপনি হয়তো বয়ষ্ক ব্যক্তি। কারণ এমন ধরনের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় একমাত্র বয়ষ্ক অভিজ্ঞলোকদের দ্বারাই ঘটে থাকে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয়েছে, আপনি ধারণার চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞানী বিচক্ষণ ও সুন্দর। আপনার কথা শোনার পর থেকেই আমি আপনার ভক্ত পূজারীণী হয়ে গেছি।

"এটাই হলো তোমাদের ধর্মের সবচেয়ে মন্দ দিক। তোমরা কোন বিস্ময়কর জিনিস দেখলেই সেটিকে পূজা করতে শুরু করো। কোন জিনিসকে ভয় করলেও তোমরা সেটিকে পূজা করতে থাকো। আমি পূজনীয় হওয়ার মতো কিছুই করি না। আমি যা কিছু বলি যা কিছু করি সবই আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য করি।"

আমি স্বধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনি যদি আমাকে আপনার সান্নিধ্যে থাকার অনুমতি দেন তাহলে আমি আর বাড়িতে ফিরে যাব না। তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া আমার কাছে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আমি এদেশে বিয়ে শাদী করতে আসিনি। আমি এই সব শাসকদের মতোও নই, যারা কোন শহর জয় করার পর সেখানকার সুন্দরী তরুণীদের মধ্য থেকে দু' চারজনকে বিয়ে করে বিবি বানিয়ে রাখে নয়তো শক্তির দাপটে রক্ষিতা করে রাখে। আমি বিলাস ব্যাসনের জন্য এখানে আসিনি। আমি এদেশে এসেছি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে।

শিমু উজির বুদ্ধিমান ও মায়ারাণীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে বিন কাসিম সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল এবং যে ভাবে যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আমি সবই করেছি। আমি তাঁকে কামোদ্দিপ্ত করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছি। আমি কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি, হাসি, চাউনী তথা আমার রূপ সৌন্দর্যের সবটুকুর প্রয়োগ করে বিন কাসিমের পৌরুষকে আন্দোলিত করার চেষ্টা করেছি, লোকটি আমার কথায় আচরণে হাসতো,

কথা বলতো, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা স্থির ও নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করেছি যেন সে আশি বছরের কোন বৃদ্ধ, তাঁর শরীরটা যেন আকাশ থেকে পতিত শিলার মতোই ঠাণ্ডা শীতল।

এক সময় তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। মনে মনে ভাবলাম, এবার তাহলে বরফ গলতে শুরু করেছে। আমি তাঁর এতোটাই কাছে চলে গেলাম যে, আমার জামার আঁচল তাঁর দেহ স্পর্শ করছিল। তিনি আমার ডান হাতটি তাঁর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, আমি ভাবলাম এবার তাহলে শিকার আমার ফাঁদে পা দিয়েছে। আমি অপর হাতটিও তাঁর হাতের ওপর দিয়ে দিলাম। তাঁর ভাবদেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আমার রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। আমার দৃষ্টি আকর্ষণীমূলক আচরণ তাকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি আমার প্রতি আসক্তি বোধ করছেন ভেবে আমি মনে মনে দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

হঠাৎ তিনি আমার ডান হাতের আংটি পরিহিতা মধ্যাঙ্গুলিটা চেপে ধরলেন। আংটিটি ছিল খুবই ভারী এবং টোপ ওয়ালা। দেখতে দারুণ কারুকার্যময় ছিল সেটি।

তিনি আংটিটির টোপের ওপরে হাত বুলিয়ে বললেন, দারুন সুন্দর আংটিতো।

এটি আপনি নিয়ে নিন। হয়তো আপনার কনিষ্ঠা আঙুলে এটি ধারণ করা সম্ভব হবে? তাঁর আগ্রহের জবাবে আবেগপূর্ণ ভাষায় বললাম আমি। না, আংটির দরকার নেই। এর ভিতরে করে আমার জন্য যা নিয়ে এসেছো, সেটি আমাকে দিয়ে দাও। তাহলেই হবে।

একথা শুনে চকিতে আমি হাত সরিয়ে নিলাম এবং অপর হাতে আংটিটি চেপে ধরলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার চেহারার রং হয়তো বদলে গিয়েছিল। তিনি আমার আংটিওয়ালা হাতটি হঠাৎ ধরে ফেললেন এবং খুব জোরে আমাকে হেচকা টান মেরে তাঁর কাছে নিয়ে নিলেন। আমি এরপরও তাঁর শরীরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার শরীরের কোমলতা ও ঘ্রাণে তাঁর মধ্যে মাদকতা সৃষ্টির প্রয়াস নিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে প্রায় জড়ানো ভাবে ধরে তাঁর হাতের আংটির কোণা দিয়ে আমার আংটির টোপের নীচের দিকে একটা খোচা মারলেন, তাতে আমার আংটির টোপ খুলে গেল এবং ভিতরে সংরক্ষিত বিষ মেশানো তুলা বেরিয়ে গেল।

আংটির ভিতরে তুলা দেখে বিন কাসিম ঈষৎ মুচকি হাসলেন। আমার তখন প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার অবস্থা। আমি বিষন্ন চেহারায় এক পলকে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি কিছুক্ষণ পর আমার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে বললেন, সত্যি করে বলো তো? এটি কি তুমি আমার জন্য আনোনি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার মাথা তাঁর কথায় দুলে উঠল কিন্তু অস্পষ্ট কণ্ঠে বললাম, না। তিনি দৃঢ় ও শান্তভাবেই বললেন, এই বিষ তুমি আমাকে কি ভাবে পান করানোর চিন্তা করেছিলে?

আমার মনে হয়েছিল কাজটি মোটেও কঠিন হবে না, বলল শিমু। কারণ মন্দিরের পুরোহিত; পণ্ডিত ও ঋষিরতী আমার মতো সুন্দরী তরুণীর স্পর্শ পেলে প্রখর রুদ্রতাপে বরফের মতোই গলতে থাকে। সেক্ষেত্রে আপনার মতো সুঠাম সুশ্রী যুবক আমার সংস্পর্শে সহজেই গলে যাবেন বলেই আমি মনে করেছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল, মুসলমানরা মদ পান করে না। কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী রূপসীর সংস্পর্শে সহজেই যে কোন মুসলিম তরুণ মুগ্ধ ও উত্তেজিত হবে। তোমার রূপ সৌন্দর্যে মাতাল করার মতো শক্তি আছে। আপনাকে রূপ সৌন্দর্যের যাদু বলে মুগ্ধ বিমোহিত করে পানি কিংবা শরবতের মধ্যে এই বিষ প্রয়োগ করার কথা আমাকে বলা হয়েছিল... এখন আমি একটি কথা বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি-না জানি না।

"যা বলতে ইচ্ছা করে বলো?"

"এখানে এসে আপনার আচরণ ও ব্যবহারে আমি আপনাকে বিষ পান করাতে পারতাম না। আপনার উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শবাদিতা আমার মিশনকে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল। আপনি হয়তো একথা বিশ্বাস করবেন না। হয়তো বলবেন, ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি একথা বলছি। শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি বাহানা তালাশ করছি। দয়া করে আপনি আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য অন্য কারো কাছে তুলে দেবেন না। আমার আনা বিষ আমাকে পান করতে দিন। কারণ এই বিষ এতোটাই তীব্র যে মরতে বেশি সময় লাগবে না। এর পর আমার মরদেহ যেখানে ইচ্ছা ফেলে দিন তাতে আমার কোন আফসোস থাকবে না।

না তরুণী, তুমি যা ভেবেছ আমি তেমন কিছুই করব না। তুমি যদি কোন আরব মুসলমান কন্যা হতে তাহলে তোমার এই যাদুকরী রূপ সৌন্দর্য মণ্ডিত দেহ আমার এই তরবারী দিয়েই দ্বিখণ্ডিত করে দিতাম। কিন্তু তুমি অমুসলিম ও শত্রু পক্ষের অবলা নারী। তোমাকে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেছে আমার শত্রু পক্ষ। কিন্তু কোন শত্রু নারীর ওপর আমার তরবারীর কার্যকারিতা প্রয়োগের অবকাশ নেই। ইসলাম খুবই মানব হিতৈষী ধর্ম।

রাজা দাহির, উজির বুদ্ধিমান তোমরা নিজের কৃতকর্মের আত্মউপলব্ধি করার জন্য তোমাকে অক্ষত অবস্থায় তোমার কর্তাদের কাছেই ফিরিয়ে দেবো।

একথা শুনে শিমু বলল, আপনি মানুষ নন, সত্যিই একজন দেবতা। কিন্তু দেবদেবীতে আপনি বিশ্বাসী নন বলে আপনাকে আমি ফেরেশতা বলতে চাই। আগে আমি আপনাকে প্রতারিত করার জন্য আপনার সান্নিধ্যে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এখন একান্তভাবেই আবেদন করছি, আপনার সেবাদাসী হিসাবে আপনার সংস্পর্শে আমাকে থাকার অনুমতি দিন। আমি আপনার কাছে কখনো আসব না। শুধু দূর থেকে আপনাকে দেখে দেখে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে দিন। আমাকে আপনার দাসী হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগ দিন।

তোমার সব কথার জবাব আমি ইতোমধ্যেই দিয়ে দিয়েছি। তোমার সব আকাঙ্ক্ষাও আমি পূর্ণ করেছি। তোমার পূর্বেও আমরা তোমার মতো আরো তিন তরুণীকে রাজা দাহির ও উজির বুদ্ধিমানের কাছে পাঠিয়েছি। এরা মাকরানে বসবাসকারী আরব যুবকদের সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছিল। তুমি হয়তো ওদের সম্পর্কে জানো। ওদেরকেও দাহিরের উজির সেখানে নিযুক্ত করেছিল। তাদের চক্রান্তও ব্যর্থ হয়েছে। আমি সেই তরুণীদের বলেছিলাম, তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলবে, যোদ্ধাদের লড়াই মুখোমুখি রণাঙ্গনে তরবারীর সাহায্যে হয়ে থাকে। এখন তুমি গিয়ে রাজা দাহির ও উজির বুদ্ধিমানকে বলো, "হে কাপুরুষ রাজা! আরবদের সাথে যদি মোকাবেলা করার এতোই সাধ থাকে তাহলে মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও।" সে কি ভেবেছে, তার দুর্গের উঁচু দেয়াল তাকে আরব যোদ্ধাদের তরবারী আর আল্লাহ্‌র সৈনিকদের বর্শা ও তীর থেকে রেহাই দিতে পারবে?

বিন কাসিম যখন শিমুকে একথাগুলো বলছিলেন, তখন শিমু হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত জোড় করে দেবতার মুখোমুখি পূজা করার মতো করে বসে রইলো। যেন সাক্ষাত কোন দেবতার কণ্ঠে সে আশ্চর্য কিছু শুনছে। ঘটনার আকস্মিকতায় শিমুর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

বিন কাসিম বললেন, হে হতভাগী মেয়ে! আমরা এমন ধর্মের অনুসারী যে ধর্মে নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা করাকে জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করা হয়। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় আমরা জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। আমরা কখনো নারীর জীবন উৎসর্গ করে ধর্ম ও রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করি না। তুমি জানো, তোমাদের রাজা শুধু আরব মুসাফিরদের জাহাজই লুট করেনি,

জাহাজের অধিবাসীদের কয়েদখানায় বন্দি করে রেখেছে। আমরা সেই বন্দিদেরই মুক্ত করতে এসেছি। কিন্তু আমাদের আগে আরো দু'বার আমাদের সৈন্যরা এখানে এসে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছে এবং আমার আগে দু'জন সেনাপতি শাহাদাতবরণ করেছেন। এজন্য আক্রমণের আগে আমাকে অনেক ভেবে চিন্তে এগুনোর কথা ছিল। কিন্তু এক আরব কন্যার মুক্তির ফরিয়াদী পয়গাম পেয়ে আমার চাচা হাজ্জাজ আমাকে এই বলে নির্দেশ পাঠালেন, "তুমি যেখানে যে অবস্থায় আছো এবং যা-ই করছ না কেন সেই অবস্থাতেই সিন্ধু রওয়ানা হয়ে যাবে, সৈন্যরা তোমার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। ফলে সেই অবস্থাতেই আমি রওয়ানা হয়ে এসেছি কোন প্রস্তুতিই নিতে পারিনি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দয়ার ভরসা ছাড়া আমার আর কোন বাহ্যিক শক্তি নেই।

বন্দিদের তো আপনি মুক্ত করে নিয়েছেন? বলল শিমু।

হ্যাঁ, এক অত্যাচারী রাজার হাত থেকে শুধু আরব মজলুম বন্দিদেরই আমরা মুক্ত করিনি, শহরের অধিবাসীদেরকেও মুক্তি দিয়েছি। তুমি কি এই রাজাকে অত্যাচারী বলবে না? নিজের ক্ষমতার স্বার্থে যে তোমার মতো তরুণীদেরকে সম্ভ্রম বিক্রি করে দেয়ার কাজে লিপ্ত করে। তোমার কি সাধ ছিল না, তুমি কোন বীর বাহাদুর স্বামীর বধু হবে, স্বামীর বীরত্বে গর্ববোধ করবে?

হে আরব শাহজাদা, আমি ও আমার মতো এদেশের অসংখ্য সুন্দরী তরুণী কোন ভদ্র ঘরের বধু হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছি। অতি শৈশব থেকেই আমাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের আবেগ অনুভূতি সুখ আহ্লাদকে হত্যা করা হয়েছে। যারা আমাদেরকে এই ঘৃণ্য কাজের জন্য তৈরি করেছে আমরা তাদের হাতের খেলনা মাত্র। মন্দিরের পুরোহিতরাও অবাধে আমাদের ভোগ করে...। কিন্তু আজ আপনি আমার মৃতপ্রায় অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন অনুভব করতে পারছি, আমার আত্মপরিচয়।

এখন তুমি চলে যেতে পারো? তবে যাবে কোথায়? বললেন বিন কাসিম।

প্রধান মন্দিরে যাব। বলল শিমু।

ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে দু'জন প্রহরী পাঠাচ্ছি।

না, আমি একাকীই যাব।

শিমু আর দেরী না করে বিন কাসিমের কক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রধান মন্দিরের দিকে চলে গেল।

✪✪✪

'মৃত্যুর আগে আমি সব কিছু উগড়ে দেবো' উজির বুদ্ধিমান ও মায়ারাণীর কাছে বিন কাসিমকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার বর্ণনা শেষে দৃঢ় কণ্ঠে বলল শিমু। শিমু আরো বলল, বিন কাসিমের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পর তিনি যখন আমাকে মুক্ত করে দিলেন, আমি সোজা প্রধান মন্দিরের দিকে রওয়ানা হলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল, আরব সেনাপতি আমার পিছু পিছু আসছেন। হয়তো বা তিনি শক্তিশালী যাদুকর। যাদুর সাহায্যেই আমার মিশন ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং আমার মনোভাব বদলে দিয়েছেন। আমি যাদুগ্রস্তের মতোই অবচেতন মনে মন্দিরে পৌঁছলাম। আসার পথে মনে হয়েছিল আংটির বিষ নিজের মুখে দিয়ে মৃত্যুবরণ করব কিন্তু মন্দিরে পৌঁছে পাথরের নিস্প্রাণ মূর্তিগুলো দেখে আমার মন বিদ্রোহ করল। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম মূর্তিগুলোর কার্যকারিতা ব্যর্থ প্রমাণ করেই আমি মরবো।

একথা শুনে উজির বুদ্ধিমান খুব জোরে শিমুর গালে একটা চপেটাঘাত করল।

হতভাগী, তুই ওই ম্লেচ্ছের প্রভাবে এতটাই মাতাল হয়েছিলে যে, মন্দিরে এসে দেবদেবীদের অমর্যাদা করতেও তোর বিবেকে বাধলো না। দাঁতে দাঁত পিষে বলল উজির! আমি ওর শরীরের একেকটি রগ কেটে কেটে ওকে হত্যা করবো, বলল মায়ারাণী। শয়তানীটা এই লুটেরা সেনাপতির বধূ সাজতে চেয়েছিল, তা না পেরে শেষতক দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছিল।

অ্যাহ্! রাজরাণী সাজার সখ হয়েছিল? বল, এরপর কি হলো? রাগে ক্ষোভে গজরাতে গজরাতে বলল উজির বুদ্ধিমান।

ওদের কথায় শিমুর হাসি পেলো। মুচকি হাসিটা আর চেপে রাখতে সক্ষম হলো না সে। খিক করে হেসে ফেলল। অতঃপর বলল, এরপর আমি মন্দিরে প্রবেশ করলাম। অন্যান্য তরুণীরা মন্দিরের মাতাল কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অন্যান্য পুরোহিতরা যার যার কক্ষে শুয়ে পড়েছিল। শুধু প্রধান পুরোহিত জাগ্রত ছিল।

বুদ্ধিমান আবারো শিমুর মুখে একটা চপেটাঘাত করে বলল, বেতমিজ বল, পণ্ডিতজী মহারাজ!

আমি যা একবার বলেছি শতবার বললেও তাই বলবো। আমার মন থেকে যার শ্রদ্ধা শেষ হয়ে গেছে, তার বেলায় সম্মানজনক ভাষা আমার মুখে আনা সম্ভব নয়। তার নাম আমি ঘৃণা ভরেই উচ্চারণ করব।

উজির! ও যা বলতে চায় বলতে দিন।

এই কুলাঙ্গীনী যা বকছিলে বকে যা। বলল মায়ারাণী। শিমু বলতে শুরু করল,

বড় পণ্ডিত আমার অপেক্ষায় তখনো জেগে ছিল। আমাকে দেখেই সে বলল, কাজ সেরে এসেছ? আমি বললাম করে এসেছি। পণ্ডিত আনন্দে জয়ধ্বনী দিলো এবং দু'হাত আমার দিকে প্রসারিত করে এগিয়ে এসে আমাকে পাজাকোলা করে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেল। তার মুখের লালার দুর্গন্ধ এখনো আমার মুখে লেগে রয়েছে। সে আমাকে বিছানার ওপর ফেলে পাগলা ষাড়ের মতো ঘুতাতে লাগল। পণ্ডিতের এই উন্মত্ততা দেখে আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ বদলে গেল। পুরুষের শয্যাসঙ্গী হওয়াটা আমার জীবনে আশ্চর্যজনক কিছু না। এই পণ্ডিতের কাছেও ইতোপূর্বে দু'বার আমি কাটিয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মধ্যকার বোধ ও বিবেক সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। আমি আর আগেকার মতো পণ্ডিতের সান্নিধ্যকে পবিত্র মনে করতে পারছিলাম না। কারণ এমন এক যৌবনদীপ্ত সুঠাম যুবকের কাছে আমাকে পাঠানো হয়েছিল, যে কোন সুন্দরী নারীর সংস্পর্শে এলে এমন যুবকের পক্ষে নিজেকে সামলে রাখা মুশকিল কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি তাঁর পৌরুষ নাড়াতে পারিনি। সে আমাকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও অস্পর্শ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে। অপরাধের আহ্বানকেও সে কঠিন অপরাধ মনে করে। আমি তাঁকে বিষপানে হত্যা করতে চেয়েছিলাম তা ধরতে পেরেও সে আমাকে কোন শাস্তি না দিয়ে সসম্মানে বিদায় করেদিল। আমি তাকে হত্যা করার কথা স্বীকার করার পরও সে আমাকে কোন শাস্তি না দিয়ে নিরাপদে আমার মন্দিরে পৌছার জন্য আমার সাথে দু'জন সিপাহী পাঠানোর প্রস্তাব করল। আর পণ্ডিত এমন এক ব্যক্তি দেবালয়েও অবৈধ নারী সম্ভোগে বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না। যার অন্তরে মন্দিরের এতটুকু সম্মান নেই...।

আমি মনে মনে পণ করেছিলাম, মিশনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তোমরা হয়তো আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে, তাতে কি আমি নিজেই এই বিষপানে আত্মহত্যা করবো। কিন্তু হঠাৎ আমার ইচ্ছা বদলে গেল। পণ্ডিতের প্রতি আমার মনে প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক হলো। আমি অনেক কষ্টে একথা বলে বিছানা থেকে তার পাঞ্জা মুক্ত হলাম যে, আমি একটু পানি পান করবো। আপনিও পান করে নিন। সে আমার কথায় লাফিয়ে উঠে বলল, আরে আজ রাত কি শুধু পানি পান করার নাকি? সে লাফিয়ে উঠে তাক থেকে একটি সুরাহী ও দু'টি পেয়ালা নামিয়ে এনে বললো, এটা পান করো, আমাকেও পান করাও।

আমি উভয় পানপাত্রে সুরাহী থেকে অল্প অল্প শরাব ঢেলে দিলাম এবং পণ্ডিতের দিকে পিঠ দিয়ে তাকে আড়াল করে খুব দ্রুত আংটির বিষ তার পানপাত্রে ঢেলে দিয়ে একটু নাড়িয়ে পণ্ডিতের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। সে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শরাব নিঃশেষ করে ফেলল। অবশ্য তখনো আমার জানা ছিল না এই বিষ এতটা শক্তিশালী, এতো অল্প সময়ে...।

কয়েক ঢোক শরাব গলধঃকরণের পরই পণ্ডিত দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। অতঃপর সে দু'হাতে বুক মালিশ করতে শুরু করল। খুব কষ্টে সে শুধু এতোটুকুই বলতে সক্ষম হলো, তুমি আমাকে কি পান করিয়েছো? আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, পণ্ডিতজী মহারাজ! এটা কাউকে না কাউকে তো পান করতেই হতো...।

এরপর আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলাম। সদর দরজার কাছে পৌঁছলে মন্দিরে অচেনা এক লোককে প্রবেশ করতে দেখলাম। তখনো পণ্ডিতের কক্ষে প্রদীপ জ্বলছিল আর পণ্ডিত এক হাতে বুক চেপে ধরে ঝুঁকে ঘোঙাচ্ছিল। পণ্ডিতের ঘোঙানীর শব্দ শুনে লোকটি দৌড়ে পণ্ডিতের কক্ষে প্রবেশ করল। এদিকে তখন আমি মন্দিরের প্রধান ফটক পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গেছি। পণ্ডিত হয়তো মরতে মরতে লোকটিকে বলেছিল, আমিই তাকে বিষ পান করিয়ে পালাচ্ছি।

তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছিলে? জিজ্ঞেস করল মায়ারাণী। কোথায় যাব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি। আমার কোন বোধই তখন কাজ করছিল না। পরে আমি বুঝেছি আমি আনমনে মুসলিম সেনাপতি যে দিকে থাকে সে দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি বেশী দূর এগুতে পারলাম না। পিছনে অনেক লোকের দৌড়ানোর আওয়াজ পেয়ে আমি পথ বদল করে ফেললাম। আমি একটি গলিতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু গলিটির পথ এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেল। সামনে অগ্রসর হওয়ার মতো আর কোন পথই ছিল না, ফলে পিছু ধাওয়াকারীরা আমাকে গলির মাথায় ধরে ফেলল। এরা আমাকে ধরে মন্দিরে নিয়ে গেল। এর আগেই পণ্ডিত মরে গেছে। এর পরের ঘটনা তোমরা জানো, আমাকে কিভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

সেই রাত শেষে ভোর বেলায় বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাৎকারীণী মহিলা দলের দলনেত্রীসহ অন্যান্য তরুণীদেরকে কাঠের বেষ্টণীতে ভরে উটের ওপর তুলে নগর ফটক পেরিয়ে আনা হলো। ওদের শহর থেকে নিরাপদে বের করে দিয়ে শহরময় প্রচার করা হলো কে বা কারা মন্দিরের প্রধান পণ্ডিতকে

বিষ পান করিয়ে হত্যা করেছে। আর সেই তরুণী শিমুকে চরম অমানবিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করল উজির।

সেই দিন সকাল বেলায় গোয়েন্দা প্রধান বিন কাসিমের কক্ষে গিয়ে বললেন, খবর পেলাম, গত রাতে বড় মন্দিরের প্রধান পণ্ডিতকে অজ্ঞাত লোকে বিষ পানে হত্যা করেছে? গোয়েন্দা প্রধান তাকে আরো জানালেন, আমি নিজে মরদেহ দেখে এসেছি। মরদেহ ও তার মুখের লালা দেখে নিশ্চিত হয়েছি, তাকে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাঁ' তাকে বিষ পানেই হত্যা করা হতে পারে। আর আমি তোমাকে একথাও বলে দিতে পারি কে তাকে বিষ পান করিয়েছে? বললেন বিন কাসিম। আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠিক সময়েই তুমি এসে গেছো। গতকাল আমার এখানে কিছু মেহমান এসেছিল। ...বিন কাসিম গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে রাতের পূর্বাপর পুরো ঘটনা শোনালেন। শিমুর প্রতিটি কথা ও আচরণ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। আমি তোমাকে বলবো বলে মনস্থ করেছিলাম, এসব মন্দির বন্ধ করে দিতে হবে। মন্দিরগুলো রাজা দাহিরের চক্রান্তকারীদের নিরাপদ আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পণ্ডিতকে সেই তরুণীই বিষ পান করিয়েছে, যে গতরাতে আমার কাছে এসেছিল।

বিন কাসিমের কথা শুনে দ্রুত সেখান থেকে উঠে গোয়েন্দা প্রধান মন্দিরের সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি গভীর নিরীক্ষা করে দেখতে পেলেন পণ্ডিতের কক্ষে একটি পান পাত্রে তখনো কিছুটা পানীয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এই অবশিষ্টটুকু আসলে শরাব ছিল পানি নয়। শা'বান ছাকাফী সেখানে অবস্থানরত সৈন্যদেরকে একটি লা ওয়ারিশ কুকুর ধরে আনতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সৈন্যরা একটি কুকুর ধরে আনলো। কুকুরটিকে অবশিষ্ট পানীয় খাইয়ে দেয়া হলো। দেখতে দেখতে কুকুরটার মাথা কয়েকবার ঝাকুনী দিয়ে মৃত্যুর কোলো ঢলে পড়ল। অতঃপর গোয়েন্দা প্রধান যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে।

মন্দির থেকে সেনাপ্রধানের কাছে এসে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী বললেন। সম্মানিত সেনাপতি! আমাদের ও আপনার চার পাশে যেসব বিপদ ও আশঙ্কা ভিড় জমেছে আপনি হয়তো এসবকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনি রণাঙ্গনে পারদর্শী বটে কিন্তু আমাদের শত্রুতা অদৃশ্য যেসব আক্রমণ আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছে এসব হয়তো পুরোপুরি আপনার

বোধগম্য নাও হতে পারে। আমি এখানে এমন কিছু বিপদাশঙ্কা করছি যেগুলোর খুঁটিনাটি আপনার গোচরীভূত নাও হতে পারে। আমি আপনাকে পরিষ্কার বলে দিতে চাই, আজ থেকে সরাসরি আপনার সাথে কাউকে দেখা করতে দেয়া হবে না।

✪ ✪ ✪

যুদ্ধ ছাড়াই নিরূন জয় করেছিলেন বিন কাসিম। নিরূন পর্যন্ত নৌকা করে মিনজানিকগুলো বহণ করা হয়েছিল। নিরূন অবরোধ করার সময়ও সব মিনজানিক সেখানে ব্যবহার করা হয়নি। মাত্র কয়েকটি মিনজানিক অবরোধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অধিকাংশই রয়ে গিয়েছিল নৌকায়। নৌকাগুলো ছিল সাকিরা নদীতে। আর সাকিরা নদী নিরূন থেকে কয়েক মাইল দূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বিন কাসিম জানতেন, নিরূনের শাসক সুন্দরশ্রী বিন কাসিমের মোকাবেলা করবেন না, তিনি প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। তিনি দৃঢ় আশাবাদী ছিলেন নিরূনে তাকে কোন আক্রোশের মুখোমুখি হতে হবে না। বাস্তবেও তাই ঘটল।

যেহেতু নিরূন অঞ্চল বিন কাসিমের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল গুপ্ত হামলার সম্ভাবনা তেমন ছিল না সেই সাথে যেসব মিনজানিক নৌকায় রাখা ছিল সেগুলোর মধ্যে কোন হামলার আশঙ্কাও কম ছিল। এরপরও নদীর তীরে রাতের বেলায় পাহারা ও টহলের ব্যবস্থা রাখা হলো। নদীতে যারা মাছ ধরতো তাদের সবাইকে বলা হলো, তোমরা ক'দিন রাতের বেলায় মাছ ধরা বন্ধ রাখবে এবং নৌকাগুলো আমাদের কাছে জমা থাকবে।

বিন কাসিমের পরবর্তী গন্তব্য ছিল সিহুন। পথিমধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দুর্গ ছিল কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে কোন আশঙ্কা ছিল না। কারণ সুন্দরশ্রী তাঁকে এসব ছোট ছোট দুর্গের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছিলেন। এগুলোর শক্তি সৈন্যবল ও নিয়ন্ত্রকের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন বিন কাসিম। সিহুনের শাসকও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধরা যুদ্ধ সংঘাত ও হত্যাকাণ্ডকে খুবই অপরাধ বলে বিশ্বাস করতো, তাই আশা করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সিহুনও সংঘর্ষ ছাড়াই কব্জা করা যাবে। কিন্তু সেখানকার সেনাবাহিনীর সিংহভাগ ছিল হিন্দু। এদিক থেকে একটা আশঙ্কা রয়েই গিয়েছিল হিন্দু সৈন্যরা বিনা বাধায় দুর্গ বিন কাসিমের হাতে তুলে দেবে না।

নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী এক দূতকে সিহুনের শাসকের কাছে আগেই এই খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন লড়াই থেকে বিরত থাকেন এবং

মুসলিম বাহিনীকে দুর্গফটক খুলে স্বাগত জানান। কিন্তু তখনো সুন্দরশ্রীর দূত ফিরে আসেনি, এজন্য বিন কাসিম যাত্রা বিলম্বিত করছিলেন। সেই সাথে আরো রসদ ও জরুরি সামগ্রী এসে পৌছার জন্যও কিছুটা অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল।

হঠাৎ একদিন খবর এলো, যেসব সৈন্য নদী তীরে মিনজানিক পাহারায় দিচ্ছিল, এদের মধ্যে দু'জনকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে পাওয়া গেছে আর দু'জনের কোন খোঁজ নেই।

পাহারা দেয়ার জন্য এক সপ্তাহের জন্য চারজন সৈন্য পাঠানো হতো। তাদের দু'জন সেখানে তাঁবুতে বিশ্রাম করত আর দু'জন নদীতীরে বাঁধা নৌকাগুলো পাহারা দিতে টহল দিতো। এভাবে পর্যায়ক্রমে কিছুক্ষণ পরপর পালা বদল করে কর্তব্য পালন করতো। নদীর তীরের প্রায় এক মাইলের মতো জায়গায় সামরিক সরঞ্জাম ভর্তি নৌকাগুলো বাঁধা। বিন কাসিমের কাছে সংবাদটি ছিল খুবই দুশ্চিন্তার। দু'জন মৃত আর দু'জন নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপাটি মোটেও স্বাভাবিক কোন ঘটনা ছিল না। মৃতদেরকে খঞ্জরাঘাতে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল।

সংবাদ পেয়েই বিন কাসিম ও গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী তাদের একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে অকুস্থল পরিদর্শন করলেন।

তারা দেখতে পেলেন, উভয়ের মৃতদেহ নদীতীরে পানি থেকে কিছুটা দূরত্বে পড়ে রয়েছে। শা'বান ছাকাফী সেখানকার মাটিতে মানুষের পদচিহ্ন নিরীক্ষা করলেন, পদচিহ্ন দেখে বুঝতে পারলেন এখানে সংঘর্ষ তেমন হয়নি। উভয়ের তরবারী ছিল কোষবদ্ধ, তাতে বোঝা যায় মোকাবেলা করার মতো সুযোগ তারা পায়নি।

আকস্মিক আক্রমণ করা হয়েছে এদের ওপর, বললেন শা'বান ছাকাফী। ধোকা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এদেরকে। তাহলে যে দু'জন নিখোঁজ হয়েছে, এরাই এদের ঘাতক? জানতে চাইলেন বিন কাসিম।

আল্লাহ্র কসম? এটা আমি বিশ্বাস করব না! বললেন গোয়েন্দা প্রধান।

গভীরভাবে সেখানকার মাটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন শা'বান ছাকাফী। এলাকাটি ছিল অনাবাদী ও বালুকাময়। পায়ের ছাপ পরিষ্কার বোঝা যায়। পায়ের ছাপ দেখে দেখে শা'বান ছাকাফী নদীতীর থেকে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। এক পর্যায়ে তিনি নিখোঁজ প্রহরীদের মৃতদেহও পেয়ে গেলেন। নদীতীর থেকে অনেক দূরে তাদের খঞ্জরাঘাতে হত্যা করে ফসলী খেতের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল।

সেই জায়গা থেকে পদচিহ্ন দেখে দেখে শা'বান ছাকাফী আবার নদীর তীরের দিকে অগ্রসর হয়ে একেবারে সর্বশেষ মিনজানিক বহণকারী নৌকার কাছে পৌঁছলেন।

ঘাতকের পদচিহ্ন তাকে এই পর্যবেক্ষণে বাধ্য করল। এখানে এসে তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, মিনজানিক কতগুলো আছে তা এক্ষুণি গুণে দেখো। সব মিনজানিক ও সামরিক সরঞ্জাম তল্লাসী করা হলে জানা গেল, মিনজানিকের সংখ্যা একটি কম এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র মিনজানিকটি নেই। শা'বান ছাকাফী বিন কাসিমকে রিপোর্ট দিলেন, "এই হত্যাকাণ্ড শত্রুপক্ষের কাজ শত্রু ঘাতকরা এদের হত্যা করে ছোট্ট মিনজানিকটি নিয়েগেছে।"

অবশ্য এটা জানা সম্ভব হয়নি, কি করে মিনজানিকটি হিন্দুরা এখান থেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। শা'বান ছাকাফী আশঙ্কা করলেন, রাজা দাহির এখন তার কারিগরদের দিয়ে দ্রুত মিনজানিক তৈরি করার চেষ্টা করবে।

তখনকার দিনে মিনজানিক ছিল এক বিস্ময়কর সামরিক অস্ত্র। আরবরা যখন মিনজানিক ব্যবহার করতে শুরু করে হিন্দুস্তানে এর কোন নামগন্ধও ছিল। মিনজানিকের অদ্ভূত কার্যকারিতা দেখে রাজা দাহির তার উজির বুদ্ধিমানকে বলল, যে কোনভাবে অন্তত একটা মিনজানিক হাত করার চেষ্টা করো। যাতে আমরাও এমন মিনজানিক তৈরির চেষ্টা করতে পারি। মিনজানিক নিয়ে ওরা যেভাবে আমাদের দুর্গের ভিতরে বিরাট বিরাট পাথর নিক্ষেপ করছে, তাতে দুর্গ রক্ষা করা মুশকিল।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিমের নিরাপত্তারক্ষীদের নদীর তীরবর্তী এলাকায় তল্লাশী করে দুর্ঘটনার সূত্র উদ্ঘাটনের নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশ পাওয়া মাত্র দ্রুত ঘোড়া দৌড়াল চৌকস বিশেষ বাহিনী। বিন কাসিম ও গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীও দু'দিকে ঘোড়া দৌড়ালেন। নদীর যে তীরে নৌকাগুলো বাধা ছিল সেই তীরবর্তী বহু দূর পর্যন্ত গোটা এলাকা তারা তন্নতন্ন করে তল্লাশী করলেন কিন্তু কোন দুষ্কৃতিকারীর কোন চিহ্নও খুঁজে পেলেন না। অবশেষে হতাশ হয়ে উভয়েই অকুস্থলে ফিরে এলেন।

সম্মানিত সেনাপতি! বললেন গোয়েন্দা প্রধান। আমি নদীর অপর তীরে যাচ্ছি। আপনার দু'জন নিরাপত্তারক্ষী আমাকে দেন আর আপনি শিবিরে চলে

যান। শত্রুরা খুবই গভীর ফাঁদ তৈরী করেছে। আপনার এখানে থাকা ঠিক হবে না।

নিরূনে আমাদের আর অবস্থান করাটাই ঠিক হবে না, বললেন বিন কাসিম। আমাদেরকে এখন দ্রুতগতিতে অভিযানে নামতে হবে। শত্রুরা আমাদের মিনজানিক এজন্যই চুরি করেছে, যাতে এটা দেখে তারা মিনজানিক বানিয়ে নিতে পারে। আমি তাদেরকে মিনজানিক তৈরি করে প্রতিরোধ করার সুযোগ দিতে চাই না।

হতে পারে আমি চোরকে পথিমধ্যে পাকড়াও করবো, বললেন গোয়েন্দা প্রধান। মিনজানিক এতোছোট জিনিস নয় যে, তাড়াতাড়ি এটিকে যে কোন দিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে।

এ এলাকা থেকে আপনার চলে যাওয়া উচিত। এমন না হয় যে, লুকিয়ে থাকা কোন শত্রুর তীর আপনাকে বিদ্ধ করে। বিন কাসিম মৃত সৈন্যদের লাশগুলোকে তুলে আনবার জন্য কয়েকজন সেনাকে নির্দেশ দিলেন।

রাতের কোন সময় মিনজানিক এখান থেকে নিয়ে গেছে এ ব্যাপারটি কারো পক্ষে জানার উপায় ছিল না। এটাও জানার উপায় ছিল না, কোন দিকে নিয়ে গেছে এগুলো। শা'বান ছাকাফীর একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকজন তার সাথে ছিল। তাছাড়া বিন কাসিমের একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের থেকে আরো দু'জনকে তিনি সাথে নিয়ে গেলেন। গোয়েন্দা প্রধান সৈন্যদের নিয়ে নদীতীর দিয়ে ভাটির দিকে অগ্রসর হয়ে এমন একটি জায়গায় গিয়ে থামলেন সেখানে নদীটা বেশ চওড়া। সেখানে তিনি সবাইকে ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন এবং সাথীদের নিয়ে ঘোড়াসহ সাতরিয়ে নদী পার হলেন। নদী পার হয়ে সহযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি ভাটিতীর ধরে ভাটির দিকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। তীরের এক জায়গায় একটি নৌকার অর্ধেকটা ডাঙ্গায় উঠানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন এটিই সেই হারিয়ে যাওয়া নৌকা যেটাতে সবচেয়ে ছোট মিনজানিকটি বোঝাই করা ছিল। নৌকাটি তখন ছিল খালি। নদীতীরে মিনজানিক নৌকা থেকে টেনে নামানোর স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলেন গোয়েন্দা প্রধান।

মিনজানিকটির চারটি চাকা ছিল। এগুলোর চিহ্নগুলো মাটিতে স্পষ্ট রয়ে গেছে। গোয়েন্দা প্রধান দেখতে পেলেন সেখানে হাতি ও ঘোড়ার পদচিহ্নও রয়েছে। শা'বান ছাকাফী বুঝতে পারলেন শত্রু বাহিনী মিনজানিকটি চুরি করে এখানে এসে হাতি দিয়ে টেনে তুলে হাতি ব্যবহার করে সেটিকে টেনে নিয়ে

গেছে। হাতির শক্তি সামর্থ ও গতি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। তদুপরি পদচিহ্ন ধরে কয়েক মাইল অগ্রসর হলেন তিনি। কিন্তু মিনজানিক বহণকারী কোন দলকে দেখতে পেলেন না। অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মিনজানিক কোথায় নিয়ে যেতে পারে শত্রু সেনারা তা আন্দাজ করতে পারলেন তিনি। তাই যাত্রা বিরতি দিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে। ফিরে এলেন নিরূন।

✪ ✪ ✪

সম্মানিক সেনাপতি! তল্লাশী অভিযান থেকে ফিরে এসে বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বললেন গোয়েন্দা প্রধান। আমাদের মিনজানিকটি শত্রু সেনারা নিয়ে গেছে। ওরাই প্রহরীদের হত্যা করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি মিনজানিকটি ওরা সিস্তান নিয়ে গেছে। এখন আমাদের দ্রুত অগ্রাভিযান চালাতে হবে। আপনি গতকাল ঠিকই বলেছেন, অনুরূপ মিনজানিক তৈরি করার সুযোগ আমরা শত্রুদের দেবো না। এতো দ্রুত আমরা ওদের ওপর আক্রমণ করব, মিনজানিক বানানো দূরে থাক জিনিসটি ওরা ভালোভাবে দেখার সুযোগও পাবে না।

নিরূন থেকে বিন কাসিম সিস্তান অভিযানেরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু এতো শীঘ্র অভিযানের সংকল্প তাঁর ছিল না। যতোটাই সিন্ধু অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল মুসলিম বাহিনী, বিন কাসিমকে ততোটাই ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। রাজা দাহিরের রণকৌশল আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বিন কাসিম। দাহির ভেবে ঠিক করেছিল আরব সৈন্যরা একেরপর এক অভিযান চালিয়ে দুর্গের পর দুর্গ জয় করে শক্তিক্ষয় ও অংশ বিশেষকে বিজিত এলাকার নিয়ন্ত্রণে রেখে যখন সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন প্রবল প্রতাপে এক আক্রমণেই মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেবে দাহির বাহিনী। তাই প্রতিটি অগ্রাভিযানের আগে সঠিক পরিকল্পনা এবং জনশক্তি ক্ষয়ের জন্য গভীরভাবে ভাবতে হতো বিন কাসিমকে। কিন্তু বেশি ভাবনার সুযোগ তাঁর হলো না। পরিস্থিতি দ্রুত অভিযান চালাতে বাধ্য করল।

নিরূন শাসক সুন্দরশ্রী তার অনুগত এক বৌদ্ধকে সিস্তানের বৌদ্ধ শাসকের কাছে পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। যাতে সেখানকার শাসক বিন কাসিমের মোকাবেলা না করে স্বাগত জানায়। বিন কাসিম এই দূতের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ইতোমধ্যে সেই দূতও ফিরে এলো।

দূত এসে সুন্দরশ্রীর উপস্থিতিতে বিন কাসিমকে জানালো, সিস্তান এখন শুধু একটি দুর্গ নয়, সেটি পাহাড়ের মতো দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে। রাজা দাহির

সিস্তানের বৌদ্ধ শাসককে রাজধানীতে তলব করেছেন আর তার পরিবর্তে তার ভাতিজা বিজয় রায়কে সেখানকার শাসক বানিয়েছেন।

বিজয় রায় এসেই সেনাবাহিনীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সে সেনাদেরকে নতুনভাবে তৈরি করেছে। এমনিতেই সিস্তান দুর্গ মজবুত। তদুপরি বিজয় রায় দুর্গটিকে আরো দুর্ভেদ্য বানিয়ে ফেলেছে। সিস্তান দুর্গ অবরোধ করে জয় করা সহজসাধ্য হবে না। তাছাড়া দুর্গ রক্ষার জন্য তারা কোত্থেকে জানি একটি মিনজানিক নিয়ে এসেছে।

মিনজানিক ওখানে কখন এনেছে ওরা? দূতকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

আমি সেখানে থাকাবস্থায়ই মিনজানিকটি এনেছে তারা। দুর্গের ভিতরে সেটিকে নিয়ে আসার দৃশ্যও আমি দেখেছি, বলল দূত। দু'টি হাতি সেটিকে টেনে নিয়ে আসছিল, আর বারো তোরোজন অশ্বারোহীও সেটির সাথে ছিল। আমিতো দেখে অবাক। মিনজানিক কোত্থেকে আনলো এরা। কারণ এই অঞ্চলে এমন যন্ত্র বানানোর কোন কারিগর নেই।

দুর্গের প্রধান ফটকের ওপরের দুর্গপ্রাচীরে সেটিকে স্থাপন করেছে। মিনজানিকের পাশে পাথরের বিশাল স্তূপ করেছে।

দূতের কথা শুনে স্মিত হেসে বিন কাসিম বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। এরা আসলে বোকা। এরা এক দিকে দারুণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, এখানে এসে আমাদের চার সিপাহীকে হত্যা করে মিনজানিক চুরি করে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু এরা এটা জানা ও বোঝার চেষ্টা করেনি, মিনজানিক কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে হয়। ঠিক আছে তুমি আর কি দেখে এসেছ বলো...।

'সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী' বলল দূত। আমি ওখানে গিয়ে যখন জানতে পারি শাসক বদলে গেছে, তখন আত্মপরিচয় গোপন করে শহরে ঘুরতে থাকি। শহরের সাধারণ মানুষ যুদ্ধে আগ্রহী নয় কিন্তু বিজয় রায় তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছে। বিজয় রায় তাদেরকে মুসলমানদের সম্পর্কে ভয় দেখাতে বলছে, মুসলিম সৈন্যরা এতোটাই হিংস্র যে, ওরা শহরে প্রবেশ করলে নির্বিচারে গণহত্যা চালাবে, শহর তছনছ করে ফেলবে, তাছাড়া শহরে সকল যুবতীদের ধরে নিয়ে সৈন্যরা ভাগাভাগি করে তাদের সাথে...?

বিজয় রায়ের এ অপপ্রচার ছিল সকল অমুসলিমদের অপপ্রচারেরই একটা অংশ। সেও মুসলিম বিদ্বেষীদের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেই সিস্তানের

অধিবাসীদেরকে মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। কিন্তু বিজয় রায়ের এই অপপ্রচার ছিল বিন কাসিমের বাহিনীর কার্যক্রমের বিপরীত। বিন কাসিমের বাহিনী সিন্ধু এলাকার যেসব দুর্গ ও শহর জয় করেছিল সেখানকার অধিবাসী ও হিন্দু বাসিন্দারা পর্যন্ত বিন কাসিম ও মুসলিম সৈন্যদের সৎব্যবহারে ছিল মুগ্ধ। তারা রাজা দাহির ও হিন্দু শাসকদের অপপ্রচারের বিপরীত প্রত্যক্ষ করছিল মুসলিম সেনাদের মধ্যে। ফলে তাদের ইতিবাচক প্রচারণা হিন্দু শাসকদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডাকে অকার্যকর করে দিচ্ছিল। ডাভেল, নিরূন বিজিত হওয়ার পর সেখানকার বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ব্যবসায়ী নানা কাজে সিস্তানসহ অন্যান্য এলাকায় গিয়ে মুসলিম সৈন্যদের সৎব্যবহার ও তাদের সুশাসনের প্রচার করছিল। তারা যেখানেই যেত সর্বাগ্রে আলাপ আলোচনায় স্থান পেতো মুসলিম সৈন্যদের ন্যায়নীতি ও সুশাসনের প্রশংসা।

বিজিত শহর আরমান ভিলা, ডাভেল ও নিরূনের কিছু ব্যবসায়ী ও নাগরিক সিস্তানে এসে মুসলিম সৈন্যদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করায় বিজয় রায়ের অপপ্রচার হালে পানি পাচ্ছিল না। বিজিত এলাকার ব্যবসায়ীরা এসে সিস্তানবাসীদের জানালো, বিজয়ী সৈন্যরা ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে না, কোন বাড়িঘরে হামলা করে না, কারো ওপর জুলুম অত্যাচার করে না, বিশেষ করে কোন নারীর প্রতি তারা তাকিয়েও দেখে না। তারা নারীকে খুবই ইজ্জত ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে।

সুন্দরশ্রীর দূত আরো বলল, সিস্তানের সাধারণ নাগরিক আর সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য নেই। হিন্দু সেনাবাহিনী ও সেখানকার সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ নাগরিকদের মধ্যে আদর্শিক মত পার্থক্য প্রবল।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম একজনকে নিরূনের শাসক নিযুক্ত করে এবং সেনাদের একটি ইউনিটকে নিরূনের প্রশাসনিক দায়িত্বে রেখে সিস্তানের দিকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিলেন। বিন কাসিম কোন সালের কোন মাসে কোন তারিখে নিরূন থেকে সিস্তানের দিকে অগ্রাভিযান শুরু করেছিলেন এর সুস্পষ্ট কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মিনজানিক চুরি হওয়া এবং চারজন সৈন্য গুপ্তঘাতকের আক্রমণে মারা যাওয়ার পর বিন কাসিম খুবই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বের চেয়ে তিনি আরো বেশি সতর্ক ও সচেতনতার সাথে পা মেপে মেপে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কোন ধরনের ঝটিকা আক্রমণে যাতে শত্রু বাহিনী তাদের ঘায়েল করতে না পারে এজন্য সৈন্যদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে অভিযান শুরু করলেন।

তিনি মধ্যভাগে অবস্থান নিলেন। সবার আগে পাঠিয়ে দিলেন অগ্রবর্তী দল। আর দু'পাশের বাহুতে উষ্ট্রারোহী বাহিনীকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন, যাতে শত্রু বাহিনী হঠাৎ পিছন দিক কিংবা কোন বাহুতে ঝটিকা আক্রমণ করে সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করতে না পারে। যথাসম্ভম যাত্রা বিরতি কম করে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য সেনাদের নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। রাজা দাহিরের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় বিন কাসিমের জনবল ছিল কম কিন্তু কম হলেও তারা প্লাবনের মতো দ্রুতগতিতে শত্রু ঘাটির প্রতি অগ্রসর হচ্ছিল। এদিকে রাজা দাহির সিস্তানের বৌদ্ধ শাসককে রাজধানীতে ডেকে নিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিস্তানের শাসক ও সেনাপ্রধানের ক্ষমতায় আপন ভাতিজা বিজয় রায়কে বসায়।

অভিযানের তৃতীয় দিনে বিন কাসিমের সৈন্যরা মৌজ নামক স্থানে পৌঁছে গেল। মৌজ সিস্তান শাসকের অধীনে ছিল। এলাকাটির অবস্থান ছিল একটি নদীর তীরে। নদীর তীরে বসতিও ছিল তবে এরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বিন কাসিমের বাহিনী যখন সেখানে শিবির স্থাপন করল, তখন সেখানকার বৌদ্ধদের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিন কাসিমের কাছে হাজির হলো। ভিক্ষুরা গিয়ে বিন কাসিমকে জানালো, আমরা আপনার কাছে শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমরা কোন সংঘাতে বিশ্বাস করি না। বৌদ্ধধর্ম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। হিংসা বিদ্বেষ রক্তপাত আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ও মহাপাপ। আমরা আপনার কাছে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছি। আপনি আমাদেরকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করুন।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, মৌজ এলাকার বৌদ্ধরা সিস্তানের পরিবর্তিত শাসক বিজয় রায়ের কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এই আবেদন করেছিলেন যে, আপনি দুর্গভ্যন্তরে রয়েছেন আপনার হাতে রয়েছে সেনাবাহিনী। আমরা খুবই দুর্বল, আমাদের লড়াই করার সামর্থ নেই। লড়াই করতে চাইলেও আমরা তা পারব না, কারণ আমরা লড়াই ও সংঘাতে অভ্যস্ত নই। আমাদের ধর্ম যুদ্ধ সংঘাতের বিরোধী। আমাদের ধর্ম গুরু মহাত্মা বৌদ্ধ বলেছেন, সৈন্য দিয়ে কোন জনবসতিকে তোমার পর্যুদস্ত করে দিতে পারো, তরবারী দিয়ে করো দেহ দ্বিখণ্ডিত করে দিতে পারো, তীর চালিয়ে বুক ঝাঁজরা করে ফেলতে পারো কিন্তু অত্যাচার চালিয়ে কোন মানুষের মন জয় করতে পারবে না। আপনি যদি চান যে, আমরা মুসলিম সৈন্যদের আনুগত্য না করি, তাহলে আমাদের সাথে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিন কিন্তু আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না।

বিজয় রায় বৌদ্ধদের এই পয়গাম শুনে তার সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, এদেরকে অপমান করে দুর্গ থেকে বের করে দাও। বিজয় রায়ের কাছ থেকে অপমাণিত হয়ে ফিরে এসে বৌদ্ধদের একটি দল বিন কাসিমের কাছে হাজির হয়। তারা বিন কাসিমকে প্রস্তাব করে, আপনি যদি এই বসতি দখল করতে চান তাহলে করতে পারেন, আপনাকে কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে না। আপনি যদি এখান থেকে আপনাদের ঘোড়া ও উটের খাবার সংগ্রহ করতে চান, করতে পারেন, আপনি ইচ্ছা করলে সৈন্যদের জন্য খাবার ও তরিতরকারীও সংগ্রহ করতে পারেন। আপনি যদি নগত টাকা পয়সা নিতে আগ্রহী হন তাহলে তাও আমরা আপনার দরবারে হাজির করতে প্রস্তুত।

'শান্তি ও বন্ধুত্বের চেয়ে আর কিছুই বেশি দামী হতে পারে না।' ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম। আপনারা যেহেতু বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন, তাই আমরাও আপনাদের ধন সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এখন থেকে আমরাই হবো আপনাদের জীবন সম্পদ ও ইজ্জত সম্ভ্রমের পাহারাদার।

✪✪✪

বিন কাসিম সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে সিস্তানে পৌঁছে দেখলেন দুর্গের সব ক'টি ফটক বন্ধ। দুর্গপ্রাচীরের প্রশস্ত দেয়ালের ওপর সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। মুসলিম সৈন্যদের আসার খবর পেয়েই বিজয় যায় দুর্গের প্রতিরক্ষাব্যুহ রচনা করেছিল।

মুসলিম সৈন্যরা দেখলো একটি মিনজানিক দুর্গের সদর দরজার ওপরের দেয়ালে রাখা হয়েছে। বিন কাসিমের নির্দেশে এক ডেপুটি সেনাপতি ফটকের কাছে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, কোন ধরনের প্রতিরোধের চেষ্টা না করে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গের ফটক খুলে দাও। না হয় আমাদেরকে যদি দুর্গ দখল করতে হয় তাহলে তোমাদের কাছ থেকে আমরা অধীনতামূলক জিজিয়াসহ যাবতীয় যুদ্ধ ব্যয় আদায় করবো এবং তোমাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদে পরিণত হবে, আর সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তাকেই জ্যান্ত রাখা হবে না।

"যদি সাহস থাকে তাহলে হামলা করে দেখো, শক্তি থাকলে দুর্গ দখল করেই দেখিয়ে দাও।" জবাব এলো দুর্গপ্রাচীর থেকে।

দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি মিনজানিক স্থাপন করতে মিনজানিক ইউনিটকে নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। মিনজানিক এগিয়ে নিতে গেলে দেয়ালের ওপর

থেকে শত্রু বাহিনী তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। সেই সাথে দুর্গফটকের ওপরে স্থাপনকৃত মিজানিক থেকে পাথরও নিক্ষেপ শুরু করল হিন্দু সৈন্যরা। তবুও মুসলিম সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি চলে গেল কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের এমন কোন জায়গা দেখা গেল না যেখানে মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা যাবে।

দুর্গের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিজয় রায় ও তার অনুগত সেনাদের অনুকূলে ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ অধিবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মুসলিম সেনারা অবরোধ করার পরপরই বিজয় রায়ের কাছে গিয়ে আবেদন করল, "মহামান্য শাসক! আপনি দুর্গফটক খুলে দিন। শহরের অধিবাসীরা যুদ্ধ চায় না। আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা পাবেন না। বিজয় রায় তাদেরকে হুমকি ধমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে জেলখানায় বন্দি করে রাখার নির্দেশ দিলো। অতঃপর দুর্গব্যাপী হুকুম জারি করল, যারা যুদ্ধ করতে চায় না, তারা যেন নিজ নিজ বাড়িঘরে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করে আর যারা যুদ্ধ করতে চায় তারা যেন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গপ্রাচীরে এসে হাজির হয়।

বিজয় রায়ের সৈন্যরা মুসলিম বাহিনী যে দিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করে দেয়ালে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করছিল, সে দিকে তীরের তুফান বইয়ে দিচ্ছিল। তাছাড়া বিজয় রায়ের সৈন্যরা হঠাৎ কোন দরজা খুলে শত শত অশ্বারোহী ঝড়ের বেগে এসে মুসলিম সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে আবার ঝড়ের বেগে দুর্গে প্রবেশ করে পরিস্থিতি সংকটময় করে তুলছিল।

অবস্থা দেখে বিন কাসিম সর্বশ্রেষ্ঠ মিনজানিক উরূস এর পরিচালক জাউনা সালমীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের কাছ থেকে চুরি করে আনা মিনজানিক দিয়ে শত্রু সেনারা আমাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করছে। ছোট মিনজানিকগুলো দিয়ে ওটাকে আঘাত করা যাচ্ছে না। তুমি ডাভেল মন্দিরের চূড়া ভেঙে সেখানকার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দিয়েছিল। আজও এই মিনজানিকটাকে উড়িয়ে দাও।

এটি উড়িয়ে দেবো ইন্‌শাআল্লাহ্। সম্মানিত সেনাপতি! আপনি চিন্তা করবেন না। এতে আমার মাত্র তিনটি পাথর ব্যবহার করতে হবে। জাউনা সালমী উরূসকে এগিয়ে নিয়ে সুবিধা মতো স্থানে স্থাপন করে তিনটি বিরাটকায় পাথর সেটিতে রাখল। পাঁচ'শ সৈন্য তার নির্দেশে মিনজানিক উৎক্ষেপণ করলে লক্ষভেদী নিক্ষিপ্ত পাথর গিয়ে দুর্গফটকের ওপরে শত্রু

সেনাদের স্থাপিত মিনজানিকের একপাশে আঘাত হানলো। এতে শত্রুদের মিনজানিকটি এক দিকে কাত হয়ে গেল। এরপর আরেকটি পাথর নিক্ষেপ করলে সেটি গিয়ে মিনজানিকের মাথায় আঘাত করলে সেটি ধ্বসে গিয়ে স্থান থেকে সরে গেল। তৃতীয় পাথরটির আঘাতে শত্রুদের মিনজানিক দুর্গপ্রাচীরের নিচে নিক্ষিপ্ত হলো।

এরপর মুসলিম সৈন্যদের আর শত্রুদের নিক্ষিপ্ত পাথরের মোকাবেলা করতে হলো না। শুরু হলো এক তরফা মুসলিম বাহিনীর মিনজানিক থেকে শত্রুদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ। বিজয় রায় মুসলিম সৈন্যদের অবরোধ ভাঙার জন্য দুর্গফটক খুলে হঠাৎ ঝটিকা আক্রমণ করে আবার দুর্গে ফিরে আসার নির্দেশ দিলো। যথেষ্ট সাহসিকতার সাথে বিজয় রায়ের সৈন্যরা ঝটিকা আক্রমণ করে ফিরে যেত। মুসলিম সেনারা ওদের তাড়া করতেই তারা দুর্গপ্রাচীরের ভিতরে চলে যাচ্ছিল। এভাবে চলে গেল এক সপ্তাহ। উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অগ্রগতি মুসলিম সৈন্যরাও সাধন করতে পারল না।

এমন সময় রাতের বেলায় মুসলিম বাহিনীর প্রহরীদল দু'লোককে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তাদের শরীর কাদাপানিতে একাকার। তারা সৈন্যদের বলল, আমরা দুর্গের ভিতর থেকে এসেছি, মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির সাথে আমরা সাক্ষাত করতে চাই। সৈন্যরা এদেরকে সেনাপতি বিন কাসিমের কাছে না নিয়ে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর কাছে নিয়ে এলো। কারণ এদেরকে শত্রু সেনাদের গোয়েন্দা হওয়ার আশঙ্কা করছিল তারা।

"তোমরা যে দুর্গের ভিতর থেকে এসেছ, এটা কিভাবে বিশ্বাস করব?" ধৃতদের জিজ্ঞেস করলেন শা'বান ছাকাফী। শুধু তোমরা দু'জনের জন্যই কি দুর্গফটক খুলে দেয়া হয়েছে?

তোমাদের কি ধারণা শুধু ফটক দিয়েই দুর্গের বাইরে আসা যায়, আর কোন রাস্তা নেই? বলল এক আগন্তুক। দুর্গের ওই দিকটা পাহাড় টিলা ও জঙ্গলাকীর্ণ। ওদিকে দুর্গের বর্জ পানি বের হওয়ার জন্য দুর্গপ্রাচীরের নিচ দিয়ে একটি ড্রেন আছে। যেহেতু ওদিকটা জঙ্গলাকীর্ণ ও ময়লা আবর্জনার স্তুপে দুর্গন্ধময়। এ জন্য ওদিকে তেমন কেউ যায় না। ওখানকার রাস্তাও লোকজন চেনে না। আমরা দু'জন সেই ড্রেনের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের নীচের সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বের হওয়ার কাজটি সহসাধ্য ছিল না।

কি উদ্দেশ্যে তোমরা বেরিয়ে এসেছো? জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী।

আমরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বলল অপরজন। সিস্তান ও মৌজের অধিবাসীরা তোমাদেরকে কি বলেনি সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এখানে আমাদের ধর্মগুরু ভিক্ষু রয়েছেন। বৌদ্ধরা কারো সাথে সংঘাত সংঘর্ষ ও যুদ্ধ করে না, এটা তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ। আমরা জানি, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না, তাদেরকে তোমরা ভালো জানো। নিরূনে আমাদেব শাসক সুন্দরশ্রী বিনা বিবাদে তোমাদের কি স্বাগত জানায় নি? এখানে দুর্গভ্যন্তরে তোমরা যেসব পাথর নিক্ষেপ করছো, সেগুলো আমাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা শান্তি প্রিয় মানুষ। আমরা এখানে নির্বিবাদে জীবন যাপন করছি। আমাদের কোন লোক দাহিরের সেনাবাহিনীতে নেই।

আমরা এ অবস্থায় তোমাদের কি ধরনের সাহায্য করতে পারি? জানতে চাইলেন গোয়েন্দা প্রধান। তোমাদের লোকজন দুর্গের ভিতরে বসবাস করছে, কি করলে তোমাদের বাচানো যাবে?

তোমাদের সাহায্যের জন্য নয়, আমরা এসেছি তোমাদের সহযোগিতা করতে। বলল এক বৌদ্ধ। যে পথে আমরা দুর্গের বাইরে এসেছি এ পথ দিয়ে তোমরা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে পারো। কিন্তু এ পথটিকে সুড়ঙ্গ করে আরো প্রশস্ত করতে হবে। সেখানকার নীচের মাটি নরম। তোমরা রাতারাতি সুড়ঙ্গ বড় করে সকাল হওয়ার আগেই দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ো। আমাদের ভিক্ষুরা বলেছেন, দুর্গের ভিতরে তোমাদের সহযোগী লোকের অভাব হবে না। আমরা তোমাদেরকে ভিতরে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিতে এসেছি।

✪ ✪ ✪

শা'বান ছাকাফী তাৎক্ষণিকভাবে এদেরকে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে গেলেন এবং এদের সামগ্রিক অবস্থা সবিস্তারে সেনাপ্রধানকে অবহিত করলেন।

বিন কাসিম বর্ণনা শোনা মাত্র সেই স্থানটি দেখার জন্য বের হলেন। গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন জায়গাটা এতোটাই পুতি দুর্গন্ধময় যে সেখানে দাঁড়ানোই সম্ভব নয়, ময়লা আবর্জনা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে একাকার। তিনি ময়লা পানি সেখান থেকে সরানোর পথ খুঁজতে লাগলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি একটা পরিকল্পনা করলেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন। যে দিক দিয়ে দুর্গের পানি

বাইরে বের হচ্ছিল এদিকে বেশি করে পাথর নিক্ষেপের জন্য মিনজানিক চালকদের তিনি নির্দেশ দিলেন কিন্তু কোন মিনজানিককে এ দিকে এগিয়ে আনতে নিষেধ করলেন। সেই সাথে সৈন্যদের বললেন, যেকোন মূল্যে ভোর হওয়ার আগেই সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শেষ করতে হবে।

যে পথে দুর্গের পানি বের হচ্ছিল সেটিকেই খনন করে বড় করার কাজ শুরু হলো। সেখানকার মাটি ছিল কাদা পানিতে একাকার। কিন্তু পানি আটকিয়ে খনন কাজ শুরু করতেই খননকৃত জায়গায় পানি এসে ভরে যাচ্ছিল। এতে খনন কাজ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিন কাসিম সেখানেই দাড়িয়ে খনন কাজ তদারকি করছিলেন। সৈন্যরা কোমর পানিতে শরীর ডুবিয়ে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। জায়গাটি জঙ্গলাকীর্ণ বিধায় ছিল প্রচণ্ড অন্ধকারাচ্ছন্ন। এদিকে মিনজানিক থেকে দুর্গের এ পাশে অবিরাম পাথর নিক্ষেপের ফলে দুর্গের এ পাশে কেউ আসার সাহস করল না। আরব সৈন্যদের মধ্যে এ ধরনের সুড়ঙ্গ তৈরিতে পারদর্শী লোকের অভাব ছিল না। তারা জীবনবাজী রেখে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ দ্রুততার সাথে সমাপ্ত করতে জানপ্রাণ দিয়ে লেগে গেল।

ভোর হওয়ার আগেই সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। সময়ের অভাবে সুড়ং পথটি খুব বেশি বড় করা সম্ভব হয়নি। ভোর হওয়ার আগেই মুসলিম বাহিনীর জানবাজ কিছু সংখ্যক সৈন্যকে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। দু'জন সৈন্য গায়ে গা মিশিয়ে কোন মতে ভিতরে প্রবেশ করার মতো সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছিল। দু'জন ভিতরে প্রবেশ করেই পিছনে আশা সাথীকে বলল, এদিকে পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করতে বলো। সাথীরা পরস্পর একথা দুর্গের বাইরের সাথীদের মাধ্যমে দ্রুত বিন কাসিম পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

দুর্গ থেকে আগত বৌদ্ধ দু'জনও প্রবেশকারী সৈন্যদের সাথে ছিল। এদেরই অপর এক সাথী দুর্গের ভিতরে তাদের দেখার অপেক্ষায় ছিল। মুসলিম সৈন্যদের কয়েকজন ভিতরে প্রবেশ করলে বৌদ্ধরা তাদেরকে সবচেয়ে নিকটবর্তী দুর্গফটকের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে তখন কয়েকজন হিন্দু সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। হিন্দু সৈন্যরা কল্পনাও করেনি, কোন মুসলিম সৈন্য রাতের অন্ধকারে সেখানে পৌঁছে যাবে। এ দিক থেকে ওরা ছিল অনেকটাই নিশ্চিন্তে। মুসলিম জানবাজরা অতর্কিতে হিন্দু প্রহরীদের ওপর হামলে পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যে সবপ্রহরীকে ধরাশায়ী করে দ্রুত দুর্গের দরজা খুলে দিল।

ইঙ্গিত পেয়ে মুসলিম সৈন্যরা বাধ ভাঙা শ্রাবনের মতো দুর্গভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই সাথে মুসলিম সৈন্যরা আরেকটি দরজা খুলে দেয়। রাজা দাহিরের ভাতিজা বিজয় রায় ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারার মতো প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল এবং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে সে পালানোর পথ খুঁজছিল। ভোরের অন্ধকার ফুড়ে সকালে প্রথম আলোতেই দুর্গের অধিবাসীরা দেখতে পেল, প্রধান ফটকের ওপরে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীর্ন।

✪ ✪ ✪

বিজয়ী মুসলিম সৈন্যরা বিজয় রায়ের সৈন্যদের গ্রেফতার করতে শুরু করলে দুর্গব্যাপী তালাশ করেও বিজয় রায়কে কোথাও পাওয়া গেল না। বিজয় রায়ের ধৃত সৈন্যরা বিন কাসিমকে জানালো, মুসলিম বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করতে দেখেই বিজয় রায় তার বিবি বাচ্চা ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে রাতের অন্ধকার থাকতেই প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদেরকে বিজয় রায়ের পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলে বিজয় রায়ের এক কমান্ডার জানালো, তাকে এখন আর পাওয়া যাবে না। এতোক্ষণে সে সিসিম দুর্গে পৌঁছে গেছে।

বিন কাসিম বিজয় রায়ের সৈন্যদের মধ্য থেকে ধৃত কমান্ডারদের জড়ো করার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে আরো বললেন, এদেরকে বলো, যারা আমাদের মিনজানিক চুরি করেছিল এবং আমাদের চারজন সাথীকে হত্যা করেছিল, তাদেরকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে। এরা যদি ওদের চিহ্নিত করতে গড়িমসি করে তাহলে এদের প্রত্যেকের মাথা উড়িয়ে দাও এবং এদের ঘরবাড়ির সকল সহায় সম্পদ গণীমতের সম্পদ হিসেবে নিয়ে এসো।

শা'বান ছাকাফী বিজয় রায়ের ধৃত কমান্ডারদের একত্রিত করে বিন কাসিমের নির্দেশের কথা জানালেন। সেই সাথে তিনি এই হুমকিও দিলেন, তোমরা যদি ওদের চিহ্নিত করতে গড়িমসি কিংবা অজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে সবাইকে হাত পা বেধে জমিনের ওপর শুইয়ে ওপর দিয়ে ঘোড়া দৌড়িয়ে দেয়া হবে।

ধৃত কমান্ডাররা আতঙ্কিত হয়ে মিনজানিক চোরাই কাজে জড়িতদের নাম বলে দিলো এবং তাদের দেখিয়ে দিলো। বিজয় রায়ের সকল সৈন্যই ছিল যুদ্ধাপরাধী। সবাইকে বেধে এক জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তন্মধ্যে চিহ্নিত দশজনকে উঠিয়ে বিন কাসিমের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। মিনজানিক চুরি করার সময় এই দলের লোকছিল চৌদ্দজন কিন্তু তাদের মধ্য

থেকে চারজন বিজয় রায়ের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে যে দলনেতা ছিল সে নিজ থেকেই বিন কাসিমের কাছে এসে আত্মস্বীকৃতি দিলো।

তাদের কাছ থেকে জানা গেল, মূলত মিনজানিক চুরির পরিকল্পনা করেছিল রাজা দাহির ও তার উজির বুদ্ধিমান। এ কাজটি সম্পাদন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বিজয় রায়ের ওপর। বিজয় রায় মুসলিম বাহিনীর মিনজানিক চুরি করার জন্য তার সৈন্যদের মধ্য থেকে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ চৌদ্দ জনকে নিয়োগ করে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন কমান্ডারকে এদের দলনেতা নিযুক্ত করে। এর আগে বিজয় রায় গোয়েন্দার মাধ্যমে খবর নিয়েছিল মুসলিম বাহিনীর কয়েকটি মিনজানিক এখনো নৌকায় রয়ে গেছে এবং সেই নৌকাগুলো নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। গোয়েন্দা আরো জানালো, সেখানে প্রতি রাতে চারজন সৈন্য পালাক্রমে পাহারা দেয়। একটি তাঁবুতে সৈন্যরা অবস্থান করে।

বিজয় রায়ের নির্দেশে চৌদ্দজন সৈনিক শক্তিশালী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অনেকটা পথ ঘুরে সাকিরা নদীর তীরবর্তী মিনজানিক বোঝাই করা নৌকাগুলোর কাছে পৌঁছে গেল। নদীর তীর থেকে কিছুটা দূরে অপেক্ষা করে তাদের মধ্য থেকে দু'জন সৈনিক ছেঁড়া ফাটা মলিন পোশাক পরিধান করে পাহারারত মুসলিম সৈন্যদের কাছে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ফরিয়াদ করল, "আমরা আপনাদেরকে আপনাদের প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। আরো বলল, আমরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। সফরে বের হয়েছি, আমাদের সাথে দুটি যুবতী মেয়ে ছিল। এখান থেকে একটু দূরে ডাকাতরা আমাদের কাছ থেকে তাদের কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডাকাতরা আমাদের কাছ থেকে সহায় সম্পদ অর্থকড়ি সোনাদানা সবই নিয়ে গেছে। আমাদের সাথে বয়স্ক দু'জন ছিল, ডাকাতরা তাদের মেরে ফেলেছে। আমরা প্রাণ নিয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছি। আমরা যেহেতু মহাত্মা বৌদ্ধের অনুসারী, এজন্য আমরা সাথে কোন অস্ত্র রাখি না। কারো সাথে আমরা মারামারিও করতে পারি না।

ডাকাতরা কি ঘোড়া বা উটের ওপর সওয়ার? সাহায্য প্রার্থীদের জিজ্ঞেস করল এক পাহারাদার। না, এরা পায়দল। দয়া করে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। এখনতো এখানে আপনারাই রাজা বাদশা।

বিজয় রায়ের পাঠানো সৈন্য দু'জন মুসলিম পাহারাদারদের সাথে নির্যাতিত ও অসহায়ত্বের এমন নিপুণ অভিনয় করল যে, মুসলিম সৈন্যরা

অত্যাচারিতের সাহায্যের জন্য আবেগে উদ্বেলিত হয়ে গেল। হাতে তরবারী ও বর্শা নিয়ে পাহারাদার দু'জন সাহায্য প্রার্থীদের নিয়ে তাদের দেখানো জায়গার দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

এ দিকে তাদের গন্তব্য স্থলের দিক থেকে ভেসে আসছিল নারী কণ্ঠের আর্তনাদ ও আর্তচিৎকার, ফলে সাহায্যকারীগণ নির্যাতিতদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আরো বেশি আবেগ উত্তেজনা নিয়ে দৌড়াতো লাগল।

এলাকাটি ছিল ঘন ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ। সাহায্যকারীগণ দৌড়ে যাচ্ছিলো কল্পিত ডাকাতদের ধরতে আর মজলুম নারীদের উদ্ধার করতে কিন্তু গোটা ঘটনাটাই যে ছিল পরিকল্পিত নাটক তা ঘূর্ণাক্ষরেও তারা ভাবতে পারেনি। এদিকে ওৎপেতে থাকা চার পাঁচজন হিন্দু সৈন্য হঠাৎ দৌড়ে আসা মুসলিম প্রহরীদের ওপর খঞ্জর নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করল।

এদিকে আরো কয়েকজন হিন্দু সৈন্য চুপি চুপি নদীর তীরবর্তী তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো। পাহারাদারদের দু'জন তখন তাবুতে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হিন্দু ঘাতকরা পা টিপে টিপে তাবুতে ঢুকে অতর্কিতে তাদের বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দিলো। মুসলিম সৈন্য দুজন প্রতিরোধের কোন অবকাশই পেল না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শত্রু সেনাদের খঞ্জরাঘাতে নিহত হলো তারা।

পাহারাদারদের হত্যার পর বিজয় রায়ের সৈন্যরা নদীতীরে জড় হয়ে সর্বশেষ মিনজানিক বোঝাই নৌকাটির বাধন খুলে সেটিকে বেয়ে কিছুটা ভাটিতে নদীর অপর পাড়ে নিয়ে এলো।

এ পাড়ে প্রশিক্ষিত দু'টি জঙ্গী হাতিসহ কয়েজন তাদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সবাই মিলে মিনজানিক বোঝাই নৌকাটিকে টেনে কিছুটা ডাঙ্গায় উঠিয়ে মিনজানিকটি রশি দিয়ে হাতির সাথে বেঁধে দিলো। জঙ্গী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতিগুলো দু'টি মিনজানিক দ্রুত টেনে নিয়ে রাতারাতি এতোদূর অগ্রসর হলো যে তাদের আর মুসলিম বাহিনী ধরতে পারল না।

ধৃত হিন্দু সৈন্যরা বিন কাসিমকে জানালো, রাজা দাহিরের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মিনজানিকটি রাজধানী উরুঢ়ে পৌছে দেয়ার জন্য কিন্তু বিজয় রায় গোয়ার্তুমী করে মুসলিম সৈন্যদের অবরোধ ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য দুর্গপ্রাচীরের ওপরে মিনজানিক স্থাপন করে।

সে গর্ব ভরে বলছিল, আরব বাহিনী যদি সিস্তান দখল করতে আসে তাহলে এই মিনজানিক দিয়েই সে আরবদের পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু দেখা

গেল, আরব সৈন্যরা এসে মাত্র দু'টি পাথর নিক্ষেপ করেই সেই মিনজানিক বেকার করে ফেলল।

বিজয় রায় হয়তো জানতোই না, রাজা দাহির কেন এ মিনজানিকের প্রতি এতোটা আগ্রহী ছিলেন। রাজা তার কারিগরদেরকে এটি দেখিয়ে তাদের দিয়ে অনুরূপ বহু সংখ্যক মিনজানিক তৈরি করিয়ে নিতে চাচ্ছিলেন। একথাও জানা গেছে যে, দাহির যেসব দেশত্যাগী আরবকে মাকরানে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের ডেকে এনে জানতে চেয়েছিল, এই আরবদের মধ্যে কেউ মিনজানিক তৈরির কাজ জানে কি-না। কিন্তু আশ্রিত মুসলমানদের সর্দার আলাফী রাজাকে জানান, তাদের এখানে মিনজানিক তৈরি জানে এমন কেউ নেই।

অথচ বাস্তবে আলাফীর সাথীদের মধ্যে দু'জন মিনজানিক তৈরির কাজে পারদর্শি ছিল। কিন্তু তারা এ কাজ জানে এমনটি স্বীকার করেনি, কারণ তারা জানতো, স্বীকার করলে তাদেরকে ব্যবহার করে রাজা দাহির তাদেরই জ্ঞাতি ও জাতি ভাইদের বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করবে। বিন কাসিম মিনজানিক চোরাই কাজে জড়িত দলনেতাসহ সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

পর্ব আট

ঝিলপাড়ে রক্ষিত তশতরিতে বিন কাসিমের দ্বিখণ্ডিত মাথা রেখে আমার কাছে নিয়ে এসো-

হিন্দুস্তানে ইসলামের আগমন ও বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের জন্য সিস্তানের বিজয় ছিল একটি মাইল ফলক। আরব সৈন্যরা সিন্ধু অববাহিকার পলিমাটিতে নিজেদের রক্তে তৈরি করেছিল ইসলামের মহাপথ। সে পথেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ইসলাম। কিন্তু সে সময়ে এ কাজটি অতোটা সহজ ছিল না, যতোটা সহজে আজ আমরা কথামালায় সেদিনের বিজয় ও মুসলিম সৈন্যদের কীর্তির চিত্র আঁকতে চেষ্টা করছি। পৌত্তলিক হিন্দুস্তানের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন ও আল্লাহ্‌র তকবীর ধ্বনী ছড়িয়ে দিতে অসংখ্য আরব মায়ের বুক খালি করতে হয়েছে, মা হারিয়েছে আদরের ছেলে, বোন হারিয়েছে ভাই আর সোহাগিনী স্ত্রী হারিয়েছে প্রেমময় স্বামী আর কলিজার টুকরো শিশুরা হারিয়েছে প্রাণপ্রিয় পিতা। এক সাগর রক্ত ও অসংখ্য নারী পুরুষ, কন্যা-জায়া, জননী ও এতীম শিশুদের ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতে পৌত্তলিকতার স্বর্গরাজ্য হিন্দুস্তানের বাতাসে গুঞ্জরিত হয়েছে আযানের ধ্বনি।

বিন কাসিমের সহযোদ্ধাদের দেহ সিন্ধু অঞ্চলের কতো জায়গায় দাফন করতে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাদের এই আত্মত্যাগ ভারতের ধনরত্ন লুটতরাজের জন্য ছিল না, ছিল না সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা। প্রতিটি বিজিত এলাকায় তারা সাধারণ মানুষকে যে স্বাধীনতা ও শান্তির ছায়া দিতো, জিজিয়া হিসাবে তা ছিল খুবই নগণ্য। মুসলিম সৈন্যদের সদ্ব্যবহার হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক শাসকদের হাতে নির্যাতিত নিস্পেষিত সাধারণ জনতার হৃদয় জয় করেছিল, ফলে মুসলিম বাহিনী যতোই অগ্রসর হচ্ছিল হিন্দুস্তানের মাটিতেই তাদের অনুসারী ও ভক্তের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা দুর্গজয়ের পাশাপাশি গণমানুষের অন্তরও জয় করে নিচ্ছিল।

মমতা দিয়ে জয় হয় অন্তর তরবারী দিয়ে নয়। বিজিত মানুষেরা তাকেই বিজয়ী বীর বলে অভিহিত করে যে তাদের অন্তর জয় করে নিতে পারে।

বিন কাসিমের সৈন্যরা হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষের জন্য ছিল পরমবন্ধু, রেশমের মতোই কোমল কিন্তু রাজা দাহিরের মতো ইসলামের চিহ্নিত শত্রুদের জন্য বিন কাসিমের প্রতিটি সৈনিক ছিল আকাশের বজ্রের মতো আতঙ্ক।

মুসলিম ইতিহাসের গর্ব সবচেয়ে অল্প বয়ষের বিজয়ী সেনাপতি বিন কাসিম তখনো বিজিত দুর্গ শহর সিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর গন্তব্য ছিল আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার কিন্তু মুসলিম সৈন্যদের নীতি ছিল, তারা যখন কোন শহর দুর্গ বা অঞ্চল জয় করতো তখন সেই অঞ্চল বা শহরের মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা আগে সুসংহত করতো। তারা এই নীতিও অবলম্বন করত যে, শাসন কাজে তারা যাতে বিজিতদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য করও ঠিকমতো আদায় করতে পারে এবং বিজিত অঞ্চলের জনগণেরও যাতে কর দিতে কষ্টের মুখোমুখি না হতে হয়। সর্বাগ্রে তারা গণমানুষের আতঙ্ক দূর করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতো। বলার অপেক্ষা রাখে না যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কোন এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে। সিস্তানে শান্তি শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিন কাসিমকেও কিছু দিন সেখানে অবস্থান করতে হলো।

ইতোমধ্যে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সিস্তান বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে পয়গাম পাঠালেন। সেই পয়গামে তাঁর সেনাবাহিনীর অবস্থাসহ সার্বিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন। জানালেন, তাঁর সৈন্যদের কতোজন শাহাদাতবরণ করেছে, কতোজন পঙ্গু হয়ে বেকার হয়ে গেছে, আসবাব ও রসদপত্র কি পরিমাণ রয়েছে এবং সামনে কি প্রয়োজন হতে পারে। সেই সাথে শত্রুদের অবস্থাও জানালেন, সামনে কোন্ জায়গায় শত্রুরা কোন্ অবস্থায় আছে এবং কোথায় কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করেছে।

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরায় বসে সিন্ধু এলাকার যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। মাঝে মধ্যে তিনি এমন নির্দেশও পাঠাতেন, যা এখানকার পরিস্থিতি অনুধাবন করে বিন কাসিমের তৈরি পরিকল্পনার বিপরীত হতো। যেমন বিন কাসিম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এক দিকে অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু হাজ্জাজের পয়গাম এলো উল্টো দিকে যাও, সেখানে শত্রুদের তুমি এমন অবস্থায় পাবে।

ঐতিহাসিকগণ জোর দিয়েই একথা লিখেছেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের এসব নির্দেশ শুধু আন্দাজ ও অনুমান নির্ভর ছিল না। শক্তিশালী গোয়েন্দা ব্যবস্থা তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সেই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তিনি রণাঙ্গনের সার্বিক তাজা সংবাদ জানতে পারতেন। সেই সাথে সংবাদ প্রেরণের এমন গতিশীল ব্যবস্থা তিনি গড়ে তুলেছিলেন যে, ভারতের এই অঞ্চল থেকে সুদূর বসরায় মাত্র সাত দিনে খবর পৌছে যেত এবং সেই বসরা থেকে মাত্র সাতদিনে বিন কাসিম যখন যেখানে অবস্থান করতেন সেখানে সংবাদ চলে আসতো। এ জন্য তিনি সময় মতো সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে যে দিক-নির্দেশনা দিতেন তার প্রায় সিংহভাগই বাস্তব সম্মত হতো।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম তখনো সিস্তান দুর্গে অবস্থান করছিলেন। শহরের শান্তি শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। অগ্রাভিযানের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে ছিল। সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের কাজও সমাপ্ত হয়েছিল। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল। ঘরে ঘরে সেখানকার মানুষ পরম শান্তিতে বসবাস করছিল। বিজয়ী মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশের পর অধিবাসীদের মধ্যে যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল তার অবসান হয়েছিল। মুসলমান সৈন্যরা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে এ ধারণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা বিজিত বটে কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার তাদের আছে।

বিকেলের সূর্য শেষ আলোক বিকিরণ করে তলিয়ে যাচ্ছিল। দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ফটক রক্ষীরা। দুর্গের বাইরে ক্ষেত খামারে কর্মরত সকল মানুষ দুর্গের ভিতরে চলে এসেছিল। ফটক রক্ষীরা যখন দুর্গফটক বন্ধ করতে যাবে তখন সেখানে উপস্থিত হলো দু'জন লোক। প্রধান দুর্গফটকের কাছে এসে তারা থামল তাদের সাথে ছিল দুটি উষ্ট্রী। একটি উষ্ট্রীতে ছিল একজন বয়স্কা মহিলা আর অপর উষ্ট্রীর ওপর দু'জন তরুণী। পুরুষ দুজন হেটে এসেছে। মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল মলিন। পুরুষদের পরিধেয় কাপড় ছিল ময়লা। দেখে মনে হচ্ছিল অনেক দূর থেকে এসেছে।

তোমরা কে, কোথেকে এসেছ? দুর্গফটকের ওপর থেকে আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করল এক নিরাপত্তারক্ষী। অনেক দূর থেকে এসেছি। আমরা একটু আশ্রয়ের সন্ধান করছি। ওপরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো আগন্তুক এক পুরুষ।

ঠিক আছে, ভিতরে প্রবেশ করো, তবে দেউড়ীতে দাড়াও। নির্দেশের সুরে বলল নিরাপত্তারক্ষী। তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকো। ফটক বন্ধ করে দেয়া হবে। আগন্তুক উভয় পুরুষ আরোহীদের নিয়ে দু'টি উটসহ দুর্গফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। দুর্গরক্ষী দলের কমান্ডার তাদের আবারো জিজ্ঞেস করল, তারা কোত্থেকে এসেছে এবং কেন এসেছে? অজ্ঞাতনামা একটি জায়গার নাম বলে আগন্তুক এক পুরুষ বলল, তারা সেখান থেকে এসেছে, সেখানকার সৈন্য ও শাসকরা তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেছে, ফলে বাঁচার তাকিদে তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কাছে কোন ধন সম্পদ নেই, বলল বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ আগন্তুক। আমাদের কাছে এমন কোন সম্পদ নেই যা দিয়ে খোশহালে কোথাও জীবন যাপন করবো। আমাদের সাথে আছে যুবতী দুই বোন। দুর্ভাগ্য বশত এরা যুবতী এবং রূপসী। জালেম সৈন্যদের অত্যাচার থেকে এদেরকে বাঁচানোর জন্য আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এরা আমাদের সম্পদ, এরাই আমাদের সম্মানের বস্তু।

কোন মুসলিম সৈন্য কি তোমাদের হয়রাণী করেছে? না, সেখানে যদি মুসলিম সৈন্যরা পৌঁছে যেত তাহলে তো আমাদের আর কোন ভয় থাকতো না। মুসলমানরা মানুষকে সম্মান করে নারীকে ইজ্জত দেয় একথা শুনেই আমরা এখানে এসেছি। শুনেছি, মুসলমানরা নারীর ইজ্জতকে খুব সম্মান করে, কারো ধন সম্পদে হস্তক্ষেপ করে না। আপনি প্রয়োজনে আমাদের দুর্গ থেকে বের করে দিতে পারেন কিন্তু দয়া করে এই দুই যুবতী ও এদের বয়স্কা মাকে আশ্রয় দিন। পথ হারিয়ে আমরা অনেক দিন মরুভূমিতে এবং অচেনাপথে ঘুরে ঘুরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছি। আর সূর্য্যের তাপে দিনের বেলায় পুড়েছি।

দুঃখ কষ্টের কথা এরা এভাবে পাহারাদারকে শোনালো যে, তাদের কষ্টের বর্ণনা শুনে দুর্গফটকের কমান্ডার ও তার সহকর্মীদের মধ্যে দয়ার উদ্রেক হলো।

দুর্গফটকের কমান্ডার বলল, তোমরা দুর্গের ভিতরের দিকে চলে যাও, গিয়ে জেনে নাও, এখানে কোথায় পান্থশালা আছে। সেখানে গিয়ে থাকো। পান্থশালায় মুসাফিরদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্তু আছে। আচ্ছা, তোমাদের ধর্ম কি? জিজ্ঞেস করল কমান্ডার।

আমরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। জবাব দিলো বয়স্ক লোকটি। এখন গিয়ে মুসাফিরখানায় থাকো। দিনের বেলায় এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ভিক্ষুর

সাথে সাক্ষাত করো, সেই তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। শহরে বেশ কয়েকটি বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে। এগুলো এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের ঘর বাড়ি। ওগুলোতে তোমরা নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে।

আগন্তুকরা মাথা নীচু করে দুর্গরক্ষী কমান্ডারকে কুর্নিশ করে সামনে অগ্রসর হলো।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়িয়ে এক সৈনিক মাগরিবের আযান দিচ্ছিল। আযানের বিস্ময়কর ও মুগ্ধকর আওয়াজে থমকে দাঁড়াল মুসাফির দল। তারা দেখতে পেল আযানের সাথে সাথে বিক্ষিপ্ত সৈন্যরা সারিবেঁধে পাশা পাশি দাঁড়াচ্ছে পার্শ্ববর্তী খোলা জায়গায়। মুসাফির দল মোহনীয় আযানের ধ্বনি শেষে অবাক বিস্ময়ে একটু দূরে সরে গিয়ে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল সৈন্যরা কি করে? তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করল, এতো সৈন্যদের উপস্থিতিতেও আযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। কোথাও কারো মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় নি। আযানের পরপরই দেখা গেল, সবাই সারিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং একজন লোক সামনে দাঁড়িয়ে গেছে আর বাকীরাও তার মতোই একই দিকে মুখ করে তার অনুসরণ করে উঠবস করছে।

তৎকালীন সময়ের রীতি অনুযায়ী নামাযে ইমামতি করলেন সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। বিন কাসিমের তেলাওয়াতের মধ্যে ছিল দারুণ আকর্ষণ। তাঁর তেলাওয়াতে পথিকেরা আরো বেশি বিমুগ্ধ হলো। ঐতিহাসিক মাসুমী লিখেছেন, সেই দিনের মাগরিবের জামাতের নামায যেসব পথিক দেখেছিল তারা এতোটাই বিমোহিত হয়েছিল যে, তারা ভুলে গিয়েছিল ভ্রমণের ক্লান্তি। অভিযাত্রীদের মধ্যে উঠের উষ্ট্রারোহী একটি পরিবারে ছিল একজন বৃদ্ধ একজন বয়স্কা মহিলা ও দু'জন তরুণী। এরা এতোটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে তারা সওয়ারী থেকে নেমে পড়েছিল। বয়স্কা মহিলা তরুণীদের উদ্দেশ্যে বিন কাসিমকে লক্ষ্য করে বলছিল, দেখো, কেমন মায়াবী চেহারা। আর দুই তরুণীর দৃষ্টি বিন কাসিমের ওপর এভাবে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তারা বিন কাসিমের অস্তিত্বে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল।

✪ ✪ ✪

নামায শেষে সৈন্যরা নিজেদের তাবুতে ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু বিন কাসিম ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন কোন সৈনিক পরম শ্রদ্ধা ভরে বিন কাসিমের

সাথে মোসাফাহা করছিল। এভাবে অনেক সৈনিক মোসাফাহা করে ফিরে গেলে এক পর্যায়ে বিন কাসিমের পাশে মাত্র কয়েকজন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী আর তাঁর একান্ত গুটি কয়েক নিরাপত্তারক্ষী তখনো রয়ে গিয়েছিল।

অতি উৎসাহী সেই পথিক পরিবার সামনে অগ্রসর হলো। অগ্রসর হয়ে তারা এক অমুসলিমের দেখা পেয়ে তার কাছ থেকে জেনে নিলো, সৈন্যরা এতোক্ষণ কি করছিল। অমুসলিম লোকটি জানালো সৈন্যরা এতোক্ষণ ইবাদত করছিল। তারা এও জেনে নিয়ে ছিল সবার সামনে দাঁড়ানো লোকটি কে? তাদের জানানো হলো, সবার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এই সৈন্য দলের প্রধান সেনাপতি। হিন্দুস্তানে সেনা প্রধানকে যেমন শাসক ও সেনাদের হর্তাকর্তা মনে করা হয়, মুসলমানদের মধ্যে সেনা প্রধান শুধু প্রশাসনিক প্রধানই থাকে না, সে প্রার্থনা ও উপাসনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করে। মুসাফির দল এক সৈনিকের কাছে জানতে চাইলো, আমরা কি তোমাদের প্রধান সেনাপতির সাথে সাক্ষাত করতে পারব? আমরা অনেক দূর থেকে তোমাদের বাহিনীর এবং তোমাদের সেনাপতির প্রশংসা শুনে এসেছি।

তাহলে সামনে এগিয়ে যাও; সামনে গেলেই তুমি জানতে পারবে তোমাদের পক্ষে তাঁর সাক্ষাত পাওয়া সম্ভব কিনা? বলল সৈনিক।

মুসাফিররা বিন কাসিমের দিকে অগ্রসর হলো। দুই পুরুষের পিছু পিছু তাদের মা ও দুই বোনও অগ্রসর হচ্ছিল। বিন কাসিম আগন্তুক দলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে নিজেই ধীরে ধীরে তাদের প্রতি অগ্রসর হলেন। অভিযাত্রী দুই পুরুষ বিন কাসিমের কাছে এসে হাটু গেড়ে এভাবে নমস্কার করল যে তাঁকে সিজদা করছে। দুই তরুণী বিন কাসিমের পাশে গিয়ে পুরুষদের মতোই হাটু গেড়ে বসে তাঁর জামা ধরে চুমু দিলো।

বিন কাসিম দুভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা কি চায় জিজ্ঞেস করো?

দুভাষী তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে সে কথাই তারা পুনর্ব্যক্ত করল, যা তারা এদিকে আসার সময় প্রহরী সৈন্যকে বলেছিল। তরুণীদ্বয় যখন তাদের নিকাব খুলে দেখালো, তখন সবাই লক্ষ্য করল দুজনই খুব সুন্দরী। উভয় তরুণী দুভাষীর দিকে হাত জোড় করে আবেদন করল, তুমি তোমার রাজাকে বলো, তাঁর প্রাসাদে আমাদেরকে সেবিকার চাকরি দিতে, আমরা তার প্রাসাদেই নিরাপদ থাকতে পারব।

যেহেতু বিন কাসিম নিজে এখানে উপস্থিত তাই তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর পক্ষ হয়ে আর কারো জবাব দেয়ার সুযোগ ছিল না। তরুণীদ্বয় কি আবেদন করছে, হুবহু দুভাষী আরবীতে বিন কাসিমের কাছে ব্যক্ত করল।

বিন কাসিম শা'বান ছাকাফীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, রাজত্ব সব দেশেই বিদ্যমান। সাধারণ মানুষ মনে করে এসব রাজা বাদশাকে আল্লাহ্ তাআলা রাজা বাদশা করেই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আমরা এসব লোককে কি করে বোঝাব সারা দুনিয়ার রাজা আল্লাহ্ তাআলাই। এরা আমাকে তাদের রাজার সাথে তুলনা করছে। রাজা ভাবছে। তিনি দুভাষীর মাধ্যমে তরুণীদের বললেন, আমাদের সমাজে কেউ রাজা বাদশা নেই। কোন প্রজাও নেই। আমরা কোন নারীকে কর্মচারী রাখি না। রণাঙ্গনেই আমাদের জীবন কেটে যায়? তোমরা তোমাদের পুরুষদের সাথে মুসাফিরখানায় চলে যাও। সেখানে তোমরা সসম্মানে থাকতে পারবে, তোমাদের ইজ্জতের ওপর কোন ধরনের আক্রমণ হবে না। তোমাদের সব প্রয়োজনই সেখানে বিনা মূল্যে পূরণ করা হবে।

আমরা আপনার কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমরা আপনার সেবাদাসী হিসাবে থাকার জন্যই এখানে এসেছি।

মুচকী হেসে বিন কাসিম বললেন, আমি তো আর তোমাদের অবতার বা রাজা নই। আমার সেবাদাসী হতে তোমাদের এতোটা আগ্রহ কেন?

আপনি আমাদের দেবতার চেয়েও বেশি। আমাদের ধর্মের লোকদের প্রতি আমাদের আস্থা নেই। আমাদের ধর্মগুরু পণ্ডিতরা দেবদূতের আসনে বসেও আমাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা আমাদের সম্ভ্রম রক্ষার তাকিদে আপনার কাছে এসেছি। আমরা জানতে পেরেছি মুসলমানদের কাছেই নারীর ইজ্জত সুরক্ষিত থাকে।

বিন কাসিম তরুণীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন কোন নারী বিশেষ করে তাদের মতো তরুণী রূপসীদের তিনি তাঁর দফতরে চাকরি দিতে পারেন না। কিন্তু উভয় তরুণী বিন কাসিমের সান্নিধ্যে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। তারা বলল, তাদের দৃষ্টিতে বিন কাসিম দেবতাতুল্য, তারা এই দেবতার পূজা করতে চায়। তরুণীদ্বয় কখনো বিন কাসিমের হাতে চুমু দিতো আবার কখনো তাঁর জামার আস্তিন চোখে লাগাতো। তাদের সাথে যে পুরুষ

ছিল, তারাও মিনতি জানাতে লাগল বিন কাসিম যেন এদের আবেদন মঞ্জুর করে তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ দেন।

✪✪✪

গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী অনতি দূরে দাঁড়িয়ে দুই তরুণী, তাদের সফর সঙ্গী বয়স্কা মহিলা এবং পুরুষদের গতিবিধি, আচার আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এক পর্যায়ে বিন কাসিম তাকে ইঙ্গিত করলে তিনি এগিয়ে এলেন। আগন্তুকদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল এলাকার কৃষকদের মতো।

গোয়েন্দা প্রধান এগিয়ে এসে দুই তরুণীর কাধে হাত রেখে বললেন, আমার সাথে এসো, আমি তোমাদের চাকরি দেবো।

তরুণীদ্বয় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে বিন কাসিমের দিকে তাকালো। বিন কাসিম মুচকি হেসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, তোমরা এই লোকের সাথে চলে যেতে পারো। সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকারে চারপাশ ছেয়ে গেল। চতুর্দিকে জ্বলে উঠল প্রদীপ। শা'বান ছাকাফী দুই তরুণী ও বৃদ্ধাসহ তাদের সঙ্গী পুরুষদের একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। গোয়েন্দা প্রধান দুই তরুণীকে তার কক্ষে নিয়ে বয়স্কা মহিলা ও পুরুষদের বাইরে বসার নির্দেশ দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি কক্ষে প্রবেশ করতেই আরো প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরটি আলোকময় করে দেয়া হলো। শা'বান ছাকাফী তার একান্ত সচিবকেও কক্ষ থেকে বের করে দিয়ে তরুণী দুজনের মাথার উড়না ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তরুণীরা তাদের রেশমী চুল উদোম করে দিলে গভীরভাবে তাদের চুলের বর্ণ ও পরিপাটি নিরীক্ষণ করে তাদের হাত নিজের হাতে নিয়ে আঙুলের গঠন ও হাতের ত্বক পরখ করলেন। অতঃপর তাদের বাজু থেকে বস্ত্র সরিয়ে তাও পরখ করলেন। পায়ের জুতো খুলে পায়ের গঠন পর্যবেক্ষণ করলেন।

তোমরা ঠিকই শুনেছ যে, মুসলমানরা নারীকে সম্মান করে, তরুণীদের উদ্দেশ্যে বললেন, গোয়েন্দা প্রধান। আমরা তোমাদের মতো তরুণীদের ইজ্জতের ওপর হাত দেই না কিন্তু হত্যা করি। অবশ্য সেই হত্যাকাণ্ডটি খুবই মর্মান্তিক হয়ে থাকে। তোমরা যদি সত্য কথা বলো, কোন বিষয় আড়াল না করো এবং চালাকী চাতুরী করে বিভ্রান্তিমূলক জবাব না দাও; তাহলে তোমাদের কোন কষ্ট দেবো না। তোমরা যে ভাবে এসেছো, ঠিক সেভাবেই সসম্মানে তোমাদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।

একথা শুনে উভয় তরুণী প্রকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমাদের কেন হত্যা করা হবে, আমরা কি অপরাধ করেছি? এরা অপরাধের কারণ জানতে শা'বান ছাকাফীর গায়ের সাথে গা মিশিয়ে দিয়ে অনুনয় বিনয় করছিল। ওদের অঙ্গভঙ্গি ছিল খুবই উন্মাদনাপূর্ণ। শা'বান ছাকাফীর মতো অভিজ্ঞ গোয়েন্দার পক্ষে বুঝতে মোটেও অসুবিধা হলো না, এদের এই কাকুতি মিনতির মধ্যে কোন ভয় শঙ্কা নেই, বরং আছে সচেতন সতর্ক লক্ষ্যভেদী আক্রমণের প্রয়াস। গোয়েন্দা প্রধান উভয় তরুণীর চুল, হাত, পায়ের গঠন দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন এরা পশ্চাদপদ কোন দলিত শ্রেণির হিন্দু পরিবারের মেয়ে নয়। এরা সেনা প্রধানের সাথে যেভাবে কথা বলছিল তাতেও প্রমাণ হয় এরা কোন আনাড়ী অশিক্ষিতা অবলা মেয়ে নয়, বরং খুব পটু ও প্রশিক্ষিত। কোন পশ্চাদপদ দলিত শ্রেণির কৃষাণ কন্যার পক্ষে এভাবে সেনা প্রধানের সাথে জড়তাহীন কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া এদের হাত পা চেহারা শরীরে বিন্দুমাত্র অভাব দারিদ্র্য দুঃখ যন্ত্রণার ছাপ নেই।

ওরা আসলে খুব নির্বোধ, যারা তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, বক্র হাসি দিয়ে বললেন গোয়েন্দা প্রধান। ওরা তোমাদেরকে গরীব কৃষাণ কন্যার বেশে পাঠালেও ভেবে দেখেনি, আসলে তোমাদেরকে কৃষাণ কন্যাদের মতো দেখায় কি না। তোমরাই বলো, কি উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে এসেছ? আমাদের সেনাপতিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে এসেছিলে, না গোয়েন্দাগিরি করে আমাদের ভিতরকার অবস্থা জেনে তথ্য পাচার করার জন্যে এসেছো?

তরুণীদ্বয় একথার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগেই শা'বান ছাকাফী এক তরুণীকে কাছে টেনে এক হাতে তাকে নিজের পাজরের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। ভাবটা এমন যেন তিনি তরুণীর প্রতি অতিশয় আগ্রহের আতিশয্যে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছেন। তিনি ডান হাতে তরুণীর গালে আলতু করে টোকা দিয়ে গভীরভাবে তাকে নিজের সাথে মিশিয়ে ফেললেন।

পরম সোহাগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, বলো, আমি ইচ্ছা করলে উভয়কে শাহজাদী বানিয়ে রাখতে পারি। আর আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের হাত পা বেঁধে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে ঘোড়া দৌড়িয়ে তোমাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি।

আপনি কে? তরুণী তার শরীরের সাথে আরো লেপ্টে গিয়ে পরম মাদকতা মেশানো কণ্ঠে বলল, আপনিও কি সেনাপতি?

শুধু সেনাপতি নই, এখানকার সব কিছুই আমি। আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, সেটির জবাব দাও?

তরুণী গোয়েন্দা প্রধানের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাতো দূরে থাক, বরং নিজেকে সে আরো মেলে দিলো, আরো গভীরভাবে তার তুলতুলে শরীরটা গোয়েন্দা প্রধানের শরীরের সাথে মিশিয়ে দিয়ে একহাতে শা'বান ছাকাফীর কোমর পেচিয়ে ধরল।

গোয়েন্দা প্রধানের এই কাণ্ড দেখে অপর তরুণীর ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভা ফুটে উঠল যা শা'বান ছাকাফীর দৃষ্টিকে আড়াল করতে পারল না। তাতে শা'বান ছাকাফী চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন। এক ঝটকায় তরুণীকে সরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে অপর কক্ষে বসা দু'পুরুষ সাথীকে ডেকে ভিতরের কক্ষে নিয়ে এলেন। শা'বান ছাকাফীর বুঝতে বাকী রইলো না এরা গোয়েন্দা।

তিনি পুরুষ সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এতোটা নির্বোধ হলে কি তোমরা কাজ করতে পারবে? না তোমরা আরবদের বোকা মনে করো? না তোমরা মনে করো যে, আমরা তোমাদের চালচলন, রীতিনীতি, চক্রান্ত ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানিনা। জানো, আমি যে কোন মানুষের হাত পা দেখে ওর পূর্ব পুরুষের পেশাও বলে দিতে পারি।

একথা বলে তিনি যুবক লোকটির দু'হাত টেনে নিয়ে ওলট পালট করে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সেনাবাহিনীতে তুমি কোন পদমর্যাদার অফিসার? তুমি কৃষকের পোষাক গায়ে জড়িয়ে এসেছ কিন্তু তোমার তিন পুরুষের মধ্যে কেউ কি কখনো কৃষি কাজ করেছে?

আপনি আমাদের ভিতর তলব না করলেও আমরা নিজে থেকেই ভিতরে আসার চিন্তা করছিলাম হুজুর! বলল বয়স্ক লোকটি।

আমরা কিছু বললে হয়তো আপনি মনে করবেন, শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলছি। আমরা দু'জন বাইরে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, ভিতরে এসে আপনাকে বলে দেবো, আমরা রাজা কাকার পাঠানো গোয়েন্দা।

এই দুর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া বিজয়রায় আমাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। বলল অপর লোকটি। এই দুই তরুণী বিজয় রায়ের নিজ খান্দানের মেয়ে।

"বিজয় রায় কি এখান থেকে পালিয়ে সিসিমপুরে চলে গেছে।" জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা প্রধান।

জী হ্যাঁ। জবাব দিলো লোকটি। তিনি রাজা কাকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তারা উভয়ে মিলে এখন আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিন কাসিমের সৈন্যরা যখন আংটা দিয়ে সিস্তানের দুর্গে প্রবেশ করছিল তখন দুর্গপতি রাজা দাহিরের ভাতিজা বিজয় রায় তার পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিন কাসিম বিজয় রায়ের পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু তাঁর গোয়েন্দারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছিল না বিজয় রায় ঠিক কোন দিকে পালিয়েছে। বিন কাসিম রাজা দাহিরের রাজ্য ও তার প্রশাসন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে এ বিষয়টি জানতে সক্ষম হয়েছিলেন, রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ তার ভাতিজা বিজয় রায় ও ছেলে জয়সেনার কমান্ডে তুর্কমান ও সিস্তানে নিয়োজিত রয়েছে। তাই বিন কাসিম চেষ্টা করছিলেন উভয়কেই পাকড়াও করতে নয়তো নিঃশেষ করে দিতে। কারণ তাতে রাজা দাহিরের সিংহ ভাগ সমরশক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত।

সিস্তানের পর বিন কাসিমের প্রধান লক্ষ্য ছিল সিসিমপুর দুর্গ। সিসিমপুর ছিল বৌদ্ধ রাজ্যের রাজধানী। ওখানকার রাজা কাকা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এই রাজ্য দৃশ্যত স্বাধীন হলেও মূলত রাজা দাহিরের করতলগত ছিল। রাজা দাহির রাজা কাকাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিল, তোমার রাজ্য যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে আমি সৈন্যদল নিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করব।

বিন কাসিম ও গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর জন্য এই তথ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গভীর অনুসন্ধান করে বিন কাসিমের অভিজ্ঞ গোয়েন্দারা এই তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিন কাসিম জানতে পেরেছিলেন সিসিমপুর তেমন কোন শক্তিশালী দুর্গ নয়। এছাড়া সিসিমপুরের রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তিনি ধারণা করেছিলেন বৌদ্ধরা যেহেতু অহিংসবাদী ও রক্তপাত বিরোধী তাই নিরূনের বৌদ্ধ শাসকের মতো রাজা কাকাও তাঁর প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে মুসলিম সৈন্যদের স্বাগত জানাবে। কিন্তু ধৃত গোয়েন্দারা তাকে ভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করল। অবশ্য এদের পরিবেশিত সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে সংশয় ছিল এরা সঠিক সংবাদ দিচ্ছে কি-না। তা ছাড়া এদের কথাবার্তা এমনও হতে পারে যে, তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে তোমরা সিস্তান গিয়ে এমন আচরণ করবে যাতে তোমাদেরকে তারা শত্রু গোয়েন্দা মনে করে পাকড়াও করলে তোমরা জীবন বাঁচানোর জন্য

গোপন সংবাদ বলে দেয়ার ভান করে বলবে যে, বিজয় রায় আর রাজা কাকা মিলিত হয়ে বিন কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

✪ ✪ ✪

আমরা জানি, আপনি আমাদের কখনো ছেড়ে দেবেন না। বলল পুরুষ দু'জনের একজন। কারণ আমরা যে অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়েছি, তাতে আমাদের গর্দান আমরাই আপনার তরবারীর নীচে নিক্ষেপ করেছি। আমরা হয়তো আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব না, আমরা যা বলেছি তা কতটুকু সত্য ও বাস্তব।

কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমরা উভয়েই যথেষ্ট জ্ঞানী। বললেন শা'বান ছাকাফী। আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই, আমি তাদেরই একজন যারা তোমাদের মতো লোকদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে। তোমরা যদি ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলো, তাহলে আমি দিব্যি তা বলে দিতে পারব তোমরা কোন্ কথাটি মিথ্যা বলেছ। আচ্ছা! তোমরা কি আমাকে বলবে, নিজেদের জীবন বাচানো ছাড়া আর কি কারণ ঘটেছে যে, আমার কাছে তোমরা নিজেদের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিচ্ছ? "আমরা এই প্রথম মুসলমানদের ইবাদত করতে দেখেছি" বললো দু'জনের একজন পুরুষ। আপনাদের আযানের ধ্বনিও আমরা এই প্রথম শুনেছি। আপনাদের নামায পড়াও প্রথম দেখলাম। আমরা হিন্দু। হিন্দুরা নানা জাতি ও বর্ণে গোত্রে বিভক্ত। আমাদের ধর্মকর্মে আপনাদের নামাযের মতো এমন কোন জিনিস নেই। আপনাদের নামায, আযান আমাদের মধ্যে এমন অদৃশ্য প্রভাব সৃষ্টি করেছে যা আমরা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমি তোমাদের এতো দীর্ঘ দাস্তান শুনতে পারব না। তোমরা সংক্ষেপে আমাকে একথা বলো, এখানে তোমাদের আসার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? আমার প্রশংসা ও আমাদের ধর্মের প্রশংসা করে তোমরা আমার অন্তর গলাতে পারবে না। বললেন শা'বান ছাকাফী।

আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এরপর আপনারা কোন দিকে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তা জানা। তাছাড়া আমাদেরকে একথাও বলে দেয়া হয়েছিল, আপনাদের সৈন্য সংখ্যা কত এবং তাদের অবস্থা কি তাও জানা। সেই সাথে আপনাদের রসদপত্র কোন পথে কিভাবে আসে সে বিষয়টিও আমাদের জানতে বলা হয়েছিল। বলল বয়স্ক লোকটি।

এ বিষয় জানার জন্য এই তরুণীদের সাথে আনার কি প্রয়োজন ছিল? জানতে চাইলেন গোয়েন্দা প্রধান। তোমরা দু'জন কি এ কাজ করতে পারতে না?

এসব তথ্য জানার জন্য উর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিদের সংশ্রবে যাওয়ার প্রয়োজন হতো। বলল ধৃত এক গোয়েন্দা। আমাদের একথাও বলা হয়েছিল, মুসলিম সেনাপতি একজন নওজোয়ান লোক। সে সহজেই নারীর ফাঁদে পা দিতে পারে। নারীর ফাঁদে পা দেয়ার মতো লোকেরা ফেঁসে যেতে বেশি দেরী করে না। কিন্তু আমরা শুরুতেই বুঝতে পেরেছি, আপনাদের সেনাপতির মধ্যে নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

নারীর প্রতি তাঁর আসক্তি কি করে হবে বলো? বললেন শা'বান ছাকাফী। তোমরা কি দেখোনি, তিনি শুধু আমাদের সেনাপতিই নন, আমাদের ইমামও তিনি। সেনাপতি পাপীষ্ঠ হলেও সৈন্যদের মধ্যে এর তেমন প্রভাব পড়ে না, কিন্তু ইমাম বদকার হলে তার প্রভাব মুসল্লীদের মধ্যেও পড়ে...। ওহ্! আমি কি বলছি, তা তোমাদের পক্ষে হয়তো বোঝা মুশকিল। যাক তোমরা তোমাদের কথাই বলো। এর আগেও আমরা তোমাদের রাজা দাহিরের কাছে এদের মতোই তরুণীদেরকে এই পয়গাম দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি যে, এসব দুশ্চরিত্রা মেয়েদের দিয়ে সে আমাদের আক্রমণ থেকে তার রাজত্ব ও রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না। আর এখন তার ভাতিজা নিজ খান্দানের মেয়েদেরকেই এ কাজে পাঠাল।

✪ ✪ ✪

'আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব না' বলল এক গোয়েন্দা। কিন্তু আমরা চাই রাজা কাকা ও বিজয় রায়ের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে একটা পয়গাম দিতে। আমরা তাদের জানাতে চাই, তোমরা এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কখনো সফল হবে না। যাদের ইবাদত ঐক্য ও মমতার শিক্ষা দেয়, যারা এক ইমামের পিছনে পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আবার সোজা হয় আবার মাথা অবনত করে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হিন্দুদের এই গোয়েন্দারা বিন কাসিমের নামায, ইমামতি ও আযান শুনে ও প্রত্যক্ষ করে এতোটাই প্রভাবিত হয়ে ছিল যে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ফিরে গিয়ে রাজা কাকা ও বিজয় রায়কে বলবে, তারা মুসলমানদের সাফল্য ও বিজয়ের রহস্য জেনে এসেছে। আর এই রহস্য হলো, তাদের এক ইমামের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইবাদত করা এক ইমামের

পিছনে ভেদাভেদহীনভাবে একই সারিতে দাঁড়িয়ে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নামায পড়া। তারা মুসলমানদের বিজয়ের দ্বিতীয় যে কারণটি অনুধাবন করেছিল, তা হলো, মুসলিম সেনাপতি একজন তরুণ হওয়ার পরও সুন্দরী তরুণীদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম ছিল, বিন্দুমাত্র তাঁর মধ্যে নারীর প্রতি আসক্তি ছিল না।

গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী ধৃত শত্রু গোয়েন্দাদেরকে সৈন্যদের প্রহরায় রেখে বিন কাসিমের শরনাপন্ন হয়ে বললেন, আপনার কাছে চাকরি ও আশ্রয় প্রার্থী দলটি শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা দল। ধৃত গোয়েন্দা দলের কাছ থেকে তিনি যে তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, এ সম্পর্কেও বিন কাসিমকে তিনি অবহিত করলেন। দুর্গের দ্বার রক্ষীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা নিশ্চিত হলেন, সে দিন সন্ধ্যায়ই এই লোকগুলো দুর্গে প্রবেশ করে, এরা এই দুর্গের বাসিন্দা নয়। এদেরকে এখানে আর দেখা যায়নি।

বিন কাসিম কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওদেরকে দুর্গ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সম্ভবত বিন কাসিমের জীবনে এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমি ঘটনা। চিহ্নিত শত্রুদের তিনি কখনো ক্ষমা করতেন না। শত্রুদের জন্য তিনি ছিলেন সাক্ষাত যমদূত।

'আমাদের সিপাহসালার তোমাদেরকে বিনা বিচারে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন' বিন কাসিমের কাছ থেকে তার দফতরে ফিরে এসে ধৃত গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্যে বললেন শা'বান ছাকাফী। ফিরে গিয়ে বিজয় রায় ও রাজা কাকাকে বলবে, খুব শিগগিরই তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। তীরন্দাজদের বিষাক্ত তীর আর মিনজানিকের পাথর দিয়ে আমরা তাদের শুভেচ্ছা জানাবো। সেই রাতেই ধৃত শত্রু গোয়েন্দা দলটিকে বিনা বিচারে দুর্গ থেকে বের করে দেয়া হলো।

✪ ✪ ✪

বিজয় রায় সিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়ে সিসিমে রাজা কাকার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে রাজা কাকাকে বলে, প্লাবনের মতো মুসলিম সৈন্যরা অগ্রসর হচ্ছে। আপনি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করুন।

'তোমরা তো জানো, আমরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, আমরা স্নেহ-মমতার পূজারী, কারো রক্ত ঝরানো আমাদের ধর্মের চেতনা বিরোধী।'

'মুসলমানরা স্বধর্মের লোক ছাড়া সব মানুষের প্রতিই সহিংস।' বলল বিজয় রায়। যে কোন মানুষের রক্ত ঝরাতে এরা দ্বিধা করে না। তুমি এরপর

কি বলবে তা আমি জানি রাজা কাকাকে বলল বিজয় রায়। তোমার আর কোন কথা শুনতে চাই না। বৌদ্ধ কাপুরুষদের জন্য আজ গোটা হিন্দুস্তান বেদখল হতে চলছে। নিরূনের মতো মজবুত দুর্গও সুন্দরশ্রী বিনা বাধায় মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে। মৌজ অঞ্চলের বৌদ্ধরা আমাদের সাথে বেঈমানী করার কারণে মুসলমানরা সিস্তান কব্জা করতে সক্ষম হয়েছে। এখন তুমিও ধর্মের বাহানা দিয়ে ওদের পথই অনুসরণ করছ।

কোন ধরনের প্রতিরোধ না করে স্বেচ্ছায় অস্ত্র সমর্পণ করেছ সেসব মুসলমানরা তোমাদের কন্যা জায়াদের নিয়ে আমোদ স্ফূর্তি করছে।

নানা, ওরা এমন করে না বিজয় রায়। বলল রাজা কাকা। আমি খোঁজ নিয়েছি। ওদের ব্যাপারে তোমাদের এই অভিযোগ ঠিক নয়।

মুসলমানরা যদি নাও করে, তবে আমরাই তোমাদের কন্যা জায়াদের নিয়ে স্ফূর্তি করব। হুমকির সুরে বলল বিজয় রায়। তোমরা কি ভুলে গেছ, রাজা দাহিরের অনুগ্রহে রাজত্ব করছ তোমরা। তুমিও যদি আমাদের সাথে বেঈমানী করো, তাহলে তোমার খান্দানের কোন একটা শিশুকেও জ্যান্ত রাখা হবে না। তোমরা আমার সহযোগিতা করো, আমাকে সিস্তানের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দাও। তুমি কি জানো না, রাজা দাহির আমার ওপর কতটা নির্ভর করে।

সে কথা তো জানি, কিন্তু বলো, এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল রাজা কাকা। তোমার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে হবে। বলল বিজয় রায়। চুন্না বংশের লোকেরা তোমার প্রজা। এরা খুবই দুর্ধর্ষ ও লড়াকু। ওই বংশের যুবকদের দিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে আমার সাহায্যের জন্যে বলো।

বদলে গেল রাজা কাকা। সে বিজয় রায়ের কথায় প্রভাবিত হয়ে গেল। সে বিজয় রায়ের সাথে বিন কাসিমের অগ্রাভিযান ও সামরিক চাল সম্পর্কে আলাপ চারিতায় মগ্ন হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তারা বিন কাসিমকে পরাজিত করার পরিকল্পনা করতে শুরু করল।

মুহাম্মদ কাসিম এদিকে অগ্রসর হবে এটা কিভাবে জানা যাবে? জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলল বিজয় রায়। মুসলিম বাহিনী এদিকেই আসবে এমনটি মনে করে আমি দুর্গবন্দি হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। আমি ময়দানে ওদের মোকাবেলা করবো, উন্মুক্ত ময়দানেই সিস্তানে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাই। রাজা দাহির অবশ্য নির্দেশ দিয়েছেন দুর্গবন্দি হয়ে লড়াই করতে। এর ফলে আমরা একটির পর একটি দুর্গ মুসলমানদের দখলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। সিস্তানের

পরাজয় আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমি বুঝতে পারছি না সিস্তান থেকে কিভাবে মুসলমানদের বিতাড়িত করব। আমরা খবর নেয়ার জন্যে গোয়েন্দা পাঠাব, প্রস্তাবের সুরে বলল রাজা কাকা। আমার কাছে এমন কোন মেয়ে নেই, যাকে গোয়েন্দা কাজে পাঠানো যায়। এ কাজের জন্য দুইজন সুন্দরী তরুণী দরকার।

সুন্দরী তরুণীর প্রয়োজন হলে আমার কাছে বলো। আমার নিজের খান্দানের মধ্যে সুন্দর সুন্দর শিক্ষিত চতুর তরুণী আছে।

রাজা কাকার সাথে পরিকল্পনার পর বিজয় রায় তার নিজ খান্দানের মহিলা ও তরুণীদের ডেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলে দুই সুন্দরী তরুণী স্বেচ্ছায় গোয়েন্দা অভিযানে বের হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। কাকা এই তরুণীদেরকে তাদের কর্ম পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল। কাকা বুঝতে পারেনি সে যে কাজের জন্য এই তরুণীদের পাঠাচ্ছে বাস্তবে এ কাজটি তার ধারণা মতো অতোটা সহজ সাধ্য নয়। কাকা মনে করেছিল হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা যেমন সুন্দরী তরুণী দেখলেই তাকে রাজমহলের অলংকারে পরিণত করে মুসলিম সেনাপতিরাও এমন সুন্দরী রূপসীদের দেখে নিজেদের দীনধর্ম কর্তব্য ভুলে যাবে। তরুণীরা তাদের ভিতর থেকে সকল গোপন রহস্য উদঘাটন করে সাবাড় করে দেবে। রাজা কাকা তার দেখা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিন কাসিম সম্পর্কে চিন্তা করেছিল। সে জানতো মহা ভারতের মন্দিরগুলোতে পুরোহিত মণি ঋষিরা পর্যন্ত যৌন লিপ্সা চরিতার্থ করতে নারী পুরুষকে একই সাথে রাখে। এবং তাদের ব্যভিচার কর্মকে ধর্মের আচরণে ঢেকে রাখে। কাকা আরো ভেবেছিল দূর দেশে দীর্ঘ দিন নারী সম্ভোগ থেকে দূরে থাকা মুসলিম সেনাপতিরা সুন্দরী ললনাদের কাছে পেয়ে নিজেদের ক্ষুধা দমিয়ে রাখতে পারবে না। অবশ্য মানবিক চাহিদাও এটাই প্রত্যাশা করে। মহা ভারতের ইতিহাসও তাই বলে যে, বিজয়ী রাজা মহারাজারা বিজিত রাজ্য দখল করে সেখানকার প্রজাদের কাছে প্রথম যে উপঢৌকন প্রত্যাশা করে তা হলো সেখানকার সুন্দরী ললনা। হিন্দু রাজা মহারাজারা বিজিত রাজ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই সেখানকার নারীদের ওপর আগ্রাসন চালাত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে সময়ের পারিপার্শিকতায় রাজা কাকা যা ভেবেছিল তা যথার্থই ছিল কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে, বিন কাসিম পার্থিব স্বার্থের মোহে ভারত অভিযানে বের হননি, তিনি এ উদ্দেশেও যুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি, জয়ী হলে লোকে তাকে বিজয়ী বীর বলবে এবং বিজিত রাজ্যের সাধারণ লোকজন তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে।

গোয়েন্দা কাজে যে বয়স্কা মহিলাকে কাকা পাঠিয়েছিল, সে ছিল বিজয় রায়ের খান্দানের একজন পুরনো ভৃত্য। এই মহিলা ছিল চালাক ও ধূর্ত। সে বিজয় রায়ের খান্দানের লোকজনকেও চাতুরীপনার আঙুলের ইরাশায় নাচাতো। যে দু'জন পুরুষকে তাদের সাথে পাঠানো হয়েছিল এরা ছিল বিজয় রায়ের সৈন্যদলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এরা অসি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ ও অশ্বারোহনে খুব পারদর্শী ছিল। এরা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ছিল কিন্তু গোয়েন্দাদের মধ্যে যে দূরদর্শিতা থাকে তা ওদের মধ্যে ছিল না। কারণ গোয়েন্দাদের মধ্যে কোন রাগ অনুরাগের বশবর্তী হওয়ার সুযোগ নেই। আবেগকে গোয়েন্দা কর্মে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এরা মুসলমানদের সারিবেধে নামায পড়তে দেখেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে বিনা জিজ্ঞাসাবাদেই নিজেদের পরিচয় ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেয়।

✪ ✪ ✪

হঠাৎ একদিন রাজা কাকা ও বিজয় রায়ের পাঠানো গোয়েন্দা দল ফিরে এলো। বিজয় রায় ও কাকা সহাস্যে তাদের ফিরে আসায় স্বাগত জানালো। তারা উভয়েই কিছুটা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, মেয়েদের তোমরা ফিরিয়ে এনেছ কেন? অতঃপর গোয়েন্দা দল তাদের পুরো কাহিনী রাজা কাকা ও বিজয় রায়কে শোনালে তাদের চোখ কপালে উঠল। উভয়েই গোয়েন্দা দলের দুই সেনা কর্মকর্তাকে গালমন্দ করতে শুরু করল।

ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে বিজয় রায় বলল, তোমাদের এই ব্যর্থতার জন্য উভয়কে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়াই হবে উচিত বিচার।

'ওদেরকে হাত পা বেধে দুর্গম মরুভূমিতে ফেলে আসা উচিত' বলল রাজা কাকা। মরুভূমিতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যু বরণ করলেও ওদের যথার্থ বিচার হবে না। আমরা ওদের কিসের জন্য পাঠালাম আর ওরা করে এলো কি?

'আমরা আপনাদের জন্য বহুত দামী সংবাদ এনেছি মহারাজ' বলল দু'জনের একজন। সবচেয়ে দামী রহস্যজনক সংবাদ হলো আপনাদের পক্ষে কোনভাবেই ওদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। আমরা তাদেরকে যেভাবে ইবাদত করতে দেখেছি তাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, ওদের ঐক্য ও আনুগত্যে কখনো বিচ্যুতি ঘটবে না, তারা এক কমান্ডে জীবন দিতেও প্রস্তুত। আমরা দেখে এসেছি, ওখানকার অমুসলিম অধিবাসীরা খুবই শান্তিতে বসবাস করছে।

এরা মুসলমানদের নামায দেখে যেভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা ব্যক্ত করল উভয় তরুণীর মধ্যে তখন বিরাজ করছে আতঙ্ক। তারা নীরবে নতশিরে দণ্ডায়মান। তাদের ওপর শাসকদের কোন শাস্তি নেমে আসতে পারে এ নিয়ে তাদের কোন উদ্বেগ ছিল না। তারা হতাশ ও আফসোস করছিল, ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে কাল বিলম্ব না করে তাদেরকে মুসলমানরা সিস্তান থেকে বের করে দিয়েছিল বলে। তারাও মুসলমানদের প্রতি এতোটাই প্রভাবিত ও মুগ্ধ হয়েছিল যতোটা প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছিল তাদের সহযাত্রী দুই পুরুষ কর্মকর্তা।

আপনারা যদি তাদেরকে পরাজিত করতে চান, তাহলে আপনাদেরকেও সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের মতো আনুগত্য, সৎ চরিত্র এবং ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে। বলল অপর কর্মকর্তা। অথবা এমনই কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দু'জনকে এমন কোন কঠিন দায়িত্ব দিন যা আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমরা জীবন দিয়ে সেই কাজ করে দেখাবো।

সেই দু'সেনা কর্মকর্তাকে পুনরায় কোন ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে ইতিহাস নীরব কিন্তু একথা ঠিক তাদের বলার পর বিজয় রায় ও রাজা কাকা বিন কাসিমকে পরাজিত করার জন্য নতুন এক কৌশলের চিন্তা করল।

এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিস্তান থেকে রওয়ানা হলেন। সিসিমের দিকেই ছিল তাঁর অগ্রাভিযান। তিনি সৈন্যদেরকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর গোয়েন্দারা খবর দিলো, পথিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট দুর্গ রয়েছে এগুলো দখলে নিতে হবে। গাইড তাদের সাথে থেকে পথ নির্দেশনা দিচ্ছিল।

সিস্তান আর সিসিমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল সিন্ধু নদী। বিন কাসিম আগেই নদী পার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নৌকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। গোটা বাহিনীকে অল্প সময়ের মধ্যে নদী পার করা সম্ভব ছিল কিন্তু সামরিক সাজ সরঞ্জাম ও রসদপত্র পার করাটা ছিল সময় সাপেক্ষ। কিন্তু বিশাল সামরিকবহর ও বিরাট বিরাট মিনজানিক ও উট ঘোড়ার বিপুল সমাহার পার করাটা সহজ সাধ্য ছিল না। তবুও বিন কাসিম নির্দেশ দেন যতো কম সময়ে সম্ভব সব কিছু নিয়ে নদী পেরিয়ে যেতে হবে।

বিশাল সৈন্যবহর সাজ সরঞ্জাম নিয়ে নদী পাড়ি দেয়াটা ছিল সে সময়কার একটি মহাকর্মযজ্ঞ। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাজা দাহির সিন্ধু নদীর একটি জায়গায় নৌকা দিয়ে পুল বানিয়েছিল কিন্তু বিন কাসিমের

অগ্রাভিযান দেখে সে পুল রাজা দাহির ভেঙে ফেলে। এ পুল তৈরির ব্যাপারটি কতটুকু বাস্তব সে সম্পর্কে বিশদ জানা যায়নি। রাজা কাকা ও বিজয় রায় ভেবেছিল মুহাম্মদ বিন কাসিম যদি সিস্তান থেকে সিসিমের দিকে অগ্রসর হন, তাহলে রাস্তার মধ্যে তারা যখন যাত্রা বিরতি করবে তখন তারা রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা চালাবে। কাকা ধর্মীয় দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও জাতিগতভাবে ছিল চেন্নাই বংশোদ্ভূত। তিনি সে দিনই নির্দেশ দিলেন, চিন্নাই জনগোষ্ঠী থেকে বাছাই করে এক হাজার সাহসী অশ্বারোহী ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী যুবককে আমার সামনে তিন দিনের মধ্যে হাজির করো। ঠিক তিন দিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর লোকেরা বাছাইকৃত এক হাজার যুবককে এনে রাজা কাকার সামনে উপস্থিত করলো। তাদের সবাইকে সিসিম দুর্গে এনে সারিবদ্ধ করা হলো। রাজা কাকা জড়ো করা যুবকদেরকে বিজয় রায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হামলার জন্য তৈরি করে নাও। তুমি ওদের যতো তাড়াতাড়ি পারো ট্রেনিং দিয়ে তোমার মতো করে প্রস্তুত করো।

সে দিন থেকেই এক হাজার চেন্নাই যুবককে ট্রেনিং দেয়া শুরু হলো। বিজয় রায় নিজে যুবকদের দুর্গের বাইরে নিয়ে কল্পিত মুসলিম শিবির তৈরি করে কিভাবে হামলা করতে হবে সে নির্দেশনা দিতো। বিন কাসিম নদী পার হওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ রশি তৈরি করিয়েছিলেন। রশির একমাথা এপাড়ের তীরবর্তী বৃক্ষরাজির সাথে বেধে দিয়ে নৌকা করে অপর মাথা ও পাড়ে নিয়ে গাছের সাথে বেধে দেয়া হলো। সাধারণ সৈনিকরা সেই রশি বেয়ে দ্রুত নদী পার হয়ে যাচ্ছিল। আর ভারী রশদপত্র নৌকায় বোঝাই করে অপর পাড়ে উঠানো হচ্ছিল।

বিন কাসিম অশ্বারোহন করে গোটা এলাকা জুড়ে প্রদক্ষিণ করছিলেন আর সৈন্যদের দ্রুত কাজ করার জন্য বলছিলেন, 'ভাইয়েরা! তাড়াতাড়ি করো সময় বয়ে যাচ্ছে।'

বিন কাসিম সৈন্যদের বললেন, বন্ধুরা একটু ওপর দিকে তাকিয়ে দেখো, সূর্য হেলে পড়ছে, সময় দ্রুত তোমাদের আগে চলে যাচ্ছে, সময়কে তোমাদের পিছনে ফেলতে হবে।

তরুণ সেনাপতির উদ্বিগ্ন তাড়া আর তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাস দেখে অশ্বারোহী ইউনিট তাদের ঘোড়া গুলোকে নৌকা দিয়ে পার করার অপেক্ষা না করে সবাই নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দিল। এভাবে অতি অল্প

সময়ের মধ্যে গোটা বাহিনী সব কিছু নিয়ে সিন্ধু নদী পেরিয়ে নদীর ওপারে চলে গেল।

✪ ✪ ✪

সিস্তান থেকে সিসিম যাওয়ার পথে বিন কাসিম কয়টি জায়গায় এবং কোন কোন জায়গায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন ইতিহাস তা উল্লেখ করেনি। শুধু এতটুকু জানা যায়, পথিমধ্যে তিনটি শত্রু দুর্গ ছিল সেগুলো তিনি অবরোধ করে দখলে নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি দুর্গ দখল করতে আট দিন সময় লেগেছিল। এভাবে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সিস্তান থেকে সিসিম পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁর তিন মাস লেগে গিয়েছিল।

অবশেষে এক দিন বিন কাসিমের সেনাবাহিনী সিসিম থেকে অনতি দূরে বন্ধা নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেটিই ছিল সিসিমের আগে শেষ যাত্রা বিরতি। অন্যান্য যাত্রাবিরতির চেয়ে এখানে কিছুদিন বেশি থাকার সিদ্ধান্ত নেন বিন কাসিম। কারণ দীর্ঘ পথ এক নাগাড়ে অতিক্রম করা এবং পথিমধ্যে কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সিসিম অবরোধ করার আগে সেনাবাহিনীর কিছুটা বিশ্রাম ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

এদিকে সিসিম দুর্গে অবস্থানকারী বিজয় রায় ও রাজা কাকার কাছে বিদ্যুৎগতিতে খবর পৌঁছে গেল যে, বন্ধা নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী এসে গেছে এবং সেখানে তাঁবু গেড়েছে।

এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে বিজয় রায় চেন্নাই জনগোষ্ঠীর সেই এক হাজার যুবককে ডেকে পাঠালো। তাদের একত্রিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করতে শুরু করল। বিজয় রায় চেন্নাই যুবকদের বলল, মুসলমানরা হিংস্র এরা দেশ দখল করে লুটপাট করে এবং যুবতী তরুণীদের ধরে নিয়ে যায় আর মানুষের ধন সম্পদ ঘর বাড়ি সব তছনছ করে দেয়। বিজয় রায় চেন্নাই যুবকদের বলল, সাধারণ মানুষ এবং দেশের নারীদের সম্ভ্রম ও ধন সম্পদ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা যদি সেই দায়িত্ব পালন না করি তাহলে সবার সাথে আমাদেরকেও মুসলিম বাহিনীর গোলামী করে অবমাননাকর জীবনের মুখোমুখি হতে হবে। বস্তুত যে কোন অমুসলিম স্বজাতির মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যে ধরনের অসত্য ও কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে বিজয় রায়ও চেন্নাই যুবকদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দেয়ার জন্য এসবের সবকিছুই প্রয়োগ করল।

এদিকে বন্ধা এলাকায় বসবাসকারী একটি অমুসলিম যাযাবর গোত্র মুসলিম সৈন্যদের আগমন দেখে তাদের ওপর রাতের অন্ধকারে গুপ্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। এদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আক্রমণের আগে রাজা কাকাকে ব্যাপারটি অবহিত ও অনুমতির জন্য সিসিম দুর্গে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালো।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, এই গোত্র ছিল জাট। জাট গোত্র ছিল হিন্দু ধর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী। এরা বিজয় রায় ও কাকার অপপ্রচারে জানতে পারে, মুসলমান সৈন্যরা অমুসলিম এলাকা দখল করে সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালায় লুটপাট করে সব কিছু তছনছ করে দেয় এবং অধিবাসীদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। এই অপপ্রচারের কারণে নিজেদের জাতিধর্ম রক্ষায় জাট সম্প্রদায় দৃঢ় শপথ নিল এবং রাতের অন্ধকারে গেরিলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজার কাছে গেল।

জাট গোত্রের প্রতিনিধিরা সিসিম দুর্গে গিয়ে রাজা কাকাকে তাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালে সব চেয়ে বেশি খুশী হলো বিজয় রায়। বিজয় রায় মন্দিরের পুরোহিতদের ডেকে তাদেরকে বলল, শত্রু আক্রমণের জন্যে কোন্ সময়টা শুভ হবে তা যেন তারা বলে দেন। সেই সাথে বিজয় রায় পণ্ডিতদের কাছে জানতে চাইলো সাফল্যের জন্য কি কোন ধরনের বলিদানের প্রয়োজন হবে কি–না তাও জানাতে। পণ্ডিতরা বিজয় রায়ের নির্দেশ পালনে মন্দিরে চলে গেল এবং আক্রমণের শুভক্ষণ বের করার জন্য তপস্যা শুরু করে দিলো।

জাট প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বিজয় রায় বলল, তোমরা যদি তাঁবুতেই মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের রাজকীয় পুরস্কারে ভূষিত করব। তোমাদের কেউ যদি মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে জীবিত পাকড়াও করে আনতে পারো, তাকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হবে, রাজ দরবারে তাকে মর্যাদার আসন দেয়া হবে এবং মুসলিম সেনাপতির মাথার ওজন সমান সোনা উপঢৌকন দেয়া হবে। এই অঞ্চলের যে কোন তরুণীকে সে পছন্দ করবে তাকেই বিয়ে দেয়া হবে। আর কেউ যদি বিন কাসিমের দ্বিখণ্ডিত মাথা আনতে পারে তাহলে তাকে মাথার দ্বিগুণ সোনা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এবং দেশের সেরা সুন্দরী নারীর সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

তোমরাই মোকাবেলা করবে না, এক হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত চেন্নাই যুবক তোমাদের সঙ্গে থাকবে, বিজয় রায়ের কথার সাথে যোগ করল রাজা কাকা। তোমরা উভয় সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে আক্রমণ করবে।

মহারাজের জয় হোক ধ্বনি তুলল এক জাট প্রতিনিধি। আমরা কোন পুরস্কারের আশায় যুদ্ধ করতে উৎসাহী হইনি। আমরা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি এ জন্য যে, মহারাজা দাহিরের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযান রুখতে পারেনি। আজ আমরা মুসলমানদের অগ্রাভিযানের ক্ষমতা নিঃশেষ করে দেবো। এরা আমাদের তরবারীর আঘাতে মরতে এসেছে। মহারাজ আমরা পুরস্কার চাই না, আমাদের কর্তব্য পালনে আপনার আশির্বাদ চাই।

পণ্ডিত মহারাজ শুভক্ষণ বলে দেবেন। যে রাতে তোমরা আক্রমণ করবে সে রাতে পণ্ডিতজী মন্দিরে ভজনা করবেন, যাতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পারো। বলল বিজয় সেনরায়।

✪ ✪ ✪

পরদিন সকালে মন্দিরের পুরোহিত এসে দু'দিন পরের রাতে আক্রমণের শুভক্ষণ বলে মত প্রকাশ করল। একথাও বলল যে, আক্রমণের সময় হবে অর্ধরাতের পর।

কোন বলিদান করতে হবে কি? জিজ্ঞেস করল বিজয় রায়।

"এক কুমারী। এক কুমারী বলিদান করতে হবে। আক্রমণে যাওয়ার আগে আক্রমণকারীদের পথে এক কুমারীর তাজা রক্ত ছিটিয়ে দিতে হবে; আর কুমারীর মাথা মানচার ঝিলে ডুবিয়ে রাখতে হবে, হামলাকারীরা আক্রমণে যাওয়ার আগে সেই ঝিল থেকে এক চুমু পানি পান করে যাবে।" বলল পণ্ডিত।

দিন শেষেই এলো শুভ রাত। রাতের আগেই আটশ জাট পুরুষ তরবারী, বর্শা, তীর, ধনুক নিয়ে সিসিম দুর্গে এসে জড়ো হলো। এদিকে চেন্নাই গোত্রের এক হাজার প্রশিক্ষিত যুবক তাদের সাথে যোগ দিলো। চেন্নাই যুবকদের সবাই ছিল অশ্বারোহী। জাটদের কেউ ছিল অশ্বারোহী আবার কেউ পদাতিক।

জাট ও চেন্নাই গোত্রের আঠারোশ যোদ্ধাকে বিজয় রায় শেষ দিক নির্দেশনা দিচ্ছিল। বিজয় রায় যোদ্ধাদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কাতে শুরু করল। এ দিকে মন্দিরের পুরোহিত এক কুমারীর মাথা একটি বড় ধরনের তশতরিতে নিয়ে আরো কয়েকজন পণ্ডিতের সমবিহারে দুর্গে আগমন করল। বলিকৃত কুমারীর প্রবাহিত রক্ত একটি পাত্রে জমা করাছিল। আর পুরোহিতরা ভজন গাইতে ছিল এবং থেমে থেমে মন্দিরের ঘণ্টা বাজাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর এক পণ্ডিত বড় ধরনের তশতরিতে বলি দেয়া কুমারীর ছিন্নমস্তক নিয়ে গুপ্ত হামলাকারীদের সমাবেশে হাজির হলো। এদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। চার পাশে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে অসংখ্য মশাল। যে পণ্ডিত কুমারীর ছিন্ন মস্তক নিয়ে এসেছিল তার দুপাশে দুজন দীর্ঘদেহী লোক মশাল উঁচিয়ে রেখেছিল, যাতে দূর থেকেও মশালের আলোয় ছিন্ন মস্তক সবাই দেখতে পারে। তার পিছনে ভজন গাইতেছিল চারজন পণ্ডিত।

বিজয় রায় তশতরি নিয়ে আসতে দেখে পণ্ডিতের দিকে এগিয়ে তার কাছ থেকে তশতরি নিজ হাতে নিয়ে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গুপ্ত হামলাকারীদের ছিন্নমস্তক দেখিয়ে বলল, এই কুমারীর ছিন্ন মস্তক ঝিলে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এই তশতরি ঝিলের পাড়ে রেখে দেয়া হবে। তোমরা সবাই এই ঝিল থেকে এক ঢোক করে পানি পান করে যাবে। এরপর তোমরা যখন মুসলিম বাহিনীকে হত্যা করে কিংবা অধিকাংশ সৈন্যকে নিঃশেষ করে দিয়ে আসবে এবং যার হাতে মুসলিম সেনাপতি বিন কাসিমের ছিন্ন মস্তক থাকবে সেটি এনে এই তশতরিতে রেখে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে...। তোমাদের মনে রাখতে হবে, তোমাদের সাফল্যের জন্য এই কুমারী নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। এই কুমারীর রক্ত তোমাদের গমন পথে ছিটিয়ে দেয়া হবে।

কুমারীর মস্তক বিচ্ছিন্নকারী পণ্ডিত এবার বিজয় রায়ের কাছ থেকে তশতরি নিয়ে দুর্গফটকের দিকে অগ্রসর হলো। তার পিছু পিছু আরো ক'জন পণ্ডিত ভজন গেয়ে গেয়ে এগুচ্ছিল। মন্দির থেকে ঘণ্টা ধ্বনি বাজছিল। দুর্গফটকের কাছেই ছিল ঝিলের অবস্থান। পণ্ডিত ঝিলের তীরে দাঁড়িয়ে কাটা মস্তকটি ঝিলের পানিতে ছুড়ে মারল। ছুড়ে মারা মাথাটি ঝিলের পানিতে আঁছড়ে পড়ার শব্দ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়ায় দুর্গের প্রধান ফটক খুলে গেল। ফটক দিয়ে বেরুতে শুরু করল শত শত অশ্বারোহী ও পদাতিক লড়াকু। অশ্বারোহী ও পদাতিক হামলাকারীরাও পায়দল ঝিলে নেমে সবাই চিল্লু দিয়ে এক ঢোক করে পানি পান করে এগিয়ে চলল। তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য বিজয় রায় ও রাজা কাকাও এসে একটি উচু স্থানে দাড়িয়ে হামলাকারীদের হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

✪✪✪

সেই যুগের মানদণ্ডে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন প্রশ্নবিদ্ধ হলেও অমুসলিমদের মোকাবেলায় সে নিজেকে মুসলিম ঐতিহ্যের ধারকবাহক মনে করত। তিনি যতবার বিন কাসিমকে পয়গাম লিখতেন, সামরিক দিক নির্দেশনার পাশা পাশি লিখতেন, সব সময় তোমাদের সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক অভিযানের গমন পথে যদি কোথাও যাত্রা বিরতি করতে হয় তাহলে রাতের বেলায় সৈন্যদের সতর্ক রাখবে, জাগ্রত থাকতে বলবে। রাতে সৈন্যদের সতর্ক ও সচেতন রাখার ভালো ব্যবস্থা হলো, সৈন্যদের মধ্যে যারা কুরআন শরীফ পড়তে পারে তারা রাতের বেলায় তেলাওয়াত করবে এবং যারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারে না, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবে। সবার উচিত বেশি বেশি নফল নামায পড়া এবং নামাযের পর আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাফল্যের জন্য দোয়া করা। সেই সাথে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেশি বেশি পাঠ করবে।

সেই রাতের সিসিম থেকে কিছুটা দূরবর্তী যাত্রা বিরতির পর তাঁবু ফেলে বিন কাসিমের সৈন্যদের অধিকাংশই তেলাওয়াত করছিল, আর যারা কুরআন শরীফ পড়তে জানত না, তাদেরকে অন্যেরা কুরআন পড়া শেখাচ্ছিল। কেউ কেউ নফল নামাযে লিপ্ত ছিল। তাবুর ফাঁকে ফাঁকে জ্বলছিল মশাল। সকাল বেলায় সৈন্যদের সিসিমের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। তারা আশা করছিল দুপুর নাগাদ তারা সিসিম দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন করতে পারবে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন রাতের বেলায় কুরআন তেলাওয়াত, শিক্ষা ও ইবাদতের পাশা পাশি তারা যেন জরুরি বিশ্রাম করে কিন্তু সে রাতে কোন সৈনিকই বিশ্রাম ও আরামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দেয়নি। সকল সৈন্যই কুরআন পাঠ ও নামাযে রাত কাটিয়েছে। সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও সৈনিকের স্ত্রী সন্তান তাদের সাথেই শিবিরে অবস্থান করছিল। তখনকার সময়ে প্রতিটি যুদ্ধেই কিছু সংখ্যক লোককে স্ত্রী সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। বিন কাসিমের সৈন্যদলেও কিছু সংখ্যক সৈন্য পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছিল। সৈন্যদের সাথে আসা মহিলারা আহত সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষা করত। সেই রাতেও রাত জেগে মহিলারা আহত সৈন্যদের দেখা শোনা করছিল।

আর এদিকে আঠারো'শ হিন্দু যোদ্ধা বিজয় রায়ের নির্দেশে রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা চালানোর জন্যে এগিয়ে আসছিল। সে দিন মুসলমানরা কোন মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মুসলিম শিবিরের পাহারাদার ও

শিবিরের বাইরে টহলদল ছাড়া আর কোন সৈনিকের যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিল না। রাতের অন্ধকারে শত্রু পক্ষের অজ্ঞাতে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে শত্রুদের পর্যুদস্ত করা ছিল মুসলমান সেনাদের ঐতিহ্য। কিন্তু আজ বিজয় রায় ও রাজা কাকার তৈরি বাহিনী মুসলমানদের ওপর ঝটিকা আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছিল। অথচ এদিকে সেইরাতে ঝটিকা আক্রমণ হতে পারে এমনটি ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবেনি মুসলিম শিবির। ফলে তারা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, অসতর্ক। মুসলিম শিবিরে নারী শিশুদের অবস্থানের কারণে হিন্দু সেনাদের রাতের আক্রমণ আরো বেশি বিপর্যয়কর হয়ে ওঠতে পারত।

পৌত্তলিক হিন্দু সৈন্যরা এক কুমারীকে বলি দিয়ে সেই কুমারীর রক্ত মাড়িয়ে অভিযানে বের হয়েছিল, তাদের সাফল্যের জন্য মন্দিরে চলছিল ভজন ও পূজা-অর্চনা । রাত ব্যাপী মন্দিরগুলোতে পুরোহিত পণ্ডিতেরা জড় মূর্তিগুলোর সামনে বসে সাফল্যের জন্য কাকুতি মিনতি করছিল।

আর এদিকে বিন কাসিমের সৈন্যরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ইবাদতে লিপ্ত ছিল। সেই রাতের ঝটিকা আক্রমণ সফল হলে বিন কাসিমের বাহিনীর অগ্রাভিযান শুধু সেখানেই রুদ্ধ হতো না, আরব সাগরের অথৈ পানিতে তাদের চিহ্নও হারিয়ে যেত।

✪ ✪ ✪

সিসিম দুর্গ থেকে এক দুপুরের পথ দূরে বিন কাসিমের বাহিনী শিবির স্থাপন করেছিল। জায়গাটি ছিল তুলনামূলকভাবে নীচু। সেই সাথে এলাকাটি ছিল অসমতল। জায়গায় জায়গায় টিলা ঝোপ ঝাড় ও গাছ গাছালীতে আকীর্ণ। একটা জায়গায় এতোটা পানি হয়েছিল যেন বিশাল একটা পুকুর। বিন কাসিম সিসিমের যাতায়াত পথ থেকে অনেকটা দূরের এই স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেন।

বিন কাসিমের অসাধারণ প্রজ্ঞার এটি একটি উদাহরণ ছিল যে, তিনি কখনো পরিচিত পথে অভিযান পরিচালনা করতেন না। সেই দিনের শিবিরটি তিনি এমন এক জায়গায় স্থাপন করেছিলেন, বিশাল আসবাবপত্র ও সাজ সরঞ্জামসহ গোটা বাহিনীকে সেই নীচু জায়গাটি আড়াল করে ফেলেছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে একথাও বলা যায় যে, রাজা কাকা ও বিজয় রায় মুসলিম বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েই ঝটিকা বাহিনীকে আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে ছিল।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিমের রাতের শিবির ছিল কুরআন তেলাওয়াতে মুখরিত। মাঝে মধ্যে আহত সৈনিকদের উহ্ আহ্ তেলাওয়াতের গুঞ্জরনে তলিয়ে যেত। যখনই কোন আহত সৈনিক যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠত সেবারত মহিলারা দৌড়ে সেই সৈনিকের কাছে ছুটে যেত।

রাত বাড়ার সাথে সাথে এমন আশঙ্কা ছিল যে রাতের তেলাওয়াতের গুঞ্জরণ ও আহত সৈন্যদের যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠার সাথে হিন্দু আগ্রাসীদের আক্রমণের আর্তনাদ মিশে একাকার হয়ে যাবে কিন্তু রাত গভীর হতে হতে এক সময় তেলাওয়াতের গুঞ্জরণ স্তিমিতি হয়ে নেমে এলো নিস্তব্ধতা। আর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে উচ্চ আওয়াজে ধ্বনিত হলো ফজরের আযান "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"। আযানের মধুর ধ্বনি ইথারে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গেল পৌত্তলিক ভারতের সিসিমের বাতাসে। ছড়িয়ে পড়ল বহু দূর পর্যন্ত।

মুসলিম শিবিরে ফজরের নামাযের জন্য সকল সৈন্যরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। গোটা শিবিরে পিনপতন নীরবতা। সেনাপতি বিন কাসিমের কুরআন তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি যেন নির্জন এই এলাকার বৃক্ষ তরুলতাকেও এক অপার্থিব মুগ্ধতার আবেশে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। এদিকে সেনাবাহিনীর ঘোড়া ও ভারবাহী উটগুলো তখন খাবারের জন্যে হ্রেষারব করছে।

সিসিমের প্রধান মন্দিরের ঘন্টা ধ্বনি তখনো অবিরাম বেজেই চলছে। ভোর হতেই বিজয় রায় ও রাজা কাকা দুর্গপ্রাচীরের ওপরে এসে দাঁড়াল। উভয়েই ঝটিকা আক্রমণকারীদের আগমন প্রত্যাশায় পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। ভোরের পূর্বাকাশ আলোকিত করে উঁকি দিলো দিবাকর। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সকালের মিষ্টি রোদ। মরুভূমির সূর্যোদয়ের দৃশ্য খুবই মনোরম হয়ে থাকে কিন্তু সে দিনের সূর্যোদয় রাজা কাকা ও বিজয় রায়ের জন্যে ছিল খুবই মলিন অসুন্দর। কারণ তারা ভোরের সূর্যালোক দেখা নয় অপেক্ষা করছিল বিজয়বার্তা নিয়ে অভিযানকারীদের ফিরে আসার দৃশ্য দেখার জন্যে।

সকালের সূর্য ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল, বাড়তে থাকল উষ্ণতা। মুগ্ধতার পরিবর্তে বিজয় রায়ের মধ্যে দেখা দিলো উদ্বেগ অস্থিরতা। অপেক্ষার পালা দীর্ঘায়িত হওয়ায় বিজয় রায়কে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে তুলল। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিজয় রায় বলল, কি ব্যাপার, ওরা কি সবাই মারা পড়ছে না কি-? এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

আমি বলতে পারি কি হয়েছে? বলল কাকা। ওরা মুসলিমদের ধ্বংস করে ওদের ধন সম্পদ কব্জা করায় ব্যস্ত হয়ে গেছে। আর তাদের নারীদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে। এসে যাবে, হয়তো আসছে।

"আচ্ছা, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়, দেখো কি করে আসে। আমার কাছে তো আলামত ভালো মনে হচ্ছে না।" বলল বিজয় রায়।

এমন সময় পূর্ব দিকে ধূলিবালির আরবণ দেখা গেল। দেখতে দেখতে ধূলিময় অন্ধকার আরো ঘনিভূত হয়ে আকাশ ঢেকে ফেলল। কিছুক্ষণ পর ধূলিস্তর ভেদ করে নজরে পড়ল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের আগমন। বিজয় রায় ও কাকা ঝটিকা বাহিনীর আগমন দেখে দুর্গপ্রাচীর থেকে দৌড়ে নীচে নেমে এলো। প্রধান ফটকেই তাদের ঘোড়া অপেক্ষমান ছিল, উভয়েই এক লাফে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ঝটিকা বাহিনীকে স্বাগত জানানোর জন্যে ঘোড়া দৌড়াল।

তারা উভয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাকিয়ে ঝটিকা বাহিনীর সামনে গিয়ে থামল। তাদের প্রত্যাশানুযায়ী সেনারা বিজয়ের কোন জয় ধ্বনী করল না। ঝটিকা বাহিনীর কমান্ডারের চেহারা ছিল হতাশায় বিমর্ষ। আমি কোন ব্যর্থতার দাস্তান শুনবো না, ক্ষোভে কম্পমান কণ্ঠে বলল বিজয় রায়।

বিজয় রায়ের গর্জনে কমান্ডার দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তাকালো। মুখ ফুটে কিছু বলল না। বিজয় রায়ের আগমনে ঝটিকা বাহিনী পদাতিক ও অশ্বারোহী সবাই থেমে গেল। বিজয় রায় ঘোড়ার বাগ ধরে এক চক্কর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে সবার চেহারা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে নিলো, তাদের মধ্যে কাউকেই আহত হওয়ার মতো কোন চিহ্ন দেখা গেল না। চার পাশে চক্কর দিয়ে বিজয় রায় ফিরে এলো কমান্ডারের সামনে। কমান্ডারের সামনে এসে তার তরবারীর হাত ধরে এক টানে তরবারী কোষমুক্ত করল। রোদের আলোতে ঝলসে উঠল তরবারী। গভীরভাবে তরবারীটা একবার দেখে নিলো বিজয় রায়।

তরবারী তো তেমনই রয়ে গেছে যেমনটি নিয়ে গিয়ে ছিলে। তরবারী কোষমুক্তই করোনি? কি হয়েছে কথা বলছ না কেন? গর্জে উঠল বিজয় রায়।

'মহারাজের জয় হোক' বিধ্বস্ত কণ্ঠে বলল কমান্ডার। আমরা মুসলিম শিবির পর্যন্ত পৌছতেই পারিনি।

কেন পৌছতে পারলে না? কোথায় গিয়ে মরে ছিলে তোমরা? না কাপুরুষের মতো ভয়ে সেখানে যেতেই সাহস পাওনি?

মহারাজ আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে যে দু'জন আমাদের সাথে পাঠিয়েছিলেন তারা আমাদেরকে মুসলিম শিবিরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে কোন কিছুই ছিল না। আমরা যখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম, মুসলিম শিবির কোথায়? তখন তারা বলল দুঃখিত, আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমরা পথ হারিয়ে অনেক দূরে এসে গেছি। এরপর ওরা আমাদেরকে নিয়ে অচেনা পথে ঘুরতে লাগল এভাবেই শেষ হয়ে গেল রাত আমরা আর মুসলিম শিবির পর্যন্ত পৌছতে পারলাম না। যখন ভোর হয়ে পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিলো, তখন আর আমাদের ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। কারণ দিনের বেলায় এতো বড় বাহিনীর মুখোমুখি হলে আমাদের অবস্থা কি হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কমান্ডারের তরবারীর বাট ছিল বিজয় রায়ের হাতে। রাগে ক্ষোভে আগ্নেয়গিরি মতো ফুসছিল সে। হঠাৎ ঝকমকে তরবারীটা প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুরালো বিজয় রায়। কমান্ডারের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে গিয়ে পড়ল, আর শরীরটা গড়িয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ল জমিন। হতভাগাটার মাথাটা ঝিলে ফেলে দাও। ওই শয়তান দু'টা কোথায় যাদেরকে পথ দেখানোর জন্য তোমাদের সাথে দিয়েছিলাম? সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল বিজয় রায়।

আঠারো শত সৈন্যের মধ্যে তন্নতন্ন করে সবাইকে যাচাই করা হলো কিন্তু গাইড দু'জনকে এদের মধ্যে পাওয়া গেল না। কিন্তু এই সময়ে এরা এখান থেকেও পালিয়ে গেলে কেউ না কেউ দেখতো। অবশেষে ঝটিকা দলের ডেপুটি কমান্ডার জানালো, আমরা ফেরার পথে আর ওদের পাইনি, ওরা আমাদের ফিরে আসার সময় সবার অগোচরে পালিয়ে গেছে।

কমান্ডারের বিচ্ছিন্ন দেহ থেকে ছিন্ন মাথা এক সিপাহী ঝিলের মধ্যে নিক্ষেপ করল। আর ঝিলের পাড়ে রাখা তশতরি খালিই পড়ে রইলো। সেটায় আর বিন কাসিমের মাথা রাখা সম্ভব হলো না।

✪ ✪ ✪

সেই দুই গাইডকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বিজয় রায় ঘোষণা করল, ওদেরকে যেখানেই পাবে ওদের মাথা কেটে ঝিলে ফেলে দেবে আর ওদের দেহ পোড়ানোর বদলে জঙ্গলে ফেলে রাখবে।

আসলে ওদের দু'জনের দেখা পাওয়ার সম্ভব ছিল না। তারা তখন সিসিম দুর্গের পরিবর্তে মুসলিম শিবিরে গিয়ে হাজির হয়েছে। তারা বিজয় রায়ের ক্ষোভের মুখে পড়ার পরিবর্তে মুসলিম শিবিরে পরম যত্নে আরাম করছিল।

এরা দু'জন ছিল সেই দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তা যাদেরকে দু'জন তরুণী ও একজন বয়স্কা মহিলা সঙ্গে করে বিন কাসিমের সিস্তান দুর্গে পাঠিয়েছিল বিজয় রায় ও কাকা গোয়েন্দা কাজের জন্য। তারা আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে দুর্গে প্রবেশ করেছিল বটে কিন্তু গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী তাদের পাকড়াও করে তাদের দূরভিসন্ধি বের করে ফেলেছিলেন। গোয়েন্দা প্রধানের জেরার মুখে এরা স্বীকার করেছিল তারা যে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য কৃষকের বেশে নাটক সাজিয়ে দুর্গে এসেছে। কিন্তু গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগ সত্ত্বেও সেনাপ্রধান বিন কাসিম তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেই রাতের শেষে ফজরের নামাযান্তে বিন কাসিম তাঁর তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন টহলরত সৈন্যরা এ দুই হিন্দু সৈন্যকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো। তারা ধৃতদেরকে নিয়ে গেল গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর কাছে। তারা জানালো, এরা আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। প্রহরী সৈন্যরা আগেই তাদের তরবারী ও বর্শা ছিনিয়ে নিয়েছিল। শা'বান ছাকাফী তাদের দেখেই চিনে ফেললেন।

আবার এসেছ তোমরা? এখন আবার কোন মেয়েদের এনেছো? এখন আর তোমাদের জ্যান্ত ছেড়ে দেয়া হবে না। আগের বেলায় আমাদের প্রধান সেনাপতি দয়া পরবশ হয়ে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু এবার তেমনটি করতে দেয়া হবে না।

আমরা সেই উপকারের বদলা দিয়েছি। বলল ধৃতদের একজন। সেই সাথে আমরা এখন মরতে আসিনি, জেনে বুঝে জীবিত থাকার জন্য এবং আমৃত্যু আপনাদের সাথে থাকার জন্যই এসেছি।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসাবে শত্রু গোয়েন্দাদের কথায় নির্ভর করতে পারছিলেন না শা'বান ছাকাফী। কিন্তু এদের দাবী ও প্রস্তাবও উড়িয়ে দেয়ার মতো ছিল না। তারা জানালো, ফিরে গিয়ে তারা বিজয় রায় ও রাজা কাকাকে বলেছিল মুসলমানদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তারা ফিরে গিয়ে শাসকদের যা বলেছিল এর সবই জানালো শাবান ছাকাফীকে। তাদের একজন বলল, এক পর্যায়ে আমরা বিজয় রায়কে বললাম, আমাদেরকে এমন কোন কাজের দায়িত্ব

দিন যাতে জীবনের ঝুকি রয়েছে। আমরা সেটি করে দেখিয়ে দেবো কিন্তু মুসলিম শিবিরে গিয়ে গোয়েন্দা গিরি করতে পারব না। কারণ আমরা সৈনিক, যুদ্ধ ময়দানে বীরত্ব দেখানোর কাজেই আমরা পারদর্শি। আমাদের ব্যর্থতার জন্য বিজয় রায় উভয়কে হত্যা করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু কথায় কথায় তার সিদ্ধান্ত বদলে গেল, রাতের অন্ধকারে মুসলিম শিবিরে চোরাগুপ্তা হামলার সিদ্ধান্ত নিলো সে। অবশ্য আমরাই তাকে অন্য কোন ভাবে মুসলিমদের মোকাবেলা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। চোরা গুপ্তা আক্রমণ ছাড়া বিকল্প কোন কার্যকরপন্থা ছিল না। আমরা বললাম, তাহলে আমরা মুসিলম সৈন্যদের খোঁজ রাখি। যেখানে তারা সর্বশেষ শিবির স্থাপন করে সেখানে রাতের অন্ধকারে আমাদের সৈন্যদের আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো এবং ঘুমন্ত মুসলিমদের শেষ করে দেবো।

তারা শা'বান ছাকাফীকে জানালো, এরপর আমরা বেশ বদল করে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খোঁজ খবর নিতে বেরিয়ে পড়লাম, সেই সাথে বিজয় রায়ের বাহিনীকে ব্যর্থ করার পরিকল্পনা তৈরি করলাম। অবশেষে মুসলিম বাহিনীর সর্বশেষ শিবির দেখে সিসিমে ফিরে গেলাম। আমরা আপনাদের প্রধান সেনাপতির দূরদর্শীতার প্রশংসা না করে পারছি না। বলল অপর ব্যক্তি। আপনাদের সেনাপতি এমন রাস্তা দিয়ে সৈন্যদের নিয়ে এসেছেন যে পথে কোন জন মানুষের যাতায়াত নেই। দুর্গম ও অসমতল পথে আপনারা অগ্রসর হয়ে এমন এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেছেন যে, কেউ চিন্তাও করতে পারেনি, এখানে এতো বিশাল একটা বাহিনী শিবির স্থাপন করতে পারে।

আমরা কাকতালীয়ভাবেই আপনাদের আগমন ও শিবির দেখে ফেলেছিলাম। নয়তো স্বাভাবিক সৃষ্টিতে আমাদের এই দিকে আসার কথা ছিল না। আমরা ফিরে গিয়ে বিজয় রায়কে আপনাদের শিবির স্থাপনের কথা জানালাম। সেই সাথে আমরা এও প্রস্তাব করলাম, ঝটিকা হামলাকারী দলের মধ্যে আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।

আমাদের উৎসাহ দেখে বিজয় রায় ঝটিকা বাহিনীকে রাতের বেলায় পথ দেখিয়ে মুসলিম শিবিরে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত করল।

আমরা ইচ্ছা করলে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত আঠার'শ গেরিলা সৈন্যকে সোজা আপনাদের শিবিরে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমরা আপনাদের

সেনাপতির দয়া ও আপনাদের ইবাদত দেখে এতোটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, শত্রু সৈন্যকে পাকাড়াও করে জীবন্ত মুক্ত করে দেয়ার প্রতিদান দেবই বলে স্থির করলাম।

এ জন্য রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গেরিলা অভিযানে আসা সৈন্যদেরকে আমরা ভিন্ন পথে নিয়ে গিয়ে দিকভ্রান্ত করে শিবির থেকে অনেক দূরে ঘুরাতে শুরু করলাম। এক পর্যায়ে ওদের জানালাম, আমরা তো রাস্তা ভুলে অনেকটা সরে এসেছি। ফের ঠিক রাস্তায় আসার কথা বলে আবারো ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাত পার করে দিলাম। অবশেষে যখন পূর্বাকাশে আলো দেখা গেল, তখন তাদেরকে ফিরে আসার পথ দেখিয়ে বললাম, এখন তো রাত শেষ। আমাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দিনের আলোয় মুসলিম বাহিনী আমাদের দেখতে পেলে একজনকেও জীবন নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না। একথা শুনে সবাই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। আর ফেরার পথে হঠাৎ আমরা দু'জন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবার অলক্ষ্যে এদিকে রওয়ানা হলাম। আপনারা ভোরের ইবাদত শেষ করেছেন, আমরাও এখানে এসে পৌছেছি। আপনিই এখন আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের হত্যা করতে পারেন কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি

তোমরা কি তোমাদের ধর্মের প্রতি এতোটাই ঘৃণা পোষণ করো? বললেন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী।

আগে ঘৃণা করতাম না কিন্তু আপনাদের ইবাদত বন্দেগী আমাদের এতোটাই আকৃষ্ট করল যে, আমাদের ধর্মের প্রতি আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি। তাছাড়া নিজ ধর্মের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির আরেকটি কারণ হলো, গেরিলা বাহিনীর সাফল্যের জন্য সিসিম মন্দিরে একটি কুমারী বলি দান করে তার ছিন্ন মস্তক ঝিলে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী গোয়েন্দা দু'জন শা'বান ছাকাফীর কাছে জানতে চাইলো আপনারাও কি এ ধরনের সাফল্যের জন্য নরবলী দিয়ে থাকেন?

'নরবলী দিয়েই তো আমরা এ পর্যন্ত এসেছি' বললেন গোয়েন্দা প্রধান। কিন্তু তোমাদের মতো আমরা কুমারী বলি দান করি না। আমরা বরং এ ধরনের কুমারী সে যে ধর্মেরই হোক তাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমাদের জীবন কুরবানী করে দেই।

অত্যাচার ও জুলুমের ভয়ানক অবস্থা দেখুন, বলল অপর গোয়েন্দা। গেরিলা বাহিনীর বিজয়ের জন্য যে কুমারীকে বলিদান করা হয়েছে, তার রক্ত

গেরিলা বাহিনীর গমন পথে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা জানতাম হিন্দু ধর্মে নরবলী দেয়ার রীতি আছে কিন্তু এর আগে নরবলী দানের ঘটনা আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। আহা! সেই কুমারী মেয়েটির মা-বাবা আর ছোট দু'টি ভাইকে মাটিতে পড়ে কান্নায় গড়াগড়ি করতে দেখেছি...। কি নির্মম হত্যা কাণ্ড। তাহলে আপনাদের ধর্মে এ ধরনের কাণ্ড ঘটে না?

না, আমাদের ধর্মে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। আমরা আমাদের নবীর দেখানো পথে চলি। আমাদের পথে যদি কোন অহংকারী শাসক সামরিক শক্তির অহমিকায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা সেই ভ্রষ্টচারী অহংকারীর রক্ত প্রবাহিত করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। বললেন শা'বান ছাকাফী।

✪ ✪ ✪

গোয়েন্দা প্রধান পুনর্বার মুসলিম শিবিরে আসা সেই দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে বিন কাসিমের কাছে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে সবিস্তারে ওদের বলা কাহিনী জানালেন। বললেন, গতরাতে আমাদের ওপর ভয়াবহ এক কেয়ামত ধেয়ে আসছিল, এরা দু'জন সেটিকে রুখে দেয়ার দাবী করছে।

এটা আল্লাহ্ তাআলার অপার মেহেরবানী, বললেন বিন কাসিম। চাচা হাজ্জাজ যে আমাদেরকে বারবার আল্লাহর দরবারে দোয়া করা, আল্লাহ্র মদদ কামনা করা এবং রাতের বেলায় ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার কথা জোর দিয়ে বলছিলেন, এই বলা অর্থহীন নয়। রাতের বেলায় যেখানে সমগ্র বাহিনী ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত আল্লাহ্র সাহায্যের আশায় ক্রন্দরত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে সেখানে নরবলী দানকারী খোদাদ্রোহী আগ্রাসী বাহিনী এসে অন্ধ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

তিনি ধৃত গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করলেন, সিসিমের রাজা কাকা আর কি কি পরিকল্পনা এঁটেছে?

আসলে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, বলল এক গোয়েন্দা। বিজয় রায়ের প্ররোচনায় সে যুদ্ধ করতে রাজী হয়ে যায়। আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে কাকার কাছে দূত পাঠিয়ে সমঝোতার প্রস্তাব করতে পারেন।

'বিজয় রায় সমঝোতা করতে রাজি হবে না,' বললেন গোয়েন্দা প্রধান।

সে না মানলেও কিছু যায় আসে না। কারণ এখন আর তার হাতে কোন সৈন্য নেই। সে তো এই দুর্গে আশ্রয় প্রার্থী। বলল অপর গোয়েন্দা।

ওদের সাথে সামরিক কলা কৌশল নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না বিন কাসিম। কারণ সামরিক কলা কৌশল নিয়ে ওদের সাথে আলোচনা করা তিনি যৌক্তিক মনে করেননি। গোয়েন্দা প্রধানকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বিন কাসিম বললেন, এদের সম্মানের সাথে থাকা খাওয়া এবং ভালো কাপড় চোপড় পরিধানের ব্যবস্থা করে দিন।

মহামান্য সেনাপতি আমাদেরকে আপনার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ দিন। এর চেয়ে আমাদের জন্যে আর সম্মানের জিনিস কি হতে পারে। বললো এক গোয়েন্দা। আপনি অনুমতি দিলে আমরা মুসলমান হিসাবে আপনার সেনাদলে যোগাদান করতে আগ্রহী।

অতঃপর উভয়েই কালেমা পড়ে বিন কাসিমের হাতে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষা নিলো। বিন কাসিম এদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

রাতেই বিন কাসিম সৈন্যদেরকে সকাল বেলায় অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। ফলে সকাল বেলায় অভিযান শুরু করার জন্যে সবাই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এদিকে যে সিসিমের অবস্থা ভিন্ন এ সম্পর্কে মোটেও কোন তথ্য জানা ছিল না বিন কাসিমের। নওমুসলিম গোয়েন্দার কাছ থেকে শুনে সকাল বেলা চারজন নিরাপত্তারক্ষীসহ গোয়েন্দা ও দূতিয়ালীতে পারদর্শী খুবই মেধাবী ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন বাকপটু যোদ্ধা নাবাহ বিন হানযালাকে অগ্রবর্তী দূত হিসাবে সিসিম দুর্গের রাজা কাকার কাছে পয়গাম দিয়ে পাঠালেন সেনাপ্রধান। তিনি বলেদিলেন, সিসিমের রাজা কাকাকে বলবে, সে যেন বিনা রক্তপাতে দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দেয় এবং আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে। তাহলে স্বপদে তাকে বহাল রাখা হবে এবং তার ও দুর্গের সকল অধিবাসীর জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব থাকবে আমাদের ওপর।

বিন কাসিমের পয়গাম ও দিক নির্দেশনা নিয়ে দূত নাবাহ বিন হানযালা সৈন্যদের আগে দ্রুতগতিতে রওয়ানা হলেন।

✪ ✪ ✪

এদিকে সিসিম দুর্গে বিজয় রায় ও রাজা কাকার মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিলো। ঝটিকা বাহিনীর পরাজয় আমার কাছে মনে হচ্ছে অশুভ সংকেত, বিজয় রায়ের উদ্দেশ্যে বলল রাজা কাকা। এতে পরিষ্কার বোঝা

যাচ্ছে, আমরা যদি মুসলিম সৈন্যদের অবরোধ ভাঙতে চেষ্টা করি তাহলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

'কাপুরুষ হয়ো না কাকা' বলল বিজয় রায়। অবরোধ তো এখনো হয়নি। আমি দাহিরের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে আরো সৈন্য নিয়ে আসবো। তোমার কাছেও তো সৈন্য রয়েছে। তাছাড়া আমার প্রশিক্ষিণপ্রাপ্ত আঠার'শ সৈন্য তো রয়েই গেছে। এদেরকে আমরা আগেই দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দেবো। মুসলমানরা অবরোধ করলে এরা পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে।

বিজয় রায়! রাজা দাহিরের ভাতিজা হওয়া ছাড়া তোমার আর কি গুণ আছে, বলো? সিন্তানে তোমার সৈন্যের অভাব ছিল? তুমি যদি এতোই যুদ্ধ পারদর্শী হতে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে আসলে কেন? বলল কাকা। আমি যা বলছি, তা বোঝার চেষ্টা করো। আমি বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধ ধর্মে এ ধরনের খুনোখুনির অনুমতি নেই। কোন মানুষের জীবনহরণ করাকে আমার ধর্ম মোটেও অনুমোদন দেয় না। অথচ তোমরা আমার সামনে একটি অবলা কিশোরীকে হত্যা করে তার মস্তক ঝিলে ফেলে দিয়েছ। তাতে কি লাভ হয়েছে....? হতাশা আর ব্যর্থতা ছাড়া কি পেয়েছো....? এই নিরপরাধ কুমারীর প্রেতাত্মা এখন আমাদের ওপর গযব হয়ে দেখা দেবে। তোমাদের কৃত অপরাধের কারণে আমার জনগণের ওপর গযব ধেয়ে আসছে। আমি অপরাধের কাফফারা আদায় করবো। আমার চোখের সামনে আর একটি মানুষেরও রক্ত প্রবাহিত হতে আমি দেবো না।

"তার মানে কি তুমি আমাকে মুসলিম সৈন্যদের হাতে তুলে দিতে চাও?" উৎকণ্ঠিত সুরে বলল বিজয় রায়।

আসলে এটাই করা উচিত হতো। যে তশতরিতে কুমারীর মাথা রেখে সেটিতে বিন কাসিমের ছিন্ন মাথা দেখতে চেয়েছিলে তুমি, সেটিতে তোমার ছিন্ন মস্তক রাখাই ছিল উচিত কাজ। কিন্তু আমি তোমার সাথে গাদ্দারী করব না। একটাই উপায়, তুমি আমার এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও।"

কাকার হুমকিতে ভড়কে গেল বিজয় রায়। একান্ত অনুগত কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া এখানে তার কোন সৈন্য সামন্ত নেই। রাজা কাকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সে মুসলমানদের মোকাবেলা করা তো দূরে থাক নিজের অস্তিত্বই টেকাতে পারবে না। চরম অহংকারী ও তেজস্বী বিজয় রায় নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। সে বুঝতে পারল, ঝটিকা বাহিনীর ব্যর্থতার কারণে কাকা যতোটুকু মোকাবেলার জন্য

প্ররোচিত হয়েছিল ততটুকুই এখন মোকাবেলা না করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় তার দুর্গে অবস্থান করা হবে আত্মঘাতি। ফলে কাকার সাথে আর কথা না বাড়িয়ে একান্ত ক'জন অনুচর ও পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্গ ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়ে পড়ল সে। বিজয় রায়কে বিদায় করে রাজা কাকা দুর্গপ্রাচীরে উঠে বিন কাসিমের সৈন্যদের সম্ভাব্য আগমন পথের দিকে দৃষ্টি মেললো। অনেক দূরে নজরে পড়লো ধূলি ঝড়ের মতো। হয়তো বা এটাই হবে মুসলিম বাহিনীর আগমনী বার্তা। সে দুর্গপ্রাচীরের ওপর পায়চারী করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর অনেক দূরে পাঁচজন অশ্বারোহীকে দুর্গের দিকে আগোয়ান দেখতে পেল। বিষয়টা অনুমানের জন্যে দুর্গপ্রাচীরেই পায়চারী করতে লাগল রাজা কাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী পাঁচজন এসে দুর্গফটকের কাছে থামল। রাজা দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে দেখলো তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাকার বুঝতে অসুবিধা হলো না এরাই আরব সৈন্য।

দুর্গরক্ষী কমান্ডার আগন্তুকদের কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে রাজা কাকা জিজ্ঞেস করল, এরা কে? কোত্থেকে এসেছে? নাবাহ বিন হানযালার এক সহযোদ্ধা এখানকার ভাষা জানতো, সে তাকে বুঝিয়ে দিলো, দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে এরা কি জিজ্ঞেস করছে?

আমি আরব সেনা প্রধান মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে মৈত্রীর পয়গাম নিয়ে এসেছি। মানুষের হাতে মানুষের রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে আপনিও হয়তো পছন্দ করবেন না। এর আগে একটি নিরপরাধ তরুণীকে হত্যা করে আপনাদের কি লাভ হয়েছে?

রাজা কাকা তো আগে থেকেই সমঝোতা ও মৈত্রীর জন্য উদগ্রীব ছিল। সে ভাবছিল কি করে কার মাধ্যমে বিন কাসিমের কাছে প্রস্তাব পাঠাবে। তা ছাড়া বিন কাসিম মৈত্রী প্রস্তাব গ্রহণ করেন কি না, করলে কি কি শর্তারোপ করতে পারেন, ইত্যাকার নানা শঙ্কা ও সম্ভাবনা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে কাকা দৌড়ে দুর্গপ্রাচীর থেকে নিচে নেমে ফটক খুলিয়ে বাইরে এলো এবং হাসি মুখেই নাবাহ বিন হানজালাকে স্বাগত জানালো। কাকা বলল–

"আমি যদি আপনাদের সৈন্যদের জন্য দুর্গফটক খুলে দেই তাহলে আমাদের সাথে আপনাদের সম্পর্কের পর্যায়টি কেমন হবে?" কি হবে আপনাদের শর্তাদি? বিন কাসিম তাকে যেসব শর্তাবলির কথা বলে

দিয়েছিলেন, নাবাহা কাকার কাছে ব্যক্ত করলেন। কাকা তো শর্তাদির কথা শুনে হতবাক। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে সব শর্ত মেনে নিলো। কাকা বিশ্বাসই করতে পারছিল না, কোন বিজয়ী শক্তি এ ধরনের নমনীয় শর্তাদি আরোপ করতে পারে।

আমাদের সেনাপ্রধানের সাথে সাক্ষাতের জন্য আপনি কি আমার সাথে যেতে রাজী হবেন? কাকার মনোভাব জানতে চাইলেন নাবাহ। তিনি আরো বললেন, ওহ্! আমি একটি শর্তের কথা এখনো আপনাকে বলিনি, পরিবার পরিজনসহ বিজয় রায়কে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে, এ ব্যাপারে অন্যথা করা চলবে না।

বন্ধু, আপনার পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিজয় রায় আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করছিল। কিন্তু আমি তার কথায় সম্মত হচ্ছিলাম না। যুদ্ধ না করার ব্যাপারে আমার অনড় অবস্থান দেখে আপনাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে সে দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে...। আচ্ছা, আমি আপনার সাথে সম্মানিত সেনাপতির সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতে প্রস্তুত। চলুন।

✪ ✪ ✪

কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি উট বোঝাই করে মূল্যবান উপঢৌকন ও উপহার সামগ্রী নিয়ে রাজা কাকা বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলো।

এদিকে বিন কাসিম তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁর সাথে রাজা কাকার সাক্ষাত হলো। কাকা বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিলো। বিন কাসিম তাকে আশ্বস্ত করলেন, আপনি প্রতিশ্রুতি পালন করলে শুধু আপনি ও আপনার পরিবার পরিজন নয়, আপনার সকল প্রজাদের জীবন সম্পদ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে আমাদের কর্তব্য। কিছুক্ষণ পর বিন কাসিম রাজা কাকার সাথে সিসিম দুর্গে প্রবেশ করলেন।

দুর্গে প্রবেশ করে কাকার কাছে বিন কাসিম জানতে চাইলেন, এ অঞ্চলে যদি কাউকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয় তবে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়? এখানে কুরসীকে সবচেয়ে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। বলল রাজা কাকা। যাকে সম্মানিত করা হয় তাকে কুরসীতে বসিয়ে তার মাথায় একটি রেশমী কাপড় দেয়া হয়।

বিন কাসিম একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানে তাঁর পাশে রাজা কাকাকে একটি কুরসীতে বসিয়ে তার মাথায় একটি মূল্যবান রেশমী কাপড় পেঁচিয়ে দিলেন। বিজয়ী শক্তির বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার পরও বিজিত রাজাকে অপমানিত না করে তাকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ঘটনায় দুর্গের অধিবাসীরা মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং মুসলমানদেরকে শত্রু সৈন্যের বদলে মঙ্গলকামী ভাবতে লাগল।

সিসিম দুর্গ জয়ের ব্যাপারে ইতিহাসে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একজন লিখেছেন, রাজা কাকার বিজয় রায়ের সাথে বিরোধের পর বিজয় রায়কে দুর্গে রেখেই মৈত্রী প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বিন কাসিমের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে চলে গিয়েছিল। পথিমধ্যে সে বিন কাসিমের সাথে মিলিত হয়ে পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং তার সৈন্যদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এরপর বিন কাসিম এসে দুর্গ অবরোধ করেন। বিজয় রায়ের সাথে দু'দিন মোকাবেলা হয় এক পর্যায়ে বিজয় রায় নিহত হয় আর বিজয়ীবেশে বিন কাসিম দুর্গে প্রবেশ করেন।

অপর এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, বিজয় রায় সিসিম দুর্গ থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করেছিল। মোদ্দা কথা হলো, বিন কাসিমের সিসিম দুর্গ অভিযানকালে বিজয় রায় নিহত হয়েছিল।

অপর একটি বর্ণনা এমনও রয়েছে যে, রাজা কাকা সংঘর্ষ পরিহার করে স্বেচ্ছায় বিন কাসিমের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল কিন্তু আশেপাশের কিছু লোক আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা কাকার বিরুদ্ধে গিয়ে বিন কাসিমের প্রতিরোধে উদ্যত হয়। এসব বিদ্রোহের উস্কানীদাতা ছিল সিসিম দুর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া বিজয় রায়। রাজা কাকা তার নিজস্ব লোক পাঠিয়ে বিদ্রোহকারীদের বোঝাতে চেষ্টা করল কিন্তু বিদ্রোহীরা সমঝোতা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শক্তি সঞ্চয় ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম জোরদার করতে লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত রাজা কাকা বিন কাসিমকে বলতে বাধ্য হলো, আপনি বিদ্রোহ দমনে যা ভালো মনে করেন করুন, তাতে আমার কোনই আপত্তি থাকবে না।

বিন কাসিম ডেপুটি সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন কায়সকে কিছু সৈন্য দিয়ে নির্দেশ দিলেন, তুমি বিদ্রোহীদের ঘর বাড়ি ভেঙে দেবে এবং তাদের ধরে ধরে হত্যা করবে এবং তাদের দমনে যা জরুরি মনে করো তাই করবে।

এদিকে বিদ্রোহীরা তখন স্বীয় জাতির লোকজনের ঘরবাড়িতেও লুটতরাজ শুরু করে এবং মুসলিম বাহিনীর বিচ্ছিন্ন সেনা চৌকিগুলোতে গেরিলা আক্রমণ শুরু করে।

আব্দুল্লাহ বিন কায়স বিন কাসিমের নির্দেশ মতো বিদ্রোহীদের দমনে ওদের বাড়ি ঘরে আক্রমণ চালালেন। কোন কোন জায়গায় বিদ্রোহীদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই হলো। এ ধরনের একটি তীব্র লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা যখন বিপুল পরিমাণ সহযোদ্ধার লাশ ফেলে পালাতে বাধ্য হলো, তখন আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন বলল, আজকের লড়াইয়ে বিজয় রায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল, মনে হয় সে এবং অনুগত কয়েকজন কমান্ডারও নিহত হয়েছে। পরে মৃতদেহ তল্লাশী করে বিজয় রায়ের মরদেহ পাওয়া গেল। বিজয় রায়ের মৃত্যু এবং আব্দুল্লাহ বিন কায়সের দুর্দান্ত দমন অভিযানে বিদ্রোহীরা রণে ভঙ্গ দিলো এবং সম্পূর্ণ বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রনে এসে গেল।

বিদ্রোহীদের বিভিন্ন আস্তানা থেকে মূল্যবান আসবাবপত্র ও ধনদৌলত, গণীমত হিসাবে মুসলিম সেনাদের হস্তগত হলো। বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য কাপড় এবং আহার সামগ্রী পাওয়া গেল। গ্রেফতারকৃতরা জানালো, বিদ্রোহীদের উজ্জীবিত রাখার জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে বিত্তশালীদের কাছ থেকে বিজয় রায় বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল। সময় মতো বিন কাসিম যদি বিদ্রোহ দমনে কঠোর পদক্ষেপ না নিতেন, তাহলে বিদ্রোহীরা বিন কাসিমের জন্য ভয়ানক দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠত।

অতঃপর বিভিন্ন বিদ্রোহী গোত্রের গোত্রপতিরা বিন কাসিমের দরবারে সাধারণ ক্ষমার আবেদন করল। প্রত্যেক গোত্রপতিদের বাৎসরিক এক হাজার দিরহাম জিজিয়া দেয়ার শর্তে বিন কাসিম তাদের ক্ষমা করলেন। গোত্রপতিরাও এই শর্ত মেনে নিয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল। অনেক গোত্রপতি তো বিশ্বাসই করতে পারছিল না এমন পরাক্রমশালী বিজয়ী বাহিনীর সেনাপতি এতোটা নমনীয় শর্তে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারেন।

এদিকে বিদ্রোহীদের থেকে প্রাপ্ত গণীমতের সম্পদ থেকে বায়তুলমাল তথা সরকারের প্রাপ্য অংশ আলাদা করে বসরায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সিসিম দুর্গ বিজয় এবং বিদ্রোহ দমনের ঘটনা বিস্তারিত লিখলেন। সিসিম দুর্গে তিনি দু'জন শাসক নিযুক্ত করলেন, প্রধান শাসকের দায়িত্ব পেলেন বিদ্রোহ দমনকারী ডিপুটি সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন কায়স আর তার সহকারী হলেন হুমাইদ বিন বিদায়।

✪✪✪

পরবর্তী অভিযানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা করছিলেন বিন কাসিম। এরই মধ্যে বসরা থেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পয়গাম এলো। পয়গামের শুরুতে বোধী অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর হাজ্জাজ পয়গামে নির্দেশ দিলেন, অগ্রাভিযান মূলতবি করে এখন পুনরায় নিরূন দুর্গে প্রত্যাবর্তন করো। সৈন্যদের কয়েক দিন বিশ্রাম দাও, আর এর মধ্যে জনবল ঘাটতি পূরণ করে নাও। প্রয়োজনীয় সামরিক আসবাবপত্রের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে দাহিরের উদ্দেশ্যে অভিযানে নামো।

খোলা ময়দানে নেমে আসতে ওকে প্ররোচিত করো। ওর বাহিনীকে এভাবে নাকানী চোবানী খাওয়াবে যে, শেষ পর্যন্ত দাহির তোমার পায়ের তলায় এসে পড়ে। রাজা দাহিরকে পরাস্ত করার পর তোমাদের জন্যে গোটা হিন্দুস্তানের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমাদের মোকাবেলায় আর কেউ টিকেত পারবে না। তবে সব সময় নফল নামায ও আল্লাহ্র মদদের জন্য দোয়া করতে ত্রুটি করবে না। ইবাদত, তেলাওয়াত ও দোয়ার কার্যকারিতা তো ইতোমধ্যেই তোমরা উপলব্ধি করছ। তাই বেশি বেশি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করবে। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মদদ করবেন ইন্শাআল্লাহ।

হাজ্জাজের পয়গাম পাওয়ার পর কাল বিলম্ব না করে সিসিম দুর্গের দায়িত্ব দুই প্রশাসককে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি সৈন্যদের নিরূন প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। সিসিম দুর্গের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য সেখানে রেখে বাকীদের সাথে নিলেন। পথিমধ্যে সিস্তান দুর্গে যাত্রা বিরতি করলেন বিন কাসিম। বিন কাসিম সিস্তান দুর্গ থেকে রওয়ানা হবেন ঠিক এই মুহূর্তে চেন্নাই গোত্রের কিছু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলো। তারা বিন কাসিমকে জানালো, রাজা কাকা ও বিজয় রায়ের পাঠানো দুই গোয়েন্দা যারা এখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে, তারা স্বগোত্রের সরদারদের গিয়ে বলেছে, মুসলমানরা আসলে কেমন, ইসলাম কি এবং ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়া ও পরকালে কি কি পুরস্কার ও শান্তি লাভ করা যাবে। এরা দু'জন যেখানেই যেত, মুসলিম সৈন্যদের পরোপকার, তাদের সৎ চরিত্র, জনকল্যাণ ও মানব হিতৈষীর কথা প্রচার করত।

অবশ্য চেন্নাই গোত্রের লোকেরাও দেখতে পেয়েছিল, বিজিত এলাকায় মুসলমানরা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার জুলুম তো দূরে থাক তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে দিতে

কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা স্বগোত্রের দুই নও মুসলিমের মুখে মুসলিম সেনাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সৎ চরিত্রের কথা শুনে বহুলোক সদল বলে সিস্তান দুর্গে এসে বিন কাসিমের কাছে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেয়ার আবেদন জানালো।

চেন্নাই গোত্রের লোকেরা বিন কাসিমের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনও নিয়ে এলো। বিন কাসিম তাদেরকে ইসলামে দীক্ষা দিলেন। সবাই কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। তখন প্রায় দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেল। সৈন্যরা খাবার আয়োজন করল। বিন কাসিম সবাইকে খাবারে আহ্বান জানালেন।

আহার শেষে বিন কাসিম চেন্নাই গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই গোত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবারিত রিযিকের দ্বারা স্নাত হবে। তারা যেখানেই থাকুক রিযিকের ঘাটতির সম্মুখীন হবে না। এরা আরযুক। তখন থেকেই দেখা যায় চেন্নাই গোত্রের লোকেরা সত্যিকার অর্থেই রিযিকের অভাব বোধ করে না।

অতঃপর বিন কাসিম নিরূনের পথে রওয়ানা হলেন।

পর্ব নয়

অগ্নিদগ্ধ দুই প্রমোদবালাকে দাহির হাতির হাওদা থেকে ফেলে দিল

৯৩ হিজরী সনের সেই ভয়াল রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার। রণাঙ্গনের চারদিকে অসংখ্য জ্বলন্ত মশাল ভেসে বেড়াচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে রক্তের গন্ধ। আহতদের আর্তনাদ ও আহাজারী রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে জন্ম দিয়েছে এক ভয়ার্ত পরিবেশ। বিন কাসিমের যোদ্ধারা দাহির বাহিনীর নিহত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র একত্রিত করছিল। কয়েকটি দল শাহাদাত বরণকারী সহযোদ্ধাদের লাশগুলো জমা করছিল।

কয়েকটি দল আহত সৈন্যদের তুলে এনে শিবিরের পিছন দিকে সেবাদানকারীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। যেসব মহিলা বিন কাসিমের যোদ্ধাদের সাথে এসেছিল তারা এসব আহত যোদ্ধাদের ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে ওষুধ দিচ্ছিল। সেবিকা মহিলারা ছিল বিন কাসিমের সৈন্যদেরই কারো স্ত্রী বোন বা কন্যা। প্রতিটি যুদ্ধের পর আহতদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব তারাই পালন করছিল। তারা রাত জেগে বিরামহীন ভাবে আহতযোদ্ধাদের ক্ষতস্থানে ওষুধ দিত, আর পানাহার করাতো।

অশ্বারোহী একটি ইউনিট দাহির বাহিনীর মৃত ও আহত সৈন্যদের লাওয়ারিশ ঘোড়াগুলোকে ধরে ধরে মুসলিম শিবিরে পাঠাচ্ছিল।

বিন কাসিম গণীমতের সম্পদ সংগ্রহের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সৈন্যদের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন। কারণ তিনি জানতেন, আজ যে সৈন্যদের সাথে তার মোকাবেলা হয়েছে, তা রাজা দাহিরের বিপুল সৈন্যের একটি অংশ মাত্র। রাজার আরো অসংখ্য সৈন্য আরূঢ় প্রান্তরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় মোকাবেলার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন রাতের বেলায় যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হতো, কিন্তু রাতের অন্ধকারে গেরিলা আক্রমণের আশঙ্কা থাকতো। বিন কাসিম দু'জন সেনাপতিকে তাদের ইউনিট নিয়ে রণাঙ্গণ

থেকে দূরে শত্রুবাহিনীর সম্ভাব্য পথে টহল দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যে পথে শত্রুসৈন্যদের রাতের বেলায় গেরিলা আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সৈন্যরা রণক্লান্ত হলেও এতটুকু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না করার উপায় ছিল না। শত্রু পক্ষ ছিল খুবই প্রবল ও অভিজ্ঞ। কারণ রাজা দাহির অল্প কিছু সৈন্য মোকাবেলায় পাঠিয়ে বেশিসংখ্যক সৈন্য তার কাছে রেখে দিয়েছিল। রণকৌশলের দিক থেকে তা ছিল খুবই উঁচুমানের সমরবিদের পরিচায়ক।

বিন কাসিম নিজে এই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন না। রাতের বেলায় তিনি ময়দানে ঘোড়া হাঁকিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বিন কাসিমের সাথে ছিল তাঁর একান্ত নিরাপত্তারক্ষী। তারা ময়দান থেকে কিছুটা দূরে রাতের গেরিলা আক্রমণ প্রতিহতকরণে টহলদানরত সৈন্যদের কাছে চলে এলেন। টহলদলের দুই সেনাপতির উদ্দেশ্যে বিন কাসিম বললেন, বন্ধুদ্বয়! আজকের লড়াইটা সূচনামাত্র। এটাকেই শত্রু বাহিনীর পরিণতি মনে করো না। শুধু একটি মোকাবেলায় বিজয়ী হয়ে এমন আত্মশ্লাঘায় ডুবে যেয়োনা যে, সামনের প্রতিটি মোকাবেলায় শত্রুবাহিনী এভাবেই পরাস্ত হবে। রাজা দাহির তার ছেলে জয়সেনাকে কিছু সৈন্য দিয়ে মোকাবেলায় লিপ্ত করে আমাদের যুদ্ধ কৌশল দেখে নিয়েছে। সে আমাদেরকে কিভাবে পরাজিত করতে হবে তা বুঝার চেষ্টা করছে। সামনের প্রতিটি মোকাবেলায় আমাদেরকে আরো সতর্ক হয়ে লড়াই করতে হবে, অবশ্য আল্লাহ তাআলা বিজয় আমাদেরকেই দান করবেন।

'চিন্তা করবেন না বিন কাসিম! আমরা সেইদিন নিজেদেরকে বিজয়ী মনে করবো যে দিন রাজা দাহিরের খণ্ডিত মস্তক আপনার পায়ের কাছে গড়াগড়ি করবে' বললেন সেনাপতি যুরায়েম বিন আমর মাদানী। ইসলামের পথে বাধাসৃষ্টিকারী এই দেয়ালকে আমরা গুড়িয়ে দিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বলবো, আমাদের ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, আমরা সেই কর্তব্য পালন করেছি।

বিন কাসিম! নিঃসন্দেহে আমাদের এ বিজয় চূড়ান্ত বিজয় নয়; তবে এই বিজয়ই আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের পথ খুলে দিয়েছে" বললেন অপর সেনাপতি দারাস বিন আইউব। আমাদের যোদ্ধারা হাতিকে ভয় পেতো। আর এখন দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, দাহির বাহিনীর হাতিগুলোই আমাদের সৈন্যদের ভয় করতে শুরু করেছে।

নিঃসন্দেহে তা ঠিক, বললেন বিন কাসিম। আমি আমার যোদ্ধাদেরকে হাতির শুঁড় কেটে দিতে নিজ চোখে দেখেছি।

✪✪✪

এরপর বিন কাসিম তাঁর আহত সৈন্যদের দেখতে চলে গেলেন। ঘাসের ওপর কাপড় বিছিয়ে আহত সৈন্যদের শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আহত সেনা শিবিরের কাছে গিয়ে বিন কাসিম ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তিনি একেকটি তাঁবুতে ঢুকে সৈন্যদের সাথে কথা বলে আবার অন্য শিবিরে প্রবেশ করছিলেন। এ ভাবে একটির পর একটি তাঁবুতে ঢুকে সৈন্যদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর ও আহতদের সাথে কথা বলে নতুন একটি তাঁবুতে প্রবেশ করছিলেন। তাবুতে মশাল জ্বলছে। তিনি দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা আহত সৈন্যকে পানি পান করাচ্ছে। অবশ্য এর আগেই ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। বৃদ্ধার চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও তার গড়ন বেশ শক্ত। এরই মধ্যে সেবিকা বৃদ্ধার সাথে আহত সৈনিকের কথাবার্তা হয়েছে।

ঃ তুমি কার মা?

ঃ আহত সৈনিক বয়স্কা সেবিকাকে জিজ্ঞেস করল।

এ মুহূর্তে আমি সকল সৈন্যের মা, যারা আবরদের মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রক্ত ঝরিয়েছে। তোমার মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হলো কেন, যে আমি কার মা? পাল্টা প্রশ্ন করল বৃদ্ধা।

ঃ হ্যাঁ, তুমি আমারও মা-ই বটে। আমার মা হলেও এমন মমতায় পট্টি বেঁধে দিতো এবং পরম আদরে পানি মুখে তুলে দিত। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। কারণ তুমি এখন এমন বয়সে উপনীত হয়েছো যে, আমাদের উচিত ছিল তোমার সেবা করা, কিন্তু উল্টো আমাদেরকে তোমার সেবা করতে হচ্ছে।

ঃ তুমি কোন কবিলার লোক আহতকে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধা।

ঃ আমি বনী উমাইয়ার লোক। আচ্ছা, তুমি কোন গোত্রের?

ঃ আমি আলাফী গোত্রের লোক। জবাব দিল মহিলা।

ঃ আলাফী? আঁতকে উঠল আহত সৈনিক। আমাদের সেনা শিবিরে কি কোন আলাফী গোত্রের সৈন্যও আছে? যার মা তুমি?

ঃ না, বনী উমাইয়ার শাসনাধীন সেনাবাহিনীতে কোন আলাফী গোত্রের সৈন্য থাকতে পারে না। এখানেও নেই। কারণ এই দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান।

ঃ তাহলে তুমি এখানে এলে কি করে? আলাফীরা তো সবাই বিদ্রোহী। ওরা খলিফার সাথে বিদ্রোহ করে হিন্দুস্তানে এসে রাজা দাহিরের আশ্রয়ে বসতি গেড়েছে।

ঃ আমি একা নই। আমার সাথে আলাফী গোত্রের আরো চার মহিলা এসেছে। আমরা তোমাদের সৈন্যদলের সাথে আরব থেকে আসিনি, মাকরান থেকে এসেছি।

ঃ নদী কিভাবে পার হয়েছো তোমরা?

ঃ কেন, নদীতে নৌকার পুল ছিলনা? আমরা সেই পুল পেরিয়ে এসেছি। আমাদের কেউ বাধা দেয়নি।

ঃ আমি তোমার হাতে পানি পান করবো না। বৃদ্ধার হাতের পানি পান করতে অস্বীকৃতি জানালো সৈনিক। বৃদ্ধা সেবিকা ও আহত সৈন্যের মধ্যে যখন এই কথা হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন সেনাপতি বিন কাসিম।

বিন কাসিমকে প্রবেশ করতে দেখে আহত সৈনিক বৃদ্ধাকে বলল, তুমি এখান থেকে উঠে যাও, প্রধান সেনাপতি বিন কাসিম এসেছেন। তিনি যেন তোমার কথা জানতে না পারেন। বৃদ্ধা উঠে দু'হাতে বিন কাসিমের মাথা ধরে তাঁর কপালে চুমু দিলো এবং তাঁর উদ্দেশ্যে বলল–

বিন কাসিম! তুমি কি ভুলে গেছো, তোমার বাপ দাদা বনী সাকীফের লোক ছিলেন? বনী উমাইয়ার নূন রুটি কি তোমার শরীরে এতোটাই প্রভাব সৃষ্টি করেছে যে, তুমি তোমার সৈন্যদের মধ্যে আলাফীদের প্রতি এমন বিদ্বেষ তৈরি করে রেখেছো যে, এই আহত সৈনিক আমার হাতের পানি পান করতে পর্যন্ত ইচ্ছুক নয়।

ঃ কেন, কি হয়েছে? জানতে চাইলেন বিন কাসিম?

ঃ বিন কাসিমের জিজ্ঞাসার জবাবে বৃদ্ধা জানালো, সে একজন আলাফী গোত্রের মহিলা এবং মাকরান থেকে আরো চার মহিলাকে নিয়ে বিন কাসিমের আহত সৈন্যদের সেবাদানের জন্য কিভাবে এপর্যন্ত এসেছে।

ঃ তুমি জানো না বিন কাসিম, তুমি জানো না! প্রতিটি আলাফী নারী শিশু তোমার বিজয়ের জন্য কতভাবে যে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছে। এটাই ভেবে দেখো, এই বয়সেও আমি এতোদূর পর্যন্ত আসতে বাধ্য হয়েছি। তোমাকে নিজ চোখে দেখার খুব সাধ ছিল আমার। আজ

দেখেছি। আমি তোমার চেহারায় খালিদ বিন ওয়ালিদ, সাদ বিন ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও তাঁর সাথীদের নমুনা দেখতে পাচ্ছি...। দয়া করে তুমি এই সৈনিককে বলো, সে যেন আমার হাতের পানি পান করে, আমি পানিতে কোন বিষ মেশাইনি।

ঃ মাফ করো মা। আমি আলাফীদের শত্রু নয় বন্ধু মনে করি। এই বেচারা জানে না, আলাফীরা আমাদের কতভাবে সহযোগিতা করছে।

ঃ বিন কাসিম ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আহত সৈন্যের দিকে তাকালেন। সৈনিক তার চাহ্নীর ভাষা বুঝতে পারল। আর বৃদ্ধা মহিলা পরম মমতায় আহত সৈন্যের দিকে পুনরায় পানির পাত্র তুলে ধরলে সৈনিক পানি পানের জন্য তার দিকে দু' হাত প্রসারিত করে দিল।

ঃ শোন বাবা! দুটি গোত্রের মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে কিন্তু এই মতবিরোধ আর শত্রুতা ইসলামের সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারে না। যে দিন গোত্রে গোত্রে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, সেদিন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, মুসলমানরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

✪ ✪ ✪

সকাল বেলায় সূর্যোদয়ের পর দেখা গেল বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দাহিরের সৈন্যদের মৃতদেহ। এদের মধ্যে তখনও যেসব সৈন্যের দেহে প্রাণ ছিল তাদের কেউ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। মুসলিম বাহিনীর শাহাদত বরণকারী সৈন্যদের লাশগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছিল, আর সৈন্যরা সেগুলো দাফন করার জন্যে কবর খুঁড়ছিল। অবশেষে একসাথে জানাযা পড়ে সবাইকে কবর দেয়া হলো। সিন্ধুতীরে আরব মুজাহিদদের মৃতদেহগুলো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেল আর তাদের দেহগুলো চিরদিনের জন্য মাটির সাথে মিশে গেল। সৈন্যদের দাফন শেষে বিন কাসিম রাজা দাহিরের সাথে প্রথম মুখোমুখি লড়াইয়ের খবর জানিয়ে হাজ্জাজের কাছে চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে যুদ্ধের গোটা পরিস্থিতি, সাফল্যও ক্ষয়ক্ষতির কথা সবিস্তারে উল্লেখ করলেন।

চিঠি লেখা শেষ হলে বিন কাসিম পত্র বাহকের হাতে তা দিয়ে বললেন, যথাসম্ভব দ্রুত এই পয়গাম হাজ্জাজের কাছে পৌছাবে। হাজ্জাজের পরিকল্পনা মোতাবেক সপ্তম দিন বিন কাসিমের পত্রের জবাব নিয়ে পত্রবাহক ফিরে এলো। মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রাথমিক বিজয়ের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন

কাসিম ও সৈন্যদেরকে মোবারকবাদ জানালেন। সেই সাথে হাজ্জাজ কিছু দিক নির্দেশনা শেষে বিন কাসিমকে লিখলেন,

এখন তুমি রাজা দাহির যেখানে সৈন্য জমায়েত করে অবস্থান করছে সে দিকে অগ্রসর হও...। তবে ভুলে যেয়োনা, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী ছাড়া শক্তি ও কৌশলের জোরে কখনো সাফল্য ধরা দেয় না। সব শেষে হাজ্জাজ লিখলেন, 'আল্লাহর ওপর ভরসা রেখো, সব সময় আল্লাহর দরবারে সাফল্য ও মদদের জন্য মোনাজাত করতে থাকো, তাহলে প্রতিটি লড়াইয়ে আল্লাহর মদদে বিজয় তোমাদেরই হবে।'

নিজেদের গুছিয়ে বিশাল ময়দানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দাহিরের সৈন্যদের মৃত দেহ, মৃত ঘোড়া ও হাতির দেহগুলোকে টেনে হেঁচড়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে বিন কাসিমের সৈন্যদের টানা কয়েক দিন পরিশ্রম করতে হল। তাতে ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল, এক পাশে রয়ে গেল শুধু বিন কাসিমের আহত সৈন্যদের তাবু আর শহীদদের কবর, এবার বিন কাসিমের সৈন্যরা আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিন কাসিমের সেনা শিবিরে সকলের দৃষ্টি পশ্চিম আকাশের দিকে কি যেন তালাশ করছিল। হঠাৎ এক সৈনিক চিৎকার দিয়ে বলল, 'আমি দেখে ফেলেছি! রমযানের চাঁদ উঠেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর সারা শিবিরে যেন আনন্দের বন্যা বইয়ে দিল।

অপরদিকে রাজা দাহিরও রমযানের চাঁদ দেখে খুশি হল। কারণ চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে রমযানের অপেক্ষা করছিল দাহির। রাজা দাহির তার সেনাপতিপুত্র জয়সেনাকে বলেছিল, রমযানের দিনের বেলায় যখন বিন কাসিমের বাহিনী ক্ষুধা পিপাসায় কাতর থাকবে, তখন সে চূড়ান্ত আঘাত হানবে।

সেই রাতের দ্বিপ্রহরে একজন স্থানীয় লোক মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করে সরাসরি শা'বান ছাকাফীর তাঁবুতে চলে গেল। সে ছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর একজন গোয়েন্দা। গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে সে জানাল, আরুঢ়ের পার্শবর্তী একটি ময়দানে রাজা দাহিরের সৈন্যরা রণপ্রস্তুতিতে সজ্জিত। তবে গোয়েন্দার পক্ষে তা জানা সম্ভব হয়নি এই বাহিনী কোন দিকে যাত্রা করবে। তারা কি বিন কাসিমের বাহিনীর এগিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে, না নিজেরা এগিয়ে এসে বিন কাসিমকে হুমকি দেবে।

শা'বান ছাকাফী তখনি গোয়েন্দাকে সাথে নিয়ে বিন কাসিমের তাঁবুতে চলে এলেন। বিন কাসিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়া হলো। তিনি নিজে গোয়েন্দার কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিস্থিতির খবর নিলেন।

এ খবর পেয়ে বিন কাসিম আর ঘুমাতে পরলেন না। তিনি গোয়েন্দা প্রধানকে নির্দেশ দিলেন, আপনি অগ্রসর হয়ে রাজার সৈন্যদের অবস্থা নিজ চোখে দেখে আসুন। শা'বান ছাকাফীকে বলার প্রয়োজন ছিল না, কি জিনিস তাকে প্রত্যক্ষ করতে বলা হয়েছে। এদিকে বিন কাসিম সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে বললেন, বন্ধুরা! এখন সেই সময় এসে গেছে যে সময়ের জন্যে তোমরা অপেক্ষা করছো। শুধু তোমরা না, শত্রু বাহিনীও এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল।

রাজা দাহিরের রণপ্রস্তুতি ছিল রাজকীয়। রাজা দাহিরের হাতিটিও ছিল রাজকীয় সাজে সজ্জিত। অন্যান্য হাতির তুলনায় সেটি ছিল অনেক বড় এবং দেখতে ধূসর বর্ণের। এই নর হাতিটিকে কখনো কোন মাদী হাতির ধারে কাছে যেতে দেয়া হতো না। ফলে এটি সর্বক্ষণ মাতালের মতো উগ্র থাকত। হিন্দুরা হাতিকে রণাঙ্গণে নিয়ে আসার আগে এগুলোকে প্রচুর চোলাই মদ পান করাত। ফলে রণাঙ্গণে হাতিগুলো থাকতো উত্তেজিত উন্মত্ত। নির্দিষ্ট মাহুত ছাড়া আর কারো পক্ষে এসব জঙ্গী হাতিকে কাবুতে রাখা সম্ভব হতো না। মাহুতরা তাদের ইঙ্গিতেই হাতিগুলোকে ইচ্ছামতো চালাতে পারতো।

রাজা দাহিরের হাতির ওপর ছিল রাজকীয় হাওদা। সোনালী রঙের ঝালর দেয়া দামী কালো কাপড়ে আবৃত ছিল হাতির উর্ধাঙ্গ। হাওদার ওপরে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ বর্শা ও তীর। যুদ্ধাবস্থায় রাজাকে তীর ও বর্শা এগিয়ে দেয়ার জন্য হাওদায় দু'জন অভিজ্ঞ সহযোগীকে রাখা হতো। রাজা দাহির যে তীর ব্যবহার করতো তা ছিল বিশেষ ভাবে তৈরি অনন্য বৈশিষ্ট সম্পন্ন। নতুন চাঁদের মতো বাঁকা উভয় প্রান্ত ধারালো এই তীর ধনুকের সাহায্যে নিক্ষেপ করার পর ঘুরে ঘুরে গিয়ে শত্রু সৈন্যের গলায় পড়লে মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।

রাজা দাহিরের হাওদাতে অন্তত দু'জন রূপসী তরুণীকে রাখা হতো। প্রয়োজনের সময় এরা রাজাকে সুস্বাদু শবার পান করাতো।

রাজা দাহির হাতির ওপর আরোহণ করতে যাবে ঠিক এ মুহূর্তে মায়ারাণী এসে নিজ হাতে রাজার মাথায় তিলক এঁকে দিল এবং তার গালে চুমু খেল। আগেই বলা হয়েছে, মায়ারাণী দাহিরের আপন বোন হলেও তাকেই দাহির বিয়ে করে ছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এসে রাজা দাহিরের গলায় লাল সাদা সূতার তৈরি পৈতা পরিয়ে দিলো। সে সময় পুরোহিতদের একটি দল ভজন গাইতে ছিল। রাজা দাহির যখন হাওদায় পা রাখলো তখন আগে থেকে হাওদায় অবস্থানরত দুই রূপসী তরুণী তাদের কাধ রাজার দিকে এগিয়ে

দিল। রাজা দুই তরুণীর কাধে ভর দিয়ে হাওদায় অবতরণ করল। মোট কথা, রাজা দাহিরের রণাঙ্গনে যাত্রা ছিল রীতিমতো একটি জমকালো অনুষ্ঠান।

দাহির হাতির ওপর বসার সাথে সাথেই মাহুত হাতিকে চালিয়ে দিল। মাতাল হাতি শুড় ওপরে তুলে বিকট চিৎকার করে দ্রুত বেগে ছুটতে শুরু করলে চতুর্দিক থেকে শুরু হলো জয়ধ্বনী 'মহারাজের জয় হোক'। তিনবার উপস্থিত সকল মানুষ এই জয়ধ্বনী উচ্চারণ করল। রাজার হাতি কয়েকবার গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে আবার পিছিয়ে এলো, যেন হাতি রনাঙ্গণে যেতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। মাহুতের কথা ও শাসন সে মানতে নারাজ।

একপর্যায়ে টানা কয়েকটি চিৎকার দিয়ে দ্রুতবেগে রাজার হাতি সারিবেঁধে অপেক্ষমান সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সৈন্যদের অগ্রভাগে এক'শ জঙ্গী হাতি সারিবেঁধে দাঁড়ানো ছিল। প্রতিটি হাতির পিঠের হাওদায় তিনজন করে তীরন্দাজ ও চারজন করে বর্শা নিক্ষেপকারী সৈন্য সদাপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল।

হস্তিবাহিনীর পেছনে ছিল দশ হাজার অশ্বারোহী, যাদের প্রত্যেকের মাথায় শিরস্ত্রাণ এবং দেহে লোহার বর্ম। পনের হাজার পদাতিক সৈন্য তাদের ডানে ও পনের হাজার পদাতিক সৈন্য বামে সুসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়ানো। রাজা দাহিরের নির্দেশে এভাবে সকল সৈন্যকে দাঁড় করানো হলো, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে রাজা সকল সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

'পবিত্র ভারতমাতার যোগ্য সন্তানেরা! এই ধরিত্রী আজ তোমাদের কাছ থেকে রক্ত দাবী করছে। ভারত মাতা আজ তোমাদের কাছে জীবন বলিদানের আহবান জানাচ্ছে। নিজের মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ভারতমাতার জন্যে নজরানা দিয়ে দাও। আমি তোমাদের সাথেই আছি থাকবো। তোমাদের সাথে আমিও আমার জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার আগে অন্তত এক'শ শত্রু নিধন করতে হবে...। আমি দেবদেবীদের ইঙ্গিত পেয়েছি, আমার মাথা আমার শরীরেই থাকবে এবং আরব পর্যন্ত যাবে। আরব ভূমি বহু দিন ধরে তোমাদের অপেক্ষা করছে। তোমরা বিজয়ী বেশে সেই দেশে প্রবেশ করবে যে দেশ থেকে সনাতন ধর্মের শত্রুরা ভারতে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ইসলামের নবোত্থিত মাথা গুড়িয়ে দিতে হবে, মক্কার পবিত্র ঘরে আবার দেবদেবীর মূর্তি প্রতিস্থাপন করতে

হবে। চিরদিনের জন্য সেখানকার আযান বন্ধ করে দিতে হবে। সেখানে আযানের পরিবর্তে ঘণ্টা বাজবে, ভজনকীর্তন হবে, আরতি হবে।

"ভারতমাতার জয় হোক"

"রাজা দাহিরের জয় হোক"

বিশাল বাহিনীর জয়ধ্বনীতে রাজা দাহিরের আওয়াজ হারিয়ে গেল। বক্তৃতায় বিরতি দিয়ে ক্ষান্ত হলো দাহির। অতঃপর শ্লোগান থামলে দু'হাত ওপরে তুলে আবার বলতে শুরু করল—

ভারতমাতার সন্তানেরা! তোমাদের মন থেকে এই ভয় তাড়িয়ে দাও যে, মুসলমানরা খুব সাহসী বীর, ওরা রাজ কুমার জয়সেনার সৈন্যদের হারিয়ে দিয়েছে এটা নিয়ে চিন্তা করো না। ওরা আমাদের বহু দুর্গ জয় করে নিয়েছে, এটাকেও বড় মনে করো না। বৌদ্ধদের সহযোগিতার কারণে ওরা আমাদের দূরবর্তী দুর্গগুলো কব্জা করতে পেরেছে। এটা ওদের বাহাদুরী নয়। বৌদ্ধদের গাদ্দারী। এই সাফল্যেকে পুঁজি করেই মুসলমানরা নদী পার হয়ে এপারে আসার দুঃসাহস দেখিয়েছে। ওরা ভাবছে, আমাদেরকে আরো পিছু হটিয়ে দিতে পারবে। আর আমরা ওদের ভয়ে দূরে পালিয়ে যাবো। তোমরা মনে রেখো, আমি ইচ্ছা করেই ওদেরকে এ পর্যন্ত আসতে দিয়েছি। এখন আর কখনো ওরা নদীর পাড়ে যেতে পারবে না। এখন আমরা নদীর পাড়ে যাবো। ওদের নৌকাগুলোকে জ্বালিয়ে দেবো, নদীতে ভাসিয়ে দেবো। এখন নদী পার হওয়ার পালা আমাদের।

একথা মনে রেখো, যদি ওদের ভয়ে জড়সড়ো হয়ে থাকো, বুক টান করে ওদের মোকাবেলায় জীবনবাজী রাখতে না পারো, তাহলে তোমাদের যুবতী স্ত্রী, বোন, কন্যারা ওদের দাসীতে পরিণত হবে। তোমাদের ধন-সম্পদ অলংকারাদি ওরা লুটে নেবে। তোমাদের পালিত গোমাতাকে ওরা জবাই করে খাবে। তোমরা কি গোমাতার অসম্মান সহ্য করবে?

না, না, আমরা জীবন থাকতে গোমাতার অসম্মান হতে দেবো না, সমস্বরে রব উঠল হাজারো কণ্ঠে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, অনলবর্ষী বক্তৃতায় রাজা দাহির হিন্দুদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, তার সৈন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল যুদ্ধ উন্মাদনা। সৈন্যদেরকে দাহির দেবদেবীদের অভিশাপের ভয় দেখাল এবং দেবদেবীর মর্যাদা রক্ষায় জীবনপাত করনে স্বর্গের অফুরন্ত সুখ লাভের লোভ দেখাল।

রণাঙ্গণে যাওয়ার আগের রাতে রাজা দাহির তার সামরিক উপদেষ্টাদের ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করল। সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ও কমান্ডারদের সাথে যুদ্ধ নিয়ে সলাপরামর্শ করলো। পরামর্শদাতাদের মধ্যে মুসলিম সরদার হারেস আলাফীও ছিলেন। হারেস আলাফীকে দাহির নির্ভরযোগ্য সুহৃদ ও বুদ্ধিমান পরামর্শদাতা ভাবতো। অথচ আলাফী সরদারের সব আনুগত্য শুভাকাঙ্ক্ষা ছিল বিন কাসিম ও মুসলিম বাহিনীর প্রতি। সে সময় যদি বনী উমাইয়ার শাসন না হতো, তাহলে এসব আরব যোদ্ধাকে মাকরানে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হতো না।

রাজা দাহির তার কমান্ডারদের নির্দেশ দিলো, সেনাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে একেকটি দলকে পরস্পর থেকে দূরে রাখবে। রাজা মনে করেছিল, মুসলিম সৈন্যরাও তার সৈন্যদের সাথে মোকাবেলার জন্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় দাহিরের রিজার্ভ সৈন্যরা অন্য প্রান্ত থেকে অথবা পিছন দিক থেকে মুসলিম সৈন্যদের ওপর হামলা চালাবে।

'ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে মারতে হবে' বলেছিল রাজা দাহির। মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু করা হবে তখন, যখন ওরা বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবেলা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। এদের অধিকাংশ সৈন্য নিহত ও আহত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। নতুন চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই রাওয়ার দিকে অভিযান শুরু হবে কিন্তু মাত্র দুটি ইউনিট আরব বাহিনীকে মোকাবেলা করবে। এক ইউনিট আক্রমণ করে পিছনে চলে আসবে আরেক ইউনিট আক্রমণ করবে। বিগত রাতেই এসব রণকৌশল রাজা তার কমান্ডারদেরকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল। পরদিন সেনাবাহিনী রওয়ানা হবার আগে উত্তেজনা ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে সে সবার মধ্যে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করে দু'টি অশ্বারোহী ও একটি পদাতিক ইউনিটকে জয়সেনার সাথে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান রাওয়া-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিল। কারণ রাজার সংবাদবাহকরা তাকে খবর দিয়েছিল, মুসলিম সৈন্যরা এখনও রণাঙ্গনেই অবস্থান করছে তাদের অগ্রাভিযানের কোন আলামত দেখা যায়নি।

✪ ✪ ✪

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা দাহির এই বলে বক্তৃতা শেষ করেছিল– 'আমার জীবন থাকতে ইসলাম সিন্ধুতে প্রবেশ করতে দেবো না। আমরা যদি এখানেই ইসলামের আগমন রুখে দিতে না পারি, তা হলে তা সারা হিন্দুস্তানে

ছড়িয়ে পড়বে। আর আমাদের সন্তানেরাও এই অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না। মৃত্যুর পর ইঁদুর কুকুরের বেশে আমাদের পুনর্জন্ম হবে।'

বক্তৃতা শেষে আগের রাতের পরিকল্পনা মতো সৈন্যদেরকে দলে দলে বিভক্ত হয়ে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলো রাজা।

সেনাবাহিনী চলতে শুরু করলেই এক উষ্ট্রারোহী দ্রুতবেগে রাজার হাতির কাছে এসে জানালো, আরব বাহিনী রণাঙ্গন ছেড়ে আরো সামনে চলে এসেছে। এবং আমাদের থেকে সামান্য দূরে অবস্থান নিয়েছে।

বিন কাসিমকে আগেই তাঁর এক গোয়েন্দা খবর দিয়েছিল, দাহিরের সৈন্যরা অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে রাজার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শী বিন কাসিম এ খবর পাওয়া মাত্রই প্রস্তুতি অবস্থায় প্রতিপক্ষকে নাস্তনাবুদ করার জন্য রাতারাতি তাঁর সৈন্যদের অভিযানের জন্য প্রস্তুত করলেন এবং সকাল হতেই সেনাদের রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিন কাসিমের সৈন্যদের চলার গতি ছিল তীব্র ফলে দিনের শেষে তারা রাওয়া থেকে আরো চার পাঁচ মাইল সামনে পৌঁছে গেল।

এর ফলে রাজা দাহিরের পূর্ব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল। রাজা দাহির জানতো না এখন আর তার সৈন্যদের গতিবিধি বিন কাসিমের অজানা নয়। রাজা দাহির তার সৈন্যদেরকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে যে দিকে পাঠিয়েছিল বিন কাসিমের গোয়েন্দারা সব তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে যথাসময়ে অবহিত করেছিল।

রাজা দাহিরকে বিদায় জানানোর জন্য যেসব লোক সমবেত হয়েছিল তারা সবাই যার যার মতো করে ফিরে গেল। এদের মধ্যে ছিল পুরোহিত দল, সামরিক উপদেষ্টা এবং দরবারের শীর্ষ আমলা শ্রেণি। তাছাড়া রাজা দাহিরের রক্ষিতা ও স্ত্রীরাও তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। বিদায় জানাতে আসা লোকদের মধ্যে মায়ারাণী এবং সরদার আলাফীও ছিলেন।

মায়ারাণী তাকে নিয়ে আসা পালকীতে চড়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে একটি ঘোড়া আনিয়ে তাতে আরোহণ করল। এদিকে হারেস আলাফী সবার থেকে ভিন্ন হয়ে একাকী ফিরে যাচ্ছিলেন। মায়ারাণী তার ঘোড়াকে সরদার আলাফীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেল।

পাশাপাশি গিয়ে মায়ারাণী সরদার আলাফীর উদ্দেশ্যে বলল—

'সরদার আলাফী! মহারাজ তোমার পরামর্শ খুব তাড়াতাড়ি মেনে নেন। আচ্ছা তুমি কি এসব পরামর্শ মহারাজের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে করো, না তোমার শুভাকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বস্ততা আরো কারোর প্রতি?

'হঠাৎ তুমি একথা জিজ্ঞেস করছো কেন রাণী? মায়ারাণীকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন আলাফী। আমার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে?

হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে আমার মধ্যে সংশয় দেখা দেয়। কারণ তুমি মূলত একজন মুসলমান এবং আরব। তাছাড়া তুমিতো বলেই দিয়েছ, কিছুতেই তুমি আরব ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবে না। এতে আমার সন্দেহ হয় তুমি আড়ালে আবডালে আরবদেরই সহযোগিতা করছো আর মহারাজকে এমন পরামর্শ দিচ্ছো, যাতে আরব বাহিনীরই সুবিধা হয়।

তুমি কি এমন একটি পরামর্শের কথা বলতে পারবে?

তুমি মহারাজকে পরামর্শ দিয়েছো, নির্বিঘ্নে মুসলিম বাহিনীকে নদী পার হয়ে এপারে আসতে দিতে। মহারাজ তোমার এই পরামর্শ এজন্য মেনে নিয়েছেন যে, তিনি যদি আরব বাহিনীকে পরাজিত করেন তাহলে নদীর কারণে ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। একথা না বলে তুমি যদি এমন পরামর্শ দিতে আরব বাহিনীকে নদীপার হওয়ার সুযোগ দিয়ে যখন ওরা নদী পার হতে থাকবে তখন ওদের ওপর তীর ও বর্শার তুফান চালিয়ে দেবেন। তা কি ভালো হতো না?

রাণী! মহারাজ কোন বালক শিশু নন। তিনি নির্বোধ অবুঝ অদক্ষ নন। তিনি বিন কাসিমের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ। তিনি ভালো মন্দ সুবিধা অসুবিধা ভালো জানেন। এসব কথা থাক, আসলে তুমি কি বলতে চাও; সেকথা বলো?

তুমি তো বলতে চাচ্ছ, আমি প্রকৃতপক্ষে বিন কাসিমের শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমাদের সাথে থেকে মহারাজকে ধোকা দিচ্ছি।

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে একথাই বলতে চাই। আমি তোমাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মহারাজ' অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে মাকরানে আশ্রয় দিয়েছেন। না হয় এদেশে কোন মুসলমানের পক্ষে আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব ছিল না। আচ্ছা, তোমার সাথে দু'জন লোককে দেখেছিলাম, তন্মধ্যে একজনকে দেখছি, অপরজন কোথায় গেছে?

মায়া, মহারাজকে যে ধোঁকা তুমি দিয়েছ, সে কথা আমি জানি। তুমি একই সাথে মহারাজের বোন ও স্ত্রী। কিন্তু হৃদয়ের তাপ ও জ্বালা নিরসনের

জন্যে তুমি এক আরব নওজোয়ানকে বন্ধু বানিয়ে রেখেছো। তুমি জানতে চাইলে আমি তার নামও বলে দিতে পারি। তুমি আমার যে লোকের অনুপস্থিতির কথা জানতে চাচ্ছো দিনের বেলা কেন, অনেক সময় রাতের বেলায়ও সে আমার সাথে থাকে না।

আমি জানি সে তখন কোথায় থাকে' বলল মায়ারাণী।

তাহলে সে কথা বলো, সে এ মুহূর্তে কোথায়? উষ্মামাখা কণ্ঠে জানতে চাইলেন আলাফী।

আলাফী ঘোড়া থামিয়ে মায়ার চোখে চোখ রেখে বললেন, মায়া! আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা দূর করে দাও, তোমার সবচেয়ে গোপন কথা আমার অন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে।

আলাফীর ইঙ্গিতপূর্ণ এই হুমকিতে চুপ হয়ে গেল রাণী। আলাফী বললেন, আজ আমি তোমাকে আরেকটি রহস্য বলে দিচ্ছি, মহারাজ বিন কাসিমকে পরাজিত করতে পারবে না।

তুমিতো এটাই চাও!

না, এটা আমার চাওয়া নয়। এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী। আর সার্বিক পরিস্থিতিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, মহারাজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

✪ ✪ ✪

আলাফীর যে সঙ্গীর কথা মায়ারাণী জানতে চেয়েছিল, সে কিছু দূরে এক লোকের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অপর লোকটি ছিল বিন কাসিমের একজন গোয়েন্দা। আলাফীর সঙ্গী গোয়েন্দাকে বলছিল, রাজা দাহির যুদ্ধের কি পরিকল্পনা করেছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, আলাফীর পক্ষ থেকে যদি বিন কাসিমকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা না করা হতো তাহলেও বিন কাসিম দাহিরের জালে আটকা পড়ার মতো লোক ছিলেন না। দাহিরের অবস্থান থেকে চার মাইল দূরেই তিনি তাঁর সৈন্যদের অভিযান রুখে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি সবকিছু বুঝে শুনে ধীর ও বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি নতুন এই এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত হতে চাচ্ছিলেন। তাঁর ছড়িয়ে দেয়া গোয়েন্দারাও রাজার ঘরের খবর সংগ্রহ করে তাঁকে যথাসময়ে অবহিত করছিল। সেসময় বিন কাসিমের সেনাদলে ছিল

বারো হাজার অশ্বারোহী। রাজা দাহিরের ছেলে জয়সেনাকে পরাজিত করে ওর সৈন্যদের বহু ঘোড়া বিন কাসিমের যোদ্ধারা কব্জা করে নিয়েছিল। ফলে তাঁর বহু পদাতিক সৈন্যও তখন অশ্বারোহী সেনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আরবদের সাথে যেসব পদাতিক সৈন্য ছিল এদের অধিকাংশই ছিল স্থানীয়। বিজিত এলাকার লোকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে পদাতিক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

মুসলমানদের সদাচার ও তাদের বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে এসব স্থানীয় লোক বিন কাসিমের বাহিনীতে ভর্তি হয়েছিল। স্থানীয় সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। সম্মিলিত মুসলিম সৈন্যের মোকাবেলায় রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীতে পদাতিক সৈন্য সংখ্যাই ছিল ত্রিশ হাজার। বিন কাসিমের সেনাবাহিনীতে তীরন্দাজের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাদের মধ্যে একটি ইউনিট ছিল অগ্নিবাহী তীরন্দাজ।

বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের মধ্যভাগে অবস্থান নিয়ে বাকীদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিলেন। তাঁর সাথে রাখলেন সেনাপতি মিহরাব বিন সাবিতকে। ডান বাহুর দায়িত্ব দিলেন সেনাপতি জাহাস বিন জাফীর কাঁধে আর বাম বাহুর দায়িত্ব সেনাপতি যাকওয়ান বিন বকরের ওপর ন্যস্ত করলেন। রিজার্ভ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সেনাপতি আনাতা বিন হানযালা আর অগ্রগামী ইউনিটের দায়িত্ব ছিল আতা বিন মালেকের ওপর।

বিন কাসিম সবাইকে সর্বশেষ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পর ঘোষণা করলেন, আরব ভাইয়েরা! আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে মিহরাব বিন সাবিত। মিহরাবের মৃত্যু হলে সাঈদ হবে তোমাদের প্রধান সেনাপতি।

বিন কাসিম লক্ষ্য করলেন, রাজা দাহিরের সৈন্যরা ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত হয়ে বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। অবস্থা দৃষ্টে তিনি তার সৈন্যদের বেশি জায়গা জুড়ে না ছড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

কেন্দ্রীয় ও রক্ষণভাগের কমান্ড নিজের হাতে রেখে তিনি জানতে চেষ্টা করলেন রাজা দাহিরের বেশির ভাগ সৈন্য কোন অংশে। রাজা দাহিরের পরিকল্পনা ছিল তার রিজার্ভ সৈন্য দিয়ে সে মূল আঘাত হানবে আর বিক্ষিপ্ত সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদেরকে মোকাবেলায় ব্যস্ত রাখবে। সেই সাথে রাজা দাহির ভেবেছিল আরব বাহিনীকে হয়তো তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যাবে কিন্তু রাজার সৈন্যদের অনেক আগেই পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আরব বাহিনী এগিয়ে আসায় রাজার যুদ্ধ পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

বিন কাসিম আতা বিন হানযালার রিজার্ভ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা শত্রুবাহিনীর প্রধান ইউনিটের ওপর আক্রমণ চালাও।

সেনাপতি হানযালার সহযোদ্ধাদের আঘাত ছিল খুবই তীব্র। হিন্দু সৈন্যরা এই আত্মতুষ্টিতে ছিল তারা আরব সৈন্যদেরকে তাদের মর্জি মতো সুবিধাজনক স্থানে ফেলে আঘাত করবে। আর আরব সৈন্যদেরকে তাদের ইচ্ছামতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হয়রানী করে নাস্তানাবুদ করবে। রণাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাদের হাতে। কিন্তু যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে গেল। সেনাপতি আতা বিন হানযালার আক্রমণ হিন্দু সৈন্যরা দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলার চেষ্টা করল। তাদের বিশ্বাস ছিল রাজার অন্য বাহিনী তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে কিন্তু বিন কাসিম এমন নিপূণ কৌশল অবলম্বন করলেন যে, রাজার কোন ইউনিটই এদের সহযোগিতায় আসার সুযোগ পেল না। পিছনে ফিরে আসা ছাড়া রাজার এই সৈন্যদের জন্যে আর কোন পথ খোলা ছিল না। তারা পিছিয়ে আসতে শুরু করেছিল। বিন কাসিম যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। রাজার সৈন্যদেরকে পিছনে চলে যেতে দেখে তিনি সেনাপতিকে নির্দেশ পাঠালেন, তোমার সহযোদ্ধাদেরকে ওদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রাখো।

রাজার এই ইউনিটের সাথে প্রশিক্ষিত হাতিও ছিল। কিন্তু হাতিকে আরব সৈন্যরা আর মোটেও ভয় পাচ্ছিল না। কারণ হাতির বিরুদ্ধে আরব তীরন্দাজরা অগ্নিবাহী তীর ব্যবহার করছিল। তীরন্দাজরা হাতির চোখ লক্ষ্য করে অগ্নিবাহী তীর ছুড়তে শুরু করল। যেহেতু প্রশিক্ষিত হাতিগুলো ছিল প্রদক্ষিণরত এজন্য ওদের চোখে আঘাত করা সহজসাধ্য ছিল না। তবুও অগ্নিবাহী তীর হাতির গায়ের যে স্থানেই আঘাত করতো, হাতিগুলো ভঁড়কে গিয়ে তীব্র চিৎকার দিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালাতে শুরু করল।

✪ ✪ ✪

রণাঙ্গনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখেও বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে একত্রিত করার কোন চেষ্টাই করলো না রাজা দাহির। সে নিজে রণাঙ্গনের মূল ভূমিতেও প্রবেশ করল না। এ দিকে বিন কাসিমও রণক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে রাখলেন। তিনি আড়ালে থেকে তাঁর সৈন্যদেরকে আগে পিছনে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ফলে যুদ্ধ অনেকটাই ছোট ছোট সংঘর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। বেলা যতোই পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছিল উভয় পক্ষের যোদ্ধারা

সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের পরিবর্তে নিজেদেরকে পিছনে নিয়ে আসছিল। এভাবে প্রথম দিনের বেলা শেষে রাত নেমে এলো। উভয় বাহিনীর সৈন্যরা নিজ নিজ তাঁবুতে আশ্রয় নিল। রাতের বেলায় উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে পাহারা দেয়া ছাড়া কোন ধরনের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ঘটনা ঘটলো না।

রাজা দাহির মনে করেছিল, সে যেমন তার সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছে, বিন কাসিমও সৈন্যদের এভাবে ছড়িয়ে দেবেন। কিন্তু বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের এভাবে ছড়িয়ে দিলেন না। ইতিহাসের কনিষ্ঠতম এই ক্ষণজন্মা সেনাপতি ছড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাঁর সৈন্যদেরকে পরস্পর কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। প্রথমত প্রখর সামরিক দূরদর্শিতা দ্বিতীয়ত সরদার আলাফীর গোয়েন্দা তথ্যে তিনি রাজা দাহিরের পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

'না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। টানা সাত আট দিন এভাবে অনিষ্পন্ন যুদ্ধ চলার পর অধৈর্য্য হয়ে তার সামরিক কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে বলল দাহির। শত্রুরা সতর্ক হয়ে গেছে। এদিকে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। সেই সাথে ক্ষতি হচ্ছে আমার সৈন্য সংখ্যা। এখন আর বসে থাকা নয়, এখন আমি শত্রুদের হুমকি দেবো।

হ্যাঁ! মহারাজ! এখন সময় এসেছে ওদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে হুমকি ও উস্কানী দেয়ার। মুসলিম বাহিনী টানা যুদ্ধে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাজার কথায় সায় দিয়ে বলল এক সেনাপতি।

না, তোমার কথা ঠিক নয়। তোমাদের বড় ক্রটি হলো, কোন জিনিসকে তোমরা গভীর ভাবে তলিয়ে দেখো না। চোখ মেলে কোন জিনিসের ভিতরটা দেখতে চাও না। তোমাদের প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়নি। ক্লান্তও হয়নি। ওরা সতর্ক হয়ে গেছে। কিছুতেই ওরা আমাদের ফাঁদে পা দেবে না। উষ্মামাখা কণ্ঠে সেনাপতির উদ্দেশ্যে বলল রাজা।

সেই দিন রাতের ঘটনা। রাজা দাহির তার রাজকীয় তাঁবুতে দুই সুন্দরী রক্ষিতার সাথে ফুর্তি আর মদপান করছিল। এর আগে যুদ্ধ সম্পর্কে তার কমান্ডার ও সেনাপতিদের সে নির্দেশ দিল আগামীকাল মুখোমুখি লড়াই শুরু হবে।

হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ ভেসে এলো রাজার কানে। দেখতে দেখতে আওয়াজ আরো নিকটবর্তী হতে লাগল। রাজা প্রহরীকে ডেকে

বলল, কোথা থেকে অশ্বখুরের আওয়াজ আসছে? ইত্যবসরে একটি ঘোড়া এসে রাজার তাঁবুর সামনে থামল। প্রহরী রাজার নির্দেশ শুনে তাঁবু থেকে বের হচ্ছিল ঠিক সে সময় তাকে ঠেলে মায়ারাণী ভিতরে প্রবেশ করল। তার চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ। দ্রুতগতিতে তার তাঁবুতে প্রবেশ করা থেকেই বুঝা যাচ্ছিল কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কি হয়েছে রাণী? এ অসময়ে তুমি এখানে এলে? আসন ছেড়ে রাণীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল রাজা।

তাবুর মাঝামাঝি এসেই থেমে গেল রাণী। সে চোখের ইশারায় নর্তকীদের ইঙ্গিত করল। রাণীর ইঙ্গিতে নর্তকীদ্বয় তাঁবুর বাইরে চলে গেল। প্রহরী তো আগেই বাইরে চলে গিয়েছিল। রাণী রাজার কাছে গিয়ে তার দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে চেপে ধরল। তার শরীর কাঁপছে। কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্কিত কণ্ঠে রাণী বলল, মহারাজ! শুনেছি আগামীকাল থেকে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হবে। দুহাই লাগে, আপনি রণক্ষেত্রে যাবেন না। মহারাজ! আপনি পিছনে থেকে সৈন্যদের নির্দেশ দেবেন।

কি সব বলছো রাণী। কি হয়েছে তোমার? উষ্মামাখা কণ্ঠে বলল রাজা।

আমি যদি শুধু আপনার বিবি হতাম তা হলে হয়তো একথা অমন করে বলতাম না। আমি আপনার বোন। বোন হয়ে ভাইয়ের এমন না, না, এমনটি কখনো হতে পারে না। ধরা গলায় বাক্য শেষ করতে পারল না রাণী।

ওহ! রাণী, বুঝেছি! তুমি হয়তো কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়েছো। রাণীকে বুকের সাথে মিশিয়ে পিঠে হাত রেখে আদর করে বলল রাজা, এসো এটা পান করে নাও। মনটা ঠিক হয়ে যাবে। রাণীকে টেনে এনে তার দিকে শরাবের পেয়ালা উঠিয়ে দিতে দিতে বলল রাজা।

শরাবের পানপাত্রে ধাক্কা মারলো রাণী। ধাক্কায় রাজার হাত থেকে পানপাত্র ছিটকে গিয়ে পড়ল বিছানায়।

এসব মদ আমাকে খুশি করতে পারবে না মহারাজ! বলুন, আপনি রণাঙ্গনে যাবেন না...। আমি খুবই খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখেছি, আপনি পানিতে ডুবে যাচ্ছেন, আমি আপনাকে উঠাতে যাচ্ছি, জীবিত উদ্ধার করতে চাচ্ছি ঠিক এমন সময় আমাদের লোকেরাই তরবারী দিয়ে আপনার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। একথা বলে মায়ারাণী নীরব হয়ে গেল এবং ওপরের দিকে এভাবে চোখ বড় বড় করে তাকালো যেন কোন

ভয়ংকর ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করছে সে। দ্রুত বেগে বিছানার ওপর বসা দাহিরের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে রাজার দু'পা জড়িয়ে ধরে মায়ারাণী বলল, যাবেন না মহারাজ! কথা দিন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন না।

"আরে বোকা! আমি রণাঙ্গনে না গেলে আমার সৈন্যরা হতোদ্যম হয়ে পড়বে। মুসলিমরা যদি জানতে পারে, সিন্ধুরাজা রণাঙ্গনে আসেনি তাহলে ওরা আমাকে কাপুরুষ মনে করবে।" বলল রাজা দাহির। তুমি কি দেখনি রাণী, আরব বাহিনী কিভাবে আমার রাজ্য দখল করে এগিয়ে আসছে। পণ্ডিতেরা বলেছে, মুসলমানদের যে করেই হোক এখানে ধ্বংস করে দিতে হবে। এদের ধ্বংস করার দায়িত্ব দেবতারা আমার ওপর দিয়েছে।

এই পণ্ডিতেরাই তো আমার স্বপ্নের কথা শুনে বলেছে, যে করেই হোক মহারাজকে রণাঙ্গনে যাওয়া থেকে বিরত রাখো। তারা বলেছে, কাউকে পানিতে ডুবতে দেখা ভালো নয়, বলল রাণী।

রাজা দাহির মায়ারাণীকে সাথে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। নানা কথায় রাজা মায়াকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল কিন্তু তাতে রাণী আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে রাজা দাহির রাণীকে দুহাতে ধরে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে দুই সৈনিককে নির্দেশ দিলো, তোমরা মায়াকে রাওয়া দুর্গের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসো।

✪ ✪ ✪

৯৩ হিজরী সনের ৯ রমযান। রাজা দাহিরের সৈন্যরা ময়দানে রণপ্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সৈন্যদের সম্মুখ সারিতে জঙ্গী হাতি। সারিবদ্ধ হাতির পিছনে রাজা দাহিরের বিশেষ হাতি দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাজা দাহির রাজকীয় ভাবমূর্তি নিয়ে তার হাতির হাওদার ওপরে দাঁড়ানো। দাহিরের কাছেই তার ছেলে জয়সেনা একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। জঙ্গি হাতিগুলো মাতাল। প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করছে। হাতিগুলো অস্থিরভাবে দু'চার কদম এগুচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে। হাতিগুলোর অস্থিরতা দেখে মনে হচ্ছিল ওরাও যেন টের পেয়ে গেছে, তাদের সামনে অজেয় শত্রু। সব হাতির ওপরে রাজার তীরন্দাজ সৈন্য তীর ধনুক বর্শা বল্লম নিয়ে রণসাজে প্রস্তুত।

বিন কাসিম তার সৈন্যদেরকে রাজার সৈন্যদের মুখোমুখি নিয়ে দাঁড় করালেন। তিনি সেনাপতি আবু মাহের হামদানীর ইউনিটকে সর্বাগ্রে হাতির

মুখোমুখি দাঁড় করালেন। হামদানীর ইউনিটের সব যোদ্ধা ছিল আরব সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ লড়াকু ও নির্ভিক। তারেক বিন কাব, মাসউদ কালবী, সালমান আবদী, যিয়াদ বিন জালিদীকে বিন কাসিম তাঁর সাথে রাখলেন।

তাঁর সৈন্যদের ডান বাহুর কমান্ডার নিযুক্ত করলেন যাকওয়ান বিন বকরীকে। আর রিজার্ভ সৈন্যদেরকে নাবাতা বিন হানযালার অধীনে ন্যস্ত করলেন। যুদ্ধ শুরুর আগে বাশার বিন আতিয়া, মুহাম্মদ বিন যিয়াদ মুসআব বিন আব্দুর রহমান এবং খোরম বিন উরওয়া এই চারজনকে ডেকে পাঠালেন। এই চারজন ছিল অস্বাভাবিক পারদর্শিতা ও বীরত্বের অধিকারী। তাদের উদ্দেশ্যে বিন কাসিম বললেন–

"বন্ধুগণ! তোমাদের ওপর আমি এমন দায়িত্ব দিচ্ছি, যার প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তোমাদেরকে একাজের যোগ্য প্রতিদান দেবেন। কেননা তোমরা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বেরিয়েছ।"

আমাদের কি করতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে তাই বলুন, সম্মানীত সেনাপতি! বলল এদের একজন! আল্লাহর কসম! আমরা কোন ধরনের প্রতিদান অভিবাদনের তোয়াক্কা না করে আপনার নির্দেশ পালনে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।

রাজা দাহির হবে তোমাদের শিকার তোমরা তার হাতিকে ঘিরে ফেলবে। হাতিকে এমন আঘাত করবে যে ওটি পড়ে যেতে বাধ্য হয়। দাহিরকে জীবিত পাকড়াও করতে চেষ্টা করবে। জীবিত পাকড়াও করা সম্ভব না হলে ওর অঙ্গ কেটে নিয়ে আসবে। সে বহু নিরপরাধ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আরবকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে বাধ্য করেছে, ওকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

ঠিক আছে, আপনার নির্দেশ পালন করা হবে সেনাপতি! ইনশাআল্লাহ আমরা আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব।

বিন কাসিম আবার তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে আরব বন্ধুরা! আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার স্থলে মিহরাব বিন সাবিত প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে, সেও যদি শাহাদতবরণ করে তাহলে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে সাঈদ।

✪ ✪ ✪

যুদ্ধ শুরুর আগমুহূর্তে বিন কাসিমের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করল। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, রাজা দাহিরের হাতি সম্মুখ থেকে পিছনে সরে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল জায়গা বদল করছে রাজা, কিন্তু পরক্ষণে দেখা গেল শুধু জায়গা বদল নয় একেবারে সকল সৈন্যের পিছনে অবস্থান নিল রাজার হাতি। সেই সাথে হিন্দু বাহিনীর সম্মুখ ভাগের হাতির সারিকেও পিছনে সরিয়ে নিল দাহির।

বিন কাসিম কিছুটা আশা দূরাশার মধ্যেই সেনাপতি মেহরাব বিন সাবিতকে নির্দেশ দিলেন, বিন সাবিত এগিয়ে যাও! আল্লাহর নাম নিয়ে হামলা কর।

নির্দেশ পাওয়া মাত্র মিহরাবের অশ্বারোহী ইউনিটের যোদ্ধারা উর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটালো। অপর দিকে দাহিরের সৈন্যদল থেকে একটি অশ্বারোহী অংশ এগিয়ে এসে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো। শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। অবস্থা এই হলো যে, লড়াইয়ের শুরুতেই সেনাপতি মেহরাব শাহাদাত বরণ করলেন। বিন কাসিম অগ্নিবাহী তীরন্দাজদেরকে অগ্রসর হয়ে হাতিগুলোকে অগ্নিবাহী তীরের শিকারে পরিণত করার নির্দেশ দিলেন কিন্তু ততোক্ষণে রাজা দাহির হস্তিবাহিনীকে আরো পিছনে সরিয়ে নিয়েছে। রাজা দাহির হয়তো চূড়ান্ত আঘাতের জন্যে হস্তিবাহিনীকে সংরক্ষিত রাখার জন্য পিছিয়ে নিয়েগেছে।

মেহরাবের শাহাদাতের পর তার ইউনিটকে পিছনে নিয়ে এসে সেনাপতি সাঈদের ইউনিটকে আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হলো। আবারো শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। রাজা দাহির খুবই সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করছিল। রাজা আবারো একটি অশ্বারোহী ইউনিটকে এগিয়ে দিয়ে মোকাবেলার নির্দেশ দিল। এমতাবস্থায় বিন কাসিম সেনাপতি আতা বিন মালিকের ইউনিটকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। আতার ইউনিট ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পলকের মধ্যে ওরা এগিয়ে গেল। ফলে রাজার সৈন্যরা মালিকের ইউনিটকে কাবু করতে পারল না।

রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বর্ণনায় সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য তারিখে মাসুমীতে লেখা হয়েছে, রাজা দাহির প্রত্যক্ষ করছিল তার বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় নগন্যসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের মধ্যে কোন ধরনের ক্লান্তির ছাপ নেই। বিশাল হস্তিবাহিনী চোখের সামনে থাকার পরও ওদের মধ্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা যায় না।

ওরা যখন হামলা করে তখন তাদের তকবীর ধ্বনীতে আকাশ কেঁপে ওঠে, অস্বাভাবিক প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বাস মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণে।

রাজা দাহির প্রচণ্ড মোকাবেলায় তার সৈন্যদেরকে পিছনে সরে আসার নির্দেশ দিল, আরব সৈন্যরাও ওদের পিছনে তাড়িয়ে নিতে শুরু করল। বিন কাসিম লক্ষ করলেন, হঠাৎ করে সৈন্যদের পিছিয়ে নেয়ার মধ্যে রাজা দাহিরের কূটচাল রয়েছে। আবেগ তাড়িত হয়ে মুসলিম যোদ্ধারা যখন ওদেরকে তাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অগ্রসরমান ইউনিট মূল বাহিনী থেকে, তখন রাজার বাহিনী এদের ঘেরাও করে নিঃশেষ করে ফেলবে। অবস্থা আঁচ করে বিন কাসিম তাঁর অগ্রসরমান ইউনিটকে শত্রুদের তাড়া না করে পিছনে সরে আসার নির্দেশ দিলেন।

এপর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে কোন লড়াই ছিল না, তবে রণাঙ্গন হিন্দু সৈন্যদের মরদেহে ভরে গিয়েছিল। আহত সৈন্যরা আর্তচিৎকার করছিল। আহতদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আবার পড়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় উভয় দলের দু'তিনজন করে সৈনিক দৌড়ে রণাঙ্গনে গিয়ে আহত সৈন্যদের তুলে নিয়ে আসছিল।

আহত সৈন্যদের তদারকি ও তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিন কাসিম একটি ভিন্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের হাতে থাকতো পানির পাত্র এবং জরুরী ঔষুধপত্র। এই ইউনিট গঠন করা হয়েছিল যারা কোন না কোন কারণে যুদ্ধের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছিল অথবা স্বভাবতই যারা ছিল সেবা মানসিকতা সম্পন্ন এবং চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শী। বিন কাসিমের চিকিৎসা ও সেবা ইউনিটের সদস্যরা পানির পাত্র নিয়ে রণাঙ্গনে আহতদের চেহারায় পানির ঝাপটা দিয়ে তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনতো এবং আহতদের পানি পান করাতো।

হঠাৎ স্বেচ্ছাসেবকদের একজনের প্রতি বিন কাসিমের দৃষ্টি পড়ল। লোকটি তাঁর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বিন কাসিমের মনে হলো পুরুষের পোশাক পরিহিত হলেও লোকটি মনে হয় পুরুষ নয় নারী। নারী না হলেও একেবারে নাদুস নুদুস কিশোর। বিন কাসিম লোকটিকে কাছে ডাকলেন এবং ঘোড়ার পিঠে বসেই গভীর ভাবে লোকটির প্রতি তাকালেন।

আমার দৃষ্টি যদি আমাকে বিভ্রান্ত না করে থাকে তবে আমার মনে হয় তুমি পুরুষ না-নারী, বললেন বিন কাসিম।

হ্যাঁ, সাকিফ গোত্রের কোন চোখ কখনো প্রতারণার শিকার হয় না বিন কাসিম! আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি নারী। শুধু আমি একা নই, আমার মতো আরো কয়েকজন নারী এখানে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে কাজ করছে।

তুমি কি স্বামীর সাথে এসেছ? তোমার ভাইও হয়তো তোমার সাথেই যুদ্ধে এসেছে? পুরুষের বেশধারী সেবিকাকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

বিন কাসিম! বলল মহিলা। মুসলিম বাহিনীতে যুদ্ধরত সবাই আমার ভাই। আমি স্বামীর সাথে এসেছি। আর কোন কথা না বলেই মহিলা তার কাজে চলে গেল। সেই দিনের যুদ্ধে আহতরা ছাড়া আর কোন যোদ্ধা পানি পান করত না। কারণ রোযার মাস হওয়ায় যুদ্ধরত হলেও তাদের কেউই রোযা ত্যাগ করত না।

অবস্থা এমনই জটিল হয়ে গেল যে, বিন কাসিমের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ হলো না, নারীদেরকে রণাঙ্গনে থাকার অনুমতি দেবেন কি-না। কারণ ইত্যবসরে রাজা দাহির তার হস্তিবাহিনীকে আক্রমনের নির্দেশ দিয়ে দিছে। জঙ্গি হাতিগুলো মাতাল অবস্থায় বিকট চিৎকার দিয়ে এগিয়ে আসছিল। হাতির পিঠে শত্রুসেনারা তীর বর্শা ও বল্লম নিয়ে আঘাতের জন্য উদ্যত।

এমতাবস্থায় বিন কাসিমের ইঙ্গিতে সেনাপতি সাঈদ ও আতার ইউনিটের যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হওয়াটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। কয়েকটি ছোট দল মিলে একেকটি হাতিকে ঘেরাও করা ছিল তাদের দায়িত্ব। অশ্বারোহীরা হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের পিছন থেকে অগ্নিবাহী তীর নিক্ষেপকারীরা হাতিকে উদ্দেশ্য করে অগ্নিবাহী তীর ছুড়তে শুরু করল। শত্রুদের জঙ্গি হাতিগুলোকে অস্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে অগ্নিবাহী তীর ছিল কার্যকর হাতিয়ার।

হামলা শুরুর সাথে সাথে একটি অগ্নিবাহী তীর এক হাতির পিঠে দাঁড়ানো বল্লমধারী শত্রুসেনার গায়ে আঘাত হানল। সাথে সাথে শত্রুসেনার গায়ে আগুন ধরে গেল। জ্বলন্ত আগুনে সৈন্যটি হাতির হাওদাতে চিৎকার ও লাফালাফি শুরু করলে ওর এক সাথীর গায়েও আগুন ধরে গেল। আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে উভয় সৈনিক হাতির হাওদা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ল। নীচে পড়ে নিজেদের সামলে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার আগেই মুসলিম যোদ্ধাদের ধাবমান ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে গেল।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে দিবাকর দিন শেষে তলিয়ে গেল। মাহুতরা তাদের হাতিগুলোকে তখন পিছিয়ে নিতে শুরু করল। তখনকার দিনে দিন শেষে যুদ্ধ

নিষ্পন্ন থাকলেও লড়াই বন্ধ করে দেয়া হতো। রীতি অনুযায়ী হস্তিবাহিনী হিন্দু শিবিরে ফিরে গেল আর অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিম শিবিরে প্রত্যাবর্তন করল। সেদিন তিন চারটি হাতি মারাত্মক আহত হলো। আহত হাতিগুলো নিজ বাহিনীর সৈন্যদের জন্যেই মৃত্যুদূতে পরিণত হলো। বহু সৈন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেল। অবশেষে রাতের অন্ধকার রণাঙ্গনকে কালো পর্দায় ঢেকে দিল। বন্ধ হয়ে গেল মোকাবেলা।

✪ ✪ ✪

পর দিন ছিল ৯৩ হিজরী সনের ১০ রমযান। বৃহস্পতিবার। মহাভারতের ইতিহাসে সেই দিনটি সোনালী হরফে লিখে রাখার মতো দিন। সেদিন শুরু হয়েছিল ভারতের মাটিতে শিরক ও তৌহিদের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই। রাতে মুসলিম শিবিরে কোন যোদ্ধার পক্ষে সামান্য আরাম করাও সম্ভব হয়নি। সবাইকে বলে দেয়া হলো আগামীকাল হবে চূড়ান্ত লড়াই। কাজেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। তোমরা কি দেখনি, দাহির দূরে হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের তামাশা দেখছিল? সেনা-কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম। দাহির পর্যবেক্ষণ করছিল, সম্মুখ সমরে আমরা কিভাবে যুদ্ধ করি, লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের কতটুকু আছে। শেষ মুহূর্তে দাহির হস্তিবাহিনী দিয়ে আঘাত হেনেছিল, সে দেখে নিতে চেয়েছিল, কি ভাবে আমরা হাতির মোকাবেলা করি। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সে রমযান মাস পর্যন্ত এজন্য অপেক্ষা করেছে। কারণ রমযান মাসে আমরা দিনের বেলায় রোযা রাখি, পানাহার করি না। ফলে লড়াই করার মতো শক্তি আমাদের থাকবে না...। দেখবে আগামীকালের রণাঙ্গনের পরিস্থিতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সেহরীর সময়ই বিন কাসিমের সব যোদ্ধারা পানাহার পর্ব সেরে নিল। আহত কোন যোদ্ধাকে তারা রণাঙ্গনের ত্রিসীমায় যেতে দিলো না। সবাইকে রণাঙ্গন থেকে তুলে এনে শিবিরের চিকিৎসা ইউনিটে রেখে দিল। সেখানে যুদ্ধে আসা মহিলারা তাদের সেবাশুশ্রূষা করছিল।

এদিকে বিন কাসিমের কাছে একের পর এক খবর পাঠাচ্ছিল তাঁর গোয়েন্দারা, কখন শত্রুসেনারা কি করছে।

রাজা দাহির তার কমান্ডারদের সন্ধ্যাবেলায়ই বলে দিলো আগামীকালই হবে শেষ লড়াই। আগামী কালই হবে বিন কাসিমের জীবনের শেষ দিন। বিন কাসিম বাহিনীর যে সৈনিক বেঁচে থাকবে তার বাকী জীবন দাহিরের গোলামী করেই কাটাতে হবে। তবে সেই গোলামী হবে খুবই ভয়ঙ্কর, কষ্টদায়ক।

আমার সৈন্যদের মধ্যে যে বিন কাসিমের খণ্ডিত মাথা এনে আমার হাতে দেবে সে হবে সৌভাগ্যবান। তাকে আমার রাজ দরবারে বসার জায়গা দেবো এবং চারটি গ্রামের জমিদারী দেবো। সে সেখানে দুর্গ তৈরি করে নিজের মতো করে শাসন কাজ চালাতে পারবে।

রাতের দ্বি-প্রহরে মায়ারাণী আবার রাজা দাহিরের তাঁবুতে চলে এলো। রাণীর চেহারা ছিল অনেকটাই প্রসন্ন কারণ আজকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে দূরে থেকেছিল। রাণী আজও এসে বলছিল, আগামীকালও আপনি যুদ্ধে যাবেন না। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ করাবেন। রাজা দাহির মায়াকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল, ঠিক আছে, আমি তাই করব।

পরদিন সকাল বেলায় সিন্ধুতীরের পললভূমি নতুন দৃশ্য নিয়ে হাজির হলো। রাজা দাহিরের গোটা সেনাবাহিনী রণপ্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। রাজা দাহির সকল সৈন্যের মাঝখানে তার রাজকীয় হাতির ওপর সওয়ার। পাশে ছিল দাহিরের পুত্র জয়সেনা। সেদিন রাজা দাহির পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে রণাঙ্গনে আভির্ভূত হলো। দাহিরের ডানে-বামে অগ্রপশ্চাতে দশ হাজার বর্মপরিহিত অশ্বারাহী। এই দশ হাজার অশ্বারোহীই আরব বাহিনীর সাথে মোকাবেলার জন্যে যথেষ্ট, তাছাড়াও রাজা দাহিরের বাহিনীতে ছিল ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য। রণাঙ্গনে খোদ রাজাকে পেয়ে দাহিরের সৈন্যরা ছিল খুবই উজ্জীবিত।

রাজা দাহিরের সাথে তার হাওদায় দুই সুন্দরী তরুণীও ছিল। তাছাড়া ছিল কয়েকজন বল্লম ও বর্শাধারী সৈন্য এবং বাঁকানো তীর নিক্ষেপকারী তীরন্দাজ। দাহিরের হাতির হাওদাতে আরো ছিল পানপাত্র ভর্তি শরাব। রাজার হাতির দু'পাশে ছিল কয়েকজন অশ্বোরোহী পুরোহিত।

বিন কাসিম রাজা দাহিরের সৈন্যদের অবস্থান ও রণপ্রস্তুতি দেখে তাঁর সৈন্যদের কর্মপরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করলেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত দূরদর্শিতায় বিন কাসিম শত্রুপক্ষের অভিসন্ধি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর তীরন্দাজ সৈন্যদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেনিলেন। সম্ভবত তিনি এটা করেছিলেন শত্রু বাহিনীর বিস্তৃতি তার বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি ছিল বলে। প্রতিটি সৈনিককে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। প্রত্যেক তীরন্দাজ নিজ নিজ ধনুকে তীর প্রবেশ করিয়ে নিল।

বিন কাসিম তাঁর বাহিনীকে পাঁচটি গোত্রীয় সারিতে ভাগ করলেন। এক সারিতে রাখলেন আলাফী গোত্রের যোদ্ধাদের। আরেক সারিতে দাঁড়

করালেন আমীন গোত্রের লোকদেরকে। তৃতীয় সারিতে দাঁড় করালেন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের যোদ্ধাদের, চতুর্থ সারিতে রাখলেন আবুল কায়েসের নেতৃত্বাধীন তাঁর গোত্রীয় মুজাহিদদেরকে আর পঞ্চম সারিতে দাঁড় করালেন ইবাদী গোত্রের লোকদেরকে।

সারিবদ্ধভাবে সবাইকে দাঁড় করানোর পর বিন কাসিম তাঁর ঘোড়াকে সৈন্যদের সামনে দিয়ে এপ্রান্ত ওপ্রান্ত দৌড়ালেন। গোটা সৈন্যদের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করে এসে তিনি সকল সৈন্যদের সামনে মাঝখানে তাঁর ঘোড়া থামালেন।

চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সর্বকালের সর্বকনিষ্ট এই মহানায়ক যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেছিলেন তা হুবহু অক্ষরে অক্ষরে আজো ইতিহাসের পাতায় অম্লান। বিন কাসিম বললেন–

"হে আরব মায়ের সন্তানেরা! মাটির তৈরি মূর্তি পূজারী সৈন্যদেরকে তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছো। এরা শুধু তোমাদের অগ্রাভিযান রোধ করতে আসেনি, এরা আজ আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করার সংকল্প নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। এই মুশরিক বেঈমানেরা শুধু তাদের ধর্মরক্ষার জন্যেই যুদ্ধ করতে আসেনি, এরা এসেছে আমাদের আক্রমণ থেকে তাদের সহায়সম্পদ পরিবার পরিজনকে রক্ষা করতে। এরা তাদের দেবালয়, সম্পদের খাযানা রক্ষার জন্যে জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞা করে এসেছে। এদের হৃদয়ে এসব দেবালয় ও সম্পদের খাযানার প্রতি ভালোবাসা এতো প্রকট যে এগুলো রক্ষার জন্যে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে তারা প্রস্তুত। এরা আজ ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা করবে। এদের আক্রমণ হবে খুবই ভয়াবহ। তোমাদেরকে প্রচণ্ড মনোবল ও দৃঢ়তা নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। তোমরা আল্লাহর পথে শাহাদাতের আশা নিয়ে আপন মাতৃভূমি ছেড়ে হিন্দুস্তানে এসেছো। বাতিলের সাথে আজ হক এর সংঘাত। মহান আল্লাহ সত্যের পক্ষে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের মদদ করবেন। সবসময় আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে থাকো। ভয়, শঙ্কা, দ্বিধা সংকোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। মনে রেখো, আমাদের তরবারীগুলো কাফেরদের রক্তপানের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে। ওরা আজ আমাদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবে।

তোমারা যদি পার্থিব স্বার্থ, যশখ্যাতি ও সম্পদের দিকে তাকাও, তাহলে এগুলোও এই বেঈমানদের কাছ থেকে তোমরা ছিনিয়ে নিতে পারবে। বিজয়ী হলে এই জগতেও তোমরা ঢের সম্পদের অধিকারী হবে আর আখেরাতে আল্লাহ

তাআলা তোমাদেরকে অকল্পনীয় প্রাচুর্য সম্মানে ভূষিত করবেন। মনে রাখবে, যাকে যেখানে দাঁড় করানো হয়েছে এবং তৎপরতা চালানোর যে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে একচুলও এদিক সেদিক হবে না। এমন যেন না হয় বিশৃঙ্খল হয়ে ডান প্রান্তের লোকেরা বাম বাহুতে আর বাম প্রান্তের লোকেরা ডান প্রান্তে চলে এসেছো এবং মাঝের লোকেরা সামনে সামনের লোকেরা মাঝে চলে গেছো। কারো সাহায্যের প্রয়োজন ছাড়া কেউ আপন জায়গা বদল করবে না।

খুব মনে রাখবে, সৎ ও নেক মানুষেরই বিজয় হয়ে থাকে। যাদের উদ্দেশ্য সৎ আল্লাহর কাছে তারা প্রিয়। লড়াই চলাকালেও মুখে কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত করতে থাকবে এবং সবসময় 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র যিকির চালু রাখবে।

বিন কাসিমের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বনীবকর গোত্র ও বনী তামীম গোত্রের দু'জন করে লোক এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

আল্লাহর কসম! তোমরা এ মুহূর্তে কোন অভিযোগ নিয়ে আসোনি তো? এ সময় অভিযোগ শোনার মুহূর্ত নয়, বললেন বিন কাসিম।

"সম্মানিত সেনাপতি! আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় ও মদদ দিন।" বলল আগন্তুকদের একজন। আমরা সবার আগে আমাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্যে আপনার কাছে নিজেদের পেশ করছি। কাফের বাহিনীকে দেখুন, ভয়ানক আতঙ্ক হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ানো। আপনি তাকিয়ে দেখুন, ওদের হাতিয়ার কতো উন্নত। আপনি তাকিয়ে দেখুন, পাহাড়ের মতো বিশালদেহী জঙ্গি হাতি নিয়ে ওরা আমাদের মুখোমুখি। ওদের চেহারা দেখুন! নিজেদের উন্নত সমরায়োজন অস্ত্রশস্ত্র জঙ্গি হাতি এবং বর্ম বল্লমে সজ্জিত হয়ে ওরা বেশ আত্মবিশ্বাসী উৎফুল্ল। আপনি কি আমার গোত্রের লোকদেরকে সর্বাগ্রে আক্রমণ করার অনুমতি দেবেন?

আল্লাহর কসম! হে বনী তামীম ও বনী বকরের যোদ্ধারা। আমি তোমাদের শ্রদ্ধা করি। আমি বিশ্বাস করি তোমরা প্রত্যেকেই জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ করবে। তিনি আবার সব সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আরব যোদ্ধারা! বনি তামীম ও বনি বকর সবার আগে আক্রমনের জন্যে উদ্বেলিত। আমি বিশ্বাস করি তোমরা প্রত্যেকেই শত্রুদের জন্যে মৃত্যুদূতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব।

এ সময় বনী তামীম ও বনী বকর গোত্রের যোদ্ধারা একযোগে এমন জোরে তকবীর ধ্বনী করল যে, আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। তাদের তকবীর শেষ হতে না হতেই গোটা মুসলিম সৈন্যরা এমন উচ্চ আওয়াজে তকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করল যে, আরব সৈন্যদের মধ্যে যাদের মনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল তাদের দুর্বলতা প্রচণ্ড উত্তাপে দূর হয়ে গেল। আরব সৈন্যদের ঘোড়াগুলো হ্রেষারব এবং পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল যেন ওগুলোও লড়াইয়ের জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। বিন কাসিম উদ্দীপ্ত সৈন্যদেরকে দু'হাত প্রসারিত করে থামালেন।

তিনি সৈন্যদের উদ্দেশে আবারো বললেন, হে আরব যোদ্ধারা! আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ মুসলমানদের দু'টি নেয়ামত দিয়েছেন। প্রথম নেয়ামত আল্লাহর রসূল আর দ্বিতীয় নেয়ামত বান্দাদের ইস্তেগফার কবুল করা। দৃঢ় থেকো, মনের শক্তি অটুট রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেই দুশমনদের ওপর বিজয়ী করবেন।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম ঘোড়া হাঁকিয়ে দুই সৈন্যদলের মাঝামাঝি গিয়ে থামলেন এবং উচ্চ আওয়াজে বললেন, সেনাপতি সুলায়মান ও সেনাপতি আবু ফিদা! তোমরা চল্লিশজন করে যোদ্ধা নিয়ে শত্রু সেনাদের মোকাবেলার আহ্বান করো।

এটা ছিল তখনকার দিনের যুদ্ধের রীতি। মূলযুদ্ধ শুরুর আগে উভয় পক্ষের কিছুসংখ্যক যোদ্ধার মোকাবেলা হতো। আবু ফিদা ছিলেন সদ্য আযাদকৃত গোলাম। তিনি সেনাপতি সুলায়মানের নেতৃত্বে চল্লিশ জন সৈন্য নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুসেনাদের অবস্থান থেকে কিছু দূরত্বে দাঁড়িয়ে শত্রু সেনাদেরকে মোকাবেলার জন্যে আহবান জানালেন।

সেনাপতি সুলায়মানের আহ্বানে রাজা দাহির কয়েকজন ঠাকুরকে কিছুসংখ্যক সৈন্য দিয়ে মোকাবেলার নির্দেশ দিল। রাজা দাহিরের সৈন্যরা মূল সৈন্যদল থেকে কিছুটা এগিয়ে এলেই আবু ফিদা তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড আওয়াজে তকবীর ধ্বনী দিয়ে রণাঙ্গন কাঁপিয়ে দিল। আবু ফিদা শত্রুসেনাদের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে ঘুরে ওদের পিছনে চলে গেল। একদিকে সুলায়মান আর অপর দিকে আবু ফিদা এমন তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল যে, শত্রুবাহিনীর যে সৈন্যই তাদের ধারে

কাছে আসছিল ধরাশায়ী হয়ে তড়পাতে শুরু করল এবং দ্বিখণ্ডিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল।

মুসলিম মুজাহিদরা এতোটাই প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ করল যে, হিন্দু সৈন্যরা পর্যুদস্ত হয়ে গেল। আর বাকীরা পালিয়ে তাদের বাহিনীর দিকে চলে গেল।

এদিকে আবু ফিদা উন্মুক্ত ময়দানে এপাশে ওপাশে ঘোড়া হাঁকিয়ে শত্রুদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিল। এবার আরো কয়েকজন ঠাকুরের নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদলকে রাজা দাহির মোকাবেলা করার জন্যে পাঠালো। আবু ফিদা তখন আক্ষরিক অর্থেই এক আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। সে দাহিরের যোদ্ধাদেরকে রণাঙ্গনের ঠিক জায়গায় পৌঁছার অবকাশই দেয়নি। আবু ফিদার এই দুঃসাহসী মোকাবেলা তার সহযোদ্ধাদেরকেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করল। সেই সাথে নাবাতা ও তার সহযোদ্ধারাও আবু ফিদার সাহসীকতায় উজ্জীবিত হলো। ফলে রাজা দাহিরের এই সেনাদলেরও পূর্বের সেনাদলের পরিণতি বরণ করতে হলো। এবার রাজা তৃতীয় সেনাদল পাঠাল। এ দলে আগের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। মুসলিম যোদ্ধারা তৃতীয় শত্রু দলকেও পূর্ববর্তী দুই দলের মতো প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত করল। এই দলের অধিকাংশ শত্রুসেনা আহত বা নিহত হল এবং যারা অক্ষত ছিল তারা পালিয়ে মূল সৈন্যদের কাছে আশ্রয় নিল।

নাবাতা ও আবু ফিদার ছোট্ট দু'টি ইউনিটের মরণপণ আক্রমণ এবং শত্রু বাহিনীর বিপর্যয়ে মুসলিম শিবির হর্ষধ্বনী ও তকবীরে মুখরিত হয়ে উঠল। মুসলিম সৈন্যদের গগনবিদারী তকবীর ধ্বনীতে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। পরপর তিনটি সেনাদলের বিপর্যয় হিন্দু সৈন্যদের প্রভাবিত করল। যুদ্ধের ব্যাপারে রাজার কপালে ভাঁজ পড়ল, কারণ আবুফিদা শত্রুসেনাদের বিতারিত ও কচুকাটা করে শত্রু শিবিরের কাছাকাছি পর্যন্ত ঘোড়া হাঁকিয়ে শত্রুদেরকে মোকাবেলার জন্যে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছিল। আবু ফিদা বলছিল, "সাহস থাকে তো সামনে এসো না ভূতপূজারীরা! এসো না তোমাদের এই মৃত ভাইদের মরদেহগুলো তুলে নিতে? এসো না, এসো, সাহস করো! অন্তত এদের ঘোড়াগুলো এসে নিয়ে যাও... ।"

রাজা দাহিরের, আহত ও নিহত সৈন্যদের ঘোড়াগুলো রণাঙ্গন জুড়ে দিগবিদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে পাকড়াও করার

জন্যে বিন কাসিম কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন। শত্রুবাহিনীর বেশকিছু ঘোড়া মুসলমানরা পাকড়াও করে পিছনে পাঠিয়ে দিল।

সিন্ধু মাতার সন্তানেরা! এই দুশমনদেরকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে কেটে ফেল। এতোক্ষণ আমি ওদের নিয়ে খেলা করছিলাম ওদের একটু ছাড় দিয়েছিলাম, তোমরা ওদের বাহাদুরী ধূলায় মিশিয়ে দাও। হিন্দু সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করল দাহির।

রাজা দাহিরের কাছে এতো বেশি সৈন্য ছিল যে, ইচ্ছা করলে দু'প্রান্তের সৈন্যদেরকে আরো ছড়িয়ে দিয়ে সে মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করে নিতে পারতো। রাজার নির্দেশের সাথে সাথে তার দু'প্রান্তের সৈন্য আরো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল এবং অগ্রভাগের সৈন্যরা বিন কাসিমের সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করল। বিন কাসিম তাঁর দু'প্রান্তের সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের দুই বাহুকে এতটুকু ছড়িয়ে দাও যাতে শত্রু সৈন্যরা তোমাদের নাগাল না পায়।

রাজা দাহিরের সৈন্যদের আক্রমণ ছিল প্রচণ্ড। বহু জায়গা নিয়ে রাজা দাহিরের সৈন্যরা যুদ্ধের সূচনা করল। দাহির তার বিপুল সৈন্যসংখ্যা ও জঙ্গি হাতির শক্তির ওপর আস্থাবান ছিল। রাজা মনে করেছিল এতো বিপুল সৈন্যের পক্ষে ক্ষুদ্র এই বাহিনীকে ধূলায় মিশিয়ে দেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। ফলে সে কোন রণকৌশলের আশ্রয় না নিয়ে সোজা আক্রমণের নির্দেশ দিল। কিন্তু বিপুল শক্তির প্রতিপক্ষ থাকার পরও বিন কাসিম সব সময় তাঁর মেজাজকে স্থির রাখলেন। তিনি সর্বোত্তম রণকৌশল অবলম্বন করে এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আরব যোদ্ধারা! বেঈমান সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে শৃঙ্খলা নেই। তোমরা ওদের ধরে ধরে হত্যা করো।"

সেনাপতির চিৎকার শুনে মুসলিম যোদ্ধারা আরো উজ্জীবিত হলো, তারা নিজেদের শৃঙ্খলা বজায় রেখে মোকাবেলা করতে শুরু করল। মুসলিম সেনাপতিরা সৈন্যদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রতি কড়া নজর রাখলেন। দু'প্রান্তের দুই বাহুর সেনাপতিরা তাদের বাহুকে এতোটাই বিস্তৃত করে দিলেন যে, হিন্দু সৈন্যরা তাদের নাগাল পেল না। দু'প্রান্তের বিস্তৃতির পর উভয়প্রান্তের যোদ্ধারা শত্রুদের ওপর হামলে পড়ল।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা দাহির অনেকটা বেপরোয়া ভাবেই আক্রমণের নির্দেশ দিল। ফলে দাহিরের পদাতিক

ও অশ্বারোহী উভয় সৈন্য মুসলমানদের আঘাতে ধরাশায়ী হতে লাগল। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে রাজা দাহির জঙ্গি হাতিগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছিল না, কারণ বিশৃঙ্খলার কারণে তার হাতির সামনে তার অশ্বারোহী সৈন্যরা এসে বার বার বাধা সৃষ্টি করছিল।

এক পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন হলো যে, সুশৃঙ্খল মুসলিম যোদ্ধাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে দাহিরের বিশৃঙ্খল সৈন্যরা পিছিয়ে আসতে শুরু করল। এই দৃশ্য ছিল দাহিরের জন্য অসহ্যকর। রাজা দাহির ছিল তার বাহিনীর পিছনে রিজার্ভ বাহিনী পরিবেষ্টিত। চার হাজার সৈন্যের দু'টি অশ্বারোহী ইউনিটকে রিজার্ভ রেখেছিল দাহির। রিজার্ভ বাহিনী থেকে আট'শ নির্বাচিত সৈন্য নিয়ে রাজা দাহির মূল রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল। দাহিরের রিজার্ভ বাহিনীর প্রতিটি যোদ্ধাই ছিল বর্মধারী। এরা আধুনিক বর্শা ও তরবারী দিয়ে সজ্জিত। সেই সাথে আক্রমণ প্রতিহত করার মতো মজবুত ঢাল ছিল প্রত্যেকের সাথে। রাজা দাহির তার বিশেষ সাদা হাতির ওপর সওয়ার। হাতে অস্বাভাবিক ধরনের ধনুক। যা থেকে দুপাশ ধারালো ঘূর্ণিয়মান তীর নিক্ষেপ করছিল রাজা। এই বিস্ময়কর তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হতে শুরু করল মুসলিম সৈন্যরা।

✪✪✪

জঙ্গি হাতি মোকাবেলার জন্যে বিন কাসিম আলাদা ইউনিট তৈরি করেছিলেন। তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। রাজা দাহিরের হাতিকে ঘেরাও করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট চারজনকে। কিন্তু এই চারজন রণাঙ্গনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অন্য কোথাও আটকে গিয়েছিল। রাজা দাহিরের হাতিকে তার বিশেষ সৈন্যরা ঘেরাও করে রেখেছিল। এরা ছিল দাহিরের বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী। রাজার একান্ত যোদ্ধারা রাজাকে সাথে পাওয়ার কারণে স্বভাবত উজ্জীবিত ছিল। এরা পরম বিক্রমে মুসলমানদের আক্রমণ করছিল ফলে মুসলিম সৈন্যদের জীবনহানীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এমন সময় শত্রু শিবিরের এক কমান্ডার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিল, “সিন্ধু মাতার সন্তানেরা! মহারাজ রণাঙ্গণে এসে গেছেন। তিনি নিজে শত্রুদের কচুকাটা করছেন। চিৎকার শুনে অন্যান্য হিন্দু সৈন্যরাও রাজা দাহিরকে যুদ্ধ করতে দেখে বিপুল উৎসাহে মুসলিম যোদ্ধাদের ওপর হামলে পড়ল। আরব সৈন্যরা এ মুহূর্তে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হলো।

ঠিক এই মুহূর্তে আরব শিবিরের এক যোদ্ধা সুজা হাবশী ঘোড়া হাঁকিয়ে বিন কাসিমের কাছে এসে বলল, সম্মানিত সেনাপতি! দাহির ও তার হাতিকে জখম করার আগে আমার খাওয়া-পরা সব হারাম। আমি হয় দাহিরের মাথা কেটে নিয়ে আসবো নয়তো শহীদ হয়ে যাব।

বিন কাসিম কিছু বলার আগেই সুজা বিদ্যুগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে দাহিরের একান্ত সৈন্যদের ভীড়ে ঢুকে পড়ল। তখন বিন কাসিমের যোদ্ধারা বীরদর্পে দাহিরের একান্ত বাহিনীর মোকাবেলা করছিল। সুজা হাবশী দাহিরের একান্ত বাহিনীকে এড়িয়ে রাজার হাতির কাছাকাছি পৌঁছে গেল কিন্তু রাজার হাতির কাছাকাছি হলে তার ঘোড়া ভঁড়কে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে ছুটল। সুজা আবার ঘোরপথে ঘোড়াকে রাজার হাতির কাছে নিয়ে এলে ঘোড়া হাতির কাছাকাছি যেতেই আবার ঘুরে দৌড় দিল।

এসময় দাহিরের বিশেষ বাহিনীকে মুসলিম যোদ্ধারা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ফলে তাদের পক্ষে আর রাজার হাতির প্রতি বিশেষ নজর দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সুজা হাবশীর মাথায় পাগড়ী ছিল। ছুটন্ত অবস্থায়ই সে অগ্রসর হয়ে মাথার পাগড়ী খুলে তার ঘোড়ার চোখ দুটো বেঁধে ফেলল। এবার আর ঘোড়ার পক্ষে কিছু দেখা সম্ভব ছিল না। ফলে সুজা ইচ্ছামতো ঘোড়াকে ডানে-বামে সামনে পিছনে তাড়িয়ে নিতে পারছিল। এবার সুজা হাবশী পিছন দিক থেকে তার ঘোড়াকে রাজার হাতির কাছে নিয়ে গেল এবং তরবারীর প্রচণ্ড আঘাতে হাতির সূঁড় কেটে ফেলল। হাতির সূঁড় সম্পূর্ণ কাটা সম্ভব না হলেও মারাত্মক জখম হলো। আঘাত করেই সুজা হাবশী হাতির কাছ থেকে দূরে সরে গেল এবং পুনর্বার আঘাত করার জন্য ঘোড়াকে ঘুরাতে লাগল। এমন সময় দাহির ঘূর্ণিয়মান দুধারী তীর সোজা হাবশীর দিকে ছুড়ে মারল। তীরটি গিয়ে পড়ল সুজাহাবশীর গলায়, ধারালো তীরে সুজার গলা কেটে গিয়ে মাথা একদিকে হেলে পড়তেই সে ঘোড়া থেকে লুটিয়ে পড়ল। সেই সাথে তেজস্বী এই আরব যোদ্ধা তার সংকল্প পূর্ণ করে শাহাদাত বরণ করল।

✪✪✪

হঠাৎ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বদলে গেল। রাজা দাহিরের চিৎকারে তার সৈন্যরা মুসলিম সেনাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানল। রাজা দাহির এপর্যন্তই তার দু'টি ইউনিটকে রিজার্ভ রেখেছিল। এবার রিজার্ভ সৈন্যদেরও আঘাতের

নির্দেশ দিলো। বস্তুত মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের পরিবেশ বদলে গেল। বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আরব সৈন্যদের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিল। চতুর্মুখী আক্রমণ সামাল দিতে গিয়ে মুসলিম সৈন্যদের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। আরব সৈন্যদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপদ ডেকে আনল জঙ্গি হাতিগুলো। তাছাড়া দাহিরের দুধারী তীরও মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করল। বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুসলিম সৈন্যরা তাদের কমান্ডার ও সেনাপতিদের কথাও অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলো।

এমতাবস্থায় প্রধান সেনাপতি বিন কাসিম উচ্চ আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বললেন, ইসলামের সৈনিকরা! তোমাদের প্রধান সেনাপতি বিন কাসিম এখনো জীবিত। আমি তোমাদের সাথেই আছি, তোমাদের সাথেই যুদ্ধ করছি। খবরদার! কেউ বেঈমানদের পিঠ প্রদর্শন করো না। বেঈমানরা বাঁচার জন্য লড়াই করে। ওরা মত্যুকে ভয় পায়, তোমরা ভয়কে মন থেকে তাড়িয়ে দাও।

ঐতিহাসিক মাসুমী লিখেছেন, রাজা দেশাইয়ের ছেলে মুকু এতোক্ষণ রণাঙ্গনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। সে পাঁচ শতাধিক সহযোদ্ধাকে নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের যখন এই অবস্থা তখন মুকু চোখের সামনে নিজের পরিণতি ভেবে সিদ্ধান্ত নিল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হলে রাজা দাহিরের হাতে অপমানজনক মৃত্যু বরণ করতে হবে। অতএব দাহিরের অত্যাচার ও মৃত্যু থেকে বাঁচতে হলে মুসলমানদের বিজয়ের কোন বিকল্প নেই।

কাল বিলম্ব না করে মুকু তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে দাহিরের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুকুকে লড়তে দেখে বিন কাসিমের মনে সাহস সঞ্চারিত হলো। কারণ তার সামনে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুসলিম কমান্ডারদের নাম ধরে ধরে ডাকতে শুরু করলেন। হে আরব যোদ্ধারা! তোমরা পুনর্বার জেগে ওঠো, কোথায় আছো আমার মাদানী, মুহাম্মদ বিন মুসআব? নাবাতা বিন হানযালা? কোথায় গেলে' ওয়ারিস বিন আইউব, মুহাম্মদ বিন যিয়াদ, তামীম বিন যায়েদ? তোমরা কোথায়? কোথায় গেলে বন্ধুরা? তোমরা তো ইসলামের রক্ষক! হারমানা তোমাদের জন্যে বেমানান। বুকে সাহস সঞ্চার করো? দলবেধে শত্রুদের আঘাত করো, আল্লাহ তোমাদের মদদ করবেন। সবাই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনো, চূড়ান্ত আঘাত হানো। আল্লাহর কসম তোমাদের পালানোর [illegible]।

বিন কাসিমের এই চিৎকারে মুসলিম সৈন্যরা সম্বিত ফিরে পেল। কমান্ডার ও সেনাপতিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সৈন্যদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে একসাথে জড়ো করল এবং কিছুটা পিছিয়ে এলো। মুসলমানদের কোথাও থেকে সাহায্য পাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বিন কাসিমের সহযোদ্ধারা যখন পিছিয়ে এসে পুনর্বার আঘাত করল তাতে মুকু তার পাঁচ'শ যোদ্ধা নিয়ে তাদের সাথে শরীক হলো। এবার প্রচণ্ড ও চূড়ান্ত আঘাত হানল আরব বাহিনী।

চূড়ান্ত লড়াইয়ে জেতার জন্য বিন কাসিম দু'টি হাতিয়ার ব্যবহার করলেন। সাধারণত মুখোমুখি সংঘর্ষে এই হাতিয়ার ব্যবহার করা হতো না। বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন, ছোট ছোট মিনজানিক থেকে শত্রুদের হাতিগুলোর ওপর পাথর নিক্ষেপ করো। এদের হাওদাগুলো গুড়িয়ে দাও।

পিছন থেকে একদল সৈন্য ছোট মিনজানিকগুলো এগিয়ে এনে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরাই চিৎকার করতে শুরু করল পাথর নিক্ষেপ বন্ধ কর। কারণ নিক্ষিপ্ত পাথরে মুসলিম সৈন্যরাও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। যেহেতু লড়াই ছিল প্রচণ্ড এজন্য হাতিগুলো ছিল ধাবমানও অস্থির। এমতাবস্থায় লক্ষ্যভেদ করা ছিল মুশকিল। বিন কাসিম সাথে সাথেই তার এই ভুল বুঝতে পেরে পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু এই পাথর নিক্ষেপের ইতিবাচক ফল হলো, পাথর নিক্ষিপ্ত হতে দেখেই হিন্দু সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ভর করল। কারণ তারা জানত এই পাথর তাদের শত শত বছর ধরে অজেয় দুর্গ ও পূজণীয় মন্দির ডাভেল ধ্বংস করে দিয়েছে। যেখানেই মুসলমানরা পাথর ছুড়েছে সেখানে হিন্দুরা টিকতে পারেনি।

আরবদের মরণপণ আক্রমণে বেশকিছু হাতি মারাত্মকভাবে জখমী হয়ে বিকট আওয়াজে চিৎকার করে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করল। এসব হাতির পক্ষে তখন আপনপর পার্থক্য করার ক্ষমতা ছিলনা। এমতাবস্থায় সবগুলো হাতিকে বেকার করে দেয়ার জন্য বিন কাসিম এগুলোর ওপর অগ্নিতীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। আরব তীরন্দাজরা বিপুল উৎসাহে শত্রুপক্ষের হাতিকে লক্ষ্য করে অগ্নিবাহী তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। কয়েকটি তীর ছুড়ার পর একটি হাতির হাওদায় আগুন ধরে গেল। আগুন থেকে বাঁচার জন্য ওপরে দাঁড়ানো তীরন্দাজ বর্শাধারী ও মাহুতরা হাতির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। আরব সৈন্যরা আহত হাতিগুলোকে তরবারী ও

বর্শা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। তারা কোন হাতিকে বাগে আনার কোন চেষ্টাই করেনি। কারণ আরবদের দৃষ্টিতে লড়াইয়ে হাতি কোন কার্যকর বাহন বলে মনে হতো না।

এ পর্যায়ে হিন্দু বাহিনী জীবন নিয়ে পালানোর জন্যে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছিল। তারা চেষ্টা করছিল কোন মতে পশ্চাদ্ধাবন করে যুদ্ধের ইতি টানতে। কিন্তু হিন্দুদের পশ্চাদবন আত্মহুতিতে পরিণত হলো। পরিস্থিতি পরিণতির দিকে যেতে দেখে রাজা দাহির তার মাহুতকে বলল, আমার হাতিটিকে মূল রণাঙ্গনের ভিতরে নিয়ে যাও।

এপর্যায়ে রাজা দাহির নিজে জীবন মৃত্যুর লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। বিদ্যুৎগতিতে সে ডানে-বামে তার বিশেষ তীর বর্ষণ করত শুরু করল, সেই সাথে যেখানে বর্শা বল্লমের প্রয়োজন বোধ করছিল তাই ব্যবহার করছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা দাহির তখন বেপরোয়া। মেশিনের মতো কাজ করছিল তার দেহ। চাকার মতো চতুর্দিকে ঘুরছিল সে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো তীর বর্শা নিক্ষেপে লিপ্ত ছিল রাজার দু'হাত। তার হাওদায় দাঁড়ানো দুই সুন্দরী তরুণী পানপাত্রে রাজাকে শরাব দিচ্ছিল কিন্তু অতি সন্তরণশীল হাতির ঝাকুনী সামলাতে না পেরে তরুণী দু'জন পানপাত্র নিয়েই একে অন্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পরছিল। রাজা দাহিরের তখন এদের অবস্থা তাকিয়ে দেখার ফুরসত ছিল না।

একপর্যায়ে বিন কাসিমের তীরন্দাজরা রাজার হাতি লক্ষ করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। কারণ তখন দৃশ্যত রাজা একাই আক্রমণাত্মক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক অগ্নিতীর দাহিরের হাওদায় আগুন ধরিয়ে দিল। রাজার হাতির হাওদা ছিল দামী রেশমী কাপড়ে আবৃত। তার হাতির দেহ ছিল হাটু পর্যন্ত রেশমী কাপড়ে ঢাকা। মুহূর্তের মধ্যে হাতির সারা গায়ের রেশমী কাপড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুন থেকে বাঁচার জন্য মাহুত লাফিয়ে মাটিতে পড়ল। আর তরুণী দু'টি আর্তচিৎকার শুরু করে দিল। কারণ ওদের কাপড়েও আগুন ধরে গেছে। নির্বাক দাহির যেন নিজেকে জ্বালিয়ে দিতেই প্রস্তুত। সে কাল বিলম্ব না করে দুই তরুণীকে ধরে মাটিতে ছুড়ে মারল। দুই মুসলিম যোদ্ধা দুই তরুণীকে ধরে মুসলিম শিবিরের নিরাপত্তা জোনে পৌছে দিল। ওখানকার সেবিকা মহিলা ওদের ধরে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিল।

রাজার হাতির হাওদা তখন পুরোমাত্রায় জ্বলে উঠেছে। আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাতি অস্থির হয়ে উঠল। পাশেই ছিল একটা ঝিলের মতো জলাশয়। জ্বলন্ত হাতি রাজাকে পিঠে নিয়েই দৌড়ে নেমে গেল ঝিলে। অগ্নিদগ্ধ হাতি পা ভাঁজ করে পানিতে শরীর ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করল আর কাঁটা শুঁড় দিয়ে সারা গায়ে পানি ছিটিয়ে দিতে লাগল।

পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন ডুবে গেছে। রাজা দাহির অবস্থা বেগতিক দেখে হাতির ওপর থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতরে ঝিলের তীরে পৌছাল। রাজার হাতিকে অনুসরণ করে কয়েক আরব যোদ্ধা ঝিলের তীরে পৌছে গেল। রাজা তীরে উঠতেই তাকে ঘিরে ফেলল আরব যোদ্ধারা। দাহির তরবারী বের করে একাই কয়েক জনের সাথে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো। মরণ ত্যাগী রাজা নিজেকে বাঁচানোর জন্য নয় প্রতিশোধ স্পৃহায় একজনকে ধরাশায়ী করেই নিজের জীবন দিতে চেষ্টা করল কিন্তু আরবযোদ্ধারা তাকে আর সেই সুযোগ দিলো না। কিছুক্ষণ রাজাকে খেলিয়ে এক পর্যায়ে এক যোদ্ধা পিছন দিক থেকে সজোরে রাজার ঘাড়ে আঘাত হানল, কেটে গেল দাহিরের গর্দান। অমিত তেজস্বী এই আরবযোদ্ধার নাম ছিল কাসিম বিন ছালাবা। বনী তাঈ' গোত্রের লোক ছিল ছালাবা।

✪ ✪ ✪

দশমীর আলোকিত চাঁদনী রাত। কিন্তু গোটা রণাঙ্গন ছিল ধুলায় অন্ধকার। সারা দিনের তুমুল যুদ্ধের কারণে গোটা এলাকা ধূলায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এক'শ হাত দূরের মানুষকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। শেষপর্যায়ে মারাত্মকভাবে আরব বাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল রাজার বাহিনী। আর কাটা পড়েছিল কলাগাছের মতো। যেসব হিন্দু সৈন্য প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল এরা রাওয়া দুর্গে আশ্রয় নেয়ার জন্যে ওদিকে পালাতে শুরু করল। অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে বিন কাসিম তাঁর কয়েকজন কমান্ডার ও সিপাহীদের নির্দেশ দিলেন, নিজ নিজ ইউনিট নিয়ে তোমরাও রাওয়া দুর্গে ঢুকে পড়। নয়তো পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা দুর্গবন্দি হয়ে শক্তি সঞ্চয় করলে আমাদেরকে আরেকটি লড়াই করতে হবে।

নির্দেশ পেয়ে বিন কাসিমের সৈন্যদের কয়েকটি ইউনিট উর্ধশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে রাওয়া দুর্গে ঢুকে পড়ল। পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের প্রবেশের সুবিধার

জন্য দুর্গের প্রধান ফটক খোলা ছিল। তাতে আরব যোদ্ধাদের আর প্রবেশে বেগ পেতে হলো না। তাছাড়া রাজার পরাজয়ের কারণে কে আরব আর কে সিন্ধি এ খবর নেয়ার মতো কোন কর্তৃপক্ষ দুর্গফটকে ছিল না। আরব যোদ্ধারা দুর্গে প্রবেশ করেই দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিল।

সকাল হতেই বিন কাসিম একদল সৈন্য নিয়ে রাওয়া দুর্গে প্রবেশ করলেন। তখনও তিনি রাজার মৃত্যুর খবর জানতেন না। তিনি দুর্গে প্রবেশ করেই নির্দেশ দিলেন, রাজা দাহির কোথায় আছে? তার কি পরিণতি হয়েছে? এ খবর দ্রুত সংগ্রহ কর। গোয়েন্দা প্রধান হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই এ তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব শা'বান ছাকাফীর কাঁধে বর্তায়। বিন কাসিমের নির্দেশের আগেই তিনি জেনে নিয়েছিলেন রাতেই ঝিলের পাড়ে আরবদের হাতে নিহত হয়েছে দাহির।

সকালবেলায় যখন সৈন্যরা রাজার খোঁজে ঝিলের পাড়ে উপস্থিত হলো, তখন কোথাও রাজার মরদেহ খুঁজে পেল না। ব্যাপক খোঁজ খবর নেয়ার পর কেবল একজন জানালো, রাতের বেলায় প্রধান পুরোহিতকে এদিকে আসতে দেখা গেছে।

সাথে সাথে শা'বান ছাকাফী প্রধান পুরোহিতকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় তুমি ঝিলের পাড়ে কেন গিয়েছিলে?

আপনাদের মহানুভবতার বহু কাহিনী আমি শুনেছি। আমি আপনাদের কাছে সত্য প্রকাশ করে দেবো কিন্তু বিনিময়ে আমার স্ত্রী সন্তানও জীবনের নিরাপত্তা চাই আমি।

'তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হলো' বললেন ছাকাফী। কিন্তু বলো, কি ছিল সেখানে?

মৃত্যুর সাথে সাথেই আমার কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল, মহারাজা ঝিলের পাড়ে নিহত হয়েছেন, বলল পুরোহিত। হিন্দু সৈন্যরা আমার কাছে জানতে চাইলো রাজার মরদেহ কি ভাবে সৎকার করা হবে? আপনি হয়তো জানেন, আমরা মৃত্যুর পর মরদেহ জ্বালিয়ে দেই।

তিনি তো আর সাধারণ কোন লোক ছিলেন না। সাধারণ কোন প্রজার মতো তো আর তার মরদেহ সৎকার করা যায় না। কিন্তু তখনো আশেপাশে আপনার সৈন্যরা বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় আমি তাদের বললাম, রাজার

মরদেহ কাদায় পুঁতে ফেলো। মুসলমানরা এখান থেকে চলে গেলে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদায় মহারাজের মরদেহ সৎকার করতে হবে।.... এখন আসুন, দেখতে চাইলে আপনাদেরকে মহারাজের মরদেহ দেখিয়ে দিই।

পুরোহিতের লাশ গুম করে ফেলা এবং তথ্য উদঘাটনের ব্যাপারটি বিন কাসিমকে অবহিত করলেন শা'বান ছাকাফী। বিন কাসিম নিজেই চিহ্নিত শত্রুর মরদেহ দেখার জন্য অকুস্থলে হাজির হলেন এবং সৈনিকদেরকে কাদা থেকে রাজার মরদেহ উত্তোলনের নির্দেশ দিলেন।

রাজা দাহিরের চেহারা আঘাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মাথাও কেটে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সহজে রাজাকে সনাক্ত করা যাচ্ছিল না। রাজার একান্ত দুই সেবিকা তরুণীকে অকুস্থলে হাজির করলে তারা রাজার মরদেহ শনাক্ত ও নিশ্চিত করল।

'রাজার গলা কেটে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলো। ওর ছিন্ন মাথা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠানো হবে'।

বিন কাসিমের নির্দেশে দেহ থেকে রাজা দাহিরের মস্তক ছিন্ন করে ফেলা হলো।

দাহিরের পুত্র জয়সেনা কোথায়? পুরোহিতেকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

মুসলমানদের প্রবল আক্রমণ শুরু হতেই রণাঙ্গন ত্যাগ করেছিল সে, বলল পুরোহিত। সে হয়তো এখন ব্রাহ্মণাবাদ পৌঁছে গেছে।

পরাজিত পিতার ছিন্ন মস্তক বিজয়ী বিন কাসিম যখন হাজ্জাজের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন, নিহত রাজার পুত্র জয়সেনা তখন ব্রাহ্মণবাদ পৌঁছে বিন কাসিমের অগ্রাভিযান প্রতিরোধের চেষ্টায় লিপ্ত হলো।

পর্ব দশ

দু'জন পাঠানো হলো রক্তে রঞ্জিত হয়ে একজন ফিরে এলো

হিন্দুদের জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিম এক জীবন্ত আতঙ্কে পরিণত হলেন। এক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, সাপ যখন কোন ইঁদুরকে পাকড়াও করতে উদ্যত হয় তখন ভয়ে আতঙ্কে ইঁদুর পালানোর শক্তিও হারিয়ে ফেলে। বিন কাসিমের একেরপর এক বিজয়ে হিন্দুদের মধ্যেও এমন আতঙ্ক দেখা দিলো। রণাঙ্গন থেকে যেসব হিন্দুসেনা পালিয়ে গিয়েছিল এরা পুনর্বার আক্রমণের আর সাহস পাচ্ছিল না।

যখনই খবর পৌঁছত বিন কাসিম কোন দুর্গ অবরোধ করতে আসছেন, তখন সেই দুর্গের হিন্দু সৈন্যরা প্রতিরোধ কৌশল ভুলে যেত। দুর্গশাসকরা দুর্গের বাইরে বিন কাসিমকে প্রতিরোধ করার কোন কৌশলের কথাই ভাবতে পারতো না। সৈন্যরা ভয় আতঙ্কে জড়সড় হয়ে পড়ত। আর সাধারণ হিন্দুদের অবস্থা হতো আরো শোচনীয়।

বিন কাসিম যখন সিন্ধু নদীর পূর্বপাড়ের প্রায় সব দুর্গ একেরপর এক কব্জা করে নিলেন, তখন থেকেই হিন্দুদের মধ্যে বিন কাসিমের ভয় স্থায়ী হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে বিন কাসিম যখন বিজয়ী বেশে কোন দুর্গে প্রবেশ করতেন তখন সেখানকার অধিবাসীদের মন থেকে বিন কাসিমের আতঙ্ক দূর হয়ে যেতো। তারা বুঝতে পারতো অমুসলিম রাজা মহারাজাদের মতো সামরিক বেসামরিক নির্বিশেষে সকল প্রতিপক্ষের লোকদের নির্বিচারে হত্যা করতেন না বিন কাসিম। তিনি কোথাও জনগণের সহায় সম্পদ লুট করতেন না। বিজিত এলাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথে সেখানকার সাধারণ অধিবাসীদের জীবন সম্পদ ও মানসম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করতেন তিনি। তাঁর কোন সৈনিকের পক্ষে সাহস হতো না বিজিত অঞ্চলের কোন অবলা নারী বা তরুণীর গায়ে হাত দেয়ার।

হিন্দু ঐতিহাসিকরা অভিযোগ করেছেন যে, বিন কাসিম ছিলেন খুবই নির্মম তিনি কাউকে ক্ষমা করতেন না। কথাটি আংশিক সত্য। তিনি চিহ্নিত অপরাধী, কুচক্রি, বিনা কারণে রক্তপাত ও সংঘর্ষকারীদের ক্ষমা করতেন না। যেসব হিন্দু শাসক ও সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উস্কানী দিতো, যেসব হিন্দু ঠাকুর পুরোহিত ও পণ্ডিত সাধারণ নাগরিকদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করে ভয় দেখাতো, লড়াইয়ের জন্য প্ররোচিত করত কিংবা বিদ্রোহ করত এদের তিনি ক্ষমা করতেন না। চক্রান্তকারী ও জিঘাংসাপরায়ণদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতেন। শত্রুপক্ষের নেতাদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর কিন্তু সাধারণ অধিবাসী, কৃষক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের প্রতি তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতেন। সর্বাগ্রে নিশ্চিত করতেন জননিরাপত্তা।

অবশ্য এটা শুধু বিন কাসিমের অনুসৃত নীতিই ছিল না। নিরপরাধ নাগরিকদের জানমাল ইজ্জত সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান ইসলামের সকল মুসলিম বিজয়ীরাই করতেন।

এটা মুসলিম বিজয়ীদের জন্য অলিখিত আইনে পরিণত হয়েছিল। নিরপরাধ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়ার বিষয়টিকে তারা আল্লাহর নির্দেশ হিসাবে গণ্য করতেন।

বিন কাসিমের প্রজা হিতৈষী নীতির ফলে হিন্দুস্তানের পরিস্থিতি এই হলো যে, যখনই তিনি কোন দুর্গে দু'চার দিন কাটাতেন দলে দলে হিন্দু লোকেরা এসে তাঁর কাছে ইসলামে দীক্ষা নিতো।

রাজা দাহিরের মরদেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে বিন কাসিম যখন রাওয়া দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন পূর্ব থেকেই এই দুর্গে নিয়োজিত তাঁর গোয়েন্দারা তাঁকে জানাল, এখানে দাহিরের কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সেনাকর্মকর্তা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদেরকে পুনর্বার আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করছে। এদের কয়েকজন হিন্দু নাগরিকদের প্ররোচনা দিচ্ছে, তারা যেন আরবদের মোকাবেলায় তাদের সাথে যোগ দেয়। এদের মধ্যে দু'জন সেনাপতি এমন রয়েছে, যারা এখানে পালিয়ে আসা জয়সেনাকে এখানে না থেকে ব্রাহ্মণাবাদ গিয়ে পুনর্বার প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণাবাদ থেকে কয়েকজন ঠাকুরও এ লক্ষ্যেই এখানে এসেছে।

বিন কাসিমের গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী অভিযুক্ত হিন্দু সেনাকর্মকর্তা, ঠাকুর, পুরোহিত ও পণ্ডিতদের ধরে এনে এক জায়গা জড়ো

করলেন। তিনি দুর্গের অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে যারা বিদ্রোহ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সাধারণ নাগরিকদের প্ররোচনা দিচ্ছিল তাদের সবাইকে গ্রেফতার করলেন। লোকদের তথ্যে কিছু সংখ্যক বেসামরিক হিন্দু লোকও ধরা পড়ল। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলো বিন কাসিম এদের সবাইকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ইতিহাসের ক্ষণজন্মা অল্প বয়স্ক সেনাপতি বেসামরিক পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের ওপর কোন ধরনের আক্রমণ করতেন না। কারণ সমাজের স্বাভাবিকতা এরাই বজায় রাখত। কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতী ব্যবসায়ীদের চলার গতি স্বাভাবিক না থাকলে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন বাধাগ্রস্ত হবে, ভেঙে পড়বে সমাজের স্থিতিশীলতা। ফলে পেশাজীবী হত্যা না করার ব্যাপারে তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল। প্রমাণিত কোন অপরাধ ছাড়া তিনি কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হতেন না।

✪ ✪ ✪

রাজা দাহিরের নিহত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণাবাদ পর্যন্ত বিন কাসিমের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। দাহির পুত্র জয়সেনা দাহির বাহিনীর কয়েকজন উর্ধতন সেনা কর্মকর্তা, কয়েকজন রাজ দরবারী আর কিছুসংখ্যক বনেদী ঠাকুর রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ আশ্রয় নিলো।

জীবিতাবস্থায় রাজা দাহির তার ছেলে জয়সেনাকে গর্ব করে বলতো বাঘ। কিন্তু দাহিরের সেই বাঘ তার বাবার মৃতদেহ রণাঙ্গনে ফেলে শিয়ালের মতো রণাঙ্গন থেকে ব্রাহ্মণাবাদ পালিয়ে গেল। রাজা দাহিরের রাজকীয় সৈন্যরা দেখতে পেল, দাহিরের ব্যাঘ্রপুত্রধন বাবার মরদেহ ফেলে রেখে রণাঙ্গন থেকে জীবন নিয়ে পালিয়েছে। এতে তাদের মধ্যে মুসলমানদের আতঙ্ক আরো গভীর হলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, শোচনীয় পরাজয় ও বাহাদুর পিতার করুণ মৃত্যুতে জয়সেনার মাথা ঠিক ছিল না। ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে পৌঁছার পর সে সর্বাগ্রে সেখানকার প্রধান মন্দিরে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে মন্দিরে তাদের পূজনীয় প্রধান পুরোহিতকে দেখে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাতেই পুরোহিত তার প্রতি দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলো।

জয়সেনা পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, তোমরা না মহারাজকে আক্রমণের শুভলগ্ন বলেছিলে? বলেছিলে মহারাজের বিজয় নিশ্চিত?

হ্যাঁ, রাজকুমার; আমরা তাই বলেছিলাম।

কোথায় গেল তোমাদের ভবিষ্যত বাণী? তোমরা কি শোননি, মহারাজ শুধু পরাজিত হননি, তিনি নিহত হয়েছেন! তোমরা এই আশা করতে পারো এর পরও আমি তোমাদের জীবিত ছেড়ে দেবো?

রাজকুমারের যদি এটাই নির্দেশ হয়ে থাকে তবে আমাদের মরণে আপত্তি নেই। তবে আমাদের মাথা তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করার আগে শুনে নিন, মহারাজের ওপর দেবদেবীদের অভিশাপ পড়েছিল। এই অভিশাপ আমাদের সবার ওপর পড়বে। আমাদের মন্দিরগুলো মুসলমানদের আস্তাবলে পরিণত হবে।

কি সেই অভিশাপ? কেন মহারাজের ওপর দেবদেবীদের অভিশাপ পড়ল?

একই মায়ের উদরে জন্মগ্রহণকারী নারী আর পুরুষে কখনো বিয়ে হতে পারে না, রাজকুমার! মহারাজ আপন সহোদরা বোনকে বিয়ে করে বিবি বানিয়ে রেখেছিলেন, বলল প্রধান পুরোহিত। কিন্তু তিনি তো বোনের সাথে ঘর সংসার করতেন না?

পুরোহিত কিছু বলার আগেই আড়াল থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ। "হ্যাঁ, আমরা কখনো স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করিনি। সবাই নারীকণ্ঠের দিকে উৎসুক হয়ে তাকানোর আগেই দৃশ্যপটে এসে দাঁড়ালো মায়ারাণী। আড়াল থেকে মায়াই বলেছিল একথা। আমরা কখনো স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘরসংসার করিনি। আবারো স্বগতোক্তি করল রাণী। তবে আমার ভাই আমার জীবন যৌবন আশা আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। আমার ভাই এজন্য আমাকে স্ত্রী বানিয়ে রেখেছিল, আমার যদি আর কারো সাথে বিয়ে হয় তাহলে সে ক্ষমতা দখল করে নেবে আর তাকে বনবাসে যেতে হবে। তোমাদের মতো ঠাকুর পণ্ডিতরাই তার মধ্যে এই সংশয় জন্ম দিয়েছিল। এর চেয়ে কি আমাকে বলী দিয়ে দেয়া বেশি ভালো ছিল না? মন্দিরে আমাকে বলী দিয়ে আমার রক্ত দিয়ে কৃষ্ণ মাতার চরণ ধুয়ে দেয়া কি বেশি ভালো হতো না? তা না করে আমার ভাই বিনা ছুরি বল্লমে আমার যৌবনের সব আশা আকাংখা স্বপ্ন-সাধ, চাওয়া-পাওয়া তিলে তিলে হত্যা করেছে। আর তোমাদের মতো ধর্মের ঠিকাদাররা এমন কাজ থেকে মহারাজকে বিরত রাখার কোন চেষ্টাই করনি। মহারাজ তার রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আমার যৌবনকে বলী দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও তো তার রাজত্ব টিকল না।

হ্যাঁ, একথাই আমরা রাজকুমারকে বলতে চাচ্ছিলাম, যে কথা রাণী বলল, এটা দেবতার অভিশাপে হয়েছে, এই অভিশাপে মহারাজের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে।

এখন তাহলে কি হবে? আমাদের কি এর পরিণতিতে কোন বলীদান করতে হবে? পুরোহিতের কাছে জানতে চাইলো রাজকুমার জয়সেনা।

"না, এসবই মিথ্যা, এরই মধ্যে কয়েকজন নিরপরাধ কুমারীকে বলী দেয়া হয়েছে।" আর কোন কুমারী বলী দেয়া হবে না। চিৎকার করে বলল রাণী।

রাণী! রাণীকে একদিকে ঠেলে দিয়ে মহারাজের মতো গর্জে উঠল জয়সেনা। মরা এবং মারা আমাদের কাজ। তুমি তো একজন অবলা নারী মাত্র, এখানে তোমার কোন হুকুম মানা হবে না।

এখন আর কারোরই হুকুম মানা হবে না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল রাণী। মহারাজের মৃত্যুর পর আমিই রাণী, আমিই তার স্থলাভিষিক্ত।

আমার তরবারী তোমার মাথা বিচ্ছিন্ন করার আগে এখান থেকে চলে যাও রাণী! নির্দেশের স্বরে বলল জয়সেনা। তার দেহরক্ষীদের বলল, এখান থেকে ওকে সরিয়ে নাও, এ পাগল হয়ে গেছে। দু'তিন জন লোক ঝাপটে ধরে রাণীকে টেনে হেঁচড়ে মন্দিরের বাইরে নিয়ে গেল, আর তার চিৎকার শোনা গেল।

✪ ✪ ✪

জয়সেনা যখন মায়ারাণীর মাথা ছিন্ন করার হুমকি দিচ্ছিল, বিন কাসিম তখন রাওয়া দুর্গে মালে গনীমত পর্যবেক্ষণ করছিলেন। রাওয়া দুর্গে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিন কাসিমের হস্তগত হলো। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজা দাহিরের এক তরুণী ভাগ্নি, আর রাজার ছিন্ন মস্তক।

বিন কাসিমের নির্দেশে মালে গণীমতের এক পঞ্চমাংশ আলাদা করা হলো খেলাফতের জন্য। বিপুল পরিমাণ সোনাদানাসহ রাজা দাহিরের ছিন্নমস্তক ও রাজার ভাগ্নিকেও খেলাফতের অংশে রাখা হলো। খেলাফতের গোটা অংশ বিন কাসিম আলাদা করে কাব বিন মুখারিকের কাছে সোপর্দ করলেন।

ইবনে মুখারিক! খেলাফতের বদলে এই সম্পদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে সোপর্দ করবে এবং তাকে আমার এই পয়গাম দেবে।

বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজয়ের পর হাজ্জাজের কাছে যে ঐতিহাসিক পয়গাম দিয়েছিলেন তা ছিল এই ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

খাদেমুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে ইরাকের শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামে–

আসসালামু আলাইকুম

আল্লাহ্ তাআলার রহমত মদদ এবং আপনার দিক নির্দেশনায় সিন্ধু অঞ্চলের কেউটে সাপের মাথা কেটে দেয়া হয়েছে, ইসলামের জঘন্যতম শত্রু আরব জাহানকে পদানত করে কাবা ঘরে মূর্তি স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর রাজা দাহিরের ছিন্ন মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং দাহিরের এক ভাগ্নি যে হিন্দুস্তানের রূপ সৌন্দর্যের প্রতীক আপনার কাছে পেশ করা হলো। এটি সেই জালেম রাজার মাথা যে আমাদের নিরপরাধ নারী-শিশু ও হজ্জযাত্রীদেরকে ডাভেলের বন্দিশালায় আটকে রেখেছিল...।

আপনি যেসব আয়াত পাঠের কথা বার বার বলতেন, আমি আপনার নির্দেশ মতো সবসময়ই ঐগুলো পাঠ করি। আমরা সব সময় আল্লাহর রহমতের জন্য মোনাজাত করি, আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহর রহমতেই আমরা রাজা দাহিরকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছি। দাহিরের ছেলে জয়সেনা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেছে। ...

এ মুহূর্তে আমি রাওয়া দুর্গে অবস্থান করছি। এখানকার সাধারণ লোকদের আমরা ক্ষমা ঘোষণা করেছি। কিন্তু যারা বিদ্রোহের পায়তারা করছিল তাদেরকে চিরদিনের জন্যে খতম করে দিয়েছি।

ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অভিযান চালানোর জন্য আপনার অনুমতি চাচ্ছি। কারণ দাহিরের ছেলে জয়সেনা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সে আমাদের মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্রাহ্মণাবাদ যাওয়ার পথে আরো দুটি দুর্গ রয়েছে। এগুলোতে হিন্দু সৈন্য রয়েছে ওরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে এজন্য এগুলো দখল করে নিতে হবে।

আপনি এই বিজয়ের সুসংবাদ যাদের জানাবেন, তাদেরকে আমার সালাম জানাবেন এবং আমাদের অব্যাহত বিজয়ের জন্য দোয়া করতে বলবেন।

৯৩ হিজরী মোতাবেক ৭১২ খ্রিস্টাব্দের শাওয়াল মাসে বিন কাসিম হাজ্জাজের কাছে এই পয়গাম ও গণীমতের সম্পদ পাঠিয়েছিলেন।

✪ ✪ ✪

এদিকে যখন আল্লাহর মদদ ও নুসরতের জন্য আবেদন করা হচ্ছিল ওদিকে জয়সেনা তখন হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদের কাছে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য দূত পাঠাচ্ছিল। দাহিরপুত্র জয়সেনা হিন্দুস্তানের সব রাজা মহারাজার কাছে তার সাহায্যের জন্য দূত পাঠাল। সবাইকে জয়সেনা লিখল, তার পিতা ইসলামের অগ্রাভিযান রুখতে জীবন উৎসর্গ করেছে। জানা গেছে, আরব বাহিনীর সেনাপতি তার মাথা কেটে আরব পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আরব সেনাপতি স্বর্গবাসী রাজার এক কুমারী ভাগ্নিকেও আরব পাঠিয়ে দিয়েছে। সে কয়েকজন পুরোহিতকেও হত্যা করেছে। এখনও যদি এই তুফান রুখে দিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ না হই তাহলে আপনাদের সবার মাথাও আরব পৌঁছবে। সেই সাথে আপনাদের কুমারী কন্যারাও আরবদের দাসী হবে। আর আবহমান কাল থেকে চলে আসা আমাদের দেবদেবীদের সত্য ধর্মের পূজা অর্চনা চিরদিনের জন্য ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

জয়সেনার পয়গাম ছিল খুবই উত্তেজনা ও প্ররোচনাদায়ক। অন্যান্য রাজাদের কাছে পয়গাম পাঠানোর পাশাপাশি সে তার জ্ঞাতি ভাই গোপীর কাছেও পয়গাম পাঠাল। গোপী ছিল রাওয়া দুর্গের শাসক। দুর্গ মুসলিম বাহিনীর কব্জায় চলে যাওয়ার পর গোপীও সেখান থেকে অন্যত্র পালিয়ে যায়। জয়সেনা তার এক ভাতিজা বীরসেনাকেও পয়গাম পাঠাল। বীরসেনা ছিল বাটিয়া দুর্গের শাসক। আপন ও আত্মীয় সম্পর্ক যাদের সাথে ছিল জয়সেনা সকল শাসকদের কাছে পয়গাম পাঠাল। আপন আত্মীয়রা তার ডাকে সাড়া দিলেও অনাত্মীয় অনেক শাসক জয়সেনার ডাকে সাড়া না দিয়ে তার সহযোগিতায় না এসে বরং রাওয়া দুর্গে গিয়ে বিন কাসিমের কাছে আত্মসমর্পণ করল। বাহ্‌রার ও দাহলিলা দুর্গের শাসকরা একসাথে মিলিত হয়ে জয়সেনার পরাজয়ের জবাবে লিখল, আরব বাহিনী আমাদের খুব কাছে পৌঁছে গেছে। এমতাবস্থায় দুর্গ খালি রেখে সেনাবাহিনী নিয়ে আপনার সাহায্যে বাইরে যাওয়া যৌক্তিক মনে হয় না। এরচেয়ে আমরা দুর্গের ভিতরে থেকে অবরোধ দীর্ঘায়িত এবং দুর্গের বাইরে আরব বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করব। সেই সাথে আমরা ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আরব বাহিনীর জনবল হ্রাসের চেষ্টা করব যাতে ব্রাহ্মণাবাদ পৌঁছার আগে আরব বাহিনীর জনবল কমে যায়।

✪✪✪

গনীমতের সম্পদ এবং যুদ্ধবন্দিদেরকে নিয়ে বিন কাসিমের পাঠানো কাফেলার প্রধান কাব বিন মুখারিক যখন কুফায় প্রবেশ করলেন, তখন মানুষ মুখে মুখে সিন্ধু বিজয়ের খবর শুনে দৌড়ে রাস্তায় নেমে এলো। সিন্ধু বিজয়ের জন্য বিজয়ী বাহিনীকে মোরাবকবাদ এবং তাকবীর ধ্বনী দিতে লাগল। ফিরে আসা আরব সৈন্যদের কাছে দৌড়ে এলো নারীরাও।

তারা পরম আনন্দে তাদের আপনজনদের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করছিল গণীমতের কাফেলায় ফিরে আসা যোদ্ধাদের কাছে। হাজ্জাজ তখন কুফায় অবস্থান করছিলেন। গনীমতের সম্পদ রাজধানী দামেশ্‌ক পাঠানোর রীতি থাকলেও এগুলো হাজ্জাজের কাছেই আগে পৌছানোর নির্দেশ ছিল। কারণ সিন্ধু অভিযান ছিল হাজ্জাজের একান্ত উদ্যোগের ফসল। কেন্দ্রীয় খলিফা এই অভিযানে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু হাজ্জাজের দৃঢ়তার মুখে কেন্দ্রীয় খলিফার তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না।

বাইরে অসংখ্য মানুষের শোরগোল শুনে দ্বাররক্ষীর কাছে হাজ্জাজ শোরগোলের কারণ জানতে চাইলে দ্বাররক্ষী জানালো, সিন্ধু থেকে গণীমতের সম্পদ ও বিপুল যুদ্ধবন্দি নিয়ে বিশাল কাফেলা এসেছে। একথা শোনামাত্র হাজ্জাজ দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং একটি ঘোড়ায় চেপে কাফেলাকে অভ্যর্থনা জানাতে নিজেই এগিয়ে গেলেন। আবেগের আতিশয্যে তিনি কাফেলার নেতা কাব বিন মুখারিককে জড়িয়ে ধরলেন।

কাফেলা শহরে প্রবেশ করতেই তিনি সারা শহর জুড়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, সকল মানুষকে কেন্দ্রীয় মসজিদে জমায়েত হতে বলো। নামাযের পর সবাইকে সিন্ধু বিজয়ের বিস্তারিত খবর জানানো হবে।

তখন যোহরের ওয়াক্ত ছিল। কুফার ছোট বড় সকল লোক জামে মসজিদে জমায়েত হলো। নামায শেষে হাজ্জাজের নির্দেশে রাজা দাহিরের ছিন্নমস্তক একটি বল্লমে বিদ্ধ করে তার হাতে দেয়া হলো। হাজ্জাজ নিজে বল্লম উঁচু করে রাজা দাহিরের ছিন্নমস্তক উপস্থিত সবাইকে দেখালেন। হাজ্জাজ সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, হে কুফাবাসী! এই ছিন্নমস্তক সেই দাম্ভিক ও অপরাধী বেঈমানের, যে আমাদের নারী শিশু ও হজযাত্রীদেরকে ধরে নিয়ে ডাভেলের কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। সে এতোটাই হিংস্র ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, আমাদের কোন কথাই সে শুনতে রাজি ছিল না। সে নাকি মুসলমানদের নিঃশ্চিহ্ন করে কাবা শরীফকেও মূর্তীর মন্দিরে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর ছিল। আজ এই দাম্ভিকের ছিন্ন মাথা তোমরা দেখো। হে

কুফাবাসী! মুহাম্মদ বিন কাসিম ও মুজাহিদীনের জন্য দোয়া করতে থাকো। এই বিজয় তোমাদের দোয়া ও ত্যাগের ফসল। হে কুফার নওজোয়ানরা! তোমরা কি জানো, আমাদের যোদ্ধাদের অভিযান চূড়ান্ত করতে তাদের আরো সহযোগিতার প্রয়োজন। তোমরা কি তাদের সহযোগিতা করতে আগ্রহী নও? আমরা যদি সময়মতো তাদের সহযোগিতায় সাড়া না দেই, তাহলে এই বিজয়ের পরও তাদের মন ভেঙে যাবে। আমার বিশ্বাস, বিশাল বিজয়ের পর শুধু সহযোগিতার অভাবে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে তারা ব্যর্থ হয়ে যাক তা কোন মানুষই ভাবতে পারে না। তোমরা জানো একাধারে যুদ্ধ করতে করতে তাদের লোকবলও অনেক কমে গেছে এবং অনেকেই ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

হাজ্জাজ তার মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না, সমবেত জনতা চিৎকার করে বলতে শুরু করল, লাব্বাইক! লাব্বাইক! ইয়া হাজ্জাজ! লাব্বাইক! শত শত লোক দাঁড়িয়ে লাব্বাইক বলে চিৎকার করতে লাগল। বিন কাসিমকে সহযোগিতার জন্য সিন্ধু অভিযানে শরীক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। হাজ্জাজ তার সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন, সক্ষম তরুণদের তালিকা তৈরি করে তাদের সামরিক ট্রেনিং শুরু করে দেয়া হোক।

এরপর গণীমতের সম্পদ থেকে কানাকড়িও না রেখে পুরোটাই হাজ্জাজ দামেস্কে কেন্দ্রীয় খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেকের কাছে পৌছানোর নির্দেশ দিলেন। গণীমতের সম্পদের সাথে বিশেষভাবে প্রেরিত দাহিরের ভাগ্নী হিন্দাকেও তিনি খলিফার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। গণীমতের সম্পদের সাথে হাজ্জাজ খলিফা ওয়ালীদ বিন মালিকের নামে একটি পয়গামও পাঠালেন। হাজ্জাজ লিখলেন– "আমি জানি সিন্ধু অভিযানে আপনার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি আপনাকে এই অভিযানে সম্মত করিয়ে নিয়েছিলাম। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সিন্ধু অভিযানের সম্পূর্ণ খরচের ব্যবস্থা আমি করবো এবং আপনাকে এই খরচের চেয়ে অনেক বেশি উপঢৌকন দেবো। আপনি ইতো মধ্যেই দেখেছেন, সিন্ধু থেকে এ পর্যন্ত কতোবার গণীমতের সম্পদ এসেছে এবং একেকবার কি পরিমাণ সম্পদ ও সোনাদানা এসেছে। এ তো গেল ধন-সম্পদের কথা। এই ধনসম্পদ তো শুধু জাগতিক জাঁকজমক বজায় রাখে। কিন্তু আখেরাতের কথা চিন্তা করুন, সেখানে সোনাদানা, দিনার দিরহাম সৈন্য সামন্ত হাতি ঘোড়া কোন কাজে আসবে না। আমার কিশোর ভাতিজা ইসলামের অন্যতম দুশমন রাজা দাহিরকে শুধু পরাজিতই করেনি, মাথা ছিন্ন করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এটি

সেই অহংকারী মুশরিকের মাথা যে শুধু আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল সা.-এর রিসালতকেই অস্বীকার করেনি, ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের অপচেষ্টা করেছে। পরিশেষে হাজ্জাজ তার পয়গামে বিন কাসিমের একেরপর এক বিজয়ের কাহিনী বিস্তারিত লিখলেন। তিনি এও লিখলেন, সামনে বিন কাসিমের পরিকল্পনা কি এবং সে কোন্ দিকে অগ্রসর হবে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, গণীমতের বিপুল সম্পদসহ বহু যুদ্ধবন্দিকে নিয়ে বিশাল কাফেলা যখন কুফা থেকে দামেশ্‌কে প্রবেশ করল, তখন কুফার মতো দামেশকের লোকজনও কাফেলাকে দেখার জন্যে রাস্তায় নেমে এলো। তারা বিজয়ের আনন্দে তাকবীর ধবনী দেয়ার সাথে সাথে যুদ্ধবন্দিদের প্রতি তিরস্কার কটূক্তি করছিল। দামেশ্‌কের পথে পথে একই আওয়াজ ধবনীত হতে লাগল মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু রাজা দাহিরকে হত্যা করে বিজয়ী হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিন কাসিমের নাম। সবাই বিন কাসিমের অভাবনীয় সাফল্যে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এই বিজয়বার্তা দামেশকের অধিবাসীদের এতোটাই আবেগাপ্লুত ও উৎফুল্ল করল যে, আনন্দিত লোকজন বিজয় উৎসবে মেতে উঠল। অনেকেই ডাক পেটাতে শুরু করল।

কিন্তু দামেশ্‌ক জুড়ে এতো আনন্দ উচ্ছাসের মধ্যেও একজনের মনে এই বিজয় কোন প্রভাব সৃষ্টি করল না। উচ্ছ্বাসের বদলে তার চেহারা ছিল গম্ভীর। তার গাম্ভীর্য কখনো বিমর্ষতার রূপ ধারণ করছিল।

তার চেহারা দেখে যে কারো পক্ষে বলে দেয়া সম্ভব ছিল, বিন কাসিমের এই অভাবনীয় বিজয়ে যেন তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, বরং এই বিজয় তার জন্যে পীড়াদায়ক। বিমর্ষ এই লোকটি ছিল তৎকালীন খলিফার ভাই সুলায়মান বিন আব্দুল মালেক। সে কাফেলার যাত্রা পথে অনিহামাখা বিমর্ষ মনে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

কা'ব বিন মুখারিক খলিফা ওয়ালীদ বিন মালেকের দরবারে উপস্থিত হলেন। দরবারে খালীফা ছাড়াও তার অন্যান্য আমত্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কা'ব প্রথমেই খলিফার কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের লিখিত পয়গাম পেশ করলেন। খলিফা কাবের হাত থেকে সেটি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। হাজ্জাজের পয়গাম যতোই পড়ছিলেন, তার চেহারা সন্তুষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। তিনি পয়গাম পড়ে কাবকে বললেন, বিস্তারিত আমি তোমার মুখে

পড়ে শুনবো। অতঃপর দরবার কক্ষ থেকে তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে গনিমতের ধনসম্পদ ও যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যক্ষ করে গোটা ধনসম্পদ স্তরে স্তরে ভাগ করার নির্দেশ দিলেন। সবশেষে কাবকে বললেন, রাজা দাহিরের ভাগ্নী কোথায়? তাকে হাজির করো।

দাহিরের ভাগ্নীকে যখন খলিফা ওয়ালীদের সামনে হাজির করা হলো, দীর্ঘক্ষণ তিনি অপলক দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চেহারায় এক ধরনের উৎফুল্লভাব ফুটে উঠল। খলিফার দৃষ্টি দেখে তরুণীর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

খলিফা দুভাষীর মাধ্যমে তরুণীর উদ্দেশ্যে বললেন, হে তরুণী! তোমার সৌভাগ্যকে তুমি এখনো অনুধাবন করতে পারোনি। যার ফলে তোমার চেহারায় এর কোন প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। তুমি যদি সিন্ধুতেই রয়ে যেতে তাহলে তোমার পরিণতি খুবই ভয়ানক হতো।

আমার এই বন্দিত্বের মধ্যে সৌভাগ্যের কি আছে মহারাজ? এটা কি কোন সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো? এখানে আমি যে কারো রক্ষিতা হয়ে থাকবো। নারীর জীবনে এর চেয়ে অবমাননাকর আর কী আছে? আমি তো মুসলমানদের ব্যাপারে ভিন্নরকম গল্প শুনেছি। কিন্তু আপনি অসহায় এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা মেয়ের দুর্ভাগ্য দেখে আনন্দবোধ করছেন?

তুমি ভুল বুঝেছো তরুণী! তোমার মামা দাহির যেভাবে আমাদের অসহায় নারী শিশুদেরকে কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছিল, আমি তোমাকে সেভাবে বন্দী করে রাখবো না।

তাদের প্রতিশোধ কি আমার ওপরে নেয়া হবে?

না, প্রতিশোধ যার ওপর নেয়ার দরকার ছিল তার ওপর নেয়া হয়েছে। তোমার ওপর কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না এবং তোমাকে যে কারো রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে না, বরং তুমি সসম্মানে মর্যাদাপূর্ণ মানুষের বেগম হয়ে থাকবে। তুমি যদি সিন্ধুতে থাকতে তাহলে লড়াইরত অবস্থায় জীবন বাঁচাতে গিয়ে না জানি কার হাত থেকে কার হাতে গিয়ে পড়তে। তখন হয়তো তোমাকে গণহারে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আমাদের যেসব যোদ্ধা সিন্ধুতে যুদ্ধ করছে, তাদের কারো বেলায় এমন একটা উদাহরণ কি দিতে পারবে যে, তারা বিজিত কোন এলাকার কোন একজন নাগরিকের ইজ্জত সম্ভ্রমতো দূরে থাক সহায় সম্পদ ও বাড়ি-ঘরে হামলা করেছে? তুমি কি শোননি, মুসলিম বিজয়ী সৈন্যরা নারীর সম্ভ্রমকে খুব বেশি মূল্য দিয়ে থাকে। তুমি কি আমাদের

তরুণ সেনাপতি বিন কাসিমকে দেখোনি। সে ইচ্ছা করলেই তো তাঁর রক্ষিতা হিসেবে তোমাকে রাখতে পারতো।

হ্যাঁ, তা সেই সেনাপতি করতে পারত বটে। কিন্তু এরপরও আমি ভয় পাচ্ছি, কে আমাকে বিয়ে করবে?

আমিও করতে পারি? কিন্তু এজন্য তোমাকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে কায়মনে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এবং মনে প্রাণে আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

উপস্থিত এক লোক হঠাৎ বলে উঠল, খলিফাতুল মুসলিমীন! এই তরুণীকে বিয়ে করার আমার সাধ কি তাহলে পূরণ হবে না?

একে আমি নিজের জন্যেই পছন্দ করেছিলাম কিন্তু তোমাকে বিমুখ করতে চাই না আমি। ঠিক আছে, তোমার সাথেই ওর বিয়ে হবে, বললেন খলিফা।

ইতিহাসে সেই ব্যক্তিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মালেক লেখা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস একথাটি পরিষ্কার করেনি কেন এই লোকটি এই তরুণীকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল এবং কি ছিল তার পদবী ও পরিচয়। তাছাড়া খলিফাই বা কেন সেই লোকের সাধকে তার নিজের আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দাহিরের ভাগ্নী ইসলাম গ্রহণ করলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে বিয়ে হয়। দীর্ঘ দিন সে আব্দুল্লাহর সংসারে ছিল কিন্তু এর গর্ভজাত কোন সন্তানাদি হয়নি।

এরপর খলিফা আব্দুল মালেকের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি সিন্ধু অভিযানের সার্বিক খোঁজ খবর নেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করতে শুরু করেন। তিনি এই অস্বাভাবিক বিজয়ের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে মোবারকবাদ পাঠিয়ে বলেন, আমার এই বার্তা বিন কাসিমকেও পৌছে দেবেন।

এদিকে দামেশকে রাজা দাহিরের ছিন্নমস্তকটি একটি বল্লমে বিদ্ধ করে সারা শহরে প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হলো। প্রদর্শন করানো হলো শহর জুড়ে।

✪ ✪ ✪

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাব বিন মুখারিকের মাধ্যমে পুনরায় বিন কাসিমের কাছে পয়গাম পাঠালেন। পয়গামের শুরুতে তিনি বিন কাসিম কিভাবে অগ্রসর হবেন এজন্য তাঁকে দিক নির্দেশনা এবং উজ্জীবনীমূলক উপদেশ দিলেন। সেই সাথে পূর্বের মতোই তিনি বিন কাসিমকে তেলাওয়াত যিকির ও

ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে আল্লাহর মদদ ও নুসরতের জন্যে কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করার উপদেশ দিলেন।

বিন কাসিম ততো দিনে রাওয়া দুর্গে প্রশাসক নিয়োগ করে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করেছেন। এদিকে দুর্গের স্থাপত্য কাঠামো ও দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গোয়েন্দা প্রধান তার বেশ বদল করে দুর্গের চারপাশ ঘুরে দেখতে বের হলেন। শা'বান ছাকাফী স্থানীয় বহু লোককে গোয়েন্দা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের ঘুরে বেড়ানোতে কোন জটিলতা ছিল না। এরা স্থানীয় আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে সারা দুর্গের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতো। আবার সময় সময় দুর্গের বাইরেও চলে যেত। স্থানীয় অধিবাসী হওয়ায় তাদের কেউ সন্দেহের চোখে দেখার অবকাশ ছিল না।

উরুঢ় থেকে কিছু দূরে ব্রাহ্মণবাদের পথে বাহরু নামের একটি দুর্গ ছিল। গোয়েন্দারা বিন কাসিমকে খবর দিলো, সেই দুর্গে প্রায় ষোল হাজার হিন্দু সৈন্য জমায়েত হয়েছে। বিন কাসিমের পরবর্তী টার্গেট ছিল ব্রাহ্মণাবাদ। তিনি এ দুর্গ এড়িয়ে ঘোর পথে ব্রাহ্মণাবাদ আক্রমণ করতে পারতেন কিন্তু এতো বিপুল বাহিনীর সমাগমকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল সামরিক বিচেনায় মারাত্মক ভুল। ফলে এই দুর্গের সৈন্যদের পরাস্ত করা জরুরী হয়ে পড়ল।

৯৩ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের শেষ সপ্তাহে বিন কাসিম রাওয়া দুর্গ থেকে রওয়ানা হলেন। বিন কাসিম ভেবে ছিলেন পূর্বের মতো তিনি হয়তো শত্রুবাহিনীর অজ্ঞাতে বাহরু পৌঁছে যাবেন। কিন্তু তাঁর এই ধারণা ছিল ভুল। কারণ বাহরু দুর্গ অবরোধের সাথে সাথে সেখানকার নওজোয়ান সৈন্যরা তাঁর বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড তীর বৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করে। মুসলমানরা যখন অবরোধে লিপ্ত ঠিক সেই সময় অভাবনীয় ভাবে শত্রু বাহিনীর পক্ষ থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়। দৃশ্যত দুর্গপ্রাচীরে অবস্থান নেয়া সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা আতঙ্কিত ভীত। আর দুর্গের ভিতরে লোকজনের অবস্থান আছে বলেও মনে হচ্ছিল না। দুর্গপ্রাচীরের সৈন্যদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তারা মুসলিম সৈন্যদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে ভয় পাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীরের একেবারে কাছে চলে গিয়ে ছিল। এই সুযোগে শত্রুসেনারা তাদের ওপর তীরের তুফান বয়ে দিল। ফলে বহু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ল এবং অবরোধ চেষ্টা ভেঙে পড়ল। মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। এই সুযোগে শত্রু সৈন্যরা দুর্গের প্রধান ফটক ও আরো একটি ফটক খুলে বিদ্যুৎ বেগে মুসলিম সৈন্যদের ওপর হামলে পড়ল।

হিন্দু সৈন্যদের আক্রমণ ছিল তীব্র এবং সুশৃঙ্খল। আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানরা কাবু হয়ে গেল। প্রতিরোধের আয়োজন করার আগেই ওরা তাদের লক্ষ্য পূর্ণ করে দুর্গে ফিরে যেতে শুরু করল।

এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে বিন কাসিমকে তাঁর রণকৌশল এবং চিন্তা-ভাবনাকে ঢেলে সাজাতে হলো। তিনি সকল সৈন্যকে পিছনে সরিয়ে আনলেন। তখন পর্যন্ত হিন্দুদের আক্রমণে শাহাদাত বরণকারী যোদ্ধাদের লাশ তাদের সামনে পড়ে রয়েছে এবং যেসব যোদ্ধা মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে ওঠার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তারা ময়দানে পড়ে পড়ে কষ্টযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। দিন শেষে রাতের বেলায় নিহত ও আহত সহযোদ্ধাদের উঠিয়ে আনা হলো। পরদিন বিন কাসিম কোন ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নিলেন না। আহত ও নিহতদের সেবা শুশ্রূষা দাফন কাফনেই দিন চলে গেল। দিন শেষে সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে বিন কাসিম তাদের সাথে পরামর্শ করে নতুন সমরকৌশল গ্রহণ করলেন। সকল মুসলিম কমান্ডারই বুঝতে পেরেছিল, এই দুর্গ জয় করার ব্যাপারটি সহজসাধ্য হবে না।

তৃতীয় দিন বিন কাসিম তীরন্দাজ ও দুর্গ ভেদকারী সৈন্যদের এক জায়গায় জমা করলেন। বিন কাসিম তীরন্দাজকে নির্দেশ দিলেন, ডানে বামে এবং দেয়ালের ওপরে এ ভাবে তীর নিক্ষেপ করবে যাতে দেয়ালের ওপরের কোন শত্রু সৈন্য মাথা ওপরে উঠাতে না পারে? তীরান্দাজরা তীর বর্ষণ শুরু করতেই বিন কাসিম প্রশিক্ষিত দেয়াল ছিদ্রকারীদের দৌড়ালেন। তারা দেয়ালে গাত্রে আঘাত করতে শুরু করল। কয়েক আঘাত করার পরই দেখা গেল দেয়াল খুব শক্ত নয়, পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি। আঘাত করতেই পাথর দেয়াল গাত্র থেকে খসে পড়তে শুরু করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল দুর্গপ্রাচীরটিকে যতোটা নরম ভাবা হয়েছিল আসলে ততোটা নরম নয়। দেয়ালের গড়ন প্যাছানো বাকানো। তাছাড়া দেয়ালটির নীচের অংশ খুবই পুরু। তাতে ভাঙন ধরানো মানে রীতিমতো পাহাড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করা।

দুর্গপ্রাচীর ভাঙার কাজে যে পরিমাণ আরব যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা নির্বিঘ্নে কাজ করলে তাদের পক্ষে দুর্গপ্রাচীরে গর্ত সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রাচীরের কোণায় পাহারারত প্রহরীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ না করতে পারায় তারা মুসলিম যোদ্ধাদের দেয়াল ভাঙার অভিযান দেখে ফেলল। তারা দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে বড় বড় পাথর ও গাছের কাণ্ড নীচে ফেলার ব্যবস্থা করল। সেই সাথে জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নীচে গড়িয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে নীচের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বড় বড় পাথর গাছের কাণ্ড ও জ্বলন্ত কাঠ ফেলতে শুরু করলে দেয়াল গাত্রে ধাক্কা খেয়ে পাথর কাঠ নীচে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

হিন্দু সৈন্যদের এই ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্যে মুসীবত বয়ে আনল। ওপর থেকে পতিত পাথর ও জ্বলন্ত কাঠে বেশ কজন মুসলিম সৈন্য ঝলসে গেল এবং শরীর থেতলে গেল। কয়েকজন সৈন্য মারাত্মক ভাবে পাথর চাপা পড়ে আহত হলো। মোট কথা, কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে হিন্দুসৈন্যদের এই উদ্যোগ সফল হলো। অবশ্য হিন্দুদের এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে তাদের বেশ কয়েকজন সৈন্য তীর বিদ্ধ হয়ে নিহত হলো। কিন্তু তাতেও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কোন ধরনের শৈথিল্য দেখা গেল না।

✪ ✪ ✪

অবশেষে বিন কাসিমের দুর্গপ্রাচীর ভাঙার কৌশলও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ফলে এটা ত্যাগ করে বিন কাসিম দুর্গফটক ভাঙার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু হিন্দু তীরন্দাজরা আরব সৈন্যদেরকে দুর্গফটকের ধারে কাছে ভীড়তেই দিচ্ছিল না। কয়েক ধরনের কৌশল অবলম্বন করলেন বিন কাসিম। কিন্তু কোন কৌশলই দুর্গফটক ভাঙার কাজে সফল হলো না। অপর দিকে হিন্দু সৈন্যরা দুর্গফটক দিয়ে হঠাৎ বের হয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আবার দুর্গে ফিরে যাওয়ার কৌশলও অব্যাহত রাখল।

অবশেষে বিন কাসিম বুঝতে পারলেন, আমরা যেমন রাতের বেলায় ঝটিকা আক্রমণ করে পালিয়ে যাই হিন্দু সৈন্যরাও অবরোধ ভাঙার জন্য এই ঝটিকা ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে।

শত্রুদের এই ব্যবস্থা ব্যর্থ করার জন্য বিন কাসিম চিন্তা করলেন, হিন্দু সৈন্যরা যখন দুর্গ থেকে বের হয়ে ঝটিকা আক্রমণে অগ্রসর হবে তখন আমরা ওদেরকে ঘেরাও এর মধ্যে ফেলে কুপকাত করব।

এই চিন্তার তিন দিন পর পুনরায় হিন্দু সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলিম সৈন্যদের উপর আক্রমণে অগ্রসর হলো। তখন মুসলিম সৈন্যরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ডানে-বামে অগ্রসর হয়ে হিন্দু সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে ফেলল। এই ঘেরাও করতে গিয়ে মুসলিম যোদ্ধারা দুর্গফটক ও প্রাচীরের একেবারে কাছে চলে গিয়েছিল, ফলে তাদের দিকে দুর্গপ্রাচীর থেকে তীর বৃষ্টির

পাশাপাশি পাথর নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করল। এমতাবস্থায় হিন্দু অশ্বারোহীরা অশ্বহাঁকিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের মাড়িয়েই আবার দুর্গে ঢুকে পড়ল।

এবার বিন কাসিম বিরাট ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি কয়েকজন জীবন ত্যাগী যোদ্ধাকে দুর্গফটকের কাছাকাছি অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। এবার দুদিন পর হিন্দু সৈন্যরা দুর্গ থেকে বের হলো। এদিকে ওদের বের হতে দেখেই মুসলিম যোদ্ধারা ঘোড়া হাঁকাল। এবার উভয় দলের মধ্য শুরু হলো মুখোমুখি সংঘর্ষ। মুসলিম যোদ্ধারা পূর্ব থেকে তরবারী ও বল্লম নিয়ে প্রস্তুত ছিল ফলে হিন্দু সৈন্যরা বের হতেই ওদের ওপর মুসলিম যোদ্ধারা হামলে পড়ল। যেহেতু মুসলিম সৈন্যরা ছিল দুর্গের বাইরে এজন্য তারা ডানে-বামে ইচ্ছামতো মোড় নিতে পারছিল কিন্তু হিন্দুদের সেই সুযোগ ছিল না, কারণ তারা এদিক সেদিক হতে চাইলেই প্রতিপক্ষের সহজ আক্রমনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে এবার আরব সৈন্যরা ওদের কাবু করে রীতিমতো কচুকাটা করতে লাগল।

দৃশ্যত পরিস্থিতি এমন মনে হচ্ছিল যে, মুসলিম সৈন্যরা এবার ওদের কচুকাটা করে দুর্গে প্রবেশ করবে। বিন কাসিম সহযোদ্ধাদের উৎসাহিত করতে একেবারে কাছে চলে গিয়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে বিন কাসিমের ঘোড়ার জিনে বিদ্ধ হলো। অবস্থা এমন যে তাঁর জীবন মৃত্যুর মাঝে মাত্র কয়েক চুল ব্যবধান ছিল। এই অবস্থা মুসলিম শিবিরের এক অশ্বারোহী দেখে ফেলল। বিন কাসিম তাঁর দিকে ছোড়া তীরটি জিন থেকে তুলে ফেলে দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি একে কোন গুরুত্বই দিলেন না। তিনি বরং বিপুল উৎসাহে সহযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্যে চিৎকার করে তাদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন।

যে আরব যোদ্ধা বিন কাসিমের জিনে তীর বিদ্ধ হতে দেখেছিল, কাল বিলম্ব না করে সে বিন কাসিমের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। সে এসে বলল, সম্মানিত প্রধান সেনাপতি! আপনি এখান থেকে চলে যান। আল্লাহ না করুন, আপনি না থাকলে আমাদের সবকিছুই নাই হয়ে যাবে।

যাও এখান থেকে, নিজের জায়গায় চলে যাও। সেই যোদ্ধাকে ধমক লাগালেন বিন কাসিম। কিন্তু সেই আরব যোদ্ধা প্রধান সেনাপতির ধমকি হুমকিকে কোন পরওয়া না করে, থাবা দিয়ে বিন কাসিমের ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁর ঘোড়া দৌড়িয়ে দিল। বিন কাসিম চিৎকার করলেন কিন্তু সেই

সহযোদ্ধা তাঁর চিৎকারে থামল না। তাঁর ঘোড়াকে টেনে অনেকটা দূরে নিয়ে গেল যেখানে তীর বিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ইবনে কাসিম! আপনার মূল্য অনেক। আমার মতো হাজারো আরব মারা গেলে কিছু হবে না।

এই অশ্বারোহী বিন কাসিমকে পুনর্বার কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই লড়াইয়ের দিকে অশ্ব হাঁকাল। ঠিক সেই সময় একটি তীর এসে তার পাজরের নীচে বিদ্ধ হলো। যোদ্ধাটি তীর বিদ্ধ হয়ে ঘোড়া থেকে এক পাশে ঝুকে পড়তে শুরু করল, বিন কাসিম তা দেখে বিজলীর মতো গিয়ে তাকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন এবং তার ঘোড়াটিকেও বিন কাসিম নিজের ঘোড়ার পিছনে আটকে ফেললেন।

আপনি জীবিত থাকুন বিন কাসিম! আপনি বেঁচে থাকলে বিজয় আমাদের অনিবার্য। একথা বলতেই যোদ্ধার মাথা বিন কাসিমের ঘাড়ে নেতিয়ে পড়ল। বিন কাসিম তাকে ধরাধরি করে ঘোড়া থেকে নামানোর জন্য আর দু'জনকে ডাক দিলেন।

অপর দিকে হিন্দু বাহিনীর চোখের সামনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তাদের মনে হচ্ছিল এবার আর রক্ষা নেই, মুসলিম বাহিনী দুর্গে ঢুকে পড়বে। ভয় পেয়ে বিপুল সংখ্যক হিন্দুযোদ্ধাকে দুর্গের বাইর রেখেই তারা দুর্গফটক বন্ধ করে ফেলল। দুর্গে ফেরার পথ বন্ধ হতে দেখে হিন্দু সৈন্যদের মন ভেঙে গেল। আর এই সুযোগে আরব যোদ্ধারা ওদেরকে কচুকাটা করল।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিমকে তাঁর কোন এক সেনাপতি পরামর্শ দিলেন, লড়াই না করে অবরোধ দীর্ঘায়িত করা হোক যাতে কষ্ট যাতনায় অতীষ্ট হয়ে দুর্গবাসীরা সৈন্যদেরকে অস্ত্র সমর্পনে বাধ্য করে। সেই যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাসের পর মাস দুর্গ অবরোধ করে রেখে শত্রুদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হতো। এমন ছিল যে, টানা দু'বছর পর্যন্তও অবরোধ ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত দুর্গপতি আত্মসমর্পন করে প্রথমেই বলতো, যা আছে আমাদের আগে কিছু খাবার দাও।

না, তা হতে পারে না, প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন বিন কাসিম। আমার হাতে এতো সময় নেই। আমাদের লক্ষ্য বহু দূর। অথচ জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া আমি শত্রুদের এ ধারণা করার সুযোগ দিতে চাই না

যে, আমরা তাদের শক্তিকে ভয় পেয়ে দূরে বসে আছি। এখন থেকে রাতেও লড়াই অব্যাহত থাকবে।

সকল সেনাপতি ডেপুটি সেনাপতি ও কমান্ডারদেরকে ডাকলেন বিন কাসিম। তিনি গোটা বাহিনী ও অফিসারদের দু'ভাগে ভাগ করলেন। নির্দেশ দিলেন, এক অংশ দিনের কার্যক্রম চালু রাখবে এবং অপর অংশ রাতের বেলায় অগ্নিতীর ও মিনজানিক চালাবে।

পর দিন থেকে নতুন নিয়মে লড়াই শুরু হল। দিনের বেলায় উভয় দিক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হতো, দেয়াল ভাঙার ইউনিট দেয়াল গাত্রে ছিদ্র করার চেষ্টা চালাতো, আবার কখনো শত্রুপক্ষের কোন ইউনিট বেরিয়ে এসে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে আবার দুর্গে চলে যেত। এটা ছিল গতানুগতিক রীতি। কিন্তু একরাতে হঠাৎ দুর্গের ওপর থেকে আগুন পড়তে শুরু করল আর দুর্গের ভিতরে ভারী পাথর আঘাত হানতে শুরু করল।

অগ্নিতীর নিক্ষেপের প্রথম রাতেই এই সাফল্য দেখা গেল যে দুর্গের ভিতর থেকে আগুনের কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেল। তাতে বুঝা গেল ঘরবাড়ি জ্বলছে। একপর্যায়ে বিন কাসিম অগ্নিতীর ও পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করিয়ে দিলেন, কারণ জ্বালানী ও পাথর তাঁকে খুবই কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ সিন্ধু অঞ্চলের এ জায়গাটা বালুময় এখানে কোন পাথর নেই।

জ্বালানী সংকটও তীব্র। অতএব পাথর ও জ্বালানীর ব্যবহার সঠিক ভাবে করা না হলে তাঁর বাহিনীকেই জরুরী এই দুটি পণ্যের জন্যে বিপদে পড়তে হবে।

পরদিন সকল বেলায় সৈনিকদের পালা বদল হলো। দিনের ডিউটি করার জন্য সৈন্যরা রাতের সৈন্যদের স্থলাভিষিক হল। গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, আজ যদি শত্রুবাহিনী ঝটিকা অভিযান চালায় তবে ওদের দু'চারজনকে জীবিত পাকড়াও করার চেষ্টা করবে।

সেদিনের দ্বিপ্রহরের পর একটির বদলে একসাথে দুর্গের তিনটি ফটক খুলে গেল। এসব ফটকের একটি দিয়ে পদাতিক এবং অপর দুটি দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যরা দ্রুত বেরিয়ে জোরদার ঝটিকা আক্রমণ চালালো কিন্তু মুসলমানরা যেহেতু পূর্ব থেকেই জীবিত শত্রুসেনা পাকড়াও করতে প্রস্তুত ছিল, তাই তারা পূর্ণ সতর্কতায় এ ভাবে মোকাবেলা করল যে, তিন শত্রু সৈন্যকে তারা পাকড়াও করে ফেলল এবং কয়েকজন আহত সৈন্যকে ফেলে রেখেই বাকীরা দুর্গে ফিরে গেল।

জীবিত ও আহত শত্রু সেনাদেরকে গোয়েন্দা প্রধানের কাছে নেয়া হলো। তিনি শত্রুসেনাদের প্রত্যেককেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলেন। গতরাতে দুর্গের ভিতরে কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং এই আক্রমণ সম্পর্কে দুর্গবাসীরা কি বলাবলি করছে?

মৃত্যুভয়ে শত্রুসৈন্যদের অনেকেই দুর্গের প্রকৃত অবস্থা বলে দিল। পাথর বর্ষণে কয়েকটি দালান বাড়ির ছাদ ধসে গিয়েছিল। ফৌজী আস্তাবলে পাথর পতিত হওয়ায় ডজন খানিক ঘোড়ার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি আশাপ্রদ ঘটনা ছিল দুর্গবন্দি শহরবাসী পাথর ও অগ্নিবাহী তীর নিক্ষেপে মারাত্মকভাবে ভয় পেয়ে গেছে। ভয়ে লোকজন ঘরের বাইরে খোলা আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করতে শুরু করে। সাধারণ লোকজনের মধ্যে মারাত্মক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সৈন্যও অগ্নিতীর এবং পাথর নিক্ষেপে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, সেনাদের রসদপত্র ও সাজসরঞ্জাম কোথায় রাখা হয়েছে? তারা কয়েকটি সেনা ছাউনীর কথা বলল। এও জানালো, কোথায় সৈন্যদের রসদপত্র রাখা হয় এবং দুর্গপ্রাচীরে থেকে এগুলোর দূরত্বের কথাও তারা জানিয়ে দিলো ওদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে গোয়েন্দা প্রধান বিন কাসিমকে জানালেন, আজ রাতে এসব স্থানে পাথর ও অগ্নিতীর নিক্ষেপ করতে হবে।

সূর্য ডুবে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল রাত। রুটিন মতো মুসলমান তীরন্দাজ ও মিনজানিক ইউনিট দুর্গপ্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। হিন্দু বন্দিদের থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য মতে লক্ষ বস্তুতে আঘাত হানতে মিনজানিকগুলো তীরন্দাজদের সুবিধা মতো জায়গায় দাঁড় করানো হলো। দুর্গের অধিবাসীরা যাতে নিরাপদ মনে করে ঘরে ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে এজন্য তীর ও পাথর নিক্ষেপ অর্ধরাতের পর করার সিদ্ধান্ত হলো। ঘুমন্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত পাথর ও অগ্নিতীরে আতঙ্কিত মানুষ ঘাবড়ে গিয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে দেবে এবং প্রতিরোধের কথা চিন্তা করার অবকাশ পাবে না। এ ধরনের হুলস্থুল কাণ্ড মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়, পরিস্থিতি বেশামাল হয়ে পড়ে।

মাঝরাতের পর সবগুলো মিনজানিক থেকে একই সাথে পাথর নিক্ষিপ্ত হলো, সেই সাথে অগ্নিবাহী তীরগুলো শুরু করল অগ্নিবর্ষণ। কিছুক্ষণ পর

দ্বিতীয় বার একই সাথে মিনজানিকগুলো পাথর নিক্ষেপ করল। এবার দুর্গের ভিতরকার লোকজনের চিৎকার চেচামেচি হই হুল্লোড় এতোটাই প্রকট শোনা গেল যেন দুর্গের সব লোক দুর্গপ্রাচীরের ওপরে উঠে চিৎকার করছে। দুর্গের এপাশ থেকেও দেখা গেল নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে বাড়িঘর ধ্বংসে পড়ার শব্দ। বিন কাসিম এদিক থেকে ঠিকই অনুমান করলেন এ মুহূর্তে শহরে কোন পর্যায়ে হই হুল্লোড় শুরু হয়েছে। প্রাচীরের এ পাশ থেকে দেখা গেল বিশাল কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। আগুনের শিখা এতোটাই ওপড়ে উঠে গেল যে, দুর্গের সবটাই আলোকিত হয়ে গেল। দুর্গের আগুনের আলো দুর্গের বাইরেও আলোকিত করে ফেলল। এই অগ্নিকাণ্ড ঘটলো দুর্গপ্রাচীরের কাছেই সৈন্যদের ঘোড়ার খাবার হিসাবে সংরক্ষিত ঘাসের স্তুপে অগ্নি সংযোগের কারণে। মুসলিম তীরন্দাজদের ছোড়া অগ্নিতীর হিন্দু সৈন্যদের সংরক্ষিত পশু খাদ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে ওঠে আগুন। গোটা এলাকা গ্রাস করে ফেলে আগুনের কুণ্ডলী। এসময় দুর্গপ্রাচীরের ওপরে দাঁড়ানো হিন্দু প্রহরীদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন একেকটি জীবন্ত ভূত।

ইবনে কাসিম! এরা আগুন নেভাতে গিয়ে দুর্গের গোটা পানিই খরচ করে ফেলবে। দেখবেন পানির অভাবে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ওরা আগামীকালের মধ্যে আত্মসমর্পন করতে দুর্গের ফটক খুলে দেবে, বিন কাসিমের কাছে এসে বললেন, এক জ্যৈষ্ঠ সেনাপতি।

হু, দুর্গে আপনার মতো এমন বুদ্ধিমান সেনাপতির অভাব নেই। আমরা এতোদূর পর্যন্ত এসে অনায়াসে দুর্গেরপর দুর্গ জয় করেছি কিন্তু এই দুর্গটি দখলে নিতে কঠিন বাঁধার মুখে পড়তে হয়েছে। আপনি কি দেখেননি, এরা কতো শক্তিশালী মোকাবেলা করছে? বললেন বিন কাসিম। আপনি ভেবেছেন, এখানে পানি স্বল্পতা দেখা দেবে কিন্তু এটা ভাবতে পারেননি, এরা আগুন নেভাতে পানির বদলে বালু ব্যবহার করবে। কারণ এখানে বালুর কোন অভাব নেই। আগুন নেভাতে পানির চেয়ে বালু আরো বেশি কার্যকর।

তবুও দেখবেন আগামী সন্ধ্যার মধ্যে আমরা দুর্গে প্রবেশ করবো, বললেন সেনাপতি।

বলুন এখুনি দুর্গে প্রবেশ করবো আমি। আগামীকাল পর্যন্ত বেচে থাকার কোন নিশ্চয়তা কি আপনার কাছে আছে? তিনি একান্ত এক সংবাদ বাহককে বললেন, প্রাচীর গর্তকারী ইউনিটকে এখুনি আসতে বল।

বিন কাসিম দেখতে পাচ্ছিলেন, দুর্গের ভিতরে মারাত্মক হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। দুর্গপ্রাচীরের ওপর কোন সৈন্যকেই আর দেখা যাচ্ছে না। প্রাচীর ছিদ্রকারী ইউনিট এলে বিন কাসিম নিজে তাদেরকে নিয়ে দুর্গপ্রাচীরের কাছে চলে গেলেন। প্রাচীর গাত্রে হাত রেখে একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন, এই জায়গায় ছিদ্র করার চেষ্টা কর। এতটুকু ছিদ্র করবে, যাতে দু'জন পদাতিক সৈন্য নির্বিঘ্নে ঢুকতে পারে।

✪ ✪ ✪

সৈন্যরা প্রাণপণে দুর্গপ্রাচীর ভাংতে শুরু করল। বিন কাসিম দুর্গপ্রাচীর থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সেনাপতিদের ডেকে বললেন, আমার কিছুসংখ্যক জীবন ত্যাগী পদাতিক দরকার, ভেতরের ভয়াবহ হৈ হুল্লোড়ের সুযোগে যারা দুর্গপ্রাচীরের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে। এ দিকে সৈন্যরা বিপুল উদ্যোমে প্রাচীর ভাংতে শুরু করল।

সূর্য ওঠার আগেই দুর্গপ্রাচীরে এমন ছিদ্র করে ফেলল, যা দিয়ে দু'জন বিশালদেহী মানুষও অনায়াসে আসা-যাওয়া করতে পারবে। প্রাচীর ভেদ করে দুর্গে প্রবেশের জন্যে নির্বাচিত সৈন্যরা নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। তন্মধ্যে সবার অগ্রগামী ছিল বসরার অধিবাসী হারুন বিন জাফর, আর দ্বিতীয়জনের নাম আবুল কাসেম। এই দু'জনের পরেই যারা দুর্গেরপ্রবেশ করলো এদের মধ্যে কয়েকজন ছিল মুকুর সৈন্য। আগেই বলা হয়েছে, রাওয়া যুদ্ধ থেকেই মুকু তার দলবল নিয়ে বিন কাসিমের সাথেই ছিল এবং সমতালে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছিল। এবার দুর্গে প্রবেশের জন্য মুকুর সৈন্যদল থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করা হলো।

অস্বাভাবিক অগ্নিকাণ্ড দুর্গবাসীদেরকে কোন দিকে তাকানোর অবকাশ দিলো না। সাধারণ লোকদের সাথে সৈন্যরাও আগুন নেভাতেই ব্যস্তছিল। লোকজন নিজেদের জরুরী আসবাবপত্র টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এমতাস্থায় মুসলিম সৈন্যরা হামলে পড়ল। মুসলিম যোদ্ধারা ঢুকে কয়েকজন সবচেয়ে কাছের ফটকের দিকে দৌড়ে গেল। সেখানে মাত্র কয়েকজন হিন্দু সেনা ফটক পাহারায় লিপ্ত ছিল। তারা মুসলিম যোদ্ধাদের কিছুতেই মোকাবেলা করতে পারল না। কারণ তারা যখন দেখল দুর্গের ভেতর থেকে মুসলিম সৈন্যরা তাদের ওপর আক্রমণ করছে, তখন তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

প্রধান ফটক খুলে দেয়াটাই যথেষ্ট ছিল। এর মধ্যে ভোরের আলো বিকশিত হওয়ার আগেই হাজার হাজার সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করল। বিন কাসিম

নিজেও তখন সৈন্যদের সাথে দুর্গে প্রবেশ করলেন। তিনি তার একান্ত বার্তাবাহকদের নির্দেশ দিলেন, সবাইকে বলে দাও কোন বেসামরিক নাগরিকের ওপর যেন আক্রমণ না করা হয়। সেই সাথে তিনি নির্দেশ দেন, কোন নারী ও শিশুর ওপর যেন হাত উঠানো না হয়। তাদেরকে যেন পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হয়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, দুর্গের সৈন্যরা ছিল সত্যিকার অর্থেই লড়াকু, তারা বিপদ আসন্ন দেখে মৃত্যুপণ করে মোকাবেলা করল। কিন্তু সকল মুসলিম সৈন্য তখন দুর্গে প্রবেশ করে প্রবল বিক্রমে হিন্দুদের ওপর হামলে পড়েছে। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে ষোল হাজার হিন্দু সৈন্যের মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যককে পাকড়াও করা গেল, আর বাকীরা নিহত হলো। কিছুসংখ্যক সৈন্য পালিয়ে যেতেও সক্ষম হলো।

দুর্গ জয় হলো বটে কিন্তু বিন কাসিম ও মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা এমন হলো যে, ক্লান্তি ও অবসন্নতায় তাদের আর চলার শক্তি ছিল না। প্রায় দু'মাস চলে গিয়েছিল এই দুর্গের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করতে, এতো কষ্টকর দুর্গজয়ের পরও বিন কাসিমের পক্ষে দীর্ঘ বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ ছিল না। কারণ তখনো তাঁর সামনে অজেয় দাহলিলা ও ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ। যেখানে শত্রুবাহিনী শক্তি সঞ্চয় করছিল বলে তাঁর কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। বিন কাসিম আশঙ্কা করছিলেন এই দুর্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু সৈন্যরা দাহলিলা দুর্গের শক্তি বৃদ্ধি করবে। নয়তো দাহলিলা দুর্গকে খালি করে সকল হিন্দু ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে গিয়ে জড় হয়ে বিশাল শক্তিসঞ্চয় করবে। এই আশঙ্কা বোধ করে সৈন্যদেরকে দীর্ঘ বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে বিন কাসিম দাহলিলা দুর্গের দিকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিলেন, যাতে ওখানে গিয়ে সৈন্যরা প্রস্তুতি নেয়ার আগেই তিনি দুর্গ কব্জা করতে পারেন। অবশ্য অগ্রাভিযানের অর্থ এই ছিল না যে, পরদিনই তিনি রাওয়া দুর্গ ত্যাগ করেছিলেন। এখানকার প্রশাসনিক অবস্থা পুনর্বহাল করতে তাঁর কয়েক দিন লেগে গেল। প্রায় সপ্তাহখানিক সময় তাঁর এই দুর্গের পরিস্থিতি সামলাতেই চলে গেল।

রাওয়া দুর্গ থেকে রওয়ানা হতেই দুই গোয়েন্দা এসে বিন কাসিমকে খবর দিলো, দাহলিলা দুর্গে তেমন কোন বেসামরিক লোক নেই। ভয়ে সব

বেসামরিক লোক চলে গেছে নয়তো সৈন্যরাই তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে শুধু সৈন্যরা অবস্থান করছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকেরা ওখানে গিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। ওরা বলেছে, বাঁচতে চাইলে দুর্গ ছেড়ে পালাও মুসলিম বাহিনী আসছে। দুর্গে থাকলে পুড়ে মরতে হবে। এখানে অগ্নিতীর ও মিনজানিক থেকে ছুড়া পাথরের আতঙ্ক এরা এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, বেসামরিক লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে লোকজন নিয়ে দুর্গ থেকে চলে গেছে।

এখান থেকে যেসব সৈন্য পালিয়ে গেছে, ওরা কি দাহলিলা দুর্গে উঠেছে? গোয়েন্দাদের কাছে জানতে চাইলেন বিন কাসিম। ওরা পরস্পর কি বলাবলি করে? তোমরা কি ওদের কথাবার্তা শুনতে পেরেছ?

এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা বেসামরিক লোকদের চেয়ে বেশি আতঙ্কিত, বলল গোয়েন্দা। কিন্তু সৈনিক হওয়ার কারণে ওরা পাল্টা লড়াই করতেই ওখানে থেকে গেছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, ওরা দাহলিলা থেকেই সবার আগে পালানোর চেষ্টা করবে। ওরা যে ভাষায় এই দুর্গের হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছে, তাতে সৈন্যদের মধ্যেও যে আতঙ্ক ভর করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গোয়েন্দাদের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, দাহলিলার সৈন্যরা অনেকটাই ভীতু কিন্তু বিন কাসিম দাহলিলা দুর্গ অবরোধের পর বুঝতে পারলেন আসলে যতটা ভীতু মনে করা হয়েছিল, এখানকার সৈন্যরা ঠিক ততোটা ভীতু নয়।

'দুর্গ আমাদের কব্জায় দিয়ে দাও; তোমরা তো রাওয়া দুর্গের অবস্থা জানো' ঘোষক দিয়ে প্রচার করালেন বিন কাসিম।

যারা পালিয়ে যাওয়ার তারা এখান থেকে চলে গেছে। পাথর ফেলো, আগুন লাগাও, দুর্গ জ্বালিয়ে দাও। কিন্তু দুর্গফটক খোলা হবে না। জবাব আসলো দুর্গপ্রাচীর থেকে।

আমরা যদি দুর্গ জয় করি, তাহলে কিন্তু কারো জীবন রক্ষা পাবে না? হুমকি দিলেন বিন কাসিম।

আমাদের একটি সৈন্য জীবিত থাকতেও তোমরা দুর্গের দখল নিতে পারবে না, জবাব এলো দুর্গপ্রাচীর থেকে। বিন কাসিম চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে দুর্গপ্রাচীর নিরীক্ষণ করলেন, সেই সাথে তাঁর নিজের সৈন্যদের অবস্থানও দেখে নিলেন, তারা ঠিকমতো যথাস্থানে অবস্থান নিতে পেরেছে কি-না।

বিন কাসিম যখন দুর্গপ্রাচীরের চতুর্দিক দেখছিলেন, তখন তাঁর দিকে তাক করে শত্রুরা একটি তীর ছুড়লো। তীরটি বিন কাসিমের অবস্থান থেকে খানিকটা দূরে এসে মাটিতে পড়ল।

শত্রুবাহিনীর তীর দেখে মুসলিম সৈন্যরাও তীর ছুড়তে শুরু করল। শুরু হলো উভয় দিক থেকে তীরবৃষ্টি। এখানকার সৈন্যরাও রাওয়ার সৈন্যদের কৌশল অবলম্বল করল। হঠাৎ দুর্গফটক খুলে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আবার দুর্গে ফিরে গেল।

এই দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপ ও অগ্নিতীর কোন ফল বয়ে আনার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ এখানকার বসবাসকারী সাধারণ লোকজন দুর্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দৃশ্যত দুর্গ ছিল লোকশুন্য। প্রশিক্ষিত সৈন্য ছাড়া আর লোকজন তেমন ছিল না। তাছাড়া রাওয়া দুর্গের ক্ষয়ক্ষতির কথা শুনে এখানকার সৈন্যরা তাদের সব সামরিক সরঞ্জাম দুর্গপ্রাচীর থেকে দূরে রেখেছিল।

বিন কাসিম পূর্বেকার সবকৌশলই পরীক্ষা করলেন কিন্তু কোনটিই তেমন ফলোদয় হলো না। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শত্রুবাহিনী যখন ঝটিকা আক্রমণে বের হবে তখন এদেরকে ঘেরাও করে হত্যা করতে হবে। এই পদ্ধতিতে কিছুটা কাজ হলো। শত্রু বাহিনীর জনবল কমতে শুরু করল। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকল। একপর্যায়ে তিনি দুর্গফটকের ওপর পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এতেও কিছুটা কাজ হলো। ফটক খুবই মজবুত ছিল, পাথর নিক্ষেপে তা ভাঙ্গা সম্ভব ছিল না কিন্তু হিন্দু সৈন্যরা তাতে ভীত বিহ্বল হতে লাগল। কারণ তাদের মনোবল এমনিতেই ভঙ্গুর ছিল।

শত্রু সৈন্যদের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য বিন কাসিম নতুন কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, এখন থেকে তীরন্দাজ ইউনিট দুর্গফটকের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি অবস্থান করবে, শত্রু সৈন্যরা যখনই দুর্গফটক খুলে বের হবে তখনই ওদের ওপর তুমুল তীরবৃষ্টি শুরু করবে। বিন কাসিমের এই কৌশলও কিছুটা কার্যকর প্রমাণিত হলো। কিন্তু সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পরও দু'মাস পর্যন্ত অবরোধ বহাল রাখতে হলো। দু'মাসের টানা অবরোধে শত্রু সৈন্যরা জনবল হারিয়ে যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল তদরূপ সরঞ্জামাদির সাপ্লাই না থাকায় তারা নানা দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। অবশেষে একদিন দুর্গফটক খুলে একটি মৌনমিছিল বের হতে দেখা গেল। মিছিলের সবার পরনে সাদা পোশাক এবং সবাই পদব্রজে

অস্ত্রহীন। সবার শরীর থেকে আতরের ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। মিছিলটি গুণগুণিয়ে কি যেন জপমালা পাঠ করতে করতে মুসলিম সৈন্যদের অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। একটু পরেই দেখা গেল দুর্গফটক খালি, দুর্গপ্রাচীরের কোথাও কোন সৈন্য নেই। দুর্গের সৈন্যরা যখন দেখল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার মতো কোন শক্তি আর তাদের অবশিষ্ট নেই, তখন তারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে শোক মিছিল সহকারে নিরস্ত্র অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেল। করল নীরব আত্মসমর্পণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তারা কোন লোকালয় বা দুর্গের দিকে না গিয়ে বিজন মরুভূমির পথে চলে গেল।

বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। তারা শত্রুসৈন্যদের রেখে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র একত্রিত করলেন। দুর্গের ভিতরে কিছুসংখ্যক বেসামরিক লোক ছিল। তাদের বলা হলো, তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজনদের দুর্গে ফিরে আসার জন্য খবর দাও। নাবাহ বিন হারুনকে বিন কাসিম দাহলিলা দুর্গের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন এবং এখানেই অবস্থান নিলেন।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম দাহলিলা দুর্গ থেকে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজা মহারাজাদের কাছে পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে তিনি হিন্দু রাজা মহারাজাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। এই দাওয়াত ছিল সৌজন্যমূলক। তাতে কোন ধরনের হুমকি ছিল না। পয়গামে তিনি ইসলামের আদর্শিক সৌন্দর্যের কথা লিখলেন এবং ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর বর্ণনা দিলেন। তিনি আরো লিখলেন, এপর্যন্ত যেসব এলাকা আমরা জয় করেছি, সেগুলোর অধিবাসীদের খোঁজ নিয়ে দেখুন, তারাই ইসলামের সৌন্দর্যের কথা বলতে পারবে।

দাহলিলা দুর্গে চারজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করল। তাদেরকে বিন কাসিমের কাছে সরাসরি না নিয়ে আগে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর কাছে উপস্থিত করা হলো। এটা ছিল গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর নির্দেশ। যেকোন অজ্ঞাত পরিচয় লোক এলে যাতে বিন কাসিমের কাছে সরাসরি যেতে দেয়া না হয়। কারণ তাতে তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। কোন শত্রুর চর তাঁর ওপর অতর্কিতে আত্মঘাতি আক্রমণ করে বসতে পারে। বিন কাসিমের নিরাপত্তার

প্রশ্নে প্রহরীদের প্রতি এমর্মে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন গোয়েন্দা প্রধান। লোক চারজন এসে বিন কাসিমকে জানালো, তারা রাজা দাহিরের এক মন্ত্রী সিয়াকর এর পক্ষ থেকে এসেছে। সিয়াকর একান্তই বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকার করে তার সংস্পর্শে থাকতে আগ্রহী। তবে ইসলাম গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে সে স্বাধীন থাকতে চায়।

সিয়াকর ছিল রাজা দাহিরের মন্ত্রী সভার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও জ্ঞানী উজির। শা'বান ছাকাফীও বিন কাসিমকে সিয়াকরের জ্ঞান বুদ্ধি সম্পর্কে আগেই অবহিত করেছিল।

সিয়াকরের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার সংবাদে উভয়েই খুব খুশি হলেন। বিন কাসিম আগত চার দূতকে ক্ষমামূলক পয়গাম দিয়ে তাদের বিদায় করলেন। ওদের চলে যাওয়ার কয়েক দিন পর সিয়াকর নিজে বিন কাসিমের দরবারে হাজির হলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, ডাভেল দুর্গ জয়ের পর দাহিরের হাতে যেসব আরব বন্দি ছিল সবাইকে মুক্ত করে বিন কাসিম তাৎক্ষণিক ভাবে আরব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সব বন্দি ডাভেল দুর্গে ছিল না। কিছু বন্দি উরুঢ়ে মন্ত্রী সিয়াকরের তত্ত্বাবধানে ছিল। যাদের সম্পর্কে এর আগে বিন কাসিমের কাছে কোন তথ্য ছিল না। সিয়াকর তার বিশ্বস্ততা জোরদার করার জন্যে তার আওতাধীন আরব বন্দিদের সাথে নিয়ে এলো এবং বিন কাসিমের উদ্দেশে বলল, মহান সেনাপতি! আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ হিসাবে আমি এদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছি। এরাও সেই আরবদের সাথেই বন্দি হয়েছিল কিন্তু ডাভেল দুর্গে না রেখে এদেরকে উরুঢ়ে রাখা হয়েছিল। সিয়াকরের নিয়ে আসা বন্দিদের সবাই ছিল নারী। কিন্তু এরা সবাই ছিল বয়স্কা এবং পরিশ্রমী। দেখেই মনে হলো এরা আরব বংশোদ্ভূত নয়। প্রকৃতপক্ষে যেসব মুসলমান শ্রীলংকা থেকে হজ করার উদ্দেশে আরব রওয়ানা হয়েছিল এসব নারী ছিল তাদের সেবিকা। এরা আরব বনিকদের সেবাদাসী ছিল। আরবদের সংস্পর্শে গিয়ে এরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বিন কাসিম এদেরকে পরখ করার জন্য আরবীতে নানা কথা জিজ্ঞেস করলে তারা আরবীতে জবাব দিলো। বিন কাসিম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে বন্দি অবস্থায় ওরা কেমন আচরণ করেছে? তারা জানালো, আমরা আগের মালিকের যে সব কাজ করতাম এদের কাছে গেলে তারাও আমাদের দিয়ে অনুরূপ কাজ করিয়েছে। আমরা ঘরদোর ঝাড়ু দিতাম, কাপড়

পরিষ্কার করতাম। ওদের বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো আমাদের খেতো হতো। আলাদা ভাবে আমাদেরকে তেমন কোন খাবার দেয়া হতো না।

বিন কাসিম এদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলেন, এরা বংশানুক্রমে দাস গোষ্ঠীজাত, বন্দিত্বে এদের মালিক বদল হয়েছে মাত্র। মূলত তাদের জীবনের খুব একটা ছন্দপতন ঘটেনি। এরা শুধু অতটুকুই বুঝতে পেরেছিল, তাদের আগের মালিকরা ছিল মুসলমান, আর এরা হিন্দু।

অবশেষে বিন কাসিম সিয়াকরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে তোমার মধ্যে আমাদের আনুগত্য করার বাসনা জাগলো?

এখন আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে আমি রাজার উজির ছিলাম বটে কিন্তু পুরো পরিবার পরিজনসহ রাজার বন্দিত্বে ছিলাম। আমি রাজাকে পরামর্শ দিতাম বটে কিন্তু তখন আমাকে ভাবতে হতো কোন ধরনের কথা রাজা প্রছন্দ করবে। রাজা দাহির যখন মুসলমানদের জাহাজ লুট ও তাদের বন্দি করার চিন্তা করল, তখন আমি বলেছিলাম, এমনিতেই সিন্ধুর প্রতি আরবদের দৃষ্টি রয়েছে। তাছাড়া মাকরানের একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ আরবদের হাতে। এমতাবস্থায় কোনভাবেই আরবদের ক্ষিপ্ত করা ঠিক হবেনা। কিন্তু রাজা আমার পরামর্শ মানল না। এরপর যখন একাধারে দুজন আরব সেনাপতিকে হত্যা করে আরব বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল, তাতে তার দেমাগ আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা এবং নিরঙ্কুশ করার জন্য সে অপর এক প্রভাবশালী উজির বুদ্ধিমানের পরামর্শে নিজের আপন বোনকে পর্যন্ত স্ত্রী করে রাখল।

তোমাদের ধর্মীয় গুরুরা কি রাজাকে সতর্ক করেনি যে, কোন ধর্মেই আপন বোনকে ভাই স্ত্রী করে রাখতে পারে না? সিয়াকরকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম। ধর্মীয় গুরুজন! রহস্যজনক অবজ্ঞাময় হাসি দিয়ে বলল সিয়াকর। ধর্মীয় গুরুরা তো রাজার সন্তুষ্টি লাভকেই ধর্ম মনে করে। আর রাজার নিজের কাছে ধর্মের চেয়ে ক্ষমতা ও রাজপাট বেশি প্রিয় ছিল। পুরোহিত যখন রাজাকে বলল, মহারাজ! আপনার ভবিষ্যত ভগ্নিপতি আপনার কাছ থেকে রাজ্যপাট ছিনিয়ে নেবে। তখন উজির বুদ্ধিমান পরামর্শ দিলো, মহারাজ! আপনিই বোনকে স্ত্রী বানিয়ে ফেলুন, তা হলে আর ভগ্নিপতি অস্তিত্বেই আসবে না। পরিহাসের ব্যাপার হলো, যেসব পুরোহিত রাজাকে তার আপন বোন বিয়ে করতে প্ররোচিত করেছিল, তারাই আমাকে বলেছিল,

জানি না রাজার এই পাপের অভিশাপ রাজদরবার ও প্রজাদেরও ভোগ করতে হয় কি না। আসলে এই পাপের অভিশাপ সবাইকে ঠিকই ভোগ করতে হলো। আমার দুর্ভাগ্য হলো, আমি সেই অভিশপ্ত রাজার উজির হয়ে রইলাম। কিন্তু মনে মনে আমি আশঙ্কা বোধ করছিলাম এই পাপের শাস্তি আমাকেও না হয় ভোগ করতে হবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন, তাহলে আমি আপনার সাথেই থাকবো।

এক আরব সর্দার হারেস আলাফীও তো রাজার দরবারে থাকত।

সে এখন দাহিরের ছেলে জয়সেনার সাথে রয়েছে, বলল সিয়াকর।

সে কেমন লোক? সিয়াকরকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম। কার প্রতি সে মনেপ্রাণে অনুগত?

সে আসলে দুমুখো। আমি জানি, সে আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে, কিন্তু রাজা দাহিরের প্রতিও সে ঠিক ততোটাই বিশ্বস্ত। অবশ্য আমি একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সে আরব শাসকদের প্রতি বিদ্রোহী কিন্তু ইসলামের প্রতি অনুগত। রাজা দাহির তাকে বহু ধরনের লোভ দেখিয়েছে, কিন্তু সে প্রকান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছে আরবদের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধারণ করবে না সে। একপর্যায়ে রাজা দাহির তাকে হুমকি দিলো, রাজা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তার এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। এর জবাবে সে রাজা দাহিরেকে বলেছিল, মাকরানে আশ্রয় প্রাপ্ত আবরদেরকে যদি রাজা এখান থেকে চলে যেতে বলে তাহলে এরা আরব বাহিনীর শক্তিশালী সহযোগীতে পরিণত হবে। তখন তারা রাজধানীর জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে ওঠবে।

বিন কাসিম এতোটা আনাড়ি ও অদূরদর্শী ছিলেন না যে, শত্রুবাহিনীর এক উজিরের কথায় তাকে আপন কোলে আশ্রয় দিয়ে দেবেন। তিনি দৃশ্যত সিয়াকরকে গ্রহণ করলেন এবং প্রকাশ্যে নির্দেশ দিলেন, তাকে রাজদরবারে যে মর্যাদা দেয়া হতো এখানেও সেই ধরনের মর্যাদায় রাখা হোক। আপরদিকে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে বললেন, এর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার, যাতে এর আসল উদ্দেশ্য আন্দাজ করা যায়।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম দাহলিলা থেকে রওয়ানা হয়ে একটি খরস্রোতা নদী পার হয়ে অপর পাড়ে তাঁবু ফেললেন। বিন কাসিম ওখানে অবস্থান নিয়ে জয়সেনাকে একটি লিখিত পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে তিনি লিখলেন, তুমি তোমার বাবার পরিণতি স্বচোখে দেখেছো। সিন্ধের কর্তৃত্ব তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এখন আর কতোদিন তুমি এভাবে পালিয়ে বেড়াবে, আর কোথায় পালিয়ে যাবে? যে ব্রাহ্মণাবাদে তুমি আশ্রয় নিয়েছ, সেটিকেও অস্থায়ী মনে করো। কারণ তোমাদের সৈন্যবাহিনী ও তোমাদের শক্তিশালী হস্তি এবং অশ্ববাহিনী আমাদের হাত থেকে নিজেদেরই রক্ষা করতে পারেনি। আমাদের মোকাবেলায় কোন রণাঙ্গনে দাঁড়াতেই পারেনি। তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম হবে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে সসম্মানে জীবন-যাপন করতে পারবে। তা যদি ইচ্ছা না করো তাহলে অন্তত আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নাও, তাহলেও তোমাকে আমরা বন্দি করব না। আমরা তোমাকে গোলাম বানাতে চাই না। এই অবস্থায়ও তুমি স্বপদে সসম্মানে বহাল থাকবে। তাতেও যদি রাজি না হও, তাহলে এমন এক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকো, যে লড়াইয়ে তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তিনি অবশ্যই আমাদের বিজয়ী করবেন।

বিন কাসিমের প্রেরিত দূত পয়গাম নিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এসে সে বিন কাসিমকে জানালো, দুর্গফটকেই তার পথ রোধ করে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কেন এসেছে সে? সে জানালো, রাজকুমার জয়সেনার জন্যে সিন্ধু শাসক মুসলিম সেনাপতি বিন কাসিমের পয়গাম নিয়ে এসেছি। তখন তাকে দুর্গশাসকের কাছে নিয়ে গেল।

এই পয়গাম কি রাজকুমার ছাড়া আর কাউকে দিতে পারো? দূতকে জিজ্ঞেস করল দুর্গপতি। কারণ রাজকুমার এখানে নেই।

না, কারণ রাজা দাহিরের পর সেই তো তার একমাত্র স্থলাভিষিক্ত যে একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

জয়সেনাতো এখানে আসেনি। তবে আমি জানি তোমরা কি পয়গাম নিয়ে এসেছো? এর জবাব আমিই দেবো' আমাকে পয়গামটি পড়ে শোনাও।

দূত ছিল সিন্ধু অঞ্চলের লোক। সে ছিল এক নওমুসলিম, স্থানীয় ভাষায় সে যখন পয়গামের বক্তব্য বলল, তখন দুর্গপতি একটা অট্ট হাসি দিয়ে বলল, আমি জানতাম তোমার সেনাপতি এটাই লিখবে। তোমাদের সেনাপতির দেমাগ নষ্ট হয়ে গেছে। শুনেছি, ও নাকি একেবারেই বাচ্চা মানুষ। ওর বোঝা

দরকার, রাজা দাহির মারা গেলেও আমরা সবাই মরে যাইনি। শুধু জয়সেনাই লড়াই করবে না। জয়সেনা যদি মুসলমানও হয়ে যায় তবে তাকে আর ঠেকাবে কে? কিন্তু ওর কথায় তো আর সবাই মুসলমান হয়ে যাবে না। জয়সেনা এখন পলাতক। তোমার সেনাপতিকে গিয়ে বলো, তার খুব ইচ্ছে হলে সে যেন আসে এবং দুর্গ দখল করে নেয়।

আমাদের সেনাপতি তো আসবেনই। তবে তোমাদের মনে রাখা উচিত, সাধারণ সৈনিকদের গণহত্যার দায় দায়িত্ব তোমাকেই বহণ করতে হবে।

দূত যখন বিন কাসিমকে দুর্গশাসকের ভাষায় তার জবাব শোনাচ্ছিল, ঠিক তখনই ব্রাহ্মণাবাদ থেকে বিন কাসিমের এক গোয়েন্দা এসে জানাল, জয়সেনা কয়েক দিন ব্রাহ্মণাবাদে ছিল। সেখানে থেকে সে সেনাবাহিনীকে নতুন করে তৈরী করল। পালিয়ে আসা বিচ্ছিন্ন সৈন্যদেরকে নতুন ভাবে সংগঠিত করে ব্রাহ্মণাবাদ ত্যাগ করে চেনসারের দিকে চলে গেছে।

ওহ্, সে সহযোগীদের একত্রিত করছে? বললেন বিন কাসিম। আমরা আর ওকে পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবো না।

✪ ✪ ✪

ব্রাহ্মণাবাদে প্রায় ৪০ হাজার হিন্দু সৈন্য ছিল। তাদেরকে জটিল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অদম্য করে তোলা হয় এবং কঠিন যুদ্ধের মোকাবেলায় বিজয় ছিনিয়ে আনার মতো মনোবলের অধিকারী করা হয়।

বিন কাসিম সবকিছু বুঝে শুনে ব্রাহ্মণাবাদ যুদ্ধের জন্য তাঁর রণকৌশলে পরিবর্তন আনলেন। তিনি দুর্গ অবরোধের পরিবর্তে দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে তাঁবু ফেলে তাঁবুর চারপাশে খাল খনন করলেন এবং দুজন সৈন্যকে দুর্গ ফটকের কাছে গিয়ে ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন– 'দুর্গ আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, অন্যথায় আমরা যদি লড়াই করে দুর্গ দখল করি, তাহলে কাউকে প্রাণভিক্ষা দেয়া হবে না।'

ঘোষণাকারীরা দুর্গফটকের কাছাকাছি গিয়ে কয়েকবার ঘোষণা করল কিন্তু তাদের জবাবে কারো কণ্ঠ শোনা গেল না, বরং তাদের প্রতি কয়েকটি তীর ছুটে এলো। ফলে কোন মৌখিক জবাব না পেয়ে ঘোষণাকারীরা ফিরে এলো।

সেদিনটি ছিল ৯৪ হিজরী মোতাবেক ৭১৩ খ্রিস্টাব্দের পহেলা রজব, সোমবার। হঠাৎ দুর্গফটক খুলে গেল। বাধভাঙা পানির মতো হিন্দু সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো। সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিল দশবারো জনের

একটি বাদক দল। তারা প্রশিক্ষিত সৈন্যদের মতোই শৃঙ্খলা বজায় রেখে দ্রুতগতিতে এসে মুসলিম যোদ্ধাদের ওপর হামলে পড়ল। আক্রমণ ছিল খুবই তীব্র। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত তীব্র আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর রক্ষণভাগ ভেঙে পড়ল। ব্রাহ্মণাবাদে এতোটা তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হবে এটা মোটেও ভাবেনি মুসলিম বাহিনী।

বিন কাসিম এই আক্রমণ সামলে নিলেন বটে তবে ততোক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। লড়াই চলাকালে সারাক্ষণই হিন্দুবাহিনীর বাদক দল বিরামহীনভাবে ঢোল পেটাচ্ছিল আর তাতে হিন্দু সৈন্যদের রণ-উদ্দীপনা যেন আরো উজ্জীবিত হচ্ছিল। সন্ধ্যা নেমে আসার সাথে সাথে হিন্দুবাহিনী দুর্গে ফিরে গেল। তাদের ফিরে যাওয়াও ছিল বেশ কৌশলী। ধীরে ধীরে পিছিয়ে গিয়ে তারা দুর্গের ভিতরে চলে গেল। মুসলমানরা যখন হিন্দু সৈন্যদের তাড়া করে অগ্রসর হলো, তখন দুর্গের কাছাকাছি যেতেই দুর্গপ্রাচীরে থেকে মুসলমান যোদ্ধাদের প্রতি তীব্র তীরবৃষ্টি ধেয়ে এলো। ফলে আর অগ্রসর না হয়ে মুসলিম যোদ্ধারা তাদের তাঁবুতে ফিরে এলো।

রাতের বেলায় বিন কাসিম সকল সেনাপতি ও কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তিনি হিন্দু সৈন্যদের আকস্মিক তীব্র আক্রমণ ও ফিরে যাওয়ার কৌশল নিয়ে সবার সাথে মতবিনিময় করলেন। শত্রুদের শক্তি ও সামর্থ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হলো। অনেকেই অনেক ধরনের মতামত ব্যক্ত করলেন।

সবার মতামত শোনার পর বিন কাসিম বললেন, হিন্দু সৈন্যরা চেষ্টা করছে আমরা যাতে দুর্গ অবরোধ করতে না পারি। ওরা ময়দানে আমাদের লড়াইয়ে লিপ্ত রাখতে চায়। আমরা তাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবো। তবে দুর্গকে পশ্চাদভূমি হিসাবে ব্যবহার করার মতো সুবিধা তাদের আছে, আমরা ইচ্ছা করলেও তাদের তাড়া করতে পারব না। তিনি সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা সবাই আমার চেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ। আমি আপনাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, আমাদের যোদ্ধারা ক্লান্ত। তাদের আবেগ যদিও ক্লান্ত নয় তবে রক্ত গোশ্‌তের শরীর অব্যাহত পরিশ্রমে একসময় চুরচুর হয়ে যায়। দ্বিতীয় কথাটি হলো, দুর্গ অবশ্যই আমাদের অবরুদ্ধ রাখতে হবে। আমরা যদি অবরোধ না করি, তাহলে শত্রুদের সরবরাহ পথ উন্মুক্ত রাখা হবে। আপনারা জয়সেনার কথা

শুনেছেন, সে দুর্গে নেই। জয়সেনা আশপাশের রাজা মহারাজাদের সাহায্যের জন্যে বেরিয়েছে। ওর পথ রুদ্ধ করতে হবে। কারণ সে যখন এদিকে ফিরে আসবে তখন সে একা আসবে না, বহু সৈন্য সাথে নিয়ে আসবে। আপনারা দেখেছেন হিন্দু সৈন্যরা খুবই উজ্জীবিত আবেগাপ্লুত।

"বিন কাসিম! বেশি আবেগ ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে না," বললেন বিন কাসিমের পিতৃবয়সী এক সেনাপতি। আপনি যদি ওদের এই আক্রমণে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এই দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আপনাকে আল্লাহ খুব উঁচুমাপের বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। আপনার চিন্তাশক্তি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। আপনি আল্লাহর দেয়া বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগান। আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা আল্লাহকে ভুলিনি। সবসময় নামায তেলাওয়াত দোয়া দরূদে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের মদদ করবেন।

রাতের বেলায় মিনজানিক ও অগ্নিতীর ব্যবহার করাই সঠিক কাজ হবে, বললেন অপর এক সেনাপতি।

বিন কাসিম তার মতামতের জবাবে বললেন, না, এক্ষেত্রে মিনজানিক ও অগ্নিতীর ব্যবহার করা ঠিক হবে না। ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ একটি জনবহুল দুর্গ। মিনজানিক ও অগ্নিতীর ব্যবহার করলে শিশু ও বেসামরিক লোকেরা হতাহত হবে। আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে চাই না। তাছাড়া আরো ক'দিন দেখি না, শত্রুরা তাদের রণকৌশলে কতোটা দৃঢ় থাকে।

✪ ✪ ✪

পরদিন ব্রাহ্মণাবাদের সৈন্যরা আগের দিনের মতো দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করল। আগের রাতে বিন কাসিম সেনাপতি ও কমান্ডাদের বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ ইউনিটকে দিনের শুরুতেই তাঁবু থেকে বের করে জায়গা মতো দাঁড় করালেন। অশ্বারোহী সৈন্যদের দু'প্রান্তে রেখে পদাতিক সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড় করানো হলো।

গত দিনের আক্রমণে হিন্দুরা দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি থেকে লড়াইয়ের চেষ্টা করতে দেখা গেছে। বিন কাসিম পরিকল্পনা মতো পদাতিক সৈন্যদেরকে অগ্রসর করে দিলেন। পদাতিক সেনাকমান্ডারদেরকে কি করতে হবে তা তাদের জানা ছিল। সংঘর্ষ যখন তীব্র আকার ধারণ করলো, তখন তারা

এমনভাবে পিছু হটতে শুরু করে যেনো তারা শত্রুদের আক্রমণে বিপর্যস্ত। মুসলিম সৈন্যদের পিছু হটতে দেখে হিন্দু সৈন্যরা বিপুল উদ্যমে সামনে অগ্রসর হলো।

এমতাবস্থায় হিন্দু সৈন্যদের খেয়াল ছিল না, তারা দুর্গপ্রাচীর থেকে বহুদূরে চলে এসেছে। ঠিক এমন সময় বিন কাসিম দু'প্রান্তের অশ্বারোহীদের ইশারা করলেন। অশ্বারোহীরা ইশারা পাওয়া মাত্র উর্ধশ্বাসে ঘোড়া দৌড়াল। চোখের পলকে অশ্বারোহীরা হিন্দু সৈন্যদের পিছন ও দু'পাশ থেকে আক্রমণ করল। এই আক্রমণে হিন্দু সৈন্যরা বিন কাসিমের পাতা ফাঁদে আটকে গেল। মুসলিম অশ্বারোহীদের তরবারীর আঘাতে ধরাশায়ী হতে লাগল হিন্দু সৈন্যরা। তাদের পিছু হটার পথ আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু কমান্ডারও ছিল বুদ্ধিমান। সে দুর্গ থেকে একটি অশ্বারোহী ইউনিটকে তড়িৎ মুসলিম বাহিনীর পিছন ভাগে আঘাত করার জন্য পাঠাল। এরা এসে আঘাত করায় মুসলমানদের ঘেরাও ভেঙে গেল এবং হিন্দু সৈন্যরা বেরিয়ে গেল। কিন্তু তাদেরকে ফেলে যেতে হয়েছে অসংখ্য সহযোদ্ধার মরদেহ। ততোক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বেলা ডুবার আগেই মুসলিম যোদ্ধারা তাদের মৃত ও আহত সহযোদ্ধাদের রণাঙ্গন থেকে তুলে আনল।

✪ ✪ ✪

পরবর্তী রাতে বিন কাসিম তাঁবু থেকে কিছু সৈন্যকে বের করে দুর্গের চারপাশে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে একপ্রকার অবরোধ আরোপ করলেন, যাতে দুর্গবাসীরা বাইরের কোন সরবরাহ না পায়। পরদিনও হিন্দু সৈন্যরা যখন দুর্গ থেকে বের হলো, তখন দু'পাশ থেকে তাদের ঘেরাও করে আক্রমণ করা হলো। হিন্দু সৈন্যরা দ্রুত দুর্গে ফিরে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু হুড়োহুড়ি করে প্রবেশ করতে গিয়ে ওরা দুর্গফটকে হজবরল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালো। ভীড়ে চাপা পড়ে বহু পদাতিক সৈন্য হতাহত হলো।

একই পদ্ধতিতে টানা কয়েকদিন এ ধরণের আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলল। কিন্তু কিছু দিন পর হিন্দুদের আক্রমণের মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করল। দু'তিন দিন চলে গেল তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে কোন আক্রমণ করল না। তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল হিন্দুদের জনবলে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

✪ ✪ ✪

৯৪ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে মুসলমানদের একটি সরবরাহ কাফেলা আসার কথা ছিল। কিন্তু তারিখ পেরিয়ে গেলেও সরবরাহ কাফেলার হদিস পাওয়া গেল না। হঠাৎ এক রাতে অবরোধকারী সৈন্য দলের ওপর গুপ্ত আক্রমণ হলো। অনুসন্ধান করে জানা গেল, গুপ্ত আক্রমণকারীরা দুর্গ থেকে আসেনি ওরা বাইরের। গুপ্ত আক্রমণে মুসলিম সৈন্যরা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। পরের রাতে আবারো আক্রমণ হলো।

দীর্ঘ যুদ্ধে এমনিতেই মুসলিম সৈন্যদের জনবলের ওপর চাপ পড়েছিল। এরপর এই গুপ্ত আক্রমণ সেই চাপ আরো বাড়িয়ে দিলো। অপর দিকে সরবরাহ আসার নিশ্চিত সংবাদ আসার পরও কোন ধরনের সরবরাহই পৌছেনি। এমতাবস্থায় দাহলিলা ও বাহরাত্তয়াতে সরবরাহ না পৌছার কারণ অনুসন্ধানে লোক পাঠানো হলো। কিন্তু সংবাদবাহকরাও তিন দিনের মধ্যে ফিরে এলো না। অথচ উভয় দুর্গের দূরত্ব ছিল কম। ইচ্ছা করলে একদিনেই উভয় দুর্গের খবর নিয়ে ফিরে আসা যায়।

কোন খবর না পেয়ে চতুর্থ দিন সকালবেলায় আরো দু'জনকে পাঠানো হলো। দিন শেষে বিকেলবেলায় এদের একজন আহত রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে এলো। সে জানালো, দাহলিলা দুর্গের অনতি দূরে তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায় চার অশ্বারোহী। তাতে তার সাথী মারা যায়। সে কোন মতে প্রাণ বাঁচিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই আক্রমণ থেকে বিন কাসিম বুঝে নিলেন, সরবরাহ কোন না কোনভাবে পথিমধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

বিন কাসিম সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, যারা অবরোধে নিযুক্ত, তারা যেন রাতের বেলায় সজাগ থাকে এবং রাতের আক্রমণকারীদের অন্তত দু'চার জনকে জীবন্ত পাকড়াও করার চেষ্টা করে।

সেই দিনগুলোতে প্রতিরাতেই গুপ্ত আক্রমণ হতো। কয়েক দিন পর একরাতে আক্রমণকারীদের দুজনকে পাকড়াও করা হলো। পাকড়াও করে শত্রু সেনা দুজনকে বিন কাসিমের কাছে উপস্থিত করা হলো। বিন কাসিম বহু চেষ্টা করেও ধৃতদের মুখ খুলতে পারেন নি। অবশেষে তিনি নির্দেশ দিলেন, ওদেরকে ঘোড়ার পিছনে বেধে ঘোড়া দৌড়িয়ে দাও। এমতাবস্থায় মৃত্যু ভয়ে শত্রুসেনারা কথা বলতে শুরু করল। অবশেষে ওরা রহস্য উন্মোচন করে দিলো। শত্রু সেনারা বলল, জয়সেনা বিমল রাজার কাছ থেকে সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ আসতে চাচ্ছিল। যখন সে খবর পেল, ব্রাহ্মণাবাদ অবরুদ্ধ, তখন সে দূরের একটি জায়গায় তাঁবু ফেলে গুপ্তহামলা চালাতে শুরু করে।

বিন কাসিম সেনাপতিদের ডেকে বললেন, সব সেনাপতি যেন নিজ নিজ ইউনিট থেকে কিছুসংখ্যক অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে বাছাই করে দেয়। যারা সম্মিলিতভাবে একটি দলভুক্ত হয়ে জয়সেনাকে তাড়া করবে। সেনাপতিগণ, নির্দেশ পেয়ে কিছুসংখ্যক যোদ্ধাকে বাছাই করলেন। এদেরকে একটি ইউনিটে রূপান্তরিত করে মুকু, নাবাতা বিন হানযালা, আতিয়া প্রমূখকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই সেনাদলের কমান্ডার নিযুক্ত করলেন মুকু ও খুরায়েম বিন আমের মাদানীকে। মুকু তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু বিন কাসিমের প্রতি সে বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া স্থানীয় লোক হওয়ায় এই অঞ্চলের সব পথঘাট ছিল তার নখদর্পনে।

এদিকে শত্রুপক্ষের রাতের গুপ্তহামলা অব্যাহত থাকল এবং একরাতে মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে আরো তিন হামলাকারী গ্রেফতার হলো। এরা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে জানিয়ে দিলো, জয়সেনা কোন এলাকায় আস্তানা গেড়েছে। জয়সেনার অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ায় সেই রাতেই মুকু ও মাদানীর নেতৃত্বে বিশেষ বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল। তাদের সাথে দেয়া হলো গ্রেফতার হওয়া তিন শত্রুসেনাকে, ওদের দেয়া তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে ওদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলো।

এই বিশেষ বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদ থেকে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে হঠাৎ দ'জন অশ্বারোহী উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকাল, এরা রাস্তায় কোন আড়ালে উৎপেতে ছিল। মুকু সাথে সাথে তার চার যোদ্ধাকে ওদের ধাওয়া করতে নির্দেশ দিল। কিন্তু তারা শত্রুসেনাদের নাগাল পেল না। ধাওয়াকারীদের বলে দেয়া হয়েছিল তারা যেন আয়ত্তের বাইরে না যায়। শত্রু সেনারা নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় ধাওয়াকারীরা ফিরে এলো। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল এরা নিশ্চয়ই জয়সেনার চর।

জয়সেনাকে ধরার জন্য মুকু ও মাদানীর কাফেলার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়া হলো। কিন্তু জয়সেনার অবস্থান ছিল যথেষ্ট দূরে। সকাল পর্যন্ত ইপ্সিত স্থানে পৌঁছে যাওয়ার আশা ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে মুসলিম সৈন্যদেরপক্ষে খুব বেশি দ্রুত ঘোড়া দৌড়ানো সম্ভব ছিল না।

সারারাত চলার পর সকালবেলায় তারা এমন জায়গায় পৌঁছাল, যেখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কোন সেনাবাহিনীর অবস্থানের চিহ্ন। স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে মুকু জানতে পারল, রাজা দাহিরের পুত্র জয়সেনার নেতৃত্বে এখানে কিছুদিন একটি সেনা ইউনিট অবস্থান করেছিল। কিন্তু

গতরাতের শেষপ্রহরে তারা এখান থেকে চলে গেছে। ওদের যাওয়ার সময় হিসাব করে দেখা গেল। পিছু ধাওয়া করা অর্থহীন।

জয়সেনা নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় মুকু ও মাদানীসহ অন্যান্য উর্ধতন সেনাকমান্ডারগণ পরামর্শ করলেন, এলাকাটি শত্রুমুক্ত করার জন্য দাহলিলা ও রাওয়া দুর্গ পর্যন্ত গোটা এলাকা চক্কর দেয়া দরকার। সারারাতের ভ্রমণের ক্লান্তি সৈন্য ও ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় তাঁবু ফেলা হলো। বিশ্রামের পর আবার চলতে শুরু করল কাফেলা।

চলন্ত কাফেলা হঠাৎ দুই উষ্ট্রারোহীকে দেখতে পেল। মুসলিম কাফেলাকে দেখে আরোহী দু'জন পথ বদল করে ফেলল। ওদের প্রতি সন্দেহ হওয়ায় পাঁচজন অশ্বারোহীকে নির্দেশ দেয়া হলো ওদের পাকড়াও করতে। পাঁচ অশ্বারোহীকে আসতে দেখে ওরা চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু পাঁচ অশ্বারোহী উর্ধশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘেরাও করে দুই অষ্ট্রারোহীকে পাকড়াও করল। ধরাপড়ে ওরা প্রথমে সাধারণ পথিক হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা যখন বর্শার ফলা ওদের বুকের ওপর রাখল তখন স্বীকার করল, তারা জয়সেনার সৈন্য। সেই সাথে তারা জানাল, জয়সেনা তাদের মাধ্যমে এই এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জয়সেনার গোয়েন্দাদের খবর দিয়ে দিয়েছে, তারা যদি জয়সেনার সাথে থাকতে চায়, তাহলে যেন চারু দুর্গে পৌছে, নয়তো নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায়। বিন কাসিমের বিশেষ এই ইউনিট দুই তিন দিন গোটা এলাকা চক্কর দিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ ফিরে এলো। এর দু'দিনপর সরবরাহ কাফেলাও ব্রাহ্মণাবাদ পৌছে গেল।

দেখতে দেখতে ব্রাহ্মাণাবাদ দুর্গের অবরোধ ছয় মাস পেরিয়ে গেল।

কিন্তু দু'মাস পর দুর্গ থেকে হিন্দু সৈন্যরা বেরিয়ে মুসলমানদের ওপর আঘাত করা ছেড়ে দিয়েছিল। এই সুযোগে বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদেরকে তাঁবু থেকে বের করে দুর্গ অবরোধ মজবুত করলেন এবং দুর্গপ্রাচীর ভাঙা বা ডিঙানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। দুর্গের অধিবাসীদের নিরাপদ রাখতে তিনি পাথর ও অগ্নিতীর নিক্ষেপ থেকে বিরত রইলেন।

এক পর্যায়ে স্থানীয়ভাষায় অনেকগুলো পয়গাম লিখে রাতের বেলায় দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি গিয়ে তীরে বেঁধে এগুলোকে এমনভাবে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন, যাতে এগুলো গিয়ে লোকালয়ে পড়ে।

সব পয়গামে একই বক্তব্য ছিল। পয়গামে লেখা হলো, দুর্গের বেসামরিক অধিবাসীরা যেন দুর্গফটক খুলে দিতে সৈন্যদের বাধ্য করে। নয়তো আমরা অচিরেই দুর্গে পাথর ও আগুন বর্ষণ করতে শুরু করব। তখন আর কাউকেই ক্ষমা করা হবে না। পক্ষান্তরে দুর্গবাসী যদি সৈন্যদের ফটক খুলে দিতে বাধ্য করে তাহলে বেসামরিক সব নাগরিককে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের জানমাল ইজ্জত আব্রু সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। তীরে বাঁধা নিক্ষিপ্ত পয়গামে কাজ হলো। দু'তিন দিন পর রাতের বেলায় দুর্গ থেকে একটি ছোট্ট দরজা দিয়ে দু'জন লোক বেরিয়ে মুসলিম শিবিরের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের হাতে ছিল সাদা পতাকা। এরা মুসলিম শিবিরের দিকে অগ্রসর হলে কয়েকজন সৈন্য এদের ধরে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে এলো। তারা জানাল, তীরে বাঁধা পয়গামের খবর দুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই পয়গাম পাওয়ার পর দুর্গের নের্তৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী ও মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সৈন্যদের সাথে আলোচনা করল, তোমরা দুর্গের কর্তৃত্ব ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ কর। সৈন্যরা বলল, তা সম্ভব নয়। অন্য কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে আমরা দুর্গ ত্যাগ করে চলে যেতে পারি। এর পর সিদ্ধান্ত হলো, তাদেরকে দুর্গ ত্যাগের সুযোগ করে দিলে তারা দুর্গের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে। অত:পর দুর্গফটকের প্রহরীদের এই কথা বলা হলো, তোমাদের একটি সেনাদল ছোট্ট একটি দরজা খুলে মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণ করবে, ওরা পাল্টা আক্রমণ করলে তোমরা প্রধান ফটক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবে কিন্তু দুর্গফটক খোলা থাকবে। খোলা দরজা দিয়ে মুসলিম সৈন্যরা প্রবেশ করবে আর অপর দরজা দিয়ে তোমরা পালিয়ে যাবে।

এ দুই সংবাদবাহক বিন কাসিমকে জানাল, দুর্গের অধিবাসীরা অনেক দিন থেকে দিনে একবেলা আহার করছে। সেই সাথে দুর্গের ভিতরে সুপেয় পানির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় দুর্গের অধিবাসীরা সৈন্যদের ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু জীবন ও মান রক্ষায় সৈন্যরা আত্মসমর্পনে রাজী হচ্ছিল না। তাছাড়া তাদের অর্ধেক সৈন্যই মারা গেছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে পালানোর সুযোগ দিলে তারা দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাবে।

তিনদিন পর ছোট্ট একটি ফটক দিয়ে কিছুসংখ্যক হিন্দু সৈন্য বেরিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের ওপর আঘাত করল। বিন কাসিম আগে থেকেই প্রস্তুত

ছিলেন, তিনি একটি ইউনিটকে ওদের ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা ধাওয়া করতেই ওরা প্রধান ফটক দিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দুর্গফটক খোলা রইলো, বিন কাসিমের সেই ইউনিট খোলা ফটক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল। সেই সাথে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা মুসলিম বাহিনী দুর্গের ভিতরে চলে এলো। আর হিন্দু সৈন্যরা অপর দিকের ফটক খুলে পালিয়ে গেল। বিন কাসিম ওদের পিছু ধাওয়া করতে নিষেধ করেলেন।

পর্ব এগারো

যেসব মূর্তি নিজেদের অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারেনা তোমরা এগুলোর পূজা কেন করো?

ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ জয় ছিল বিন কাসিমের বিজয়গাথার আরেকটি মাইল ফলক। মুসলিম সৈন্যরা ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে সর্বত্র ইসলামী পাতাকা উড়িয়ে দিল।

ব্রাহ্মণাবাদ ছিল একটি দুর্গবন্দি শহর। শহরের সাধারণ হিন্দুরা মনে করছিল বিজয়ী সেনারা তাদের ঘড়-বাড়িতে লুটতরাজ করবে। তাদের কুমারী কিশোরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। এই ভয়ে সবাই তরুণী-যুবতী মেয়েদের লুকানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বহুসংখ্যক তরুণী বিজয়ী সেনাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে পুরুষের পোশাক পরিধান করছিল। বহুসংখ্যক হিন্দু মন্দিরে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

মন্দিরে আশ্রয় প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রধান পুরোহিত ঘোষণা করল, হে ব্রাহ্মাণাবাদবাসী। তোমাদের কোন ভয় নেই। আমরা বিজয়ী সৈন্যদের কাছ থেকে তোমাদের জানমালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়েছি। দুর্গের প্রধান ফটক বিজয়ী বাহিনীর জন্য আমরাই খুলে দিয়েছি। তোমাদের কোন ভয় নেই। সবাই নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যাও। ঘরের দরজা খুলে ঘুমাতে পারো। কোন মুসলিম সৈন্য তোমাদের গায়ে হাত দেবে তো দূরে থাক তোমাদের দহলিজেও পা দেবে না।

এদিকে বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের জন্য হুকুম জারী করলেন, আক্রমণ উদ্যত কোন লোক ছাড়া দুর্গের কোন সাধারণ নারী, শিশু আবালবৃদ্ধ বনিতার গায়ে কেউ হাত ওঠাবে না। কারো বাড়ি-ঘরে উঁকি দিয়েও দেখবে না।

বিন কাসিমের এই নির্দেশ শহর জুড়ে আরবী ও সিন্ধি উভয় ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছিল। কারণ মুকুর স্থানীয় সৈন্যরা ছাড়াও বহুসংখ্যক স্থানীয়

নওমুসলিমও বিন কাসিমের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। যাদের অধিকাংশই আরবী ভাষা জানতো না।

বিন কাসিম আরো ঘোষণা করালেন, কোন সৈন্যকে পালানোর সুযোগ দেবে না। কারণ এরা এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গার সৈন্যদের সাথে মিশে শক্তি সঞ্চয় করবে।

বিন কাসিম! আমি কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে বরং এর বিপরীতটাই দেখতে পাচ্ছি। মুচকী হেসে বললেন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী। তিনি বললেন, হিন্দুস্তানের এসব পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা অন্য জায়গায় গিয়ে শক্তিবৃদ্ধির বদলে, বরং আরো ভীতিকেই প্রকট করে।..., তাই যারা পালাতে চায় ওদের পালিয়ে যেতে দেয়াই উচিত। আর যাদেরকে পালাতে দেয়া উচিত না, ওরা আমার জালের ভিতরেই আছে। ওরা আমার দৃষ্টির আড়াল হতে পারবে না।

✪ ✪ ✪

দুর্গের রাজ মহলে হৈচৈ পড়ে গেল। ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে একটি রাজপ্রসাদ ছিল। এখানে রাজা দাহির এসে মাঝে মধ্যে অবকাশ যাপন করত। ছেলে এবং রাণীরাও আসতো মাঝে মাঝে। রাজমহলে যখন খবর পৌঁছল দুর্গে মুসলিম সৈন্যপ্রবেশ করেছে, তখন প্রাসাদের অনেকেই ব্যাপারটি বিশ্বাস করে নি।

প্রাসাদে অবস্থানকারী রাজা দাহিরের এক মন্ত্রী বলল, "ছয় চাঁদ চলে গেছে। মুসলিম বাহিনী দুর্গপ্রাচীরের ধারে কাছে ঘেষতে পারেনি। আর এখন শুনছি ওরা দুর্গে ঢুকে পড়েছে। কখনোই না, এমনটা হতেই পারেনা।"

একথা বলছিল বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকারকারী মন্ত্রী সিয়াকর। সে কিছুদিন বিন কাসিমের সাথে থেকে তাঁর অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মাণাবাদ এসে অবস্থান নিয়েছিল। সে বলেছিল ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ জয়ের পর সে প্রকাশ্যে ইসলামে দীক্ষা নেবে।

আরেক সংবাদ দাতা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, মহামহিম উজির। মুসলিম বাহিনী দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মহারাণীকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার।

রাণী ঘুমিয়ে আছে। যে পর্যন্ত আমি নিজ চোখে মুসলিম সৈন্য না দেখব ততোক্ষণ পর্যন্ত রাণীকে জাগানোর দরকার নেই, বলল মন্ত্রী সিয়াকর।

কথিত রাণী ছিল রাজা দাহিরের প্রিয়সী। তাকে প্রিয়সী বলেই ডাকা হতো। এই রাণী ছিল রাজা দাহিরের খুবই প্রিয়। বয়সে তরুণী, অত্যধিক সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও আত্মাভিমানী। রাজার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট দখলদারিত্ব ছিল এই রাণীর। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কেও এই রাণীর দখল ছিল। মুসলিম বাহিনী যখন একের পর এক দুর্গ জয় করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন রাণী প্রিয়সী এক দিন রাজার মুখোমুখি হলো।

অসময়ে রাণীকে তার খাস কামরায় দেখে রাজা জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার প্রিয়সী? এই সময়ে তুমি রাজদরবারে? তাছাড়া তোমার চেহারা কেমন যেন মলীন দেখাচ্ছে?

শুধু আমার চেহারায় নয়, মহারাজ! গোটা সিন্ধুর আকাশেই আজ গাঢ় মেঘের ঘনঘটা। এই মেঘ আরব থেকে এসেছে এবং মাকরানকে ডুবিয়ে দিয়ে এখন মহারাজের আত্মসম্মানকেই হুমকি দিচ্ছে।

আরে আমি তো মরিনি রাণী! আমিই ওদের এতটুকু বাড়তে দিয়েছি। এসো, আমার কাছে এসো রাণী। রাজা রাণীর দিকে তার দু'হাত বাড়িয়ে দিলো।

কিন্তু রাণী পিছনে সরে গিয়ে বলল, মহারাজ! আজ থেকে আমি আপনার রাণী নই, আর আমার কোন রাজাও নেই। আপনার হৃদয়ে যদি আমার প্রতি সামান্য ভালোবাসাও থেকে থাকে তাহলে তা সিন্ধুর ভূমিকে দিয়ে দিন। আর সিন্ধুর চেয়ে যদি আমার প্রতি আপনার বেশি ভালোবাসা থেকে থাকে তাহলে বিন কাসিমের ছিন্নমস্তকটা আমার সামনে নিয়ে আসুন। যদি তা-না পারেন, তাহলে আপনার মাথাটাই বিচ্ছিন্ন করে ফেলুন। আমি এখন মুহাম্মদ বিন কাসিম না হয় আপনার ছিন্ন মস্তক দেখতে চাই! মুসলমানরা এখন রাওয়া থেকে এক হাত সামনে আসাটাকেও আমি সহ্য করতে পারছি না। মুসলিমরা রাওয়ার জল-মাটি নোংরা করে ফেলেছে। আপনি সেই দিন আমার শরীর স্পর্শ করতে পারবেন যে দিন বিন কাসিমের ছিন্ন মস্তক আমার সামনে পড়ে থাকবে। আর ওর সৈন্যরা বানভাসী খড়খুটোর মতো সিন্ধুর জলে ভেসে সাগরে চলে যাবে।

রাজা দাহির কোন কাপুরুষ শাসক ছিল না। ছিল না অনভিজ্ঞ ও মেধাহীন যে তাকে উস্কানী দিয়ে উত্তেজিত করতে হবে। রাণীর ক্ষোভ সে যথার্থই বুঝতে পারল। সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে গেল রাজা।

হ্যাঁ এমনিটিই হবে রাণী! এমনটিই হবে। তুমি ঠিকই বলেছ, আমার জীবন সিন্ধুর মাটির জন্য। তুমি ঠিকই বলেছ, কথা দিচ্ছি তোমার সামনে হয় বিন কাসিমের ছিন্ন মস্তক দেখবে নয়তো আমার মস্তক ছিন্ন হতে দেখবে।

অতঃপর ঘটনা তাই ঘটল। রাণী প্রিয়সী আবেগ উচ্ছ্বাস ও প্রেম ভালোবাসায় সিক্ত করে রাজাকে রণাঙ্গনে বিদায় জানালো। আবেগ উত্তেজনায় রাণী প্রিয়সী রাজা দাহিরের একান্ত সাদা হাতির শুঁড়ে চুমু দিলো। কিন্তু প্রিয়সী জানতো না, তার এই আবেগ ও উত্তেজনা সুফল বয়ে আনবে না। প্রিয়সী জানতো না, সে এই শেষ বারের মতো রাজা দাহিরকে জীবিত দেখছে। বিন কাসিমের ছিন্ন মস্তক দেখার সৌভাগ্য প্রিয়সীর হয়নি, তাকে রাজা দাহিরের মস্তক ছিন্ন হওয়ার দুঃসংবাদই শুনতে হয়েছে।

রাণী প্রিয়সী রাজা দাহিরকে রণাঙ্গনে বিদায় করে ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে চলে আসে। এখানে থাকাবস্থায়ই রণাঙ্গন থেকে দলে দলে সৈন্য পালিয়ে আসার খবর পায়। সেই সাথে রাজার নিহত হওয়ার খবর আসে।

একদিন পালিয়ে আসা সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে রাণী প্রিয়সী বলল, ব্রহ্মণাবাদের সকল সৈন্যকে আমার সামনে হাজির করা হোক। সৈন্যদেরকে যখন রাণী প্রিয়সীর সামনে এনে দাঁড় করানো হলো, তখন উচ্চ আওয়াজে রাণী বলল, "তোমরা কি জীবিত থাকার যোগ্যতা রাখো, তোমরা কি এখনো তোমাদের স্ত্রীদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখো? তোমাদের চেয়ে অপবিত্র সৃষ্টি এই ধরিত্রীর বুকে আর কোথাও কি আছে? যারা নিজ মাতৃভূমিকে গুটিকতক বিদেশী সৈন্যের দখলে দিয়ে দিয়েছে। তোমাদের মহারাজা আমার সাথে ওয়াদা করেছিল, হয় সে আমার সামনে বিন কাসিমের ছিন্ন মস্তক ফেলে দেবে নয়তো নিজের মাথা ছিন্ন করাবে।

খবর পেয়েছি, সে বিন কাসিমের মাথা ছিন্ন করতে পারেনি কিন্তু নিজের দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করিয়েছে। তোমাদের লজ্জা থাকা উচিত ছিল, তোমাদের রাজার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর তোমাদের দেহে এখনো মাথা বহাল রয়েছে।

ঠিক আছে, তোমাদের মতো কাপুরুষদের আর দরকার নেই। সবাই মাথা ন্যাড়া করে ঘরের কোণে বসে যাও; এখন থেকে এদেশের নারীরাই যুদ্ধ করবে। আজ থেকে আমি নারীদের নিয়েই সেনাবাহিনী গঠন করব। আমরা যদি মুসলমানদের কাছে হেরেও যাই তবুও মনে এতোটুকু শান্তি থাকবে আমরা একটা বাহাদুর জাতির বাদী হয়েছি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাণী প্রিয়সীর সেই বক্তৃতা এতোটাই উত্তেজনা পূর্ণ ছিল যে, সৈন্যরা আবেগে উত্তেজিত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল, আর তাদের ঘোড়াগুলো পর্যন্ত পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল। সেই দিন রাণী প্রিয়সী উপস্থিত সেনাবাহিনী থেকে কিছু সংখ্যক কমান্ডারঠাকুর ও সৈন্য বাছাই করে নিজের মতো করে একটি সেনাদল গঠন করল এবং নিজে পুরুষের পোশাক পরে তাজি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নবগঠিত সেনাদলের ট্রেনিং দিতে শুরু করল। এসব সৈন্য প্রশিক্ষিতই ছিল। তাদের সামরিক ট্রেনিংয়ের খুব একটা প্রয়োজন ছিল না কিন্তু রাণী প্রিয়সী বিভিন্নভাবে এমন মানসিকতা এদের মধ্যে সৃষ্টি করল যে, এই সেনাদল মানুষ খেকো বাহিনীতে পরিণত হলো। এই বাহিনীকে অন্যান্য সেনাদের চেয়ে অনেক বেশি বেতন ভাতা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলো। এই বাহিনীর সৈন্যদেরকে নগদ পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দেয়া হলো। তাছাড়া এই ঘোষণাও দেয়া হলো, লড়াইয়ে বিজয়ী হলে প্রত্যেক সৈনিককে একজন করে তরুণী উপহার দেয়া হবে।

বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ অবরোধ করার পর যে হিন্দু সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করত এবং দুর্গে ফিরে যেত এদের অধিকাংশই ছিল রাণী প্রিয়সীর বিশেষ সৈন্য। অবরোধের শেষ দু'মাসে রাণী প্রিয়সী তার বিশেষ বাহিনীকে তার নিজের প্রাসাদের অনতি দূরে বসিয়ে দিয়েছিল। রাণী ভেবেছিল একসময় ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে মুসলিম বাহিনী অবরোধ উঠিয়ে যখন চলে যেতে চাইবে তখন পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবে তার বিশেষ বাহিনী।

বিন কাসিমের বাহিনী যখন দুর্গে প্রবেশ করল, তখন রাণীর বিশেষ বাহিনী তাদের ব্যারাকেই অবস্থান করছিল, তারা মুসলিম সৈন্যদের দুর্গে প্রবেশের কোন সংবাদই পেল না। কিন্তু বিন কাসিমের গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী দুর্গে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তার একান্ত গোয়েন্দারা রাণীর বিশেষ বাহিনীর খবর দিলো। ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে শা'বান ছাকাফীর গোয়েন্দারা বহু পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল। তারা রাণীর বিশেষ বাহিনীর অবস্থান ও গঠনের পুরোপুরি খবর রাখতো।

শা'বান ছাকাফী তার গোয়েন্দাদের রিপোর্ট সম্পর্কে সাথে সাথেই বিন কাসিমকে অবহিত করলেন। তিনি বিন কাসিমের অনুমতি নিয়ে একদল সৈন্য নিয়ে রাণী প্রিয়সীর সৈন্যদের অজান্তেই ওদেরকে ঘেরাও করে ফেললেন। ওরা কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই শা'বান ছাকাফীর সৈন্যরা ওদের পাকড়াও করে

ফেলল। রাণীর বাহিনীর পক্ষে কোন ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ হলো না।

✪✪✪

রাণীর বিশেষ বাহিনী পাকড়াও হওয়ার সাথে সাথে রাজ প্রাসাদে খবর হয়ে গেল বিন কাসিমের সৈন্যরা দুর্গে ঢুকে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রী সিয়াকর রাণী প্রিয়সীকে ঘুম থেকে জাগালো। তখন বেলা অনেক ওপরে উঠে গেছে কিন্তু রাণী তখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল।

রাণী, আরব সৈন্যরা দুর্গে ঢুকে পড়েছে।

মুসলিম সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে শহরের বাইরে বসে আছে আর তোমরা এখনো দুর্গের ভিতরে আরামে দিন কাটাচ্ছ উজির। তোমার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছ থেকে এমনটাই কি প্রত্যাশিত?

রাণী, তোমার হুকুম আমার ওপর চলতে পারে কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ওপর তোমার কোন হুকুম চলবে না, এখন পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করো। ওঠো এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করো। দৃঢ়কণ্ঠে বলল উজির সিয়াকর।

আরে আমার বাঘের বাচ্চারা সব কোথায়? তুমি এসব কি বলছ? ওদের বলো, আমি ওদেরকে যে জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, সেই সময় এখন এসে গেছে।

সেই সময় আর হবে না রাণী। তোমার বাঘের বাচ্চারা সব শিয়ালের মতো মুসলিম বাহিনীর হাতে বিনা প্রতিরোধে বন্দি হয়েছে। রাণী, তুমি কি পালাতে চাও, না স্বেচ্ছায় মুসলমানদের হাতে বন্দি হতে চাও? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল উজির সিয়াকর।

আমাকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করো। আমি এক্ষুণি পুরুষের পোশাক পরে নিচ্ছি।

রাণী প্রিয়সী তার সেবিকাদের বলল, কে আছো, তাড়াতাড়ি মহারাজের পোশাক ও তরবারী নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণী প্রিয়সী রাজা দাহিরের পোষাক পরে হাতে তরবারী নিয়ে একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু রাণী প্রিয়সী রাজপ্রাসাদের আঙিনা অতিক্রম করার আগেই মুসলিম বাহিনীর পনের ষোলজন অশ্বারোহী প্রাসাদের প্রধান ফটকে প্রবেশ করল।

তাদের সাথে শা'বান ছাকাফীও ছিলেন। তিনি রাণীকে দেখেই তার গতিরোধ করলেন।

"আমি তোমাদের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি," শা'বান ছাকাফীর উদ্দেশ্যে কণ্ঠে পুরুষালী ভাব এনে বলল, পুরুষরূপী রাণী প্রিয়সী।

আরে নারী! বাঘ যদিও বা সিংহের রূপ ধরতে পারে, তুমিও হয়তো পুরুষের বেশ ধারণ করতে পারো। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি, তোমার মতো এতো সুন্দর পুরুষ সিন্ধুর মাটি জন্ম দিতে পারেনি। মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ফেলো। বলো, তোমার আসল পরিচয় কি? বললেন গোয়েন্দা প্রধান। সেই সাথে তিনি সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন, প্রাসাদের সবাইকে বন্দি করে ফেলো।

কিছুসংখ্যক সৈন্য মহলের দিকে অগ্রসর হলে শা'বান ছাকাফী তার ঘোড়াকে রাণীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে হঠাৎ রাণীর মাথার পাগড়ী একটানে খুলে ফেললেন। পাগড়ী খোলার সাথে সাথেই রাণীর দীর্ঘ কেশরাজী তার সারা কাধ ও পিঠে ছড়িয়ে পড়ল।

তোমাকে কি এখনও কেউ বলেনি, আমরা নারীর ওপর কখনো আঘাত করি না? দেখেতো মনে হচ্ছে তুমি কোন সাধারণ নারী নও। রাজা দাহিরের সাথে তোমার কি সম্পর্ক ছিল?

"আমি মহারাজ দাহিরের স্ত্রী। আমি রাণী প্রিয়সী।"

কই তোমার সেই বিশেষ বাহিনী কোথায়? আমাদের পরাস্ত করতে তুমি যে বাহিনী গঠন করেছিলে?

জানতে পারলাম, তোমাদের প্রতিরোধ করার সুযোগই ওদের হয়নি। ওরা যদি মোকাবেলার সুযোগ পেতো, তাহলে আর আমাকে পুরুষের পোশাক পরতে হতো না।

কিছুক্ষণ পর রাণী প্রিয়সীকে বন্দী করে বিন কাসিমের সামনে হাজির করা হলো।

"ওকে মহলেই নিয়ে যাও। তাকে কাপড় বদলাতে দাও এবং কোন ধরনের পেরেশানী না করে সসম্মানে থাকার সুযোগ দাও।" নিজ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম।

রাণীকে প্রাসাদে পৌঁছে দেয়া হলো। প্রাসাদে রাজা দাহিরের প্রিয়প্রাত্র উজির সিয়াকরকে গ্রেফতার করে বিন কাসিমের সামনে হাজির করা হলো।

বিন কাসিম সিয়াকরকে দেখেই চিনে ফেললেন, কারণ এর আগে সিয়াকর তার সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়ে ছিল।

সম্মানীত সেনাপতি! আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আমাদের শহরের সাধারণ মানুষের সাথে আপনার আচরণ কেমন হবে? বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বলল সিয়াকর।

যে ব্যবহার তোমার সাথে করা হচ্ছে, সবার সাথে একই আচরণ করা হবে। কাউকেই যুদ্ধবন্দি কিংবা দাসে পরিণত করা হবে না। তোমার পূর্ব মর্যাদা বহাল রাখা হবে। এজন্যই তোমাদের রাণীকে তার প্রাসাদে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

তিন চারদিন পর বিন কাসিমকে খবর দেযা হলো, প্রায় হাজারখানিক লোক যাদের সবার দাড়ি গোঁফ সম্পূর্ণ ছাটা বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। বিন কাসিম তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে দেখলেন, সুশৃঙ্খল ভাবে দাড়ানো এবং একই পোশাক পরিহিত একদল লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

বিন কাসিম তাঁর স্থানীয় দুভাষীকে বললেন, এদেরকে দেখে মনে হচ্ছে, এরা সাধারণ কোন নাগরিক নয়। এরা কোত্থেকে এসেছে? কি চায়? কি তাদের পরিচয়? জিজ্ঞেস করো?

দুভাষী জিজ্ঞেস করলে তারা জানালো, আমরা কোন সেনাবাহিনীর সদস্য নই। আমরা সবাই ব্রাহ্মণ। আমাদের বহু লোক দুর্গ পতনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে। আমরা আপনাদেরকে তাদের মরদেহ দেখাতে পারি।

তাহলে তোমরা কেন আত্মহত্যা করনি? তোমাদের ধর্ম কি আত্মহত্যা সমর্থন করে? জানতে চাইলেন বিন কাসিম।

না, আমাদের ধর্ম আত্মহত্যা সমর্থন করে না, বলল ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র। যারা আত্মহত্যা করেছে, তারা মৃত রাজার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতে আত্মহুতি দিয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত যিনি আমাদেরকে সমাজে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন। সেই সাথে আমরা তাদের প্রতিও বিশ্বস্ত থাকি, যে আমাদের সামাজিক উঁচু মর্যাদা বহাল রাখে।

তোমরা কি আমার কাছে তোমাদের উঁচু মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করতে এসেছ? জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

আমরা জানতে এসেছি, এদেশের সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্রাহ্মণ শ্রেণির প্রতি আপনার মনোভাব কি?

তোমরা যদি লড়াইকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকো এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের আক্রমণ বা যুদ্ধ চেষ্টা না করো, তাহলে আমরা তোমাদেরকে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার দেবো। কিন্তু অন্য লোকদের থেকে আমরা তোমাদের ভিন্ন মর্যাদায় বিশ্বাস করি না। আমাদের ধর্মে ধনী-গরীব, ছোট-বড় এমন কোন শ্রেণি বৈষম্য নেই। আমি আরব বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং বিজিত অঞ্চলের শাসক পদে আমাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই দায়িত্ব অনেকটা তোমাদের প্রধান পুরোহিতের মতো। কিন্তু আমাদের আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা ও আমার সওয়াব এতটুকুই যতোটুকু আমার বাহিনীর এক সাধারণ সৈনিকের। আমার নেতৃত্বে ও ইমামতিতে যারা নামায পড়ে তাদের কারো থেকে আমার বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। এখানকার একজন সাধারণ নাগরিক যতটুকু অধিকার পাবে তার সবটুকু তোমরাও পাবে, এর বেশি নয়। তোমরা যদি সাধারণ মানুষ থেকে বেশি মর্যাদা ও অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাও, তাহলে তা হবে আমাদের আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ যা আমাদের বিধানে শাস্তিযোগ্য।

ঠিক আছে, আমরা আপনার এই নির্দেশ মেনে চলবো, বলল ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র। কিন্তু হে আরব সেনাপতি! আমাদের কি স্বাধীনভাবে আমাদের মন্দিরে ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে? না আপনারা তরবারীর জোরে আমাদেরকে ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করবেন?

আমি তোমাদেরকে একথা অবশ্যই বলব, তোমরা আমাদের ধর্মের বিধিবিধান ও কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে অবলোকন কর, তোমরা পর্যবেক্ষণ করো, আমরা আমাদের ধর্মের শিক্ষা কতটুকু বাস্তবায়ন করি এবং ধর্মপালনে কোন ধরনের শ্রেণিভেদ করি কি-না?

আমাদের রাজা নিহত হয়েছে' বললেন ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র। আমরা তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম। আমরা তার সম্মানে মাথা ন্যাড়া করেছি এবং শোকের পোশাক পরেছি। এটা আমাদের দেশের রীতি। কেউ যদি মারা যায় তার বড় ছেলে শোক প্রকাশে মাথা ন্যাড়া করে এবং সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করে। এখন আপনি আমাদের রাজা। আমরা আগের রাজার মতোই আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, ব্রাহ্মণ দলের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে রাজা দাহিরের অধস্তন বংশধরদের তথ্য জানার জন্য বিন কাসিম ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যদি আমার আনুগত্য স্বীকার করেই

থাকো, আর আমার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে থাকো, তাহলে বলো, রাজা দাহিরের যেসব আপনজন এখনো বেঁচে আছে, তারা কে কোথায় অবস্থান করছে এবং কে কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

এই দুর্গে শুধু রাণী প্রিয়সী অবস্থান করছিল, যাকে আপনি গ্রেফতার করেছেন, বলল ব্রাহ্মণ মুখপাত্র। রাণী প্রিয়সী একদল রক্ত পিপাসু সৈন্য তৈরি করেছিল। তাদেরও আপনি গ্রেফতার করে ফেলেছেন। সে মুক্ত থাকলে আপনার জন্যে বিপদ হয়ে উঠতো। তাকে আপনি নাগিনী মনে করতে পারেন। তবে নাগিনীর বিষ দাঁত আপনি ভেঙে ফেলেছেন।

তবে আরেকটি কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, রাণী প্রিয়সী খুবই সুন্দরী ও ধূর্ত। তার মুখের ভাষাও যাদুমাখা। আপনি যুবক মানুষ। আপনাকে তার মোহনীয় রূপ সৌন্দর্য আর যাদুকরী কথা যেনো পেয়ে না বসে, বলল অপর এক ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণদের কথায় বিন কাসিমের মধ্যে কোন ভাবান্তর ঘটলো না, তিনি পূর্ববৎ ভাবলেশহীন রইলেন। কোন প্রতিক্রিয়াই ব্রাহ্মণের কথায় প্রকাশ করলেন না।

আরেকজন নারী আপনার জন্যে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারতো, সে ছিল মায়ারাণী। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, মহারাজা দাহিরের সাথে তার ছিল দ্বৈত সম্পর্ক। সে রাজার সহোদরা ছিল, আবার তার বিয়ে করা স্ত্রীও ছিল। এজন্য ভগবানের গজব নেমে আসে। কারণ আপন সহোদরাকে বিয়ে করা মহাপাপ।

মায়ারাণী এখন কোথায়? ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

নিশ্চিত বলতে পারব না, তবে শুনেছি, সে সতীদাহ স্বরূপ আত্মহুতি দিয়েছে।

কোথায়?

এই শহরেই। এই শহরের একপ্রান্তে আপনি একটি পতিত বাড়ি দেখতে পাবেন। শুনেছি, সেখানে সে কাঠখড়ি জড়ো করে চিতা জ্বালিয়ে আত্মহুতি দিয়েছে।

বিন কাসিম ব্রাহ্মণদের সাথে আর কথা না বাড়িয়ে তাদের বিদায় করে দিলেন।

✪ ✪ ✪

ব্রাহ্মণরা চলে গেলে বিন কাসিম শা'বান ছাকাফীকে ডেকে মায়ারাণী সম্পর্কে দেয়া ব্রাহ্মণদের তথ্য যাচাই করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, ব্রাহ্মণদের কথা কতটুকু বাস্তব তা যাচাই করে দেখা দরকার।

ব্রাহ্মণরা খুশি মনেই বিন কাসিমের কাছ থেকে বিদায় নিল। কারণ প্রথমতঃ তারা তাদের জীবনের নিরাপত্তা পেল, দ্বিতীয়তঃ তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের মন্দিরে ধর্মকর্ম করার সুযোগ পেল।

এদিকে কিছু দূর যেতেই শা'বান ছাকাফী ব্রাহ্মণদের পথরোধ করে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, তারা কার কাছে শুনেছে, মায়ারাণী আত্মহুতি দিয়েছে?

ব্রাহ্মণরা তাকে সব ঘটনা বলল এবং একটি পতিত বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, সেখানে মায়ারাণী আত্মহুতি দিয়েছে। গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী তার একান্ত দু'জন যোদ্ধাকে নিয়ে পতিত অনাবাদী এলাকার কাছাকাছি বাসিন্দাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের দু'জন জানালো, একরাতে তিনজন পুরোহিতকে তারা এই পতিত বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে। তাদের একজন আরো জানালো, সেই রাতে অনেক দেরীতে তিন পুরোহিতের মধ্যে দু'জনকে সে পতিত বাড়ি থেকে ফিরে আসতে দেখেছে। শা'বান ছাকাফী তাদের একজনকে সাথে নিলেন। কিছুক্ষণ অগ্রসর হলে ঘন গাছগাছালির ভিতরে একটি বাড়ি দেখতে পেলেন।

শা'বান ছাকাফী দেখতে পেলেন, বাড়িতে একটি মাত্র পুরনো ইটের ঘর। ঘরটির মাত্র দু'টি দরজা। দরজা ধাক্কা দিলে বোঝা গেল ভিতর থেকে খিল আটকানো। কয়েকবার ধাক্কা দেয়া হলো, কিন্তু ভিতর থেকে কারো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ভিতরের লোকজনকে তুমি ডাকো' স্থানীয় লোকটিকে নির্দেশ দিলেন গোয়েন্দা প্রধান। তিনি আরো বললেন, ভিতরের অধিবাসীদের বলো, তাদের ওপর কোন ধরনের শাস্তি হবে না এবং তাদের কোন ধরনের হয়রানী করা হবে না।

এখানে কেউ থাকে না। যদি ভিতরে কেউ থেকেও থাকে, তবে সে এখানকার বাসিন্দা নয়, কেউ হয়তো এখানে এসে লুকিয়ে থেকে থাকবে। আপনারা দরজা ভেঙে দেখুন, বলল লোকটি। শা'বান ছাকাফী ইশারা করতেই তার সাথীরা একটি দরজার খিল ভেঙে ফেলল এবং সাথে সাথে ক্ষীপ্ত গতিতে তরবারী উঁচিয়ে সবাই ভিতরে প্রবেশ করল।

ঘরের ভিতরের পরিবেশ ছিল ভীতিকর। ঘরের ভিতরে আগুনে পোড়া মানুষের দুর্গন্ধে দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। সবাই দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে নাকে কাপড় দিলো। সবার চোখ জ্বলতে শুরু করল। একটি খেরকী দরজা দিয়ে অন্য কক্ষে গেলে এটির ফাঁক দিয়ে কিছুটা আলো দেখা গেল। আলো অনুসরণ করে আরেক কক্ষে গেলে দেখা গেল একটু মেঝে ও আঙিনা।

আঙিনায় জ্বলন্ত কাঠের কয়লা দেখা গেল। কয়লার মধ্যে তিনটি মরদেহ দেখা গেল, যেগুলো পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। এগুলো এতোটাই বিকৃত হয়ে গেছে যে, হাত, পা, নাক, মুখ চেহারার অবয়ব বোঝা যায় না।

হঠাৎ অপর পাশের কোথাও কোন মানুষ দৌড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে দরজার কাছে পলায়নকারী দু'জনকে পাকড়াও করা হলো। গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশী করে তার কাছ থেকে গলে যাওয়া কিছু স্বর্ণের টুকরো পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানালো, তারা উভয়েই ছিল মায়ারাণীর একান্ত কর্মচারি। তারা জানতো মায়ারাণী এক পুরোহিত ও এক সেবিকাসহ স্বর্গবাসী হচ্ছে। তারা এও জানতো মায়ারাণীর শরীরে স্বর্ণের অলংকার রয়েছে, এজন্য তারা লোক চক্ষুর আড়ালে মায়ার চিতা থেকে স্বর্ণ তুলে নেয়ার জন্য এখানে এসেছিল।

কোন হিন্দু জ্বলন্ত চিতায় আত্মহুতি দিয়েছে, এ নিয়ে বিন কাসিম ও শা'বান ছাকাফীর কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। তারা শুধু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন, সত্যিকার অর্থেই মায়রাণী আত্মহুতি দিয়েছে কি-না। শা'বান ছাকাফী মন্দিরে গিয়ে সেই দুই পুরোহিতকে আলাদা করলেন। এদের একজন ছিল যথেষ্ট বয়স্ক। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বয়স্ক পুরোহিত বলল, 'হ্যাঁ' মায়ারাণী এক পুরোহিত ও তার একান্ত সেবিকাকে নিয়ে আত্মহুতি দিয়েছে।

আমরা জানি, তোমাদের ধর্মে সতীদাহ প্রথা রয়েছে কিন্তু রাণী প্রিয়সী নিজেকে সতীদাহ করল না কেন? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন ছাকাফী।

মায়ারাণীও আত্মহুতি দেয়ার মতো নারী ছিল না, বলল বৃদ্ধ পুরোহিত। আমি শুনেছি, সে এই ঘরে লুকিয়ে থাকার জন্য তার একান্ত চাকরাণীকে নিয়ে এসেছিল। কারণ, আপনারা দুর্গে প্রবেশ করার পর তার আর পালানোর মতো সুযোগ ছিল না। সে এই ভেবে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে বেশ বদল করে উরুঢ়ে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে আপনাদের

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করবে। সে বলেছিল, নিজে সে রণাঙ্গনে যাবে এবং নিজ ভাই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু যে ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছিল এই ঘরটি মানুষের বসবাসের উপযোগী ছিল না।

কেন, ঘরটি কি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ছিল? জানতে চাইলেন শা'বান ছাকাফী।

না, ব্যাপারটি এমন নয়। এই বাড়িটি প্রেতাত্মার আখড়া। সেখানে যে কেউ দু'একদিন কাটালে প্রেতাত্মাদের প্রভাবে আত্মহত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আমি নিজেই প্রেতাত্মার নারী কণ্ঠের আওয়াজ শুনেছি।

এই হলো তোমাদের ধর্মের একটা খারাপ দিক। তোমরা নানা আজগুবী অলৌকিকতায় বিশ্বাস করো, যার কোন বাস্তবতা নেই, বললেন গোয়েন্দা প্রধান।

ব্রাহ্মণাবাদকে বিন কাসিম তাঁর শক্তিশালী একটি সেনা শিবিরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন। এ পর্যন্ত যে কয়টি দুর্গ তিনি জয় করেছেন সবগুলোতেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুন্দর করেছিলেন। নাগরিকদের ওপর এমন সহজ করারোপ করেছিলেন, যা তারা অনায়াসে পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণাবাদের প্রশাসনের ব্যাপারে তিনি পূর্বের চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তিনি ব্রাহ্মণাবাদের অধিবাসীদের নিশ্চিন্ত করার জন্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে মুসলমানদের প্রাপ্য সব সুযোগ সুবিধা দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যে সব হিন্দু ও বৌদ্ধ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করবে তাদের ওপর ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করা হবে না। কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই জিযিয়া পরিশোধ করতে হবে। তিনি বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এই তিন ভাগে নাগরিকদের ভাগ করে পয়তাল্লিশ দিরহাম, চব্বিশ দিরহাম ও বারো দিরহাম জিযিয়া আরোপ করলেন।

দুর্গের পুরোহিতদেরকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হলো। যাদের কাছে পূর্ব থেকেই সরকারি জায়গা জমি ছিল তা তাদের কব্জায়ই বহাল রাখা হলো। হিন্দু বাহিনী যেসব ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক মোটা অংকের টাকা উসূল করছিল কিংবা যুদ্ধের কারণে যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জন্য প্রায় এক লাখ বিশ হাজার দিরহামের নগদ সাহায্য দেয়া হলো।

শহরের প্রশাসানিক ব্যবস্থায় বহু উচ্চ পদে ব্রাহ্মণদের পদায়ন করা হলো। হিন্দু প্রশাসনে যারা উচ্চপদে আসীন ছিল তাদেরকে সপদে বহাল রাখা হলো। এবং দুর্গের প্রধান ফটক রক্ষায় সেনাবাহিনীর যে অফিসার

নিযুক্ত ছিল তাকেও সেই পদে বহাল রাখা হলো। প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের পর বিন কাসিম একদিন সকল কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বললেন, আমরা বিজয়ী শক্তি হওয়ার পরও, তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছি। আমরা কি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে দাস দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারতাম না? কিন্তু আমরা তোমাদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করিনি। আমি তোমাদেরকে বলছি, শহরের সাধারণ নাগরিকদেরকে দাসদাসী মনে করবে না। তাদের কাছ থেকে আমি যা নির্ধারণ করে দিয়েছি এই পরিমাণ কর আদায় করবে। কেউ যদি কর দিতে অসুবিধা বোধ করে অথবা অক্ষম হয় তাহলে এজন্য তার ওপর অত্যাচার করবে না। এমনটি হলে আমার কাছে খবর পৌঁছাবে, আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলে তার করের বোঝা লাঘব করার ব্যবস্থা করব...।

তোমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো, শাসক ও প্রজাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা। নাগরিকরা যাতে মনে করে প্রশাসক তাদের আপন, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষি। কেউ যদি কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তাৎক্ষণিক আমাকে অবহিত করবে যাতে বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়। কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিমের ইবাদতখানা বা ধর্মালয়ের অমর্যাদা করে তাহলে সে বিজয়ী বাহিনীর লোক বলে তাকে ছেড়ে দেয়া যাবে না, তার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে যেমনটি যেকোন অপরাধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হিন্দুদেরকে দেয়া বিন কাসিমের সুযোগ সুবিধা ছিল তাদের ধারণাতীত। তাদের বিশ্বাস ছিল, অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম বিজয়ীরা তাদের পিঠের চামড়াও তুলে নিতে চেষ্টা করবে আর সামাজিক ভাবে অভিজাত হিন্দুদের অবস্থান হবে নীচু জাতের হিন্দুদের মতো। বিন কাসিমের এই উদার বদান্যতার ফল হলো, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সকল ব্রাহ্মণ ও শহরের অভিজাত হিন্দুদের ডেকে বলল, সবার কাছে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দেবে। হে সিন্ধুবাসী! তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে রাজা দাহিরের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তার বংশের রাজত্বও খতম হয়ে গেছে। সিন্ধুর শাসন ক্ষমতা আরব মুসলমানদের হাতে। মুসলমানদের সম্পর্কে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, তাদের দৃষ্টিতে উঁচু নীচু, ধনী গরীব গ্রাম্য শহুরে সকল নাগরিক সমান। এটা তাদের ধর্মের শিক্ষা। তাদের এই নীতি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া আমি কর্তব্য মনে করছি। বিজয়ী আরব

মুসলমানরা আমাদের সাথে আরো সুযোগ সুবিধা দেয়ার ওয়াদা করেছে কিন্তু শর্ত হলো তাদের অনুগত থাকতে হবে, কোন অবস্থাতেই বিদ্রোহমূলক কিছু করা যাবে না। তোমাদের কেউ যদি বিশ্বস্ততা বিনষ্ট করে গাদ্দারী করে, তাহলে সকল হিন্দুকেই এজন্য খেসারত দিতে হবে। এর চেয়ে আর সুবিধা কি হতে পারে একটি বিজাতীয় বিজয়ী শক্তি আমাদের ব্রাহ্মণজাতিকে সমাজে তাদের যে মর্যাদা ছিল তাই বহাল রেখেছে এবং মুসলিম শাসক তো শাসন ক্ষমতার সব উঁচু পদও ব্রাহ্মণদের হাতেই সোপর্দ করেছে। বিজয়ী বাহিনী আমাদের ওপর যে কর ধার্য করেছে, তা প্রত্যেক প্রজা খুব সহজেই উসূল করতে পারবে। তারপরও যদি কেউ এই কর দিতে অস্বীকার করে তবে তার উচিত হবে সিন্ধু এলাকা ছেড়ে হিন্দুস্তানের অন্য কোন অঞ্চলে চলে যাওয়া।

✪ ✪ ✪

এদিকে রাজা দাহিরের বিশ্বস্ত উজির সিয়াকরও নানা পরীক্ষায় বিন কাসিমের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখলো এবং তাকে বাস্তব ভিত্তিক নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছিল।

বিন কাসিম বিদা বিন হুমাইদ আল বাহরীকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করলেন এবং নোভা বিন দিরাসকে রাওয়া দুর্গের শাসক নিযুক্ত করে বললেন, ওখান থেকে যতসম্ভব তুমি নৌকা সরবরাহ করো এবং নদীপথে যদি কোন অপরিচিত নৌকা সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণ করে তবে তা আটকে ফেলবে। এভাবে বিজিত প্রতিটি দুর্গের শাসক হিসাবে তিনি মুসলমানদের নিয়োগ করলেন। সালেহ্ নামের এক মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম বেশ কয়েকটি যুদ্ধে এমন বীরত্ব ও কুশলী যুদ্ধ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল যে, দেহে অস্বাভাবিক শক্তি ও বুদ্ধি উভয়টির সমন্বয় না থাকলে কারো পক্ষে এতোটা কুশলী নৈপূণ্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। বিন কাসিম তার পারদর্শিতা ও নৈপূণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে মাকরানের একটি অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তারা মাকরানেই বিয়েশাদী করে বসতি স্থাপন করে। যাদের অধস্তন বংশধর এখনো মাকরানে বর্তমান রয়েছে।

বিন কাসিমের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল ছিল উরুঢ় যা রাজা দাহিরের রাজধানী। কিন্তু উরুঢ়ের আগে ছোট ছোট কয়েকট দুর্গ ছিল। তবে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ ছিল একটি উপজাতি। স্থানীয় ভাষায় এরা ছিল জাট। খুবই দুর্ধর্ষ ও

স্বাধীনচেতা এই জাট জনগোষ্ঠী। স্থানীয় লোকজন বিন কাসিমকে জানালো, জাটরা ছিল রাজা দাহিরের জন্যও চিন্তার কারণ। কেননা তারা কোন রীতিনীতির পরওয়া করে না, কারো শাসন মানতে তারা নারাজ।

বিন কাসিমের কাছে যখন জাট জনগোষ্ঠীর খবর এলো, তখন তিনি সিয়াকরকে ডেকে জাটদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সিয়াকর বলল, এই জনগোষ্ঠী খুবই দুর্ধর্ষ ও জংলী। এরা অসভ্য এবং অপরাধ প্রবণ। সভ্যসমাজে এদের যাওয়ার কোন অনুমতি নেই এবং তাদের কারো অশ্বারোহণের অনুমতি ছিল না। এদের পরিধেয় বস্ত্র মোটা। বিন কাসিম জাট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা শুনলেন কিন্তু মন্তব্য করলেন না। এদিকে বিন কাসিম যখন উরুঢ়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওদিকে উরুঢ়ে তখন বিন কাসিমকে প্রতিরোধ করার প্রাণান্তকর প্রস্তুতি চলছিল। উরুঢ়ের বিস্ময়কর অবস্থা এই ছিল যে, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী বিশ্বাস করতো, রাজা দাহির তখনো জীবিত রয়েছে। মন্দিরের পূজা-অর্চনাতেও রাজা দাহিরকে এভাবে স্মরণ করা হতো যে, রাজা দাহির জীবিত।

এই বিশ্বাসের কারণ ছিল রাওয়া যুদ্ধে দাহিরের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়েছিল। যারা জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছিল তাদের কেউই রাজা দাহিরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেনি। এর মধ্যে এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছিল রাজা দাহিরের ছোট স্ত্রীর খবর। দাহিরের ছোট স্ত্রী রাণী প্রিয়সী ব্রাহ্মণাবাদের সৈন্যদেরকে রাজার মৃত্যু খবর দিয়ে প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত করেছিল বটে কিন্তু সে উরুঢ়ে সংবাদ দিয়েছিল রাজা দাহির জীবিত। তাই উরুঢ়ে এই খবরই প্রচার হয়ে গিয়েছিল, দাহির হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে সফর করছেন।

অনেক ঐতিহাসিকও লিখেছেন, আসলে এই প্রচারণা অমূলক ছিল না, রাজার বংশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল রাজা মরেনি। সে সেনা সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছে। উরুঢ়বাসী এ খবরও জানতো না রাণী প্রিয়সী বিন কাসিমের হাতে বন্দি হয়েছে এবং মায়ারাণী আত্মহত্যা করেছে।

বিন কাসিম ৯৪ হিজরী সনের ৩ মুহররম উরুঢ়ের দিকে রওয়ানা হলেন। বিন কাসিম ডাহতা নামক একটি ঝিলের কাছে তাবু ফেলে আশেপাশের অধিবাসীদের খবর দিলেন, তারা যেন আরব বাহিনীর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। কেননা মুসলমানরা এখন সিন্ধুর শাসক। রাজা দাহির মারা গেছে। এলাকাটি ছিল বৌদ্ধ অধ্যুষিত। অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ব্যবসায়ী। খবর

পাওয়া মাত্রই বৌদ্ধদের সর্দার বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। বৌদ্ধ সর্দার এসে শুধু আনুগত্যই প্রকাশ করল না, সব ধরনের সহযোগিতা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল। বৌদ্ধদের মধ্যে দু'জন ছিল খুবই উঁচুমানের সর্দার। বিন কাসিম তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে তাদেরকে তার সরকারের ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। বিন কাসিম বৌদ্ধ সর্দারদের বললেন, তোমাদের পাশেই জাটদের বসবাস। তাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক কেমন?

জাট জনগোষ্ঠির ওপর নির্ভর করা যায় না' বলল এক বৌদ্ধ সর্দার। হিন্দু শাসকরা জাটদেরকে সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ফলে এরা সভ্য সমাজের প্রতি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। লুটতরাজ ও হিংস্রতাই এদের জীবন ও পেশা। আমরা তাদেরকে নিয়মিত কিছু চাঁদা দেই এবং তাদেরকে আমাদের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ দেই। এজন্য ওরা আমাদেরকে কোন রকম হয়রানী করে না। এদেরকে সামাজিক মর্যাদা শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে হয়তো এই হিংস্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন আসত।

আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। মানবিকতা ও মানব প্রেমের বৈশিষ্ট দিয়ে আমরা ওদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছি। ফলে ওরা আমাদের সাহায্য সহযোগিতাকে সম্মান দেয়, বলল অপর বৌদ্ধ সর্দার।

তারিখে মাসুমীতে বর্ণিত হয়েছে, সেই দিন বিন কাসিমকে খবর দেয়া হলো, দুই জাট সর্দার তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। তিনি তখনি তাদের নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। দুই জাট সর্দার যখন বিন কাসিমের কাছে এলো, তাদের দেখে কোন সর্দার ভাবার অবকাশ ছিল না। উভয়েই কাধ থেকে পা পর্যন্ত মোটা কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছিল।

তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছো? বিন কাসিম দুই জাট সর্দারকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা আপনার আনুগত্য প্রকাশ করতে এসেছি, বলল দুই জাট সর্দার। তবে আমাদের আরো গোত্র আছে, তাদের সর্দারের সাথে কথা বলে আমরা আপনাকে চূড়ান্ত আনুগত্যের কথা জানাবো। তবে এর মধ্যে আপনি আমাদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করেন তাও আমরা যাচাই করব।

'আমিও দেখবো, তোমরা আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করো' বললেন বিন কাসিম। আমি এটা দেখবো না, তোমরা আমার আনুগত্য করেছ কি

করনি কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের অভ্যাস পরিবর্তন না করো, তাহলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

আমরা শুনেছি, বিজিত এলাকার লোকদের আপনি দাসদাসীতে পরিণত করেন না। তাদেরকে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা দেন এবং তাদের জীবন সম্পদ হেফাযত করেন। আপনি যদি পূর্ববর্তী রাজাদের মতোই আচরণ করেন, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আগের পেশাতেই ফিরে যেতে হবে।

তোমরা কি এই বাহিনীকে মোকাবেলা করতে পারবে, যে বাহিনী এতোগুলো দুর্গ ও অঞ্চল জয় করেছে এবং রাজা দাহিরের মতো তুখোড় যোদ্ধাকেও হত্যা করেছে?

হে আরব সর্দার! আমাদের আক্রমণ ভিন্ন প্রকৃতির। আপনি আমাদের কখনো মুখোমুখি পাবেন না। কিন্তু বিরুদ্ধে চলে গেলে আমাদের আক্রমণ থেকে কখনোই আপনার লোকজন রেহাই পাবে না। কিন্তু আমরা আপনার কাছে শত্রুতা নয় শান্তির জন্য এসেছি। আপনি আমাদের শান্তি প্রস্তাব কবুল করে নিন।

বিন কাসিম তাদের শান্তি প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু উভয় জাট সর্দারের চেহারা ছবি ও কথাবার্তা শুনে তিনি অনুমান করলেন এরা বেশি দিন তাদের বিশ্বস্ততা বজায় রাখবে না।

'এদের ব্যাপারে সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি আপাদত শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। কিন্তু জাট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে বিশদ বর্ণনা দিয়ে পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে জাটদের ব্যাপারে কি করণীয় এ ব্যাপারে পরামর্শও চাইলেন।

বিন কাসিম কোন ধরনের ঝুকি নিতে চাচ্ছিলেন না। কারণ জাটরা হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ ও দুর্ধর্ষ। এরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হলে দাহির পুত্রের সাথে মিশে যেতে পারে। অথবা দাহিরের পুত্র এদেরকে ইরানীদের মতো বিশেষ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিন কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারে।

কয়েক দিনের মধ্যেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জবাবী পত্র এসে গেল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ লিখলেন–

প্রিয় বৎস' তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তুমি জাট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছো। আমার মতামত

পরিষ্কার। যে জনগোষ্ঠী তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করে অথবা যে জনগোষ্ঠী তোমার জন্য ঝুকিপূর্ণ এবং যারা অব্যাহতভাবে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাদের সকল যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পাকড়াও করে হত্যা করবে। জাট জনগোষ্ঠীকে আমুলী কোন জনগোষ্ঠী মনে করো না। তুমি নিশ্চয়ই জানো এই জনগোষ্ঠীর লোকেরাই ইরানীদের পক্ষ হয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ওরা খুবই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। ওদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কিছু তুমি উল্লেখ করেছো। আমি আগেই ওদের সম্পর্কে জানতাম। জাট জনগোষ্ঠী তোমার মোকাবেলায় যুদ্ধ না করলেও ওরা তোমার জন্য ঝুকিপূর্ণ। ওরা তোমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না। লুটতরাজ হিংসা খুনাখুনিই ওদের পেশা। বংশ পরম্পরায় ওরা লুটতরাজ করে আসছে।

ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে তোমাকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ওদের মধ্যে কে কে যোদ্ধা ও খুনাখুনিতে সিদ্ধহস্ত তোমাকে তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং এদের হত্যা করে ফেলতে হবে।

এ ছাড়া ওদের নারী শিশুদেরকে ধরে এনে পণবন্দি হিসেবে তোমার কাছে রাখতে হবে। তবে ওদেরকে এমন লোকদের প্রহরাধীনে রাখতে হবে যাতে নারী শিশুদের ওপর কোন নির্যাতন না হয়। এ ছাড়া ওদের মধ্যে যেসব লোক ব্যবসায়ী কৃষিজীবী কারিগর ওদের ওপর খুবই হাল্কা কর আরোপ করবে। ওদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের ওপর জিযিয়া ধার্য না করে উশর ধার্য করবে। সেই সাথে তাদেরকে ইসলামী হুকুম আহকামের সাথে পরিচিত করার ব্যবস্থা নেবে। বস্তুত তুমি অতি কাছে থেকে ওদের দেখছো, আশাকরি বাস্তবতার নিরীখে কী করণীয় সে সম্পর্কে তুমিই ভালো বুঝবে। তবে খুব সতর্কতা ও দূরদর্শীতার সাথে ওদের ব্যাপারটি সামলাতে হবে।

হাজ্জাজ কঠোর হতে বললেও বিন কাসিম জাটদের প্রতি অতোটা কঠোর হলেন না। তিনি ওদেরকে কৌশল ও মানবতার দীক্ষা দিয়ে সভ্যতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর বিন কাসিম সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে জাটদের অপর একটি গোষ্ঠী সিমা কওমের আবাসস্থলের কাছে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। সিমা কওম জাটদের ওই জনগোষ্ঠী যাদেরকে কোন শাস্তিই বাগে আনতে পারেনি। বিন কাসিমের সৈন্যরা যখন শিবির স্থাপনের জন্যে খুঁটি পুঁততে শুরু

করে তখন শোনা গেল জাট জনবসতীর দিক থেকে ঢোল ও বাদ্য বাজনার আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যে বাদ্য বাজনার আওয়াজ ও মানুষের শোরগোল আরো এগিয়ে এলো। বিন কাসিম কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন, দেখে এসো তো এই বাদ্য বাজনা কারা করছে এবং কারা এ দিকে বাজনা বাজিয়ে অগ্রসর হচ্ছে?

কারো যাওয়ার দরকার নেই সম্মানীত সেনাপতি! এরা জাট জনগোষ্ঠী, বলল বিন কাসিমের দলের সাথে থাকা দাহিরের সাবেক উজির সিয়াকর। এটা জাটদের রীতি। ওরা যখন কাউকে অভ্যর্থনা জানায় তখন এভাবে ঢাকঢোল বাজায়। মনে হচ্ছে, ওরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতেই বাদ্য বাজনা নিয়ে নেচে গেয়ে এদিকে আসছে।

আমার তো মনে হয় এরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার মতো এতোটা বোকামী করবেনা, বললেন বিন কাসিম। তিনি একথা বলে একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জাটদের আসার দিকে অগ্রসর হলেন।

বিন কাসিম ঘোড়া ছুটাতেই তাঁর একান্ত নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁর পিছনে ঘোড়া ছুটাল। জাট জনগোষ্ঠী খোলা মাথা ও খালি পায়ে নেচে গেয়ে বাদ্যের তালে তালে এদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বিন কাসিম উন্মাতাল নাচে লিপ্ত মিছিলের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামিয়ে এক লাফে নীচে নেমে পড়লেন। বিন কাসিমকে দেখে জাটদের বাজনা আরো চড়ে গেল এবং নাচগান আরো তীব্র আকার ধারণ করল। এরপর বাদ্য বাজনা থামলে ওদের মিছিল থেকে দু'তিন জন লোক তার দিকে এগিয়ে এসে বিন কাসিমের সাথে মুসাফাহা করল। বিন কাসিমের সাথে দু'ভাষী ছিল, তার মাধ্যমে তিনি ওদের সাথে কথা বললেন। জাটরা তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে একজন সর্দার ধরনের লোককে সামনে এগিয়ে দিল।

আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এসেছি। তবে জানি না, আপনি আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করবেন কি না।

তোমরা যদি তোমাদের পেশা ত্যাগ করো তাহলে আমি শুধু তোমাদের অভ্যর্থনাই কবুল করবো না, বরং তোমাদেরকে আমাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবো। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও পেশা পরিবর্তন না কর তা হলে পূর্ববর্তী রাজাদের থেকে আরো কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আচ্ছা, তোমরা কি তোমাদের মধ্য থেকে এমন কোন সর্দারকে আমার কাছে পাঠাতে পারো, যার সাথে আমি সব ধরনের কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ, নিশ্চয় পাঠাবো! বলল জাট সর্দার। আমরা আপনার কাছে আমাদের এমন সর্দারকেই পাঠাবো যার সাথে আপনি সব ধরনের আলাপ আলোচনা করতে পারবেন।

অতঃপর জাট জনগোষ্ঠীর মিছিলটি পুনরায় নেচে গেয়ে বাদ্যবাজনা বাজাতে বাজাতে তাদের বসতির দিকে চলে গেল। ওদের দেখে বিন কাসিম কিছুটা স্বস্তিই বোধ করলেন। কিছুক্ষণ পরে বহুরিয়া নামে এক বৃদ্ধ জাট সর্দার আরো তিনজনকে সাথে নিয়ে বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। বিন কাসিম তাঁর তাঁবুতে সসম্মানে এদের বসালেন। তখন শা'বান ছাকাফীও আরো দু'জন সেনাপতি বিন কাসিমের তাঁবুতে বসা ছিলেন।

হে জাট সর্দার! বলো তোমরা কি উদ্দেশে আমার এখানে এসেছ? দু'ভাষীর মাধ্যমে জাট সর্দারকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

হে আরব সেনাপতি! আমার কওমের লোকেরা তোমাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তা থেকেই তোমার বুঝে নেয়া উচিত আমি কি উদ্দেশে এসেছি? বলল বৃদ্ধ জাট সর্দার। আমরা যাকে পছন্দ করি, যাকে সম্মান করি, তাকে এ ভাবেই অভ্যর্থনা জানাই। এটা আমাদের কওমের রীতি। আমাদের এলাকায় তোমাদের আগমনে আমরা খুশি হয়েছি।'

এখন আর এই এলাকা তোমাদের নয় সর্দার, এটা আমার এলাকা। এই এলাকা তখন তোমাদের হবে, যখন তোমরা আমার কাছে এটা প্রমাণ করবে যে, এই এলাকার কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা তোমাদের আছে। তোমরা তো একটা বীর জাতি ছিলে এখন তোমরা এমন লুটেরা খুনি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলে কেন? জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

আমাদের এই অবনতির কারণ রাজা চাচ। সে আমাদেরকে সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। রাজা চাচের ওপর যখন ইরানীরা আক্রমণ করেছিল, তখন সে আমাদেরকে দিয়ে যুদ্ধ করায়। তখন যদি আমরা জীবনবাজী রেখে যুদ্ধ না করতাম তবে ইরানীরা গোটা সিন্ধু অঞ্চল কব্জা করে নিতো। রাজা চাচ ও তার ছেলে দাহিরের কোন নাম নিশানাও থাকতো না। কিন্তু আমরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে ইরানীদের মাকরান থেকে আর সামনে অগ্রসর হতে দেইনি। কিন্তু রাজা চাচ আমাদের কোন সহযোগিতাই করেনি। ফলে বহুসংখ্যক জাট ইরানীদের হাতে বন্দি হয়। জাট বন্দিদেরকে ইরানীরা পশুর মতো থাকতে বাধ্য করে। কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা যখন ইরান আক্রমণ করে তখন ইরানীরা জাটদের দাসত্ব থেকে

মুক্তি দিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত করে। যুদ্ধে জাটরা আরবদের হাতে বন্দি হয়? আমরা যারা তাদের উত্তরসূরী ছিলাম তাদের পরাজয় ও বন্দিত্বের কারণে শাস্তি নেমে এলো আমাদের ওপর। রাজা চাচ আমাদের সব ধরনের মানবিক অধিকার কেড়ে নিলো। বাধ্য হয়েই আমরা লুটতরাজের পথ বেছে নিলাম। বৃদ্ধ জাট সর্দারের বলার ভঙ্গি এমন আবেগপূর্ণ ছিল যে, বিন কাসিম মনোযোগ দিয়ে তা শুনছিলেন।

তুমি জানো না আরব সেনাপতি! আমাদের সাথে এখানকার শাসকরা কেমন আচরণ করে তা তুমি জানো না। মোটা কম্বল ছাড়া আমাদের কোন কাপড় পড়ার অধিকার নেই। আমাদের পায়ে জুতো পরার অধিকার নেই। আমরা মাথায় পাগড়ী বাঁধতে পারিনা। আমরা ছিলাম ঘোড় সওয়ার জাতি। কিন্তু রাজা চাচ আমাদের অশ্বারোহণে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। যদিও বা কোন শাসকের অনুমতিতে আমাদের কোন সর্দারকে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার অনুমতি দেয়া হয় তবে সে ঘোড়ায় জিন লাগাতে পারে না। আমাদের কয়েকটি গোষ্ঠীর নারী শিশু আবাল বৃদ্ধ সবাইকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে আমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছি। যেখানেই আমরা সুবিধা পাই লুটতরাজ করি। এখন বলো, হে আরব সেনাপতি! তুমিও কি রাজার মতোই আমাদের সাথে আচরণ করবে?

এ প্রশ্নের জবাব তুমিই ভালো দিতে পারো, বললেন বিন কাসিম। তোমরা যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এমন আচরণই প্রত্যাশা করো এবং এমন আচরণই করো তাহলে পূর্বের রাজার দুঃশাসন থেকেও আমার আচরণ হবে আরো কঠোর। আরব থেকে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যে বিশৃঙ্খলা, হাঙ্গামা ও খুনাখুনি করবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। আর যারা শান্তি ও নিরাপদ জীবন-যাপনে আগ্রহী তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা দেবে এবং তাদের ওপর সহজ ও লঘু কর আরোপ করা। আমাকে এই নির্দেশও দেয়া হয়েছে, যারা সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকে সাধারণ মুসলমানদের মতোই সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমার ধর্মেরও নির্দেশ হলো, সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। তোমার ও আমার মধ্যে মানুষ হিসাবে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য যতটুকু আছে তা শুধু দায়িত্ব ও কর্তব্যের। সর্দার! তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো?

তোমার সব কথাই আমি বুঝতে পারছি আরব সেনাপতি! বলল জাট সর্দার। তুমিতো এখনো দুনিয়াকে ততোটা দেখোনি। তোমার বয়সটা আমার কেটেছে ঘোড়া ও তাঁবুতে। আমি জগতটাকে অনেক দেখেছি। তুমি যদি আমাদেরকে মানুষের মর্যাদা দাও, তাহলে আমরা তোমাকে তোমার বাহিনীর সেনাদের মতোই সুসভ্য মানুষ হয়ে দেখিয়ে দেবো।

এটা মনে করো না, তোমার সেনাবাহিনীর ভয়ে আমি একথা বলছি। আমি তোমাদের ধর্মের রীতি-নীতি সম্পর্কে জানি। আমি তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করবো কি করবো না এটা পরের কথা কিন্তু আমি জানি, তোমাদের ধর্ম আমার ও রাজা দাহিরের ধর্ম থেকে ভালো। আমি শুনেছি, এ পর্যন্ত তুমি যেসব অঞ্চল জয় করেছো, সোখানকার অধিবাসীদের ওপর কোন জুলুম অত্যাচার করোনি।

তোমার গোত্রের সব লোক কি তোমার নির্দেশ মেনে চলে? জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

আমার গোত্রের লোকেরা শুধু আমার নির্দেশই মান্য করে না, ওরা তো আমাকে রীতিমতো ভগবানের মতো সম্মান করে। তুমি বলো, কোন নির্দেশ তুমি মানাতে চাও? বলল জাট সর্দার বহুরিয়া।

আমি চাই, তোমরা মানুষের মতো জীবন-যাপন করো এবং আমাদের কাছ থেকেও মানুষের আচরণ প্রত্যাশা করো। আমার ধর্মের বিধিনিষেধকে দেখো। আমার বাহিনীর কোন সিপাহী বা কর্মকর্তা সম্পর্কে যদি কোন অপরাধের অভিযোগ করো, তাহলে তাকেও এমনই শাস্তি দেয়া হবে যেমন শাস্তি তোমাদেরকে রাজা দাহিরের পক্ষ থেকে দেয়া হতো।

তা হলে শুনে রাখো হে আরব সেনাপতি! আজ থেকে আমরা ঠিক সেই রকম মানুষ হয়ে গেলাম যেমনটি তুমি দেখতে চাও। আমরা তোমার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। তুমি যা ইচ্ছা আমাদের ওপর কর ধার্য করতে পারো। আমরা খুশী মনেই তা পরিশোধ করবো।

আজ থেকে তোমাদের সব ধরনের কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হলো, বললেন বিন কাসিম। আর কাউকেই খালি পা ও খালি মাথায় থাকতে হবে না। এখন থেকে তোমরা জিন লাগিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারবে। কিছুদিন আমি তোমাদের দেখবো, তোমরা আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছো কি না। তোমরা যদি আমার কথা মেনে চলো, তাহলে কিছুদিন পর তোমাদের লোকজনকে আমরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেবো।

যে জাট জনগোষ্ঠী ছিল হিংস্র লুটেরা কলহপ্রিয় ও খুনী এবং অনিয়ন্ত্রিত বিন কাসিমের দূরদর্শিতায় তারা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হলো। বিন কাসিম জাট সর্দার বহুরিয়াকে তার সমান্তরালে বসিয়ে কথা বললেন এবং তাকে কিছু হাদিয়া তোহফা দিলেন এবং তার মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে পায়ে জুতা পরিয়ে দিলেন।

ইবনে কাসিম! আমাদের ওপর কৃতজ্ঞতামূলক সেজদা ওয়াজিব হয়ে গেছে, বললেন বিন কাসিমের পাশে বসা সেনাপতি বিন আমের। কারণ এই ঝুকিপূর্ণ দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠী খুব সহজেই আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। কথাগুলো আরবীতে বললেন বিন আমের।

বিন কাসিম তার কথায় হেসে বললেন, হে ইবনে আমের! তুমি যদি সেজদা শোকর ওয়াজিব মনে করে থাকো, তাহলে এই অঞ্চলের শাসকের দায়িত্বে তোমাকেই নিয়োগ করবো।

বহুরিয়াকে বিদায় করতে তারা সবাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখেন বহুসংখ্যক জাট গোষ্ঠীর লোক বাইরে দাঁড়ানো। তারা মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় তাদের সর্দার বহুরিয়াকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে দেখে আনন্দে ঢোল পেটাতে লাগল এবং নাচতে গাইতে শুরু করল। ওদের নাচ ও গান বন্ধ হলে সেনাপতি ইবনে আমের তার পকেট থেকে বিশ দিরহাম বের করে তাদের হাদিয়া দিলেন।

✪ ✪ ✪

জাটদের সমস্যা সহজে মিটে যাওয়ায় বিন কাসিমের মাথা থেকে বিরাট বোঝা অপসারিত হলো। তিনি সেখান থেকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এখন বিন কাসিমের সামনে এলো সবচেয়ে কঠিন মনজিল। উরুঢ় রাজা দাহিরের রাজধানী। বিন কাসিম অনেক আগেই তাঁর গোয়েন্দা দাহিরের রাজধানীতে নিয়োগ করে রেখেছিলেন। তাদের কাছ থেকে উরুঢ় সম্পর্কে তথ্য জেনে বিন কাসিম তাঁর রণকৌশল নির্ধারণের জন্যে বসে গেলেন।

রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তার এক ছেলে গোপী উরুঢ়ের ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। গোপী কিছুতেই তার বাবার মৃত্যুর খবরে বিশ্বাস করতো না। তার কাছে রাজার মৃত্যু খবর বলার সাহসও কেউ পেতো না।

বিন কাসিম উরুঢ়ের দিকে রওয়ানা করে সূর্য ডোবার আগেই উরুঢ় থেকে মাইলখানিক দূরে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। উরুঢ় অবরোধ করার

আগেই বিন কাসিম তাঁবুর এলাকায় দ্রুত একটি মসজিদ তৈরি করেন। প্রথম জুমআর দিনে এই মসজিদে তিনি জুমআর খুতবা দেন এবং জুমআর নামাযের পর উরুঢ় দুর্গ অবরোধ করেন।

মুসলমানদের অবরোধের খবর শোনামাত্রই উরুঢ় দুর্গে হৈ চৈ পড়ে গেল। মুসলমানদের ভয় ও আতঙ্কে এমনিতেই সাধারণ মানুষ ছিল আতঙ্কিত। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ভীতি কাজ করছিল। কারণ এ পর্যন্ত মুসলমানদের কোন রণাঙ্গনে পরাজয়ের খবর তারা জানতো না। বিন কাসিমের বাহিনী একের পর এক জয়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে উরুঢ় পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেল।

অবরোধ আরোপের সাথে সাথে উরুঢ়ের প্রধান মন্দিরে বিরতিহীনভাবে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। শহরের মধ্যে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে যায়। দলে দলে মানুষ মন্দিরে গিয়ে ভীড় করে। মন্দিরে বিপুল মানুষের স্থান সংকুলান না হওয়ায় অধিকাংশই মন্দিরের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমবেত লোকজনদের উদ্দেশ্যে তখন মন্দিরের পুরোহিত ঘোষণা করল, হে উরুঢ়ের অধিবাসীরা! তোমরা ভয় করো না। মহারাজ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আসছেন। তোমরা দেখেছো, রাজকুমার গোপী যেভাবে দুর্গের বাইরে থেকে এখানে পৌঁছে গেছেন, মহারাজও ঠিকই পৌঁছে যাবেন। রাওয়াত মহারাজের মৃত্যু হয়েছে একথা বিশ্বাস করো না। মুসলমানদের মৃত্যু অত্যাসন্ন। মৃত্যুই তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

মন্দিরের পুরোহিতরা রাতদিন একটানা রাজা দাহিরের সৈন্যদল নিয়ে ফিরে আসার কথা ঘোষণা করছিল এবং লড়াইয়ের জন্য লোকজনকে উৎসাহিত ও বিক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করছিল। পুরোহিতরা বলতে লাগল, মহারাজ বিশাল সৈন্যদল নিয়ে মুসলমানদের ওপর পিছন থেকে হামলা করবেন। মুসলমানরা মহারাজ ও দুর্গের সৈন্যদের দ্বিমুখী আক্রমণের মাঝে পড়ে পিষ্ট হয়ে যাবে।

এদিকে বিন কাসিম আরবদের কৌশল প্রয়োগ করে দুর্গ জয়ের চেষ্টা শুরু করে দিলেন। কয়েকবার তীরন্দাজদের সহায়তায় দেয়ালে ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টা করা হলো। কিন্তু প্রতিবারই হিন্দু সৈন্যরা বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করে মুসলিম সৈন্যদের দুর্গপ্রাচীর থেকে চলে আসতে বাধ্য করল। এক পর্যায়ে দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়ানো হিন্দু সৈন্যরা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, আরে আহম্মকের দল! তোমরা কেন আরবে ফিরে যাচ্ছো না। তোমরা কি

আমাদের হাতেই প্রাণ দিতে পণ করেছ? একথা বলার পর দুর্গপ্রাচীরের সৈন্যরা একযোগে হেসে উঠল। অতঃপর তারা মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি নানা ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করতে শুরু করল। বার বার হিন্দু সৈন্যরা বলতে লাগল, 'হে আরব বোকার দল! মৃত্যু তোমাদেরকে এখানে টেনে এনেছে। এখনো সময় আছে, দেশে ফিরে যাও।'

এক সৈন্য বলে উঠল, এখনো মহারাজ দাহির জীবিত আছেন, তার ফিরে আসার আগেই তোমরা পালিয়ে যাও।'

বিন কাসিম আগেই খবর পেয়েছিলেন, শহরের লোকজনকে জানানো হয়েছে, রাজা দাহির জীবিত। তিনি সৈন্য নিয়ে আসছেন। বিন কাসিম রাতের বেলায় তাঁর সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও রাজার জীবিত থাকার কথা প্রচারের বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গের লোকজনকে এটা বিশ্বাস না করানো যাবে যে রাজা দাহির মারা গেছে, সে কোন সৈন্যবাহিনী আনতে যায়নি ততোক্ষণ পর্যন্ত ওদের মনোবল চাঙ্গা থাকবে। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক পর্যালোচনার পর একজনের বলা একটি কৌশল বিন কাসিমের মনপূত হলো।

তিনি সেটিকে গ্রহণ করলেন। প্রস্তাবটি ছিল, রাণী প্রিয়সীকে ব্যবহার করা। রাণী প্রিয়সী বিন কাসিমের হাতে বন্দি ছিল এবং বাহিনীর সাথেই ছিল। বিন কাসিম রাণী প্রিয়সীকে ডেকে এনে বললেন, "উরুঢ় দুর্গের লোকজন আমাদের মোকাবেলা করার অপচেষ্টা করছে, দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে না। ওরা ভাবছে রাজা দাহির জীবিত। উরুঢ়ের প্রতারিত লোকজনের প্রতি কি তুমি দয়া দেখাবে না? রাণী প্রিয়সীকে বিন কাসিম আরো বললেন, দেখো রাণী! অবরোধের একমাস হয়ে গেল। এখনো দুর্গের লোকেরা মনে করছে রাজা বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে ওদের উদ্ধার করবে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমি এখন বাধ্য হয়েই দুর্গের ভিতরে মিনজানিক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করবো। তুমি জানো, আমাদের হাতে আছে অগ্নিবাহী তীর। অগ্নিতীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলে গোটা দুর্গশহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।

"আমাকে বলো, আমি কি করতে পারি, বিন কাসিমের কাছে জানতে চাইলো রাণী প্রিয়সী! তোমরা কি আমাকে দুর্গের ভিতরে যেতে দেবে?"

না, আমরা তোমাকে দুর্গের ভিতরে যেতে দিতে পারি না। এটা হয়তো তোমার জন্য ভালো হবেনা, বললেন বিন কাসিম। কারণ ওরা ভেবে বসতে

পারে তুমি স্বেচ্ছায়ই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছো। তুমি বরং আমার সাথে দুর্গপ্রাচীরের কাছে গিয়ে বলো, রাজা দাহির রাওয়া যুদ্ধে মারা গেছে। সে কখনো আর সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবে না। তুমি আমাদের হাতে বন্দি। মায়ারাণী আত্মহুতি দিয়েছে। এখন দুর্গ আমাদের হাতে তুলে না দিলে দুর্গবাসীকে কি ধরনের ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতে হবে।

হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি তাই বলবো। তোমরা আমাকে দুর্গপ্রাচীরের কাছে নিয়ে চলো।

রাজা দাহিরের নিজস্ব যে হাতিটি ছিল, সেটি ছিল সর্বপরিচিত সাদা হাতি, সেটি রাওয়া যুদ্ধে মারা পড়েছিল। রাজা দাহিরের বিশেষ একটি উট ছিল। এটির রং ছিল কালো। উটটি বিন কাসিমের কব্জায় ছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাণী প্রিয়সী ও রাজা দাহির মাঝে মধ্যে একই সাথে কালো উটে আরোহণ করতো।

বিন কাসিম রাণী প্রিয়সীকে রাজা দাহিরের উটে সওয়ার করে নিজে একটি ঘোড়ায় সাওয়ার হলেন। অবরোধকারী মুসলিম সৈন্যদের কাছে গিয়ে বিন কাসিম থেমে গেলেন এবং রাণী প্রিয়সীকে সামনে যেতে নির্দেশ দিলেন। রাণী প্রিয়সী দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে গিয়ে থামলো এবং চেহারা থেকে নেকাব খুলে ফেলল। দুর্গশাসক প্রাচীরের ওপরে দাঁড়ানো ছিল।

দুর্গবাসীদের উদ্দেশ্যে রাণী প্রিয়সী উচ্চ আওয়াজে বলল, হে দুর্গবাসী! আমাকে তোমরা চেনো। আমি তোমাদের রাণী, তোমাদের শাসকদের ডাকো, আমি তাদের সাথে কথা বলব। কিছুক্ষণ পর দুর্গপ্রাচীরের ওপরে এসে দাঁড়াল দাহিরপুত্র গোপী। দুর্গের নিরাপত্তা কর্মকর্তাও তার সাথেই ছিল।

দুর্গপ্রাচীর থেকে আওয়াজ এলো, আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি রাণী! বলো কি বলতে চাও।

"মহারাজ দাহির মারা গেছেন! তোমরা একথা বিশ্বাস করো," দুর্গবাসীদের উদ্দেশ্যে বলল রাণী প্রিয়সী। তিনি জীবিত থাকলে আমাকে মুসলমানদের হাতে বন্দিত্ববরণ করতে হতো না। মহারাজের মাথা ও তার ঝাণ্ডা মুসলমানরা আরব দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, একথা বলে রাণী উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের ওপরে দাঁড়ানো লোকদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, তারা একথা মোটেও বিশ্বাস করেনি।

তুমি মিথ্যা বলছো, দুর্গপ্রাচীর থেকে রাণীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল গোপী। তুমি ওইসব লুটেরা আরব গোমাতা খোরদের জাদুর খপ্পরে পড়েছ। মহারাজ জীবিত আছেন, বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি অবশ্যই আসবেন। ওদের সাথে মিশে তুমি নিজেকে অপবিত্র করে ফেলেছো রাণী! মহারাজ ফিরে এলে তোমার আশ্রয় দাতাদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমি তোমাদেরকে ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্যেই এসেছি, কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল রাণী। তুমি জানো না গোপী! মুসলমানরা গোটা শহরটাকে ধ্বংস করে ফেলবে, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমাকে অবিশ্বাস করো না।

কিন্তু রাণীর কথায় কেউ সায় দিলো না, বরং প্রাচীরের ওপর থেকে রাণীকে গালমন্দ করতে শুরু করল দুর্গবাসিরা। অবস্থা দেখে বিন কাসিম রাণী প্রিয়সীকে ডেকে বললেন, রাণী! তুমি ফিরে এসো। ওদের কপাল খুবই মন্দ। ওদের ভাগ্যে ধ্বংসই লেখা রয়েছে। এ থেকে ওদের কেউই রক্ষা পাবেনা। রাণী অগত্যায় ফিরে এলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাণী প্রিয়সীর কথায় গোপী ও অন্যান্যরা বিশ্বাস করলনা বটে কিন্তু তাদের মনে সংশয় দেখা দিল। কারণ একমাসের বেশি সময় ধরে মুসলমানরা উরুঢ় দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে, রাজা দাহির অন্তরাল হয়েছে আরো আগে কিন্তু এখনো পর্যন্ত না তার কোন খবর পাওয়া গেল, না উরুঢ় রক্ষায় কোন সেনাবাহিনী এগিয়ে এলো। সংশয় দূর করতে গোপী কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে দুর্গের এক বৃদ্ধা যাদুরাণীর কাছে গেল। যাদুরাণী আশ্চর্যজনকভাবে অনেক ভবিষ্যতবাণী বলে দিতে পারে বলে দুর্গের সবাই বিশ্বাস করত। যাদুরাণী গোপীকে বলল, রাজা দাহির সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব সে আগামী কাল উন্মুক্ত ময়দানে দেবে।

গোপী অতি সংগোপনে যাদুরাণীর কাছে গিয়েছিল। কিন্তু এ খবর এক কান দু'কান হয়ে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল, "আগামীকাল অমুক সময়ে শহরের ময়দানে যাদুগীর বৃদ্ধা মহারাজের ব্যাপারে তথ্য দেবো।"

পর দিন বেলা কিছুটা চড়তেই লোকজন এক এক করে খোলা ময়দানে জমায়েত হতে লাগল। এদিকে হঠাৎ দেখা গেল বাহারী এক ধরনের পোশাক পরিধান করে যাদুবুড়ি ময়দানে হাজির হলো। তার হাতে গোল মরিচের একটি তাজা ডাল। সে এই ডালটি একহাতে উঁচিয়ে রেখেছে।

এক পর্যায়ে যাদুবুড়ি উচ্চ আওয়াজে কাপা কণ্ঠে বলল, হে লোক সকল, তোমরা কেন বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। আমি দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে ওপর

প্রান্ত ঘুরে এসেছি এবং সারা হিন্দুস্তান ঘুরে এসেছি, আমি কোথাও তোমাদের রাজাকে দেখতে পাইনি। সে বেঁচে নেই। তোমরা আর রাজার অপেক্ষা না করে নিজেদের শান্তি নিরাপত্তার কথা চিন্তা করো।

যাদুবুড়ির এই ঘোষণায় সাধারণ মানুষ খুবই হতাশ হলো, কারণ দুর্গের লোকজন মুসলমানদের মিনজানিক ও অগ্নিবাহী তীরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ শুনে এমনিতেই আতঙ্কিত ছিল। যাদুবুড়ির মুখে রাজার মৃত্যুর কথা শুনে তখনই তারা দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়ার কথা বলাবলি করতে লাগল। লোকজনের এই মনোভাবে সৈন্যরাও প্রভাবিত হলো, তাদের লড়াইয়ের মনোবল ভেঙে গেল।

সৈনিকদের মধ্যে দু'চারজন উর্ধতন কর্মকর্তা মুসলমান বিজয়ীদের সংব্যবহার ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করতে শুরু করল।

রাতের বেলায় মুসলমানদের ঘেরাও এর এক জায়গায় এসে একটি তীর পতিত হলো। তীরের মাথায় পাতলা চামড়ায় একটি পুটলীর মতো বাঁধা। তীরটিতে কোন বার্তা আছে মনে করে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর কাছে তীরটি পাঠিয়ে দেয়া হলো। তীরটিতে পয়গাম লিখা ছিল। এই পয়গাম দুর্গের ভিতর থেকে আলাফীদের এক লোক যে দুর্গের রাজপ্রাসাদে কর্মরত ছিল সে পাঠিয়েছে। জাদুবুড়ির কথা শুনে দুর্গের সাধারণ মানুষ যখন হতাশ হয়ে দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে আর সৈন্যদের মনোবলও ভেঙে পড়ে এমতাবস্থায় সোনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল হতে থাকে। এই পরিস্থিতি আন্দাজ করে দাহিরপুত্র গোপী তার পরিবার পরিজন নিয়ে রাতের আধারে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছে।

এই পয়গাম ছিল বিন কাসিমের জন্য খুবই ফলদায়ক। তিনি সেনাবাহিনীর মনোবল দুর্বল করার জন্য তার সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা সমস্বরে উচ্চ আওয়াজে তকবীর ধ্বনী দিয়ে দুর্গপ্রাচীরের ওপরে তীর বর্ষণ করো আর একদল দুর্গফটককে আঘাত হানো।

বিন কাসিমের নির্দেশে মুসলিম সৈন্যরা যখন সমস্বরে তকবীর ধ্বনী দিলো, দুর্গের ভিতরে অধিবাসীরা মুসলমানদের তকবীর ধ্বনী শুনে আতঙ্কবোধ করতে শুরু করল।

দিনের বেলায় হঠাৎ একটি ফটক খুলে কিছু বেসামরিক লোক বেরিয়ে এলো। তারা কিছু দূর অগ্রসর হয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করল, দুর্গের ব্যবসায়ী ও সম্মানিত নাগরিকরা তাদেরকে পাঠিয়েছে, তারা মুসলিম

সেনাপতির সাথে কথা বলতে চায়। তাদেরকে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে গেলে তারা জানাল–

"আমরা বন্ধুত্বের জন্য এসেছি। দুর্গের ব্যবসায়ী ও অভিজাত লোকেরা যুদ্ধ চায় না। এতোদিন দুর্গবাসীদের বিশ্বাস ছিল রাজা দাহির জীবিত তিনি বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে আসবেন। কিন্তু এখন আমাদের বিশ্বাস হয়েছে, রাজা মারা গেছেন। রাজকুমার গোপী ছিল দুর্গের শাসক। পরিস্থিতি অনুধাবন করে সে দুর্গবাসীকে ফেলে রেখে পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন আর আমাদের সৈন্যদের আপনার মোকাবেলা করার হিম্মত নেই, সাধারণ মানুষও যুদ্ধের বিরোধী। আমরা আপনার আনুগত্য করতে প্রস্তুত তবে আপনাকে আমাদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দিতে হবে।" বললেন দুর্গের বেসামরিক লোকেরা।

তোমরা বুদ্ধিমানের কাজ করছ, কিন্তু যে পর্যন্ত দুর্গপ্রাচীর ও দুর্গের ভিতরে সৈন্য মোতায়েন থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের কথার ওপর আস্থা রাখতে পারি না। আমাদের আস্থা অর্জন করতে হলে তোমাদেরকে দুর্গপ্রাচীর থেকে সৈন্য অপসারণ করতে হবে এবং ভিতরের শাসকদেরকে দুর্গ থেকে বের করে দিতে হবে।

দুর্গের প্রতিনিধিরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর মুসলিম সৈন্যরা দেখতে পেল দুর্গপ্রাচীর থেকে একেক করে সৈন্য সরে যাচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পর দুর্গের প্রধান ফটক দিয়ে বহুসংখ্যক সেনা অফিসার বের হয়ে এলো এবং তারা তরবারি অবনত করে ধীরপায়ে এগিয়ে এসে বিন কাসিমের সামনে হাতিয়ার ফেলে দিলো এবং দুর্গফটকের চাবি বিন কাসিমের হাতে সোপর্দ করল।

বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে ফটক পেরিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল দুর্গের ভিতরকার একটি মন্দিরে। এই মন্দিরকে স্থানীয় লোকজন নৌবিহার বলে ডাকত। মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিন কাসিমের দৃষ্টি পড়ল মন্দিরের দরজার দিকে। তিনি দেখতে পেলেন বহু লোক একটি মূর্তির সামনে সেজদাবনত।

বিন কাসিম ঘোড়া থেকে নেমে মন্দিরের ভিতরে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, একটি পাথরের তৈরি ঘোড়ার সামনে লোকগুলো সিজদা দিচ্ছে। পাথরের ঘোড়ার ওপরে একজন দেবতা সওয়ার। সওয়ারী দেবতার দুই বাহুতে চামড়ার বাজুবন্ধ বাধা। বাজুবন্ধের ওপর সোনা ও মনিমুক্তা খচিত। বিন কাসিম এগিয়ে গিয়ে মুর্তির গা থেকে একটি বাজুবন্ধ খুলে ফেললেন।

অতঃপর তিনি পূজারীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই মন্দিরের পুরোহিত কে? তাকে ডাকো।

এক পূজারী দু'হাত প্রসারিত করে করজোড়ে এসে বিন কাসিমের সামনে দাঁড়াল।

এই মূর্তির অপর বাজুবন্ধটি কোথায়? পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম। পূজারী অজ্ঞতা প্রকাশ করল। এ খবর মূর্তিকেই জিজ্ঞেস করোনা? বললেন বিন কাসিম। এ খবর মূর্তি কি করে বলবে? সে তো নিষ্প্রাণ পাথর। তাই যদি হবে তাহলে তোমরা এর পূজা কর কেন? বললেন বিন কাসিম। তার বাজুবন্ধ কে খুলে নিয়েছে, সে যদি তাই বলতে না পারে তবে এটি তোমাদের কি উপকার করতে পারবে? পুরোহিত নীরব হয়ে গেল। বিন কাসিম স্মিত হেসে মন্দিরের বাইরে চলে এলেন।

পর্ব বারো

সুন্দরী তরুণীদের ভোগ করতে রাজা বাদশারাও হিংস্র হয়ে ওঠে

বিন কাসিমের সেই হাসিতে ইসলামের নূর ছিল, তাঁর ঈমানী আভায় সেদিন চমকে ওঠেছিল সিন্ধু অঞ্চলের বালুকারাশি, যে উরুঢ় ছিল ইসলামের চরম শত্রু রাজা দাহিরের ক্ষমতার দাপট, জুলুম অত্যাচারের কেন্দ্র বিন্দু সেটি এখন বিন কাসিমের পদানত। রাজা দাহিরের মৃত্যুর পরও উরুঢ় ছিল হিন্দুদের মর্যাদার কেন্দ্রবিন্দু। তাই এটিকে শত্রুমুক্ত করা ছিল অতি জরুরী।

এদিকে মুসলিম সৈন্যদের দুর্গে প্রবেশের খবর শুনে দুর্গবাসীদের মধ্যে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে গেল। মুসলিম সৈন্যরা যখন দুর্গে প্রবেশ করল তখন শহরের লোকদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল তাদের ওপর কোন ধরনের জুলুম অত্যাচার করা হবে না। কিন্তু ভীত বিহ্বল জনতা তারপরও নিজেদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটাছুটি করতে শুরু করে এবং দুর্গ থেকে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ততোক্ষণে দুর্গফটকে মুসলিম সৈন্যরা প্রহরা বসিয়েছে দেখে আতঙ্কিত লোকজন নিজেদের ঘরে দরজা বন্ধ করেও স্বস্থিবোধ করতে পারছিলনা। অনেকেই দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে।

বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন, শহর জুড়ে ঘোষণা করে দাও, শহরের ছেলে বুড়ো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। সবার জীবন সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া হলো কারো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবাই নিরাপদে নিজ নিজ ঘরবাড়িতে নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে পারে। শহরের কোন নারীর ওপর বিজয়ী সৈন্যরা জুলুমতো দূরে থাক তাকিয়েও দেখবে না। তবে যেসব সৈন্য মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে কেউ ঘরে আশ্রয় দিতে পারবে না। কারো ঘরে যদি লুকিয়ে থাকা সৈন্যকে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সেই ঘরের নারী শিশু ছাড়া সবাইকে হত্যা করা হবে।

বেলা ডুবা পর্যন্ত শহরময় এই ঘোষণা করা হলো, যাতে সকল দুর্গবাসীর কাছেই বিজয়ী বাহিনীর বার্তা পৌঁছে যায়। 'ফাতহুল বুলদান' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন, 'যেসব সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করা হোক।'

মন্দির প্রদর্শন এবং শহরের নাগরিকদেরকে নিরাপত্তার ঘোষণা এবং শত্রুসেনাদের হত্যার নির্দেশ দিয়ে বিন কাসিম ধীরে সুস্থে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তার নির্দেশ মতো কাজ হবে। কারণ তার নির্দেশের ব্যতিক্রম করে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে নির্দেশের খেলাপ করার কোন দৃষ্টান্তই অতীতে ছিলনা।

নির্দেশ করা মাত্রই উরুঢ়ের যুদ্ধবাজ সৈন্যদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। বিদ্রোহী সৈন্যদের পাকড়াও করতে গিয়ে কয়েকজন মুসলিম সৈনিক নিহত হলো।

বিন কাসিম অশ্বারোহণ করে চতুর্দিক দেখে শুনে রাজমহলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর সাথে সাথেই অগ্রসর হচ্ছিল একান্ত নিরাপত্তারক্ষী ও চারজন সংবাদ বাহক।

এক দুভাষীও তাঁর সাথে ছিল। যে দুভাষী আরবী ও সিন্ধিভাষা অনর্গল বলতে পারতো। এমন সময় এক বিচিত্র পোষাক পরিহিতা বৃদ্ধা বিন কাসিমের নজর কাড়ল। বৃদ্ধা মাথায় একটি লাল কাপড়ের রুমাল বেঁধে রেখেছে এবং সাদা চুল রুমালের বাইরে ঝুলে রয়েছে। বৃদ্ধার গলায় হাজার দানার একটি মালা ঝুলছে। তার পরনে কাধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা চৌগা! তার পায়ে কোন জুতা ছিল না। তার পা কাপড়ে প্যাচানো।

বৃদ্ধা বিন কাসিমের বিপরীত দিক থেকে আসছিল। এক নিরাপত্তারক্ষী তার ঘোড়াকে আগে বাড়িয়ে বৃদ্ধাকে রাস্তা থেকে সরে যেতে বলল। কিন্তু বৃদ্ধা নিরাপত্তারক্ষীর ঘোড়াকে পাশে ফেলে এগিয়ে চলল। তার এক হাতে একটি তাজা গাছের ডাল। আর অপর হাতে কাঁচের মতো দানার মালা। তার চেহারা মলিন কিন্তু চেহারার দীপ্তি ও দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ ও গভীর। দেখে যে কারো মনে হবে বৃদ্ধা পাগলী অপ্রকৃতস্থ। বৃদ্ধার গতিরোধ করার জন্য অপর একজন নিরাপত্তারক্ষী তার ঘোড়াকে বৃদ্ধার সামনে দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধা ও বিন কাসিমের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করল।

এমতাবস্থায় বৃদ্ধা দৃঢ় কণ্ঠে সৈনিকের উদ্দেশ্যে বলল, "বিজয়ের গর্বে এতোটা ফুলে যেয়ো না হে অশ্বারোহী!" বিন কাসিমের দু'ভাষী আরবীতে

বৃদ্ধার কথা তাঁকে জানাল। বৃদ্ধার কথা বুঝে নিয়ে বিন কাসিম নিরাপত্তারক্ষীকে বললেন, সরে যাও ওর সামনে থেকে। নিরাপত্তারক্ষী সামনে থেকে সরে গেলে বৃদ্ধা একেবারে বিন কাসিমের সামনে এসে পড়ল। এমন সময় এক অশ্বারোহী উর্ধশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে বিন কাসিমের পাশে এসে ঘোড়া থামালেন। এই আগন্তুক আর কেউ নন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী। গোয়েন্দা প্রধান বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বললেন, সম্মানিত সেনাপতি! আপনি কি জানেন এই বৃদ্ধা কে?

না, আমি ওর ব্যাপারে কিছুই জানি না।

এতো মস্তবড় যাদুবুড়ি। স্থানীয় লোকজন আমাকে জানিয়েছে, এই যাদুবুড়ি নাকি গোপীকে গণনা শুনে বলেছে, রাজা দাহির মারা গেছে। এই বুড়ি নাকি তার যাদু দিয়ে জানতে পেরেছে, রাজা দাহির মারা গেছে।

হে যাদুবুড়ি! তোমার যাদু দিয়ে কি তুমি দূরের জীবিত মানুষজনকেও দেখতে পারো? বুড়ির উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম।

তুমি আমার হাতে এই গোল মরিচের তাজা ডাল দেখতে পাচ্ছো না? এই গাছ সিন্দু অঞ্চলের কোথাও জন্মে না। তুমি কি বলতে পারো যে এটা আমি কোত্থেকে এনেছি?

না, আমি কি করে বলবো' বললেন বিন কাসিম।

হ্যাঁ' তুমি বলতে পারবে না, তোমার দৃষ্টি শুধু দুর্গ আর সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তুমি শুধু জয় আর পরাজয় বোঝো। তুমি জানোনা, আগামী কাল তোমার জীবনে কি ঘটবে। তোমার জীবন বেলাতো উদিত হওয়ার সাথে সাথেই ডুবে যাচ্ছে।

আমি শুধু জানি, আল্লাহ আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এই দায়িত্ব পালনে আমার দিনটি কিভাবে কাটল, যাতে আল্লাহর কাছে গেলে আমি বলতে পারি স্বীয় কর্তব্য পালনে আমি `কোন ত্রুটি করিনি' বুড়ির উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম।

বিন কাসিম যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে কথিত যাদুবুড়ির সাথে কথা বললেন, কারণ তার কাছে মনে হলো এই বৃদ্ধার কথাবার্তা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। কোন মতেই তাকে পাগল বা অপ্রকৃতস্থ বলা যায় না।

তুমি কি ঘোড়া থেকে নামবে না? বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বলল যাদুবুড়ি। তুমি অবশ্যই ঘোড়া থেকে নামবে। তোমার চোখমুখ চেহারা ছবি বলছে, তুমি

অপরাপর রাজা বাদশাদের মতো নও, যারা আমার মতো বৃদ্ধাকে অশ্বখুরে পিষ্ট হওয়ার যোগ্য মনে করে।

বিন কাসিম ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলে যাদুবুড়ি তার মাথায় এভাবে হাত রাখলো যে তার হাতের শাহাদত আঙুল বিন কাসিমের নাক বরাবর ছিল। যাদুবুড়ি এরপর বিন কাসিমের চোখের দিকে উঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে দুকদম পিছিয়ে গেল।

রাজা দাহির মরে গেছে, অথচ সবাই বলে সে নাকি জীবিত। আর তুমি......না আর সামনে শুনতে চেয়োও না। একথা বলে সে নীরব হয়ে গেল এবং এক পাশ দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো।

বিন কাসিম হাত প্রসারিত করে তার গতি রোধ করলেন।

তুমি বলতে না চাইলেও আমি তা শুনবো। বুঝেছি তুমি আমার মৃত্যুর খবর আমাকে শুনাতে চাও না। তুমি হয়তো জানো না, আমরা মৃত্যুকে মেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি। প্রতি মুহূর্তকেই আমরা জীবনের শেষক্ষণ মনে করি। মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না। শত্রুর কামান থেকে নিক্ষিপ্ত যে কোন একটা তীরে আমাদের মৃত্যু হতে পারে। তুমি আমাকে মৃত্যুর খবর শোনালেও তাতে আমার মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না, বললেন বিন কাসিম।

রণাঙ্গনে যুদ্ধ ময়দানে তোমার মৃত্যু হবে না, বলল যাদুবুড়ি। তোমার জীবন খুবই সংকীর্ণ। তোমার ভাগ্যতারা খুব দ্রুত ওপরে উঠে গেছে, তাই এটি দ্রুত ভেঙে পড়বে।

কখন তা হবে? জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

এ বছরই তা হতে পারে। তবে তোমার জীবনের দ্যুতি কখনো শেষ হবে না। লোকেরা তোমাকে যুগযুগ স্মরণ করবে। বুড়ির কথা শুনে বিন কাসিম হেসে ফেললেন। মৃত্যুর কথায় তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর ঘটল না।

সব রাজা বাদশারা চায়, তারা যেন অমরত্ব লাভ করে। বহু দিন বেঁচে থাকতে চায়। রাজা বাদশারা মনে করে জগতের সব প্রজাদের হায়াত যদি তারা পেয়ে যেতো। কিন্তু মৃত্যু তাদের জীবনে একদিন হানা দেয় এবং প্রজাদের চোখের সামনেই তাদের জীবনের অবসান ঘটে। প্রজারাই তাকে মাটির নীচে দাফন কিংবা চিতায় পুড়িয়ে দেয়। বিড় বিড় করে বলল যাদুবুড়ি।

বিন কাসিম স্মীত হেসে তার পথ ছেড়ে দিলেন। এবার আর যাদুবুড়িকে আটকানোর কোন চেষ্টা করলেন না।

কিছুক্ষণ পর বিন কাসিম রাজ প্রাসাদের সীমানায় প্রবেশ করলেন। উষ্ণ মরুময় এলাকায় সাজানো রং বেরঙের বাহারী বৃক্ষলতা ফুল সজ্জিত দৃশ্য দেখে তিনি অভিভূত হলেন। ঘোড়া থেকে নেমে চতুর্দিকে চোখ বুলালেন বিন কাসিম। তাঁর ঠোঁটের কোণে যে স্মিত হাসি ছিল তা মিলিয়ে গেল। অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, এই প্রাসাদে সেই রাজা থাকতো যে মনে করতো তার কোন দিন মৃত্যু হবে না। মৃত্যুকে তারা ভৃত্য ভাবতো।

বিন কাসিম যখন রাজা দাহিরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন তখন রাজ পরিবারের কেউই সেখানে ছিল না। গোপী তার পরিবার পরিজন ও একান্ত ভৃত্যদের নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিন কাসিমের সাথে আসা একমাত্র রাণী প্রিয়সীই ছিল রাজপরিবারের সদস্য। বিন কাসিম রাণী প্রিয়সীকে প্রাসাদে প্রবেশের নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্তে প্রাসাদে থাকতে পারো। বিন কাসিম যখন রাজ প্রাসাদের দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন রাণী প্রিয়সী এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিল আপনি কি তাদের সবাইকে হত্যার হুকুম দিয়েছেন, মহামান্য সেনাপতি?

হ্যাঁ, দিয়েছি। আমাদের যুদ্ধনীতি মোতাবেক আমরা শুধু তারই জীবন ভিক্ষা দেই, যে শত্রুযোদ্ধা আমাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে।

নিঃসন্দেহে বিজয়ী বাদশাহের এটাই নীতি হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার মতো মানব দরদী বিজয়ী সেনাপতির নীতি এমনটি হওয়া উচিত নয়। কারণ আপনি নিজেকে মানব দরদী বলে থাকেন; বলল রাণী প্রিয়সী।

তুমি যদি আমার একান্ত যুদ্ধ কৌশলের ব্যাপারে দখলান্দাজি না কর তাহলে আমি খুশি হবো, প্রিয়সীর উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম। তুমি যাদের প্রাণ বাঁচাতে চাচ্ছো, তারা তো তোমার কথাও শুনেনি। তারা তো তোমাকেও গালমন্দ করেছে এবং তোমার ওপর চারিত্রিক অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছে।

আপনার এই ধারণা ঠিক নয়। আপনার যুদ্ধ কৌশলে কোন ধরনের দখলদারী করার ইচ্ছা আমার নেই। তা ছাড়া আমি আমাদের কোন লোককেও বাঁচাতে বলছি না। ওরা মনে করেছিল, আপনার সেনারা শহরে প্রবেশ করলে লুটতরাজ ও খুনোখুনিতে মেতে ওঠবে এবং কারো জীবন সম্পদ ইজ্জত আব্রু রক্ষা পাবে না। এই ভয়েই তারা হাতিয়ার সমর্পণ করেনি।

আমরা যুদ্ধরত শত্রু সেনাদের হত্যা করি, কারণ এদের মুক্ত করে দিলে এরা আবার এক জায়গায় জড়ো হয়ে শক্তিসঞ্চয় করে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শত্রু বাহিনীর শক্তিকে দুর্বল করা।

গণহত্যার ব্যাপারটি থেকে বিরত থাকতে আমি অন্য কারণে আপনাকে অনুরোধ করছি' বলল রাণী প্রিয়সী। আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো বুঝেন। আপনার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতাই আপনাকে আরব থেকে এই উরুঢ়ের দুর্গে নিয়ে এসেছে। পাহাড়সম দুর্গগুলো আপনি একের পর এক জয় করে এসেছেন। আমি সবিনয়ে আপনাকে বলতে চাই, বিবেক অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে পারে। আপনি উরুঢ়ের লোকদের সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নন। এই শহর শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে ভারত বিখ্যাত। এখানকার অধিকাংশ লোক এমনকি সৈন্যরা পর্যন্ত অবসর সময়ে ক্ষেত খামারে চাষাবাদ ও বিভিন্ন কারিগরি কাজ করে।

এই শহরের প্রায় সব লোক হয় কারিগর নয়তো চাষী নয়তো ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে একটি অংশ যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরির কারিগরও রয়েছে। এই শহরে এমন ব্যবসায়ীও রয়েছে যারা সারা হিন্দুস্তান জুড়ে ব্যবসা করে। অবশ্য একথা অস্বীকার করার মতো নয় যে, এসব লোকও সৈন্যদের সাথে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের পর্যন্ত যুদ্ধে শরীক করেছিল। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, লড়াই করেই তারা দুর্গ তাদের কব্জায় রাখবে। ফলে বিজয়ী সামরিক নীতিতে এরা আপনার হাতে নিহত হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু আপনি হত্যাকাণ্ড কার্যকর করার আগে একথাও চিন্তা করুন, এদের দেয়া কর ও জিজিয়া দিয়েই তো আপনাকে প্রশাসনের চাকা সচল রাখতে হবে। এরা নিহত হলে আপনাকে শুধু বিপুল অংকের জিজিয়াই হারাতে হবে না, গোটা শহরের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। তখন আপনাকে ঐসব বেকার লোকদের ওপর করের বোঝা চাপাতে হবে, যাদের আসলে একমুঠো শষ্যও কর দেয়ার সামর্থ নেই। তখন তো আপনার সরকারি কোষাগার শুন্য হয়ে পড়বে।

একজন হিন্দু রমণীর কথায় বিন কাসিম যুদ্ধবন্দি শত্রুসেনাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন, এমনটি ধারণা করার কোনই অবকাশ ছিল না। তবে রাণী প্রিয়সীর কথাকে তিনি গুরুত্বের সাথে নিয়ে তাঁর সেনাপতি, সামরিক উপদেষ্টা বিশেষ করে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর সাথে পরামর্শ করে যুদ্ধ বন্দিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

যুদ্ধবন্দিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্ত রাজা দাহিরের দরবার হলে অনুষ্ঠিত হয়। পরামর্শ বৈঠক শেষে সবাই প্রাসাদ থেকে চলে গেলে বিন কাসিমের সাথে এক বয়স্ক লোক সাক্ষাত করতে এসে আরবী ভাষায় কথা বলে।

আগন্তুকের কথা শুনে বিন কাসিম বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার কণ্ঠে তো আরব্য মরুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তুমি তো আরব থেকে আসোনি, এবং আমাদের সেনাদলেরও কেউ নও।

আল্লাহ্ তোমার ওপর রহম করুন! ইবনে কাসিম! বলল আগন্তুক। আমি সেই সব লোকদের একজন যাদেরকে বিদ্রোহের অভিযোগে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। আমার নাম হামদ। হামদ বিন জাবের। আমি রাজপ্রাসাদে কর্মরত ছিলাম। বর্তমান আরব শাসকদের সাথে আমার শত্রুতা থাকতে পারে কিন্তু আমার দেশ, আমার ধর্ম ও আমার স্বজাতির সেনা নায়কদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমার বিশ্বাস, বনি উমাইয়া যাদেরকে শত্রু ভেবে দেশছাড়া করেছে, পর্দার আড়ালে তুমি এদেশে আসার পর থেকেই তারা তোমাকে অব্যাহত সহযোগিতা করেছে।

ইবনে জাবের! দেশ ও ধর্মের স্বার্থে তোমরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছো এবং ইসলামের আলো হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে দিতে তোমরা যে সহযোগিতা করেছ, আল্লাহ তোমাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। তুমি হয়তো জানো, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আমাকে এই অঞ্চল নতুন বাদশাহীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে পাঠাননি। আমাদের সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমরা জানো। আমি সিন্ধুতে পা দিয়ে দেখি, এখানকার লোকজন মাটি পাথরের তৈরি মূর্তিকে পূজা করে।

আমি সবার অলক্ষে এক মূর্তির হাত থেকে স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত বাজুবন্ধ খুলে ফেলি। সেই মূর্তির কব্জা থেকে আমরা দুর্গ দখল করে নেই কিন্তু আজো পর্যন্ত এখানকার মানুষ মাটি পাথরের তৈরি মূর্তিকেই পূজা করে চলছে। আমি যদি তাদের একথা বুঝাতে চেষ্টা না করি যে, জয় পরাজয়ের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ এবং ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ, তাহলে কি আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবো না? কেননা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি।

আমি একটি জরুরী কথা বলতে এসেছি বিন কাসিম! তুমি কি উরুঢ়ের যুদ্ধবন্দিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছ?

হ্যাঁ, আমি কি তা ঠিক করিনি?

সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে বিন কাসিম। আমি তোমাকে একথা বলার জন্যই এসেছি। কিন্তু এই জাতির ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। এদেরকে শারীরিকভাবে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু তাদেরকে মানসিকভাবে নির্বীর্য করে ফেলতে হবে। তাদের মনে মূর্তির যে ভূত সওয়ার হয়ে আছে, তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে এবং তাতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। তাদেরকে কোমল কঠোর শাসন করতে হবে। এগুলো কালো সাপ' তারা যেন বুঝতে না পারে তাদেরকে মুক্ত ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বিন কাসিম গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে বললেন, শহর জুড়ে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিন। শহরের প্রতিটি ঘরের ভিতরের অবস্থা জানার চেষ্টা করুন। গোয়েন্দা প্রধান শহরের অধিবাসীদের অভ্যন্তরীণ খবর জানার জন্য বিপুলসংখ্যক স্থানীয় গোয়েন্দা নিয়োগ করলেন। শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাদের মতো করে পুনর্বহাল করলেন বিন কাসিম। রাওয়া বিন আসাদকে বিন কাসিম শহরের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে উরুঢ়ের মানুষের মধ্যে যে কৃতজ্ঞতা ও স্বস্তি বিরাজ করছিল, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে ভিন্নভাবে একজনকে ধর্মীয় প্রশাসক নিযুক্ত করা হলো। মূসা বিন ইয়াকুব ছাকাফীকে একই সাথে ধর্মীয় প্রশাসক এবং প্রধান বিচারকের দায়িত্বে নিয়োগ করা হলো।

ইবনে ইয়াকুবের উদ্দেশ্যে বিন কাসিম বললেন, ইবনে ইয়াকুব! সাকীফ গোত্রের অধিবাসীরা আপনাকে নিয়ে গর্ববোধ করে। আপনি যেমন একজন তেজস্বী যোদ্ধা, সেই সাথে একজন বিচক্ষণ আলেম। আমরা এই কাফেরদের দেশে এসে প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছি, তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে বিচার ও ইনসাফ কি জিনিস। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে মুসলমানদের বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে জবাবদেহিমূলক। ইসলামের বিচার ব্যবস্থায় শাসক শাসিত, ধনী-গরীব সবাই সমান। আল্লাহর আইন পার্থিব কোন পদ পদবী আর যশ খ্যাতিকে বিবেচনা করে না। সব অপরাধীকে সমান দৃষ্টিতে দেখে এবং সবাইকে কৃত অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়। ইতিহাসে লেখা হয়েছে, বিন কাসিম মূসা বিন ইয়াকুবকে বললেন, আল্লাহর কালাম, 'তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' এই আয়াতের ভিত্তিতে আপনি ব্যবস্থা নেবেন।

বিন কাসিমের আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার তাকিদ ছিল। কিন্তু উরুঢ়ের প্রশাসন কতটুকু কার্যকর ও সফল ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁকে এখানে কিছুদিন অবস্থান করার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া এখানকার অধিবাসীরা তাদের ওপর ধার্যকৃত জিযিয়া দিতে পারছে কি-না, শহরের অধিবাসীরা সাধারণ ক্ষমার সুযোগে গোপনে নতুন কোন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করছে কি-না এ ব্যাপারটিও নিশ্চিত হওয়া জরুরী ছিল।

শা'বান ছাকাফীর নিযুক্ত গোয়েন্দারা খবর সংগ্রহ করছিল। তাদের খবর ছিল আশাব্যাঞ্জক। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ীক কাজকর্ম শুরু করে। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে। বিন কাসিম শহরের নাগরিকদের ওপর ইসলাম গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেননি, সেই সাথে হিন্দুদের মন্দিরে গমনেও কোন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। ফলে হিন্দুদের মধ্যে পূর্ণস্বস্তি বিরাজ করছিল। কারণ তাদের কারো ইজ্জত সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণ হয়নি, তাদের ধনসম্পদ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। স্থানীয় অধিবাসীরা দেখেছে, তাদের দেশের সেনারা অধিকাংশ সময় তরি-তরকারীসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিনামূল্যে কিংবা নাম মাত্র মূল্যে নিয়ে নিতো। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা পূর্ণমূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করে। বিজয়ী বাহিনীর পক্ষ থেকে এ ধরনের ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ পাওয়াটা ছিল উরুঢ়ের অধিবাসীদের কাছে অভাবণীয়। অবশ্য তারা ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছিল বিজয়ী মুসলমানরা বিজিত এলাকার অধিবাসীদের ওপর কোন ধরণের জুলুম অত্যাচার করে না।

মুসলমানদের সৎব্যবহার এবং প্রজাহিতৈষীর ফলে উরুঢ়ের সাধারণ হিন্দুরা মনেপ্রাণে মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিল। এদিকে মূসা বিন ইয়াকুব ইসলামের তাবলীগ শুরু করে দিয়েছিলেন। তার দাওয়াতে কিছু পরিবার ইসলামে দীক্ষা নেয়। এমতাবস্থায়ও বিন কাসিম কোন ধরনের ঝুকি নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য রাতে রাণী প্রিয়সীকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালেন।

রাণী প্রিয়সী ছিল যথার্থ অর্থেই যুবতী ও সুন্দরী। নিজের রূপ সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সে রাজা দাহিরের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু রাণী প্রিয়সীকে রাজা দাহির যখন রাণী হিসাবে গ্রহণ করে তখন দাহিরের যৌবন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু রাণী ছিল তরুণী। আর এই মুহূর্তে রাজা দাহিরের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে। নিজ বুদ্ধিমত্তায় রাণী

প্রিয়সী বিন কাসিমের আস্থা অর্জন করেছিল। তদ্রুপ নিজে বিন কাসিমের প্রতি আস্থাবান ছিল। উরুঢ়ে বিজয়ী বাহিনী প্রবেশ করার পর সেই যে রাণীকে রাজ প্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়, আর বিজয়ী বাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে কোন ধরনের নজরদারীতে রাখা হয়নি। এ কয়দিন স্বাধীনভাবেই রাণী প্রিয়সী দাহিরের রাজপ্রাসাদে কাটায়। কিন্তু হঠাৎ করে বিন কাসিমের পক্ষ থেকে রাতের বেলায় সাক্ষাতের আহ্বানে সে অন্য অর্থ করল। রাণী প্রিয়সীর কাছে বিন কাসিমের এই তলব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

রাণী প্রিয়সী রাতের বেলায় যখন বিন কাসিমের কক্ষে প্রবেশ করল, তখন বিন কাসিম রাণীকে দেখে অভিভূত হলেন। কারণ যুবতী এই হিন্দু নারীকে তিনি সাধারণ পোশাকে দেখেছিলেন। রাণী যতদিন তাঁর নজরদারীতে অবস্থান করেছিল খুব সাদামাটা পোশাকেই অবস্থান করেছিল। কিন্তু আজ রাতে সেই সাদামাটা রমণীর অবস্থা আর আগের মতো ছিল না। পূর্ণ জৌলুস আর রাজকীয় সাজসজ্জায় কামোদীপ্ত এক রমণীয় পোশাক পরে রাণী এলো বিন কাসিমের কক্ষে। যে রাণীর চেহারা ছবি ছিল যথেষ্ট গম্ভীর আজ সেই রাণীর ঠোঁটে ইঙ্গিতপূর্ণ মুচকী হাসি, হাটায় চলায় উদ্দীপনাময় ভাবভঙ্গি।

আমি জানতাম, কোন না কোন এক রাতে আপনি আমাকে ডাকবেন! কক্ষে প্রবেশ করেই বিন কাসিমের উদ্দেশ্য চপল চাহনী ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলল, রাণী প্রিয়সী। আপনার যৌবন শেষ পর্যন্ত আমাকে তলব করতে বাধ্য করেছে।

হাসলেন বিন কাসিম।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, বাধ্য হয়েই তোমাকে ডেকেছি। কিন্তু তুমি যদি এভাবে সেজেগুজে না এসে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে তাহলে আমি খুশি হতাম, রাণীর উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম।

আমি একটি সৌন্দর্য ও কৃতজ্ঞতার উপঢৌকন হয়ে এসেছি। আপনি এরই মধ্যে আমাকে যে ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, এই সাজসজ্জা ছাড়া এসে এর প্রতিদান দেয়া যায় না। আমি তো আপনার হাতে বন্দি ছিলাম? কিন্তু আপনি আমাকে কখনো বন্দি থাকার বিষয়টি অনুভব করতে দেননি। আপনাকে সকল উরুঢ়বাসীকে সাধারন ক্ষমা করার অনুরোধ করলাম, আপনি আমার সেই অনুরোধও রক্ষা করেছেন। এখন যদি আমি এদেশের রাণী থাকতাম, তাহলে রাজসিংহাসনে আপনাকে আমার পাশে আসন দিতাম। কিন্তু আজ আমার কিছুই

নেই। আছে শুধু আমার অস্তিত্ব। এজন্য আমার হৃদয়ের মণিকোঠা আর আমার চোখের মণিতেই দিয়েছি আপনার আসন। আর এই দেহটাকে সোপর্দ করছি আপনার সেবায়।

হ্যাঁ, প্রতিদান আমার চাই রাণী। কিন্তু প্রতিদানে আমি তোমাকে গ্রহণ করতে রাজী নই। আমি তোমার কাছে শুধু এতটুকু প্রতিদান চাই, তুমি সত্যিকার অর্থে আমাকে সহযোগিতা করো এবং এখানকার বাস্তব পরিস্থিতি কি সে খবর আমাকে জানাও এবং করণীয় সম্পর্কে আমাকে পরামর্শ দাও। আমি যদি তোমাকেই চাইতাম, তাহলে আর আমার এসব লোক কক্ষে থাকত না। যারা তোমার আর আমার কথা আমাদের নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে আমাদের কাছে পেশ করছে। তুমি যে নেশা ও আশা নিয়ে সেজেগুজে এসেছ এই নেশা ও প্রত্যাশা আমার মধ্যে থাকলে তোমার আমার কথোপকথনের জন্য কোন দুভাষীর প্রয়োজন হতো না। কারণ দেহ জ্বালার এই ভাষা জগৎ জুড়ে একই। এক্ষেত্রে কোন দুভাষীর প্রয়োজন হয় না।

বিন কাসিম রাণীকে কাছে বসতে না দিয়ে কিছুটা দূরত্বে একটি কুরসীতে বসতে দিয়ে বললেন, আমি জরুরী কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করার জন্য তোমাকে ডেকেছি। আমার পরবর্তী গন্তব্য ভাথিয়া। ভাথিয়ার ভৌগলিক অবস্থান দুর্গের অবস্থা এবং শাসক ও অধিবাসীদের সম্পর্কে আমি খবর নিয়েছি। কাকসা ওখানকার দুর্গশাসক। আমি জেনেছি, রাজা কাকসা দাহিরের চাচাতো ভাই। আমি তোমার কাছে জানতে চাই, তুমি কি জানো, কাকসাও কি দাহিরের মতো উগ্র মেজাজের লোক?

না, সে রাজা দাহিরের মতো উগ্র নয়। সে খুবই বুদ্ধিমান লোক, সবকিছুই বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করে।

সে যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বীরযোদ্ধা। মুখোমুখি যুদ্ধে তাকে কেউ হারাতে পারে না। আপনি হয়তো জানেন না, কাকসা আপনার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। রাজা দাহিরের সাথে সেও যুদ্ধে শরীক ছিল। কিন্তু রাজা দাহির নিহত হওয়ার পর সে উরুঢ় ফিরে আসে। কাকসা যখন জানতে পারে, আপনার সেনাবাহিনী উরুঢ়ের দিকে এগিয়ে আসছে তখন সে ভাথিয়া চলে আসে।

সে কি যুদ্ধ না করে দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দেবে? রাণী প্রিয়সীকে প্রশ্ন করলেন বিন কাসিম। আমার যোদ্ধারা তার কাছ থেকে নিঃসন্দেহে দুর্গ ছিনিয়ে নেবে, তবে তাতে প্রচুর রক্তক্ষয় হবে। আমি চাই সে যেন যুদ্ধ ছাড়াই দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দেয়।

আপনি অনুমতি দিলে আমি কাকসার কাছে চলে যেতে পারি, বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বলল রাণী প্রিয়সী। আমি তাকে বলব, অবশেষে যদি তাকে পরাজয়ই বরণ করতে হয় তাহলে জনগণের রক্তপাত এড়াতে কেন আগেই আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।

না প্রিয়সী! তুমি এমনটি করবে না। এমনটি করলে সে ভাববে, আরব বাহিনীর সেনাপতি একজন কাপুরুষ। সে একজন অবলা নারীকে তার বিজয়ের মাধ্যম বানিয়েছে। আমি শুধু জানতে চাই, তার মধ্যে বিবেক বুদ্ধি কেমন?

সে তো প্রকৃতপক্ষে উরুঢ়েরই অধিবাসী ছিল। আপনি দেখেছেন উরুঢ়ের অধিবাসীরা বুদ্ধিমান। শুধু তাই নয়, এখানকার অধিবাসীরা বিশ্বস্ত ও বন্ধুবৎসল। কাকসা যে কোন সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। সে যুদ্ধ করা না করার সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নেবে। প্রয়োজন হলে আমি তার কাছে চলে যাব।

রাণী প্রিয়সী যখন বিন কাসিমের কক্ষ থেকে বের হলো, তখন তার চেহারায় ফুটে উঠল গাঢ় হতাশা। কারণ সে ভিন্ন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বিন কাসিমের ডাকে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু বিন কাসিম তার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাণী প্রিয়সী ছিল বুদ্ধিমতি বিচক্ষণ সুন্দরী যুবতী। রাণী সেই রাতে নানা ভাবে নানা কথা ও অঙ্গ ভঙ্গিতে বিন কাসিমকে কামোদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে অনুভব করেছে, আসলে বিন কাসিম টগবগে যুবক হলেও সে রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ কোন যুবক নয়, তাঁর গোটা দেহটাই একটা পবিত্র মোড়কে মোড়ানো। যেখানে সামান্যতম মানবিক ত্রুটির চিহ্ন নেই। আগাগোড়া বিন কাসিম একজন পূত পবিত্র মানব মূর্তি। সেখানে এতটুকু খাদ নেই।

রাণী প্রিয়সী বিন কাসিমের কক্ষ থেকে বের হয়ে অল্পক্ষণ পরে আবার কক্ষে প্রবেশ করে বলল, ক্ষমা করে দিন সিপাহসালার! আজ আমি কুমতলব নিয়ে আপনাকে অপবিত্র করার বাসনা নিয়ে এসেছিলাম।

তুমি কি আমার ওপর তোমার রূপের যাদু চালিয়ে আমার ক্ষতি করার ইচ্ছা করেছিলে? জানতে চাইলেন বিন কাসিম। তুমি কি মনে করেছিলে, তোমার রূপের দ্যুতি ও জৌলুস ছড়িয়ে আমাকে কাবু করে ফেলবে?

না' না' এমনটি নয়। আমি আপনাকেও রক্তমাংসের গড়া মানুষ ভেবেছিলাম। সুন্দরী রূপসী তরুণীদের সঙ্গলাভের জন্য তো প্রবল প্রতাপশালী রাজা বাদশারাও তাদের আত্মমর্যাদা ভুলে নীচে নেমে আসে।

আমি আপনাকেও তেমনই একজন প্রতাপশালী রাজা বাদশার প্রতিকৃতি ভেবেছিলাম।

এজন্য রাজপরিবারের একজন মর্যাদাবান রাণীর উচ্চাসন ভুলে তুমিও নীচে নেমে এসেছিলে? বললেন বিন কাসিম।

না, আপনি যেমনটি ভেবেছেন তা নয়। আমি রাজ পরিবারের কেউ নই। আমার দেহে রাজপরিবারের রক্ত নেই। আমিতো সাধারণ একজন ব্যবসায়ীর মেয়ে। রাজা দাহির আমাকে দেখে পছন্দ করে রাজ প্রাসাদে উঠিয়েছে। রাজ পরিবারের লোক নই বলেই আমার মনে সাধারণ মানুষের প্রতি প্রবল মায়ামমতা। সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যই তো আমি উরুঢ়ের দুর্গপ্রাচীরের কাছে এসে দুর্গের যুদ্ধরত সৈনিকদেরকে বলেছিলাম, রাজা দাহিরের মৃত্যু হয়েছে, তারা যেন আপনার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, দুর্গের সামরিক বেসামরিক সবাইকে ক্ষমা করে দিতে। আজ আমি আপনাকে একথাও বলে দিতে পারি, কাকসা কোন রক্তক্ষয় না করেই আপনার বশ্যতা স্বীকার করে নেবে, একথা বলে রাণী প্রিয়সী কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর সকল সেনাদের নিয়ে ভাথিয়া দুর্গের কাছে শিবির স্থাপন করলেন বিন কাসিম। ভাথিয়া দুর্গের অবস্থান ছিল বিয়াস নদীর পূর্ব পাড়ে। সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময়ও এই জনবসতির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আজ আর সেই জনবসতির ধ্বংসাবশেষও অবশিষ্ট নেই।

বিন কাসিমের সৈন্যদের সাথেই রাণী প্রিয়সী ভাথিয়া দুর্গে গিয়েছিল। রাণী প্রিয়সী মুসলিম সৈন্যদের সাথে আসা তাদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে অবস্থান করছিল। বিন কাসিম তাকে সাথে নিয়েছিলেন এ জন্য যে, যুদ্ধের কোন পরিস্থিতিতে রাণী প্রিয়সীর প্রয়োজন হতে পারে ভেবে।

বিন কাসিমের সৈন্যরা তখনো তাঁবু তৈরিতে ব্যস্ত। বিন কাসিমের তাঁবু তৈরি শেষে তিনি তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন ঠিক এমন সময় সংবাদবাহক খবর নিয়ে এলো, দুর্গের দিক থেকে সাতজন অশ্বারোহী এবং তাদের পিছনে তিনটি উট আসছে।

খবর শুনে বিন কাসিম তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরও নজরে পড়ল কয়েকটি অশ্বারোহী ও তিনটি উট তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসার দৃশ্য। তিনি নির্দেশ দিলেন, অশ্বারোহীরা যদি তার সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তবে তাদেরকে না আটকিয়ে সরাসরি এখানে নিয়ে আসা হোক।

অশ্বারোহীরা তাঁবুর দিকেই আসছিল। কিন্তু তাঁবু এলাকায় প্রবেশের আগেই তাদের পথরোধ করা হলো। কারণ গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তাকে অবহিত না করে যেন কিছুতেই কাউকে প্রধান সেনাপতির কাছে যেতে না দেয়া হয়।

গোয়েন্দা প্রধান আগন্তুক অশ্বারোহীদের যাছাই করে তাদের সাথে থাকা অস্ত্র নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি আগন্তুকদের কোমর ও দেহ তল্লাশী করে তাদের সাথে গোপনে কোন খঞ্জর রয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করেন। নিশ্চিত হওয়ার পর তাদেরকে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনিও তাদের সাথেই রওয়ানা হন।

আগত প্রতিনিধি দলের দলনেতা রাজা কাকসার একজন শাসক, বিন কাসিমকে জানালেন গোয়েন্দা প্রধান। এরা রাজা কাকসার উপঢৌকন নিয়ে এসেছে।

বিন কাসিম আগন্তুক প্রতিনিধি দলের সাথে সহাস্যে মিলিত হলেন এবং তাদেরকে সসম্মানে তাঁবুতে বসিয়ে মেহমানদারীর নির্দেশ দিলেন।

আমরা কিছুতেই আপনাকে হত্যা করতে এভাবে আসিনি, আপনার এই কর্মকর্তা আমাদের কাছ থেকে তরবারীগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের অসম্মান করেছে। আমরা ময়দানের লড়াইয়ে অভ্যস্ত। রণাঙ্গনেই আমরা মরতে ও মারতে পছন্দ করি। কাউকে গোপনে হত্যায় আমরা বিশ্বাস করি না। এটা কাপুরুষের কাজ। আমরা কাপুরুষ নই, বলল দল নেতা।

বিন কাসিমের নির্দেশে আগন্তুক প্রতিনিধি দলের তরবারী নিয়ে আসা হলো। বিন কাসিম তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া তরবারীগুলো সসম্মানে ফিরিয়ে দিলেন।প্রতিনিধি দল তাদের সাথে নিয়ে আসা উপঢৌকন পেশ করল।

বিন কাসিম বললেন, এসব উপহার উপঢৌকন দেয়ার অর্থ কি? এর অর্থ কি আমি কাকসার দুর্গের দিকে না তাকিয়ে এটি এড়িয়ে সামনে চলে যাব? না এটি তোমাদের রাজা কাকসা আমার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার প্রতীক?

আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় ছেড়ে সামনে এগিয়ে যান, তাহলে আমরা আপনার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সব তরিতরকারী আহার সামগ্রী দেবো। শুধু তাই নয়, আমরা আপনার সেনাবাহিনীর ঘোড়া ও উটের খাবারও সংগ্রহ করে দেবো।

আমরা এখানে কোন ভিক্ষা করতে আসিনি, বললেন বিন কাসিম। আমার সেনাদের খাবার দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং আমার বাহিনীর আনা

ঘোড়া ও উটের খাবারও আমরা সাথে নিয়ে এসেছি। আমাদের দরকার দুর্গ। এ প্রশ্নে আমরা কোন ধরনের বেচা কেনা করব না। তোমাদের রাজা কাকসা কি আত্মসমর্পন করবে না?

আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন আপনি যদি আমাদের প্রথম প্রস্তাব মানতে সম্মত না হন, তাহলে আমরা যাতে আত্মসমর্পনের শর্তাদি নিয়ে কথা বলি। আমরা যাতে এ ব্যাপারেও কথা বলি আত্মসমর্পণ করলে রাজা কাকসার মর্যাদা কি হবে?....

আমি আপনাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি, রাজা কাকসা রাজা দাহিরের মতো এতোটা গোঁয়ার নন। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাকে বলেছিল একজন সেনা সদস্য জীবিত থাকাবস্থায়ও দুর্গ যেন আপনার হাতে তুলে দেয়া না হয়। কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা সবাইকে হতবাক করেছে।

'তোমরাও কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলে? জানতে চাইলেন বিন কাসিম। আপনি একটি লড়াকু জাতির লড়াকু সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। নিজের মাতৃভূমি নিজের দুর্গ রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে নিশ্চয়ই আপনি অপরাধ বলে গণ্য করবেন না, জবাব দিল দলনেতা। তাছাড়া একথাও একটু ভেবে দেখুন, রাজা দাহিরের নিমক আমরা খেয়েছি। রাজা দাহির আমাদের দিয়েছেন ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি। তাই কেন আমরা তার রেখে যাওয়া রাজ্যের সুরক্ষার জন্য লড়াই করব না? আপনি কি আপনার অধীনস্থ লড়াইবিমূখ কর্মকর্তাদের পছন্দ করবেন?

ঠিক বলেছ। নিঃসন্দেহে তোমরা বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। কিন্তু রাজা কাকসা তোমাদের লড়াই থেকে নিবৃত্ত করল কেন? প্রশ্ন করলেন বিন কাসিম।

তিনি একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক, বলল দলনেতা। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের লড়াই আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি রাজা দাহিরের পরাজয় ও মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি। সৈন্য দলের হাতিগুলোকে আমি মুসলমানদের হাতে রক্তাক্ত হয়ে রণাঙ্গন থেকে পালাতে দেখেছি। মুসলমানরা ডাবেল, নিরূন, সিস্তান, ব্রাহ্মণাবাদের পর রাজধানী উরুঢ়ও কব্জা করে ফেলেছে। ভাথিয়াকেও তারা কব্জা করে নেবে তাতে সন্দেহ নেই। যেহেতু অবশেষে আমাদেরকে পরাজয় বরণ করতেই হবে, নয়তো ওদের হাতে নিহত হতে হবে, এমনটি জানার পরও যেসব সৈন্যকে আমরা এতোদিন লালন-পালন করেছি এবং এরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কিন্তু এজন্য

ওদেরকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে মেরে ফেলা কোন বিবেকবান মানুষের কাজ হতে পারে না। এটা অন্যায়। তাছাড়া বিজয়ী সেনাবাহিনী যখন শহরে প্রবেশ করবে তখন শহরের নিরীহ নাগরিকদের কাছ থেকে তারা যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেবে। একজন বিজয়ী সেনার মৃত্যুর বদলে বিজিত রাজ্যের বিশজন নাগরিকের জীবন নেবে। শহরের তরুণী যুবতী মেয়েদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত করবে। প্রতিটি নাগরিকের জীবন সম্পদ ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করা রাজার কর্তব্য। রাজা যখন দেখছে, সে তার রাজ্যকে শত্রু বাহিনীর হাতে তুলে দিলে প্রজাদের জীবন সম্পদ রক্ষা পাবে, তখন রাজার রাজত্বের মায়া ত্যাগ করাই উচিত। তিনি বলেছেন, শত্রুকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার উদ্দেশে যখন আমাদের লড়াই করার প্রয়োজন ছিল আমরা তা করেছি কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অবস্থায় লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া হবে আত্মঘাতি।

আমি তোমার রাজাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি, সত্যিই সে বিবেকবান লোক। যে শাসক তার নিজের জীবন সম্পদ ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য প্রজাদের জীবন সম্পদ মানসম্ভ্রম ধ্বংস না করে নিজের মর্যাদা ও ক্ষমতা কুরবানী করে ইসলামে এমন লোকের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তবে এটা কি ভালো হয় না যে, তোমাদের রাজা নিজে এসেই আমাদের স্বাগত জানাবে? সে এলে তাকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে, বললেন বিন কাসিম।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, বিন কাসিম রাজা কাকসার প্রেরিত প্রতিনিধি দলকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে বিদায় করেন। তিনি এদের আগমনকে আত্মসমর্পনের গ্লানীকর অনুষ্ঠানে পরিণত করেননি।

পরদিন সকালেই বিন কাসিমকে খবর দেয়া হলো, রাজা কাকসা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসছেন। খবর শুনে বিন কাসিম তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে তাঁবুর সীমানা ছাড়িয়ে রাজা কাকসাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন। শা'বান ছাকাফী তাঁর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে তার অনুসরণ করলেন। বিন কাসিমকে দেখে রাজা কাকসা ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন। রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্য বিন কাসিমও তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং এগিয়ে গিয়ে কাকসার সাথে হাত মেলালেন। বিন কাসিমের সাথে ছিল তার একান্ত দুভাষী।

আপনার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই; রাজা কাকসাকে বললেন বিন কাসিম। কাকসাকে তাঁবুতে বসিয়ে বললেন, আপনি কি রাজা দাহিরের চাচাতো ভাই?

"আমি রাজা দাহিরের চাচাতো ভাই, এ নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু নেই", বললেন রাজা কাকসা। কিন্তু আমি রাজা দাহিরের মতো নই এজন্য অবশ্যই আমি গর্ব করতে পারি। এর অর্থ এই নয় যে, রাজা দাহির ছিল দুঃসাহসী ও জাত্যাভিমানী আর আমি ভীতু কাপুরুষ। আমি রাজা দাহিরের মতো যুদ্ধ না করেই দুর্গ আপনার হাতে তুলে দিয়েছি।

রাজা কাকসার সাথে বিন কাসিম আলাপ করার পর বুঝতে পারলেন, কাকসা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। রাজা কাকসা ভাথিয়া দুর্গের সকল অধিবাসীর জীবন সম্পদের নিরাপত্তা ও দুর্গে স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকারের শর্তে বিন কাসিমের আনুগত্য কবুল করে নিলো।

বিন কাসিম কাকসার বুদ্ধিমত্তা ও বোধ বিবেচনা দেখে এতোটাই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি কাকসাকে তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্বে বরণ করে নিলেন। কারণ সেই এলাকায় এমন কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান বের করার জন্য কোন স্থানীয় দূরদর্শী ব্যক্তির পরামর্শ জরুরী ছিল। সেই সাথে পরামর্শ দাতাকে স্থানীয় লোকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও প্রভাবশালী হওয়াটাও ছিল জরুরী। এ ক্ষেত্রে কাকসার চেয়ে বেশিযোগ্য কেউ ছিল না। বিন কাসিম কাকসার হাতে স্থানীয় ট্রেজারীর দায়িত্বও অর্পণ করেন এবং তাকে মুশীরমোবারক অভিধায় অভিষিক্ত করেন।

এরপর ভাথিয়া দুর্গকে বিন কাসিম তাঁর শক্তিশালী সেনা শিবিরে রূপান্তরিত করে পরবর্তী লক্ষবস্তুর ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে কাকসার দেয়া পরামর্শ বিন কাসিমের জন্য খুবই সহায়ক প্রমাণিত হলো। কাকসার পরামর্শে পরবর্তী লক্ষবস্তু নির্ধারণ করা হলো আসকালান্দ।

এর মধ্যে একদিন রাণী প্রিয়সী বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাত করে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার পর বিন কাসিম দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। ভাথিয়া দুর্গে প্রবেশের পর এই সাক্ষাতের আগে বিন কাসিমের আর রাণী প্রিয়সীর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি, প্রয়োজনও পড়েনি।

রাণী প্রিয়সী বিন কাসিমের সাথে দেখা করে বলল, আমি আপনাকে বলেছিলাম না, কাকসা বুদ্ধিমান লোক, সে কোন রক্তক্ষয় না করেই দুর্গ আপনার হাতে তুলে দেবে। কারণ আমি জানতাম, পরিস্থিতি বুঝে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো বিবেক বুদ্ধি তার রয়েছে।

সে যদি লড়াই করার মতো বোকামী করতো, তাহলে তাকে কঠিন মূল্য দিতে হতো, বললেন বিন কাসিম।

কাকসা দুর্গ রক্ষার জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেও আমি তাকে লড়াই থেকে নিবৃত্ত করতে পারতাম। কারণ তার ওপর আমার এতোটা প্রভাব রয়েছে যে, তাকে আমি আমার কথা মানতে বাধ্য করতে পারতাম, বলল রাণী প্রিয়সী।

আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তা হয়ে গেছে। তুমিতো দেখেছ, আমি তার বিবেক বুদ্ধির সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে দিয়েছি, বললেন বিন কাসিম। তুমি কি কাকসার সাথে কথা বলেছ?

না, আমি তার সাথে দেখা করিনি। আপনার অনুমতি ছাড়া আমি আমার পরিচিত কোন লোকের সাথে সাক্ষাত করি না।

তুমি তার সাথে সাক্ষাত করতে পার, বললেন বিন কাসিম।

এই অনুমতির জন্যই আমি এসেছি। আমি শুধু তার সাথে দেখা করতে নয়, তার সাথেই বসবাস করতে চাই, বলল প্রিয়সী। রাণী প্রিয়সীর একথা শুনে বিন কাসিম নীরব হয়ে গেলেন। তিনি চিহ্নিত দুই প্রভাবশালী পূর্ব শত্রুর মিলিত অবস্থানের বিষয়টিতে ভবিষ্যতে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সম্ভাবনা রয়েছে মনে করে শঙ্কাবোধ করলেন।

বিন কাসিমকে দীর্ঘসময় নীরব থাকতে দেখে রাণী প্রিয়সী বলল, আপনি নীরব হয়ে গেলেন কেন? আপনার চেহারা বলছে, আপনি আমাদের একত্রিত অবস্থানকে পছন্দ করছেন না। আপনি চাচ্ছেন না আমরা একত্রে বসবাস করি। আপনার মনে যদি আমার ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলুন। কারণ কাকসার সাথে তার পরিবারের সব মহিলারাই রয়েছে, আমি শুধু তাদের সান্নিধ্যে থাকতে চেয়েছি মাত্র। আপনি যদি আমাকে বন্দি করে রাখতে চান, তবে আমার কিছুই বলার নেই। তবে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আমি কাকসার সাথে থাকলে আপনার উপকার বৈ-ক্ষতি হবে না।

ঠিক আছে প্রিয়সী! তুমি যাও, আমি তোমাকে কাকসার পরিবারে থাকার অনুমতি দিচ্ছি।

রাণী প্রিয়সী সে দিন থেকেই কাকসার পরিবার পরিজনের সাথে বসবাস করার জন্য চলে গেল।

সে দিন বিকেলে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাত করতে এলেন।

সম্মানিত সিপাহসালার! এই মহিলাকে কাকসার পরিবারে থাকতে দিয়ে আপনি মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করেছেন, বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বললেন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী। আপনাকে শুধু আমার কর্তা এবং সিন্ধের আমীরই মনে করি না, বয়োকনিষ্ঠ হওয়ার কারণে আপনাকে আমি নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। আপনি নিঃসন্দেহে একজন অনন্য সেনানায়ক এবং শাসক। কিন্তু আপনার যৌবন অনেক ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে বিচক্ষণতার চেয়ে আবেগকে প্রবল করে দেয়। আমি আপনার রণকৌশলে কখনো দখলান্দাজি করিনি, তদ্রুপ আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে কখনো আপনাকে কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেইনি। কারণ আপনার নিরাপত্তার বিষয়টি আমার ওপর ন্যস্ত।

আপনি কি কোন ঝুঁকির আশঙ্কা করছেন?

শা'বান ছাকাফীর উদ্দেশ্যে বললেন বিন কাসিম, এরা আমাদের চিহ্নিত শত্রু ছিল ক'দিন আগেও। পরাজিত হওয়ার পর প্রকাশ্য আনুগত্য করলেও এই দুই দিকপাল একত্রে মিলে কোন ঝুঁকি সৃষ্টি করার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আপনি কি মনে করেন, আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত?

না, সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা আপনার মর্যাদা ও আভিজাত্যের পরিপন্থী হবে। এটার ব্যবস্থা আমার কাছে আছে। আমি আজই এদের পিছনে আমার বিশ্বস্ত স্থানীয় দু'জন গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছি। যারা এদের ভিতরের খবর সংগ্রহ করবে।

এতো দিনে বিন কাসিম ভাথিয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁর সেনা বাহিনী তখন আসকালন্দের দিকে অভিযানের জন্যে প্রস্তুত।

আসকালন্দ অভিযানের আগেও রীতি অনুযায়ী অগ্রবর্তী বাহিনী নির্বাচন করা হলো। আসকালন্দ শহরের কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। শুধু এতটুকু জানা যায়, আসকালন্দ ছিল আবয়াস নদীর পূর্বতীরে। আসকালন্দ অভিযানের অগ্রবর্তী দলের কমান্ড বিন কাসিম কাকসার ওপর ন্যস্ত করলেন। কারণ এলাকাটি সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় একজন স্থানীয় লোকের প্রয়োজন ছিল। কাকসাকে অগ্রবর্তী দলের কমান্ডার নিযুক্ত করলেও শা'বান ছাকাফীর পরামর্শে একজন আরব সেনাপতিকেও তার সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করা

হলো। তার নাম ছিল জায়েদ বিন আলতাই। এখানে বলে রাখা ভালো, কাকসা নিজেই অগ্রবর্তী দলের কমান্ডার হওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

পরবর্তীতে কাকসা তার দায়িত্বে পূর্ণ বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রাখলেন। বিয়াস নদী পারাপারের সময় সে স্থানীয় মাছ শিকারীর কাছ থেকে নৌকা নিয়ে নিতে সক্ষম হলো। ফলে সহজেই বিন কাসিম তাঁর দলবল নিয়ে নদী পেরিয়ে গেলেন। বিন কাসিমের সৈন্যরা যখন নদী পার হচ্ছিল তখন দুর্গে খবর পৌছে যায় মুসলিম বাহিনী এসে গেছে। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে সারা দুর্গে ছড়িয়ে পড়লে অধিবাসীদের মধ্যে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে যায়। লোকজন বলাবলি করতে শুরু করে, মুসলিম বাহিনী তুফানের মতো ধেয়ে আসছে। এই তুফানে দুর্গের সবকিছু খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। দুর্গশাসক সিহরা ছিল খুবই বেয়াড়া ও গোঁয়ার লোক। সে মুসলিম বাহিনীর আগমনে দুর্গের লোকদের ভীত সন্ত্রস্ত হতে দেয়নি।

মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে দুর্গের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নাগরিক সিহরার দফতরে গিয়ে জানাল, তারা দুর্গপ্রাচীরে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর আগমন দেখেছে। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বিপুল।

তোমরা কি চাও? আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে বলল সিহরা। তোমরা ভয়ে মরে যাচ্ছো কেন?

আমরা আমাদের স্ত্রী সন্তান মা বোনদের জীবন সম্ভ্রমের নিরাপত্তা চাই, বলল এক আগন্তুক। আপনি যদি মনে করেন, আমাদের সেনাবাহিনী দুর্গ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে মুসলিম সৈন্যদের জন্য দুর্গফটক খুলে দিন। আমরা শুনেছি, মুসলিম বাহিনী কোন নাগরিককে হয়রানী করে না। জিযিয়া ছাড়া আর কিছুই নেয় না এবং শহরে লুটতরাজও করে না।

আরব বাহিনী অনেক বড় বাহিনী মহারাজ! বলল অপর একজন। তারা শহরে পাথর ও আগুনেতীর নিক্ষেপ করে। তারা ডাভেল ও উরুঢ়ের মতো দুর্গ দখল করে নিয়েছে, আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবো না।

তোমরা এমন কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছো কেন? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল দুর্গশাসক সিহরা। তোমরা আমার কথা শোনো। মুসলিম বাহিনীকে আমরা বুঝে শুনেই আসার সুযোগ দিয়েছি। পরপর কয়েকটি বিজয়ে আরব সেনাকমান্ডারদের মাথা বিগড়ে গেছে। তারা ভাবছে, তাদের কেউ মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না। রাজা দাহির বলেছিলেন, মুসলিম সৈন্যরা যখন সিন্দু অঞ্চলের

ভিতরে চলে আসবে, তখন ওদের জনবল কমে যাবে, যখন তাদের খাবার মতো কিছুই থাকবে না তখন আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করব। সে সময় তাদের পালাবার কোন পথ থাকবে না। আমরা আরব বাহিনীর সিপাহসালার ও সৈন্যদেরকে জীবিত পাকড়াও করবো আর আমাদের প্রতিটি ঘরে একজন করে আরব গোলাম থাকবে। ওদের ঘোড়া ও উটগুলো হবে আমাদের সম্পদ। রাজা দাহির যে স্থানে এদের নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন, তারা এখন সেখানেই এসে গেছে, এখন আমাদের কর্তব্য হলো ওদেরকে পিছু হটার সুযোগ না দেয়া। আমরা ওদেরকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নদীর তীর পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগও দেবো না।

আপনি তাদের নিক্ষিপ্ত পাথর ও অগ্নিবাহী তীর কিভাবে রোধ করবেন? সিহরাকে প্রশ্ন করল আরেকজন।

আমাদের তীরন্দাজরা কি মরে গেছে? আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা কি বেকার হয়ে গেছে? আমাদের সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাদের ওপর এমন আক্রমণ করবে যে, তারা পাথর অগ্নিবাহী তীর নিক্ষেপের সুযোগই পাবে না, বলল দুর্গশাসক সিহরা। তোমরা কাপুরুষ হয়ে যেয়ো না। বুকে সাহস রাখো, শহরের যেসব লোক তীর তরবারী বল্লম চালাতে জানে তাদেরকে সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দাও, তারা দুর্গপ্রাচীরের ওপরে উঠে সৈন্যদের সহযোগিতা করুক। আর যারা অশ্বারোহণ, ও তরবারী চালাতে সক্ষম তাদেরকে অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথে শামিল হওয়ার কথা বলো।

শুনেছি, রাজা দাহির মারা গেছেন? বলল আগন্তুকদের একজন।

মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, গলা চড়িয়ে বলল সিহরা। রাজা দাহির বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে হিন্দুস্তানের সৈন্যদের জমায়েত করছেন। দেখবে তিনি সময় মতো ঠিকই এসে যাবেন।

দুর্গশাসক সিহরা শহরের লোকদেরকে এভাবে উত্তেজিত করল যে, শহরের অধিবাসীরাও সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার জন্য মৃত্যুপণ করল। শহরের মন্দিরের পুরোহিতরা লড়াই না করলে দেবদেবীদের অভিশাপ পড়ার কথা বলে অধিবাসীদের ভয় দেখালো। একপর্যায়ে শহরের সব অধিবাসী ও সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য একজোট হয়ে গেল। তাদের কাছে বিজয় অবশ্যম্ভাবী মনে হতে লাগল।

নদী পারাপারের পর কাকসার পরামর্শে নৌকার মালিকদেরকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক উপহার দেয়া হলো। সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত শস্যভাণ্ডার থেকে তাদেরকে তরিতরকারী দেয়ার নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম।

দুর্গের চতুর্পাশে অবরোধ আরোপের সময় দুর্গপ্রাচীর থেকে অবরোধ আরোপকারী মুসলিম সৈন্যদের প্রতি বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ করল হিন্দু সৈন্যরা। কাকসা একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে দুর্গের প্রধান ফটকের ওপর দাঁড়ানো দুর্গশাসক সিহরার কাছাকাছি গিয়ে সিহরার উদ্দেশ্যে বললেন–

সিহরা! আমাকে চিনতে চেষ্টা করো, আমি রাজা দাহিরের চাচাতো ভাই কাকসা!

আরে কাকসা' এই লুটেরাদের সঙ্গী হয়ে তুমি কি নিতে এসেছো? তুমিও কি বাপদাদার ধর্ম বিক্রি করে দিয়েছো?

প্রধান ফটক খুলে দাও! ভিতরে এসেই বলব, কেন আমি এদের সাথে এসেছি।

এই ফটক শুধু রাজা দাহিরের জন্যেই খোলা হবে।

রাজা দাহিরের আর আসা হবে না। সে নিহত হয়েছে, তার খণ্ডিত মাথা আরবদেশে চলে গেছে। রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী রাণী প্রিয়সী আমার সাথেই রয়েছে।

রাণী প্রিয়সী ছিল অনেকটা পিছনে। কাকসার ইঙ্গিতে সে একটি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে কাকসার পাশে এসে দাঁড়াল। রাণী তার চেহারা কাপড়ে ঢেকে রেখেছিল।

চেহারার আবরণ ফেলে দিয়ে রাণী প্রিয়সী বলল, আমার দিকে তাকাও সিহরা! তুমি তো আমাকে চেনো। রাজা দাহির জীবিত থাকলে আমি মুসলমানদের সাথে আসতাম না। সময় নষ্ট না করে দুর্গের ফটক খুলে দাও, তাতে কাকসার মতো তুমিও সম্মানিত হবে, তুমিই থাকবে দুর্গের শাসক।

শহরের অলিগলি নিজের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের রক্তে রঞ্জিত করোনা সিহরা! সিহরার উদ্দেশ্যে বললেন কাকসা। নিজের ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনো না। মনে রাখবে, আমি এখন মুসলিম বাহিনীর একজন উপদেষ্টা।

সত্যিই যদি রাজা দাহির এই আরবদের দ্বারা নিহত হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার রক্তের প্রতিশোধ নেবো। এসো না! সাহস থাকলে এগিয়ে এসে

দুর্গের দরজা খুলতে চেষ্টা করে দেখো। তুমি মান মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আরবদের কর্মকর্তা সেজেছ...। তোমার চোখে বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হওয়ার আগেই জীবন বাঁচাতে চাইলে এখান থেকে চলে যাও।

উরুঢ় দুর্গ অবরোধ করার পর রাণী প্রিয়সী দুর্গফটকের কাছে গিয়ে যখন রাজা দাহিরের মৃত্যু সংবাদের খবর বলেছিল তখন ঠিক এমনই এক বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল রাণী প্রিয়সী, যা আজ রাজা কাক্সার হতে হলো। রাজা কাকসা ও রাণী প্রিয়সীর সাথেও আসকালন্দ দুর্গের অধিবাসীরাও তাই করল। তাদেরকে অপমান ও ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিলো।

"রাজা দাহিরকে হত্যা করার মতো কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই। সে যদি নিহত হয়েই থাকে তাহলে তোমরাই তাকে হত্যা করিয়েছ," দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে কাকসা ও প্রিয়সীর উদ্দেশ্যে বলল সিহরা। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা রাজা হত্যার প্রতিশোধ নেবো।

বিন কাসিম তাঁর দু'ভাষীকে ডেকে বললেন, কাকসা ও প্রিয়সীকে ফিরে আসতে বলো। এদের ভাগ্য খুবই খারাপ। দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসই ওদের বিধিলিপি। এদের উপকার করার চেষ্টা অর্থহীন।

বিন কাসিমের নির্দেশে তারা ফিরে এলো।

কাকসা ও রাণী প্রিয়সীর সমঝোতা চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর বিন কাসিম দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা যখন দুর্গের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল ঠিক সেই সময় দুর্গের এক কোণের একটি দরজা খুলে গেল। দুর্গের ভিতর থেকে জয়ধ্বনী দিয়ে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্লাবনের মতো বেরিয়ে এলো এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে না দাঁড়িয়ে ঘেরাও রত মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলে পড়ল। মুসলমানরা কোন ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই প্রতিরোধে লিপ্ত হলো। লড়াই ছিল এলোপাতাড়ি ফলে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

উভয় পক্ষের বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে নিহত ও আহতের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। মুসলিম সেনাপতিরা তাদের যোদ্ধাদের একটা শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করছিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণের মুখে সৈন্যদের শৃঙ্খলায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছিল না।

বিন কাসিমের বেশি সময় লাগল না সিহরার যুদ্ধ কৌশল অনুধাবন করতে। তিনি হিন্দু সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ উন্মাদনাও দেখতে পেলেন।

বিন কাসিম চিৎকার করে তাঁর যোদ্ধাদেরকে পিছিয়ে আসার আহবান করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, হিন্দু সৈন্যরা যাতে মুসলমানদের তাড়া করতে করতে দুর্গের পাশ থেকে দূরে সরে আসে কিন্তু সিহরা যখন দেখতে পেল মুসলিম সৈন্যরা পিছনে সরে যাচ্ছে তখন সে তার সৈন্যদেরকেও পিছনে সরিয়ে নিল এবং খুব দ্রুত প্রধান ফটক পেরিয়ে দুর্গের ভিতরে চলে গেল। হিন্দু সৈন্যদের বিদ্যুৎ গতিতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসা এবং প্রবেশ করা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, তাদেরকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তারা এ ধরনের আক্রমণের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিহত ও আহত হলো। হিন্দুরা তাদের নিহত ও আহত যোদ্ধাদের তুলে নেয়ার কোন চেষ্টা না করেই দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিলো। আহত হিন্দুযোদ্ধারা উঠে দুর্গের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল দুর্গফটক বন্ধ হতে দেখে মুসলিম তীরন্দাজরা অতি সহজেই ওদেরকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে শুরু করল। ফলে কোন আহত হিন্দু যোদ্ধার পক্ষেই জীবন নিয়ে দুর্গে ফেরা সম্ভব হলো না। হিন্দুরা তাদের নিহত সহযোদ্ধাদের মরদেহ তুলে নেয়ার কোন চেষ্টাই করল না এবং আহতদের জীবন রক্ষারও পরোয়া করল না।

দুর্গফটক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নির্বিঘ্নে মুসলিম যোদ্ধারা তাদের নিহত ও আহত সহযোদ্ধারদেরকে তুলে আনতে শুরু করল। এদিকে মুসলিম শিবিরে থাকা মহিলারা বেরিয়ে এসে আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টিবেধে তাদের ওষুধ খাইয়ে পানি ঢেলে সুস্থ করার কাজে লেগে গেল।

সেদিন যুদ্ধ শেষে বিন কাসিম তাঁর বাহিনীর সকল সোনাপতি ও কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠক করলেন। শত্রুদের যুদ্ধ কৌশল নিয়ে পর্যালোচনার পর তারা বুঝতে পারলেন আজকের মতো হঠাৎ দুর্গ থেকে বেরিয়ে হামলে পড়াই হবে শত্রুদের যুদ্ধকৌশল। সেই সাথে অবরোধ সম্পন্ন করার পাশাপাশি শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে কিছুসংখ্যক রিজার্ভ সৈন্য রাখার সিদ্ধান্ত হলো। কিছু যোদ্ধাকে রাখা হলো বিচরণশীল। যারা যে কোন দিকে আক্রমণ হলে আক্রান্তদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে।

পরদিন মুসলিম সৈন্যরা দুর্গের চতুর্দিকে অবরোধ আরোপ করেছিল। বিন কাসিম দুর্গের চতুর্দিক ঘুরে দুর্গপ্রাচীর কোন দিক দিয়ে ডিঙানো যায় কিনা কিংবা দুর্গপ্রাচীর ভাঙা যায় কি-না তা নিরীক্ষণ করছিলেন। যোহরের নামাযের সময় মুসলিম সৈন্যরা ময়দানেই জামাতে নামায আদায়

করছিল। নামায শেষে অনেকেই ছিল মোনাজাত রত ঠিক এমন সময় দুর্গের পূর্বপাশের একটি ফটক খুলে বন্যার পানির মতো হিন্দু সৈন্যরা বেরিয়ে এসে হামলে পড়ল মুসলিম সৈন্যদের ওপর। মুসলমান সৈন্যরা ঘটনার আকস্মিকতায় পরিকল্পিত প্রতিরোধের অবকাশ পেলনা। অধিকাংশ মুসলিম সৈনিকের পক্ষে নামায থেকে উঠে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণের সুযোগ হলো না। হাতের কাছের তরবারী নিয়ে অশ্বারোহীরাও পদাতিকের মতোই হামলে পড়া শত্রুদের প্রতিরোধে লিপ্ত হলো।

আক্রমণ হয়েছিল অবরোধের এক কোণে। বিন কাসিম আক্রমণ হতে দেখেই রিজার্ভ ও চলমান সৈন্যদেরকে আক্রান্তদের সহযোগিতার জন্য দৌড়ালেন। উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হলো তীব্র লড়াই। অপ্রস্তুত থাকার পরও দ্রুত সহযোগীদের পৌছে যাওয়ায় মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণ সামলে নিল কিন্তু এই আক্রমণে হিন্দুদের বিরাট মূল্য দিতে হলো। হিন্দুরা বেরিয়ে আসা অর্ধেক যোদ্ধাকে আহত ও নিহত অবস্থায় ময়দানে ফেলে রেখে দুর্গে ফিরে গেল।

এই ক্ষয়ক্ষতির পর আর সিহরার কোন সৈন্যদল দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল না। তারা দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি করার চেষ্টায় লেগে গেল।

সিহরার সৈন্যরা আরব সৈন্যদের নৌকা থেকে চুরি করে আনা মিনজানিকের আদলে ছোট্ট মিনজানিক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব মিনজনিক দিয়ে মুসলিম সৈন্যদের প্রতি ছোট্ট পাথর নিক্ষেপ করছিল সিহরার বাহিনী। নিক্ষিপ্ত এক দেড় কেজি ওজনের পাথরের দ্বারা মুসলিম শিবিরের তেমন কোন ক্ষতিসাধন সম্ভব হলো না। কারণ নিক্ষিপ্ত পাথরের গতি বুঝে নিয়ে মুসলমানরা তাদের তাঁবু সরিয়ে নিয়েছিল কিন্তু হিন্দুদের অব্যাহত ও তীব্র পাথর নিক্ষেপের কারণে দুর্গপ্রাচীরে ভাঙন সৃষ্টিকারী আরব যোদ্ধাদের পক্ষে প্রাচীরের ধারে কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এভাবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত চেষ্টা করার পরও দুর্গপ্রাচীর ডিঙানোর কৌশল ফলপ্রসূ না হওয়ায় অবশেষে বিন কাসিম শেষ পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে আসা বড় বড় মিনজানিক থেকে দুর্গের ভিতরে বড় বড় পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন সেই সাথে অগ্নিতীর ছোড়ারও অনুমতি দিয়ে দিলেন।

মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত পাথর ও অগ্নিবাহী তীরে শহরের অনেক জায়গায় আগুন ধরে গেল এবং পাথরের আঘাতে ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে শুরু করল। আতঙ্কিত শহরবাসীর মধ্যে শুরু হলো আর্তচিৎকার হুড়োহুড়ি দৌড়-ঝাপ।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দুর্গের একটি ফটক খুলে দুর্গের ভিতর থেকে অন্য দুদিনের মতো হিন্দু সৈন্যরা বেরিয়ে এসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করল। হিন্দু সৈন্যদের সংখ্যা ও আক্রমণের ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল দুর্গের সকল সৈন্যই বেরিয়ে এসেছে এবং তারা আখেরী ও চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। হিন্দুদের আখেরী আক্রমণ প্রতিহত করতে বিন কাসিম অবরোধ ভেঙে দিয়ে সৈন্যদেরকে প্রতিরোধ আক্রমণকে নির্মূল আঘাতে পরিণত করার চেষ্টা করলেন। সন্ধ্যার সামান্য আগের এই আক্রমণ প্রতি আক্রমণ বেশি সময় স্থায়ী হলো না। সন্ধ্যা নেমে আসায় বিপুল সাথীকে ময়দানে ফেলে রেখেই অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্যরা দুর্গে ফিরে গেল। রাতের বেলায় গোটা ময়দান আহত সৈন্যদের আর্তচিৎকার ও কান্নাকাটিতে কাটল। এদিকে দুর্গের ভিতরেও রাতভর শোনা গেল শহরবাসীর মধ্যে হট্টগোল। সকাল বেলায় দেখা গেল দুর্গের কয়েকটি জায়গায় উঁচু বাঁশের মাথায় সাদা পতাকা বেঁধে দেয়া হয়েছে। সাদা পতাকা সাধারণত শান্তি ও আত্মসমর্পণের আহবান বোঝায় কিন্তু সিহরার কার্যক্রমের কারণে বিন কাসিম এটাকে প্রতারণতার একটি কৌশল মনে করলেন। বেলা কিছুটা বাড়ার পর দুর্গের প্রধান ফটক খুলে কয়েকজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের একজন উচ্চ আওয়াজে মুসলমানদের উদ্দেশ্য বলল, তারা মুসলিম প্রধান সেনাপতির সাথে দেখা করতে চায়। তাদেরকে অগ্রসর হতে বলা হলো। তারা এগিয়ে এলে তাদের কাছ থেকে তরবারী ও হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর হাতে সোর্পদ করা হলো। গোয়েন্দা প্রধান তাদেরকে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে গেলেন।

আমরা আপনার কাছে নিরাপত্তা চাইতে এসেছি, আমরা আপনার কাছে আমাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার আবেদন করছি', বলল আগন্তুকদের একজন।

তোমাদের শাসকের কি সাহস হলো না এখানে আসার? আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করলন বিন কাসিম। দুর্গশাসক নিজে না এসে তোমাদের পাঠাল কেন? আত্মসমর্পণের রীতি তো এটা নয়। সে নিজে না আসার অর্থ হলো, তার এখনো যুদ্ধ করার সাধ মিটেনি।

মহামান্য আরব সেনাপতি! সে দুর্গে থাকলে তো আসবে? বলল প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র। আমরা আসার অর্থই হলো সে নেই। দুর্গশাসক পালিয়ে গেছে।

কখন পালালো? কোন দিক দিয়ে পালালো?

পালানোর সুযোগ সে করে নিয়েছিল। গতকাল আপনার সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত পাথরে যখন শহরের অধিবাসী ও সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং অগ্নিবাহী তীরে কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরে যায়, ভীতসন্ত্রস্ত নারী ও শিশুদের আর্তনাদে আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় তখন শহরের অধিবাসীদের মধ্য থেকে আমরা আত্মসমর্পণের জন্য সিহরাকে বলি। আমরা তাকে বললাম, আরব সৈন্যদের আক্রমণ থেকে আমরা দুর্গ রক্ষা করতে পারবো না, তাই আরবরা দুর্গ জ্বালিয়ে ভস্ম করার আগেই আত্মসমর্পণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। না হয় আরবরা দুর্গ দখল করবে। আমাদের সকল যুবক-যুবতী নারী ও শিশু আরবদের গোলামবাদী হবে এবং তুমি সহ সেনাবাহিনীর সকলকেই হত্যা করা হবে। তার চেয়ে কি ভালো নয় আরবদের কাছে আত্মসমর্পণ করে সবার জানমাল ইজ্জত আব্রু রক্ষা করা। এটা করলে শহরও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাবে।

আমাদের প্রস্তাবে সিহরা গভীর ভাবনায় ডুবে গেল। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর নীরবতা ভেঙে বলল, ইতিমধ্যে আমরা বহু আরব সৈন্যকে হত্যা করেছি এবং বিপুলসংখ্যক আরব সৈন্যকে আহত করেছি। আরব সেনাপতি তাদের এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্যে আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না। এখন যদি আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলে তারা আমাদের কাছ থেকে জিযিয়াও নেবে যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির জন্য মোটা অংকের ভর্তুকি উসূল করবে। শুধু এর ওপরই তারা খুশি হবে না, এরা আমাদের স্ত্রী কন্যা বোন ও সোনাদানা সবই কুক্ষিগত করবে। আর আমাদের সবাইকে দাসদাসী বানিয়ে আরব দেশে পাঠিয়ে দেবে।

এরপর দুর্গশাসক সিহরা শহরের প্রধান মন্দির থেকে দু'জন পুরোহিতকে ডেকে পাঠালো আমাদের বুঝানোর জন্য। পুরোহিতরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের উৎসাহিত করল। তারা লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করলে দুনিয়াতে আমাদের যে নির্মম লজ্জাকর পরিণতি বরণ করতে হবে সেই সম্পর্কে সতর্ক করল এবং পরপারে আমাদের আরো কঠিন শাস্তির কথা বলল। পুরোহিতরা সতর্ক করল এই বলে যে, লড়াই না করলে মৃত্যুর পর তোমাদেরকে শূকর কুকুরের বেশে পূর্ণজন্ম দেয়া হবে।

তোমরা বোঝাতে চাচ্ছো, সিহরা ও পুরোহিতরা তোমাদেরকে লড়াই করতে বাধ্য করেছে।

হ্যাঁ, আমরা আপনাকে আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝানোর জন্যই বিস্তারিত বলছি। আমরা আপনার কাছে যাতে আমাদের অপরাধের ক্ষমা পেতে পারি এজন্য আমরা প্রকৃত ঘটনা আপনাকে অবহিত করছি। সিহরা ও পুরোহিতরা আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করার পর বলল, আজ দিনের শেষ ভাগে আমরা মুসলমানদের ওপর এমন আক্রমণ চালাবো যে, মুসলমানরা পালানোর পথ পাবে না। এরপর সরকারি সৈন্যরা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। শহরে যত যুবক ও সামর্থবান পুরুষ ছিল সবাইকে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্যদের সাথে লড়াইয়ে শরীক হওয়ার আহ্বান জানালো। তারা বলল, আজ বিকেলে মুসলিম বাহিনীকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশে আখেরী হামলা চালানো হবে। এসো সবাই নিধনযজ্ঞে শামিল হও। একথা শুনে শহরের সকল সক্ষমপুরুষই নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে সৈন্যদের সাথে মুসলিম নিধনযজ্ঞে শামিল হলো। সন্ধ্যার সামান্য আগে সৈন্য ও শহরের লোকেরা মিলে আপনাদের ওপর আক্রমণ চালালো।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে অক্ষত সৈন্য ও বেঁচে যাওয়া লোকজন দুর্গে ফিরে গেল। আমরা রাতে সিহরার প্রাসাদে গিয়ে দেখি সে নেই। প্রাসাদের এক রক্ষী বলল, সকল সৈন্যও লোকেরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন সিহরা তার প্রাসাদে রক্ষিত সকল সোনাদানা মনিমুক্তা দামী আসবাবপত্র জড়ো করল। পূর্ব থেকেই প্রাসাদের সামনে কয়েকটি ঘোড়া প্রস্তুত ছিল। এমনসময় এক সৈনিক দৌড়ে এসে সিহরাকে কানে কানে কি যেন বলে সব মালপত্র একটি ঘোড়ার পিঠে তুলে অন্য ঘোড়ার পিঠে সিহরার পরিবার-পরিজনকে তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাথে সাথে সিহরাও গায়েব হয়ে গেল। জানা নেই তারা কোন দিক দিয়ে দুর্গ ছেড়ে গেছে।

বিন কাসিম প্রতিনিধি দলের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং জিযিয়া ছাড়া তাদের ওপর কোন জরিমানা ধার্য করেননি। তিনি প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিলেন, তোমরা আগে যেসব নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে সেসব সুবিধার সবগুলোই তোমাদের বহাল থাকবে।

দুর্গে প্রবেশ করার পর গোয়েন্দা প্রধান বিভিন্ন লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে চেষ্টা করলেন, সিহরা কোন দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পর তিনি জানতে পারলেন, পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই করে রেখেছিল সিহরা কিন্তু অবরোধের কারণে তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে সে শহরের সকল লোকও

সৈন্যদের দিয়ে অবরোধের একপাশে এমন জোরদার আক্রমণ করল যে, সকল মুসলিম সৈন্য প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো। এই হামলাও করল সন্ধ্যার ঠিক আগমুহূর্তে। দু'পক্ষের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো আর এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে খালি জায়গা দিয়ে সিহরা তার পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে যে দুই পুরোহিত যুদ্ধের জন্য লোকজনকে প্ররোচিত করেছিল তারাও গায়েব। রাতের বেলায় যুদ্ধ ফেরত লোকজন যখন দেখল তাদের শাসক ও ধর্মগুরু কেউই নেই, তখন শহরের লোকেরা সবাই মিলে পরামর্শ করে তাদের জীবনও সম্পদ রক্ষার আবেদন জানানোর জন্য বিন কাসিমের কাছে এই প্রতিনিধিদলকে পাঠাল।

অত:পর বিজয়ী বেশে বিন কাসিম আসকালন্দ দুর্গে প্রবেশ করলেন। এবং উতবা বিন সালামা তামিমীকে আসকালন্দ দুর্গের শাসক নিযুক্ত করলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রায় বারো হাজারের মতো হিন্দু সেদিন আসকালন্দ দুর্গের বাইরে নিহত হয়েছিল এবং হাজারেরও বেশী আহত হয়েছিল।

বর্তমানে যে সিন্ধু প্রদেশ রয়েছে এর পুরো এলাকাটিই তখন বিন কাসিমের দখলে চলে আসে। অবশ্য রাজা দাহিরের রাজত্বের পরিধি মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিন কাসিমের পরবর্তী গন্তব্য ছিল মুলতান। বিন কাসিম মুলতানের নকশা মেলে অভিযানের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। স্থানীয় উপদেষ্টাগণ বিন কাসিমকে জানালেন, মুলতানের আগে সিককা নামে একটি দুর্গ রয়েছে সেটিকে অবশ্যই জয় করতে হবে।

ইতিহাসে বর্ণিত সিককা নগরীর কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। জানা যায় সিককা শহরের অবস্থান ছিল চুন্নাব নদীর পূর্বতীরে মুলতান শহরের অপর পাশে। সিককা শহর ও মুলতানের মাঝে যদি নদী না থাকত তাহলে উভয় শহর একই শহরে রূপান্তরিত হতো। সিককা নগরের শাসক ছিল রাজা দাহিরের ভাতিজা বিজয়রায়ের সহোদর বজরা এবং মুলতানের শাসক ছিল রাজা দাহিরের ভাই চন্দ্রের ছেলে কুরসিয়া। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, মুলতানের শাসকের নাম ছিল গৌরাঙ্গ।

কাকসা বিন কাসিমকে জানালেন, কুরসিয়াও এভাবেই লড়াই করবে। তাই ওর সৈন্যদেরকে দুর্গের বাইরেই দুর্বল করে ফেলতে হবে। বিন কাসিম কাকসার পরামর্শকে পছন্দ করলেন, তিনি পাথর নিক্ষেপ ও অগ্নিবাহী তীর

নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতেন। কারণ তাতে দুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কই শুধু ছড়িয়ে পড়তো না, দুর্গের লোকজনের ব্যাপক ধনসম্পদ ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হতো। বিন কাসিম বিজিত এলাকার লোকজনের কাছ থেকে কর ও জিযিয়া আদায় করতেন। কিন্তু পাথর ও আগুনে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলে জিযিয়া আদায় করা অসম্ভব হয়ে যেত। লোকজন বলত, আমাদের সব কিছুই তো ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাদের জীবন ব্যয় মিটানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় জিযিয়া কিভাবে পরিশোধ করব? অথচ যুদ্ধের ব্যাপক ব্যয় নির্বাহে জিযিয়া প্রাপ্তির বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরদিন ভোরের সূর্য যখন চতুর্দিকে আলো ছড়ালো, তখন মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সিককার সৈন্যদের মুখোমুখি দাঁড়ানো। বেলা কিছুটা ওপরে উঠার পর বিন কাসিম ইসলামী যুদ্ধরীতি অনুযায়ী মধ্যভাগের সৈন্যদেরকে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। অপর দিকেরও মধ্যভাগের সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। দুপক্ষের মধ্যে শুরু হলো তীব্র লড়াই। এক পর্যায়ে আরব সৈন্যরা তাদের রীতি অনুয়ায়ী পিছনে সরে আসতে শুরু করলো। মধ্যভাগের সৈন্যদের পিছনে সরিয়ে এনে বিন কাসিম দুই প্রান্তের সৈন্যদের ঘেরাও আরো প্রলম্বিত করে শত্রুসেনাদের ঘেরাও করতে চাইলেন কিন্তু শত্রুবাহিনী মুসলমানদের ইচ্ছা বুঝতে পেরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলো। ফলে বিন কাসিমের এই কৌশল কোন কাজে এলো না।

এভাবে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর সন্ধ্যা নেমে এলে বজরা তার সৈন্যদেরকে দুর্গে ফিরিয়ে নিল। বিন কাসিম দুর্গ অবরোধের কোন চেষ্টাই করলেন না। অবরোধ না করে তিনি কিছু সৈনিককে দুর্গের বিপরীত পাশে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, দুর্গ থেকে যাতে কোন লোক বাইরে যেতে না পারে এবং বাইরের কোন লোকও যাতে দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে। বাইরের দুনিয়া থেকে দুর্গকে বিচ্ছিন্ন করা ছিল এই নির্দেশের উদ্দেশ্য।

এ ভাবে চার পাঁচ দিন চলে গেল। দুর্গ থেকে বেরিয়ে হিন্দু সৈন্যরা যুদ্ধ করতো, আবার দিন শেষে দুর্গে ফিরে যেত। তাতে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল বটে কিন্তু ক্ষতি থেকে মুসলমানরাও মুক্ত ছিল না।

কিন্তু চার পাঁচ দিন যুদ্ধের পরও সিককার সৈন্যদের যুদ্ধ উন্মাদনায় কোন ঘাটতি দেখা গেল না। বিন কাসিম সেনাপতি ও কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেনো মুসলিম সৈন্যদেরকে বিরতি দিয়ে লড়াই

করায় এবং দুই বাহুর সৈন্যরা যাতে ওদেরকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে না দেয়। ওদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ক্লান্ত করে ফেলে এবং তীরন্দাজরা তীরের চেয়ে বর্শার ব্যবহার বেশি করে।

এভাবেও তিন চার দিন যুদ্ধ হলো। এই কৌশলে মুসলমান সৈন্যরা ছিল খুবই পারদর্শী। পারদর্শিতার সাথেই তারা এই চাল প্রয়োগ করল। তাতে শত্রুবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো বটে কিন্তু তাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ল না।

শেষ দিন গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী বিন কাসিমকে জানালেন, দুর্গপ্রাচীরের ওপরে যেসব লোক রয়েছে এদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। সৈন্যরা সবাই দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধে আহত সৈন্যদেরকে ওরা কখনই উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত না। এরা ময়দানেই মরণযন্ত্রণায় ভুগে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। শা'বান ছাকাফী প্রতি দিনই ময়দান থেকে দু'একজন আহত শত্রু সৈন্যকে তুলে এনে ওদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করে তাদের প্রাণভিক্ষা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে ওদের কাছ থেকে ভিতরের তথ্য বের করে নিতেন।

তুলে আনা শত্রুসৈন্যরা প্রাণে বাঁচার আশায় দুর্গের অভ্যন্তরের সব খবর শা'বান ছাকাফীকে জানিয়ে দিতো। আহত হিন্দু সৈন্যরা তাকে জানিয়েছে, দুর্গপ্রাচীরের ওপরে কোন নিয়মিত সৈনিক নেই, সবাই শহরের বেসামরিক নাগরিক। তারাই তীরবর্শা দিয়ে প্রতিরোধ করছে। এটাও জানালো, শহরের সকল নাগরিক মন্দিরে গিয়ে জীবন দিয়ে হলেও শহর রক্ষার শপথ নিয়েছে। সর্বশেষ তুলে আনা আহত সৈন্যরা শা'বান ছাকাফীকে জানালো, দুর্গে সৈন্যসংখ্যা মারাত্মক কমে গেছে এবং খাবারও ফুরিয়ে এসেছে। মুলতান থেকে সাপ্লাই আসতে পারছে না।

এরপর বিন কাসিম দুর্গের চতুর্দিকে বলিষ্ঠ কণ্ঠধারী ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করালেন, শহরের সাধারণ নাগরিকরা যদি সৈন্যদের সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের সবাইকে ক্ষমা করা হবে, অন্যথায় তাদের কঠিন মূল্য দিতে হবে। তাদের আরো বলা হলো, সৈন্যদের অবস্থা দেখো, ওরা বেশি দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই। অতএব, আমাদেরকে মোকাবেলায় সময় নষ্ট না করে স্বাগত জানানোর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।

উচ্চকণ্ঠের অধিকারী স্থানীয় ঘোষক দিয়ে বিন কাসিম দুর্গের চতুর্দিকে বার বার এই ঘোষণা দেয়ালেন। কিন্তু এই ঘোষণার জবাবে দুর্গপ্রাচীরে থেকে অধিবাসীরা মুসলমানদের বিদ্রুপ করতে লাগল। তাদেরকে মন্দিরের পুরোহিতরা বলেছিল, শেষ পর্যন্ত বিজয় হিন্দুদেরই হবে, মুসলিম বাহিনী পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

পুরোহিতদের ভবিষ্যদ্বাণীতে হিন্দু অধিবাসীরা এতোটাই আশ্বস্ত ছিল যে, তারা চোখের সামনে সৈন্যদের শক্তি হ্রাস পাওয়া এবং দুর্গের ভিতরকার খাবার সামগ্রী শেষ হওয়ার ব্যাপারটি আমলেই নিলো না। তারা মুসলমানদের প্রতি নানা বিদ্রুপাত্মক অঙ্গভঙ্গি ও গালিগালাজ করছিল। ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করছিল।

এক পর্যায়ে দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে আওয়াজ এলো, হে মুসলমানেরা! আমরা মন্দিরে দেবদেবীর সামনে শপথ নিয়েছি, হয় তোমাদের ধ্বংস করবো নয় তো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

এ কথা বিন কাসিমও নিজের কানে শুনতে পেলেন। প্রলম্বিত এ যুদ্ধে ইতোমধ্যে মুসলিম বাহিনীর তিন সেনাপতি ও সতেরো জন কমান্ডার নিহত হয়েছিলেন। দুর্গপ্রাচীরের এই দম্ভোক্তি বিন কাসিমের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলো, তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি ও কমান্ডারদের মৃত্যুতে এমনিতেই তিনি ছিলেন ব্যথিত মর্মাহত। এ পর্যায়ে হিন্দুদের দম্ভোক্তি তাঁকে উত্তেজিত করে তুলল। তিনি বলে উঠলেন–আল্লাহর কসম! আমি এই শহর নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

অবশেষে টানা সতেরো দিন যুদ্ধের পর আঠারোতম দিনে যখন দুর্গের ফটক খুলে হিন্দু সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হলো বিন কাসিম ওদের আক্রমণের নির্দেশ দিলেন, তখন হিন্দুযোদ্ধাদের একাংশ দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন, শত্রুসেনাদের মধ্যে আগের মতো আর আবেগ উচ্ছ্বাস নেই। তিনি বুঝে নিলেন, নিশ্চয় ওদের কোথাও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তিনি জোরদার আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

মুসলিম যোদ্ধারা শৃঙ্খলা বজায় রেখেই জোরদার আক্রমণ চালালো। মুসলমানদের আক্রমণে হিন্দুরা ফটকের দিকে পালাতে শুরু করল। বিন কাসিম তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন দুর্গপ্রাচীরের ওপরে তীব্র আক্রমণ অব্যাহত রাখে। দুর্গের সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীর ও মুসলমানদের আক্রমণের মাঝে আটকে গেল। যারাই সুযোগ পাচ্ছিল ফটক গলিয়ে দুর্গের ভিতরে পালিয়ে যাচ্ছিল। ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গে ঢুকে

পড়ছিল। এভাবে একপর্যায়ে কয়েকটি মুসলিম ইউনিট দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ে। মুসলমান সৈন্যদের দুর্গের ভিতরে দেখে যেসব হিন্দু দুর্গপ্রাচীরের ওপরে বসে তীর নিক্ষেপ করছিল এরা পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুর্গের ভিতরেও লড়াই চলল। কিন্তু মুসলমানদের তীব্র আক্রমণে টিকতে না পেরে হিন্দু সৈন্যরা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। এরপর দুর্গের হিন্দু শাসকদের তল্লাশী চালিয়ে জানা গেল, দুর্গশাসক বজরা রাতের অন্ধকারে পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেছে। সকাল বেলায় সেনা কর্মকর্তারা সতেরো দিনের যুদ্ধে অর্ধেকের চেয়ে কম বেঁচে থাকা সৈন্যদেরকে দুর্গের বাইরে যুদ্ধের জন্য নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ করার মতো সাহস শক্তি ও মনোবল ছিল না। বিন কাসিমকে এ যুদ্ধে দু'শ পনেরো জন সৈনিক সতেরো জন কমান্ডারও তিন জন সেনাপতিকে হারাতে হয়েছিল।

বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন, শহরের সকল সামরিক বেসামরিক লোককে গ্রেফতার করা হোক।

তাৎক্ষণিক নির্দেশ পালিত হলো। সেখান থেকে বৃদ্ধ নারী ও শিশুদের আলাদা করা হলো। এরপর বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন, এই শহর ও শহরের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। তাই হলো। শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো।

সিককা শহর ধ্বংসের খবরে হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজের মধ্যে দেখা দিলো আতঙ্ক। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সিককা শহর ধ্বংসের খবর। রাজা দাহির জীবিত থাকাবস্থায় তার আশেপাশের রাজ রাজড়াদেরকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলিয়েছিলেন। তার পরিবার, উজীর, পরামর্শদাতা ও সেনাবাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তারা জানতো, রাজা দাহির আবরদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করছেন। এর ফলে রাজা দাহিরের নিহত হওয়ার পরও তার ছেলেসহ অন্যান্য লোকেরা মনে করেছিল, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাহির হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজ্যে সৈন্য সাহায্যের জন্যে চলে গেছে। কিন্তু বিন কাসিমের কৌশল ও অব্যাহত দুর্গ দখলের ফলে অল্পদিনের মধ্যে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রাজা দাহির আসলে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তার রাজধানীর পতন এবং পার্শ্ববর্তী দুর্গগুলোর একের পর এক পতনে তিনি নীরব থাকতে পারতেন না।

✪ ✪ ✪

পর্ব তেরো

তারা আমাকে ধ্বংস করে দিলো এভাবেই তারা অসংখ্য মর্দে মুজাহিদকে ধ্বংস করেছে যারা ছিল সীমান্ত ও দেশের অতন্দ্র প্রহরী

সিককা শহর ধ্বংসের খবর হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজের মধ্যে দেখা দিলো আতঙ্ক। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সিককা শহর ধ্বংসের খবর। রাজা দাহির জীবিত থাকাবস্থায় তার আশপাশের রাজরাজড়াদেরকে আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তার পরিবার, উজির, পরামর্শদাতা ও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানতো, রাজা দাহির আরবদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করছেন। এর ফলে রাজা দাহির নিহত হওয়ার পরও তার ছেলেসহ অন্যান্য লোকেরা মনে করেছিল, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাহির হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজ্যে সৈন্য সাহায্যের জন্যে চলে গেছেন। কিন্তু বিন কাসিমের কৌশল ও অব্যাহত দুর্গ দখলের ফলে অল্প দিনের মধ্যে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়, রাজা দাহির আসলে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তার রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী দুর্গগুলোর একের পর এক পতনে তিনি নীরব থাকতে পারতেন না।

ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকগণ লিখেছেন, কোন একটি দুর্গ কিংবা অবরোধে রাজা দাহির যদি মুসলমানদের হারিয়ে দিতে পারত তাহলে সেখানে প্রতিবেশী রাজা ও শাসকরা এসে ভীড় করত। সেই বিজয় তখন শুধু রাজা দাহির নয় সকলের ঐক্যতানে মহাবিজয়ে রূপান্তরিত হতো। কিন্তু বিন কাসিমের অভিযানের ক্ষেত্রে তেমন কোন ঘটনাই ঘটল না। তার বাহিনী প্লাবনের বানের মতোই ধেয়ে আসছিল। তাঁর সেনাদের সামনে একের পর এক দুর্গ বালির ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ছিল। রাজা দাহির এসব দেখেও তার রাজধানী ছেড়ে বাইরে বের হয়নি। দাহির ভেবেছিল, বিন কাসিমের সৈন্যরা

দাহিরের রাজধানীতে পৌছার আগেই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বেকার হয়ে যাবে। তখন সে তার উদ্যমী সেনাবাহিনী নিয়ে আরব বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে সহজেই আবরদের কচুঁকাটা করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। কিন্তু তার প্রতিবেশী রাজা-মহারাজারা প্রত্যক্ষ করছিল, রাজাদাহির একের পর এক দুর্গ হাতছাড়া করেও নির্বিকার আত্মশ্লাঘা অনুভব করছিল, নিজেকে মুসলমানদের মুখোমুখি দাঁড় করানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

অবশেষে রাজধানী বাঁচানোর জন্য যখন দাহির বিন কাসিমের মুখোমুখি হয় তখন সাদা হাতিসহ সে নিহত হলো। এ খবর শোনার পর দাহিরের প্রতিবেশী রাজ্যশাসকরা সতর্ক হয়ে ভাবল, সত্যিই যদি দাহির নিহত হয়ে থাকে, তবে মুসলমানদের মুখোমুখি যুদ্ধের আগে অন্তত দশবার চিন্তা করতে হবে। এরপর তারা দেখলো, দাহিরের খ্যাতিমান যোদ্ধাপুত্র ও ভাতিজারাও মুসলিম সৈন্যদের মোকাবেলায় পরাস্ত হয়ে তাদের অগ্রভাগে পালিয়ে আসছিল। তারা এটা প্রত্যক্ষ করল, দাহিরের ছেলে ও ভাতিজারা নিজেদের দুর্গ থেকে চুপিসারে নিজেদের একান্ত ভৃত্যদের নিয়ে পালিয়ে এসে অন্য দুর্গে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় অন্যান্য রাজা ও শাসকরা সিদ্ধান্ত নিলো, এ মুহূর্তে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই না করে তারা স্বাধীন মতো প্রয়োজনে লড়াই করবে, নয়তো মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি কিংবা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেবে।

মুসলমানদের হাতে সিককা নগর নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে উচিত ছিল, হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজার ঐক্যবদ্ধভাবে বিন কাসিমের মোকাবেলায় অগ্রসর হওয়া। কিন্তু তখন কেউই কারো নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখতে পারছিল না। ফলে সবাই চাচ্ছিলো, নিজেদের করণীয় সম্পর্কে তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম ধ্বংসকৃত সিককা নগরের অনতি দূরে দাঁড়িয়ে শহরের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করছিলেন। জানা নেই তাঁর হৃদয়ে তখন কি ভাবনার উদয় ঘটেছিল। একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তার সেনাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রদক্ষিণ করছিল তাঁর সেনাদের ওপর। তিনি দেখছিলেন তাঁর কয়েকজন আহত সেনাকে যাদের দেহে পট্টি বাঁধা। তিনি তখন কিভাবে ছিলেন তা বলা সম্ভব না হলেও তাঁর চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল, তা আর কখনো দেখা যায়নি।

কিছুক্ষণ পর বিন কাসিম একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে নদীর দিকে রওয়ানা হলেন। নদীটির নাম ছিল 'চন্নাব নদী'। এই নদী সিককা ও মুলতান শহরকে বিভক্ত করে রেখেছে। নদীটি না থাকলে সিক্কা ও মুলতান এক শহরেই পরিণত হতো। মুলতান ছিল সম্পূর্ণ দুর্গবন্দি শহর। বিন কাসিমের কাছে এখন সর্বাগ্রে মুলতান শহরের দুর্গপ্রাচীরের অবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খোঁজ-খবর নেয়াটাই জরুরী বিষয় হয়ে দেখা দিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের লেবাস পরিহিত তিন চারজন লোক বিন কাসিমকে নদীর দিকে এগুতে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। আগন্তুকদের একজনকে বিন কাসিম দূর থেকেই চিনি ফেললেন। তিনি ছিলেন তারই গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী। কৌশলগত কারণে গোয়েন্দা প্রধান নিজেও স্থানীয় মানুষের বেশভূশা ধারণ করেছিলেন। বেশ বদলালেও বিন কাসিম তাঁর গোয়েন্দা প্রধানকে ঠিকই চিনে নিতে পারতেন। আগন্তুক সবাই বিন কাসিমের কাছে এসে থেমে গেল। শা'বান ছাকাফী দুই সঙ্গিকে বিন কাসিমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ইবনে কাসিম! এরা দু'জন জেলে। এরা বলছে, সিক্কার শাসক বজরা এদের নৌকা করেই নদীর অপর পারে চলে গেছে।

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বজরা নদী পার হয়ে মুলতান দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। এরা হয়ত আপনাকে এও বলেছে, সিককা থেকে কি পরিমাণ সৈন্য নদী পেরিয়ে মুলতানে আশ্রয় নিয়েছে।'

তা বলেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা তেমন আশঙ্কাজনক নয়। জবাব দিলেন গোয়েন্দা প্রধান। এদের ছাড়া আমি আরো নৌকাওয়ালাদের জিজ্ঞেস করেছি, তখন নদীতে বেশী নৌকা ছিল। এই দুই জেলেকে বজরার লোকেরা পাকড়াও করে তাদেরকে নদী পার করে দিতে বাধ্য করেছিল।

কথাবার্তার পর দুই জেলেকে ছেড়ে দেয়া হলো। বিন কাসিম গোয়েন্দা প্রধানকে চোখের ইশারায় একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মুলতান দুর্গের খবর সংগ্রহের জন্য যাদের পাঠিয়েছিলেন এরা কি ফিরে এসেছে?

সিক্কা বিজয়ের আগের দিনই মুলতানে কয়েকজন স্থানীয় লোককে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রেরিত লোকদের সবাই ছিল মুকুর দলের লোক। এরা স্থানীয় হলেও বিন কাসিমের প্রতি ছিল শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বস্ত। মুকু নিজেও বিন কাসিমের সাথে ছিল। সংখ্যা বেশী না হলেও স্থানীয় হওয়ার কারণে এরা ছিল বিন কাসিমের অভিযানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী।

বিন কাসিম গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে যেদিন মুলতান প্রেরিত গোয়েন্দাদের ফিরে আসার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, এর পূর্ব রাতেই ফিরে এসেছিল গোয়েন্দারা। এরা সিককা থেকে পালিয়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের দলে মিলে গিয়েছিল ওদের মতোই পোশাক পরিচ্ছদে। তারা কৌশলে মুলতান শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সৈন্য সংখ্যা, দুর্গের গঠন ও দুর্বলতার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিল। এ ছাড়াও তারা মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে মুলতানবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতি ছড়িয়ে দেয়। এরা একজন একজন করে দল ছেড়ে বিভিন্ন মানুষের জটলায় গিয়ে সিককায় মুসলমানদের ধ্বংস্যাত্মক ভূমিকা এবং মুসলিম সৈন্যদের বীরত্ব ও শৌর্য বীর্যের কাহিনী এমন ভাষায় বর্ণনা করছে, যা শুনে সাধারণ মুলতানবাসীতো বটেই সৈন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক।

এটা ছিল এক ধরনের প্রচারণা যুদ্ধ। এই কৌশল ছিল খুবই কার্যকর একটা ব্যবস্থা। যেসব সেনা সিককা থেকে পালিয়ে এসেছিল এরাও বলছিল, মুসলিম সৈন্যরা খুবই দুঃসাহসী। তারা নিজেরাও কাপুরুষ ছিল না। কিন্তু তারপরও তাদের পালিয়ে আসা ও পরাজয়কে যুক্তিগ্রাহ্য করতে মুসলিম সৈন্যদের বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের কথা এভাবে বলছিল যে, মুসলমানদের মোকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ওদের সাথে অলৌকিক শক্তি রয়েছে।

মুলতান দুর্গে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল, সিক্কার শাসক বজরা দুর্গ থেকে পালিয়ে মুলতান এসে আশ্রয় নিয়েছে। এ খবরে মুলতানের সেনা বাহিনীর মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বজরা ততোটা ভীত ছিল না। মুলতানের শাসক ছিল রাজা কুরসিয়া। কুরসিয়া ছিল রাজা দাহিরের সম্পর্কে ভাতিজা। দাহিরের এক ভাই চন্দ্রের ছেলে কুরসিয়া। বজরা সেখানে গিয়ে কুরসিয়াকে উজ্জীবিত করছিল।

✪ ✪ ✪

"মহারাজ! এখন আমাদের কাজ হলো, আরব সেনাদের জন্য মুলতানকেই শেষ ঠিকানায় পরিণত করা এবং মুলতান দুর্গ এদের জন্য কবরস্থানে রূপান্তরিত করা।" বলল কুরসিয়ার এক সেনা কর্মকর্তা। মুলতানেও যদি আমরা এদের পথ রুদ্ধ করতে না পারি তাহলে ইসলামের প্লাবনকে কেউ রোধ করতে পারবে না। তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের ঘৃণা ভরে স্মরণ করবে, আর বলবে, আমরা কাপুরুষের মতো গোটা সিন্ধু

এলাকা মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছি। সেই সাথে ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদেরকে এই অপরাধেও অপরাধী সাব্যস্ত করবে, মুসলমানদের জন্য সিন্দু অঞ্চলের দরজা আমরাই খুলে দিয়েছি।

কি বলতে চাচ্ছো তুমি? তুমি কি মনে করছ, আমি লড়াই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি। তুমি কি আমাকে কাপুরুষ ভাবছো? বলল রাজা কুরসিয়া।

না, মহারাজ! আমি আপনার কাছে এসেছি, একথা জানানোর জন্য যে, কাকসা ও সিককা থেকে যেসব সৈন্য ও বাস্তহারা লোক আমাদের দুর্গে এসেছে, এরা মুসলমানদের সম্পর্কে সেনাবাহিনী ও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

সবচেয়ে ভয়ানক কথা এরা যা বলছে, তাহলো, মুসলমানরা দানবের মতো যুদ্ধ করে। কিন্তু যারা যুদ্ধ ও লড়াই না করে তাদের সামনে আত্মসমর্পণ করে, তাদের সাথে তারা সহোদর ভাইয়ের মতোই সদাচরণ করে। তারা কারো ঘর-সম্পদ লুটতরাজ করে না, বরং সাধারণ মানুষকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয়। তাছাড়া একথাও প্রচারিত হচ্ছে, মুসলমানরা কাউকে ধর্মান্তরে বাধ্য করে না। এটার অবশ্যই একটা বিহিত করা দরকার মহারাজ! তাছাড়া লোকজনের মধ্যে একথাও ছড়িয়ে পড়েছে সিককার শাসক মহারাজ বজরাও পালিয়ে এখানে চলে এসেছেন।

এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি পালিয়ে আসিনি। আমি লড়াই থেকেও বিমুখ ছিলাম না। কিন্তু আমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। প্রতারণা করে আমার দুর্গের দরজা খুলে দিয়েছিল কুচক্রীরা। তোমরা শহরের লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করো, আমি তাদের মুখোমুখি হয়ে এসব মিথ্যা প্রচারণার জবাব দেবো। এসব আসলে আমাদের শত্রুদের চালানো অপপ্রচার। বলল বজরা। সে তখন কুরসিয়ার পাশেই বসা ছিল।

সেই দিনই মুলতান দুর্গের সকল সৈন্য ও গণ্যমান্য লোককে এক জায়গায় জড়ো করা হলো। কুরসিয়া ও বজরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সভাস্থলে হাজির হলো। বজরা তার ঘোড়াকে এগিয়ে নিয়ে উপবিষ্ট সৈন্য ও শহরের প্রভাবশালীদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল—প্রিয় দেশমাতৃকার সাহসী সন্তানেরা! শোন! "আমাদের বলা হয়েছে, শহরে এমন সব অপপ্রচার চলছে, যা শুনে সাধারণ মানুষ মুসলমানদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এসব অপপ্রচার আমাদের ভিতরের লোকজনই প্রচার করছে। এরা এদেশের গাদ্দার। এরা সেইসব কাপুরুষদের চর যারা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ

করে গোলামীর জীবন বেঁছে নিয়েছে। এরা গোলামীর বিনিময়ে নগদ টাকা-পয়সা ও মুসলমানদের দেয়া পদ লাভ করেছে। আমার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আমি মুসলমানদের হাতে দুর্গ তুলে দিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কতিপয় গাদ্দার শত্রুদের সুযোগ করে দিতে আমার দুর্গের একটি গেট রাতের অন্ধকারে খুলে দিয়েছিল। অসীম সাহসিকতার জন্যই এমতাবস্থায়ও আমি দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। নয়তো আমি কাপুরুষ হলে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম। এখানে আমি এসেছি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। আগামী দিনে তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে পারবে, আমি কিভাবে তাদের হত্যা করি।

মুসলমানরা দানবের মতো লড়াই করে, এটা বিলকুল মিথ্যা কথা। যারা তাদের সামনে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকে ওরা খুব খাতির যত্ন করে এ কথাও সত্য নয়। এরা কাউকেই ক্ষমা করে না। সকল হিন্দুর ঘর সম্পদ লুটে নেয়, আর হিন্দু যুবতীদের ধরে নিয়ে যায়। তোমরা সিককার অবস্থায়ই দেখো না, জানোয়ারগুলো গোটা শহরটা ধ্বংস করে দিয়েছে। আর সকল যুবতী মেয়েদেরকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। এখানে তোমরাও যদি কাপুরুষের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও তাহলে তোমাদেরকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। লড়াই না করলেও তোমাদেরকে ওরা প্রাণভিক্ষা দেবে না। তোমাদের যুবতী কন্যা জায়াদের সম্ভ্রম বাঁচাবে না। বাকী জীবনটা ওদের গোলামী করে ক্ষুধা-পিপাসায় ধুকে ধুকে মরতে হবে। যারা ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবে তারা হয়তো ক'দিনের সুখ পাবে। কিন্তু ধর্মত্যাগের অপরাধে নিশ্চয়ই তাদেরকে দেবদেবীদের অভিশাপে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

বজরার ভাষণ ছিল আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। মিথ্যার বেসাতী করে বাস্তব সত্যকে আড়াল করে ফেলেছিল সে। বজরার প্রত্যাশা মতো তার ভাষণ শুনে শ্রোতারাও উত্তেজিত হয়ে উঠল। উপস্থিত সৈন্য ও শহরের অভিজাত শ্রেণির লোকেরা বজরার বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে মুসলমান বিরোধী স্লোগানে সভাস্থল মুখরিত করে তুলল। উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগান শুনে শহরের অন্যান্য লোকেরাও এসে জমায়েত হলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।

এরপর কুরসিয়া ও বজরা মিলে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে আরো মজবুত করার কাজে মনোযোগী হলো। এদিকে বিন কাসিমকে আগেই অবহিত করা হয়েছে, মুলতান দুর্গপ্রাচীরের ওপরে বহুসংখ্যক ছোট ছোট মিনজানিক স্থাপন

করা হয়েছে। এগুলো দিয়ে ছোট আকারের পাথর অনবরত নিক্ষেপ করা যায়। অবশ্য গোয়েন্দারা বহু খোঁজ-খবর নিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, মুলতানের সৈন্যদের কাছে অগ্নিবাহী কোন তীর নিক্ষেপণ ব্যবস্থা নেই।

✪✪✪

সিককা শহরকে ধ্বংস করে দেয়ার কারণে সেখানে কোন প্রশাসক ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের চিন্তা ছিল না। ফলে রাতেই নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার পুল তৈরির নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। পুল তৈরির কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিছু সৈনিককে নৌকা দিয়ে নদীর অপর প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়া হলো। যাতে পুল তৈরিতে শত্রুবাহিনী কোন ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।

সকালে সূর্য ওঠার আগেই মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য নদীর ওপারে চলে যেতে সক্ষম হয়। বড় বড় মিনজানিকগুলোকে বড় বড় নৌকায় করে বয়ে আনা হয়েছিল। নদী পেরিয়ে মুলতানের কিছুটা দূরে শিবির স্থাপনের জন্য বিন কাসিম সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন।

মুসলিম বাহিনী নদী পার হওয়ার সাথে সাথেই মুলতান দুর্গে খবর পৌঁছে গেল। মুসলিম বাহিনী এসে গেছে; এ খবরে দুর্গ জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে গেল। রাজা কুরসিয়া ও বজরা এ খবরের সত্যতা যাছাই করার জন্য দুর্গপ্রাচীরে এসে দাঁড়াল। তারা দেখতে পেল, মুসলিম সৈন্যরা মুলতান দুর্গের অনতি দূরে শিবির স্থাপন করছে।

সাথে সাথে রাজা কুরসিয়া বললেন, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি দুর্গের প্রতিটি গেট শক্ত করে বন্ধ করে দাও এবং প্রতিটি ফটকের নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ করে দাও।

এটার দরকার নেই কুরসিয়া! বলল বজরা। আমরা মুসলিমদের দুর্গ অবরোধের সুযোগই দেবো না। আমরা ওদেরকে দুর্গের বাইরেই ধ্বংস করে দেবো। বলল বজরা। আমরা দুর্গের বাইরে গিয়ে ওদের ওপর আক্রমণ চালাবো। শহরে ঘোষণা করে দাও, যেসব অধিবাসী তীর-ধনুক চালাতে পারে তারা সবাই যেন দুর্গপ্রাচীরের ওপরে চলে আসে, আর যারা অশ্বারোহণ ও তরবারী চালাতে পারে তারা সবাই যেন দুর্গের প্রধান ফটকে এসে জড়ো হয়। আর সৈন্যদেরকে বলো, সবাই যাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরেই শহরে ঢোল পেটানো শুরু হলো এবং কয়েকজন ঘোষক উচ্চ আওয়াজে মুসলিম সৈন্যদের আগমন ও রাজা কুরসিয়ার নির্দেশ ঘোষণা করতে লাগল। শহরের যেসব অধিবাসীর কাছে বেশী পরিমাণ ধনসম্পদ ও

স্বর্ণরূপা আছে তারা এগুলোকে লুকানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। শহরের লোকজন এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল আর সৈন্যরা দ্রুততার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

এদিকে মুসলিম সৈন্যরা নদী পার হয়ে শিবির স্থাপনের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। এমন সময় মুলতান দুর্গের একটি ফটক খুলে দুর্গের ভিতর থেকে সশস্ত্র সৈন্য বাইরে আসতে শুরু করল। বাইরে বের হয়ে দুর্গের সৈন্যরা রণপ্রস্তুতি নিয়ে কাতার বন্দি হতে শুরু করল। কিন্তু এদিকে মুসলিম সৈন্যরা তখনো তাঁবু তৈরিতে ব্যস্ত।

মুলতানের যেসব সৈন্য যুদ্ধ করতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো, তাদের কমান্ড ছিল বজরার হাতে। দুর্গ থেকে বের হওয়ার সময় সে উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করল, আজকের এক আক্রমণেই সে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবে। রাজা কুরসিয়াও বজরার হাতে কমান্ডের দায়িত্ব দেয়া সমীচীন মনে করল। কারণ বজরা ইতোমধ্যে মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

কুরসিয়া ও বজরা মনে করেছিল মুসলমানদের ওপর আক্রমণের এটিই মোক্ষম সময়। কারণ তারা জানত সারারাত মুসলিম বাহিনী নদী পারাপারে কাটিয়েছে। আর এখন শিবির স্থাপনে ব্যস্ত। অতএব বিরামহীনভাবে পরিশ্রমে ওরা ক্লান্ত-শ্রান্ত, নির্ঘুম বিশ্রামহীন। অভিজ্ঞতার আলোকে শিবির স্থাপনে ব্যস্ত সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য রণসাজে সজ্জিত একদল সৈন্যকে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রেখেছিল বিন কাসিম। এই সৈন্যরা দুর্গ ও শিবিরের মাঝামাঝি জায়গায় সতর্ক অবস্থায় ছিল।

প্রহরারত সৈন্যদের চেয়ে তিনগুণ বেশী সৈন্যকে বজরা আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিয়ে দিলো। বিন কাসিম যখন দেখলেন বিপুল শত্রু বাহিনী তুফানের মতো এগিয়ে আসছে। তার নিযুক্ত পদাতিক ও মুষ্টিমেয় আশ্বারোহী প্রহরীদের পক্ষে ওদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব। তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন, যেই অবস্থায় আছো, অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু আক্রমণকারীরা ছিল দ্রুতগামী। কর্মব্যস্ত সৈন্যরা তাদের ঘোড়ার জিন লাগানোর আগেই বজরার সৈন্যরা প্রহরীদের কাছে পৌঁছে গেল। শুরু হলো তিনগুণ বেশী সৈন্যের সাথে এক তৃতীয়াংশ জনবলের আরেকটি অসম লড়াই। বজরা ছিল খুব সতর্ক। সে আগেই তার কমান্ডারদের বলে দিয়েছিল, মুসলিম সৈন্যরা যদি পিছনে সরতে থাকে তবে তাদের পশ্চাদধাবন করা থেকে বিরত থাকবে, নইলে ওদের ঘেরাওয়ে পড়তে হবে। কারণ সে

জানতো, শিবির স্থাপনে ব্যস্ত সৈন্যরাও কাল বিলম্ব না করে তাদের সহযোগীদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবে।

বিন কাসিমের অবস্থা ছিল ত্রিশঙ্কু। কারণ তখনো আরব থেকে তার সাহায্য সামগ্রী এসে পৌঁছেনি। তিনি আশঙ্কা করছিলেন দুর্গে বিপুল পরিমাণ সৈন্য রয়েছে। বাইরের সৈন্যরা যদি মুসলমানদের কাবু করতে পারে তাহলে দুর্গের অবশিষ্ট সৈন্যরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধের পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে নিয়ে যেতে পারে।

আক্রমণকারীরা বাস্তবেই প্রহরাধীন ইউনিটের ওপর সংহারী আক্রমণ চালালো। বিন কাসিম নিজেকে সামলে নিয়ে কমান্ডারদের বললেন, তোমরা আক্রমণকারীদের পিছন দিকে যেতে চেষ্টা করো এবং দু'পাশ দিয়ে ওদের দু'পাশে জোরদার আক্রমণ করো।

কমান্ডারগণ বিদ্যুৎ বেগে তাদের সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিল। মুসলিম সৈন্যদেরকে আসতে দেখে বজরা তার সৈন্যদের চিৎকার করে পিছনে চলে আসার নির্দেশ দিতে শুরু করল।

এদিকে বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের বললেন, 'তোমরা ওদের পিছনে চলে যাও, ওদের পিছানোর সুযোগ দেবে না।' বিন কাসিমের প্রতিটি নির্দেশ দ্রুততার সাথে বার্তাবাহকদের মাধ্যমে কমান্ডারদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল। কারণ যুদ্ধরত অবস্থায় পয়গাম পৌঁছানোর কাজে এসব বার্তাবাহক ছিল অস্বাভাবিক পারদর্শী। আরব সৈন্যরা বজরার সৈন্যদের ঘেরাও করার জন্য দুই বাহু প্রলম্বিত করতে শুরু করলে বজরা তার সৈন্যদেরকে দুর্গে ফিরে আসার জন্য চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছিল। নির্দেশ মতো বজরার সৈন্যরা দুর্গফটকের কাছাকাছি পিছিয়ে যেতে লাগল। এদিকে বিন কাসিম তাঁর কমান্ডারদের পয়গাম পাঠালেন, শত্রু সেনাদেরকে তাড়া করে তোমরা দুর্গফটকের কাছে চলে যাও, শত্রু সেনারা যখন দুর্গে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন তোমরা ওদের পিছু ধাওয়া করে দুর্গে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করো।

কিন্তু কুরসিয়া মুসলিম সেনাদের দুর্গে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাই সে একটি সেনাদলকে দুর্গের বাইরে যুদ্ধরত সৈন্যদেরকে দুর্গে প্রবেশে সহযোগিতার জন্য ফটকের কাছে পাঠিয়ে দিলো এবং দুর্গপ্রাচীরের ওপরে অবস্থানরত শত শত তীরন্দাজ ও বর্শাধারী সৈন্যকে নির্দেশ দিলো শত্রু সেনারা আয়ত্ত্বের ভিতরে আসলেই তোমরা তীরবৃষ্টি ও বল্লম নিক্ষেপ করতে শুরু করবে।

অবস্থা তাই হলো। বজরার সৈন্যরা দ্রুত গতিতে দুর্গে প্রবেশ করতে শুরু করে। মুসলমানদের ঘেরাও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে ওরা দেয়নি। তদুপরি কিছু সংখ্যক জানবাজ মুসলিম যোদ্ধা দুর্গফটকে চলে গেল এবং হিন্দু সৈন্যদের তাড়া করে দুর্গে প্রবেশের চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সফল হলো না। সফল হওয়ার মতো কোন অবস্থাও ছিল না। দৃশ্যত এটা ছিল এই জানবাজদের জন্য আত্মহুতির নামান্তর। কারণ হিন্দু সৈন্যরা যখন এক সাথে দুর্গে প্রবেশের জন্য তাড়াহুড়ো করছিল তখন ওদের মধ্যেই জট সৃষ্টি হয়ে যেত। এমতাবস্থায় যে মুসলিম যোদ্ধা সেখানে চলে যেতো সেও জটে আটকে যেত। জট ভেঙ্গে কেউ ভিতরে প্রবেশ করলেও তার নিহত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। যে জানবাজ মুসলিম যোদ্ধা সর্বাগ্রে মুলতান দুর্গে প্রবেশের জন্য প্রাণঘাতি উদ্যোগ নিয়েছিল তার নাম ইতিহাসে আজো স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তার নাম ছিল জায়েদ বিন আমের তাঈ। জায়েদের এই দুঃসাহসী অভিযানে আরো কয়েকজন যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে দু'তিন জন ছাড়া আর কারো পক্ষে জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের পর জায়েদের মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, জায়েদ শত্রু সেনাদের সাথে দুর্গের ভিতরে ঢুকে নিহত হয়েছিল। যার ফলে তার মৃতদেহ হিন্দুরা পুড়িয়ে ফেলে।

বজরা তার সৈন্যদের নিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়ল। সূর্যও তখন পশ্চিমাকাশে শেষ আলো বিকিরণ করে ডুবে গেছে। চতুর্দিকে নেমে এসেছে অন্ধকার। কিন্তু দুর্গের বাইরে তখনও শত শত মুসলিম যোদ্ধা দণ্ডায়মান। এমতাবস্থায় দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে শত্রু সেনারা তীব্র তীরবৃষ্টি ও বল্লম নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তাতে কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধা ও কয়েকটি ঘোড়া মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরিস্থিতি সামলাতে মুসলিম কমান্ডারগণ তাদের সহযোদ্ধাদেরকে দুর্গপ্রাচীরের কাছ থেকে সরে আসার নির্দেশ দেন।

এদিকে যুদ্ধ থামতেই মুসলিম শিবিরের মহিলারা আহতদের সেবার জন্য পানির মশক ও ওষুধপত্র নিয়ে দৌড়ে রণাঙ্গনে চলে এলো। তারা আহতদের পানি পান করাতে লাগল এবং অক্ষমদেরকে রণাঙ্গন থেকে উঠে আসার সহযোগিতা দিচ্ছিল। সেবিকাদের সহযোগিতার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য রণাঙ্গনে অপেক্ষা করল আর বাকীরা শিবিরে ফিরে এলো।

✪✪✪

যুদ্ধ শেষে অসমাপ্ত তাবু ও শিবির স্থাপনের কাজে আবারো মনোযোগী হলো সৈন্যরা। বিন কাসিম তাঁর সেনাপতি ও কমান্ডাদের ডেকে পরামর্শ সভায় বসলেন।

তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আজকের লড়াই থেকে শত্রু বাহিনীর রণকৌশল অনুমান করা যায়। বিগত কয়েকটি দুর্গেও শত্রু বাহিনী এই কৌশলই অবলম্বন করেছে। এখানকার শাসক কুরসিয়াকে হয়তো সিককার শাসক বজরা এই কৌশল বলেছে। সকল সৈন্যদেরকে বলে দিন, এখানেও আমাদেরকে প্রতি দিনই মোকাবেলা করতে হবে এবং শত্রুরা আমাদেরকে অবরোধ পূর্ণ করার অবকাশ দেবে না।'

চৌকস একটি ইউনিটকে দুর্গপ্রাচীরের বাইরে টহলরত অবস্থায় রাখতে হবে। যাতে বাইরে থেকে দুর্গবাসীর কাছে কোন ধরনের সাহায্য পৌঁছতে না পারে। আর দুর্গের কোন লোক বাইরে যেতে না পারে। তিনি আরো বললেন, টহলরত দলের কমান্ডার যদি মনে করে যুদ্ধাবস্থায় তাদেরও সহযোগিতা দরকার, তবে টহলরত ইউনিটের অর্ধেক সৈন্যকে সুযোগ মতো যুদ্ধরতদের সহযোগিতার জন্য পাঠিয়ে দেবে আর বাকিরা টহল বজায় রাখবে।

রণকৌশল সম্পর্কে জরুরি দিক নির্দেশনা দেয়ার পর সেনাপতি ও কমান্ডদের উদ্দেশ্যে বিন কাসিম বললেন, প্রিয় বন্ধুগণ! সকল সৈন্যদের জানিয়ে দিন, আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে গেছি, এই দুর্গ যদি আমরা নিরাপদে সাফল্যের সাথে জয় করতে পারি, তাহলে হিন্দুস্তানের জন্য আমার প্রধান বাধা দূর হয়ে যাবে। বন্ধুগণ, মুলতান হবে হিন্দুস্তানের জন্য ইসলামের আলোর মিনার। বিভ্রান্ত হিন্দুস্তানবাসী এই মিনার দেখে সঠিক পথের দিশা পাবে। কেয়ামত পর্যন্ত হিন্দুস্তানবাসীদের জন্য এ মিনার আলো বিকিরণ করতে থাকবে। সেই সাথে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ এই আলোর মিনার স্থাপনের জন্য আপনাদেরকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বন্ধুগণ, নিজ নিজ ইউনিটের যোদ্ধাদের বলে দিন, মুলতান জয় করতে আমরা জীবন কুরবান করে দেবো। মুলতান জয় না হলে আমরা আর ফিরে যাব না। সহযোদ্ধাদের বলে দিন, আমাদের সামনে জান্নাত হাতছানি দিচ্ছে, আর পেছনে রয়েছে জাহান্নাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব হলো, দেহের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আমরা হিন্দুস্তানের মানুষের জন্য আলোর পথ নির্মাণ করব। এটাই আমাদের লক্ষ্য এটাই আমাদের তকদীর। আমরা সৌভাগ্যবান যে, এমন মহান কর্তব্য পালনের সুযোগ আমরা পেয়েছি। আমরা এই কর্তব্য

পালনে সফল হবো ইনশাআল্লাহ। সকল যোদ্ধাদের বুঝিয়ে দিন, আমরা এখানে রাজ্য বিস্তারের জন্যে খলিফা কিংবা শাসক হাজ্জাজের জন্য লড়াই করছি না, কুফরিস্তানে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষকে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর দুশমনদের সাথে লড়াই করছি।

ঐতিহাসিক মাসুমী লিখেন, এসব কথা বলতে বলতে বিন কাসিম আবেগ আপ্লুত হয়ে উঠলেন। তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। সেই রাতেই সেনাপতি ও কমান্ডারগণ নিজ নিজ ইউনিটের যোদ্ধাদের একত্রিত করে বিন কাসিমের দেয়া নির্দেশনা জানিয়ে দিলেন।

বস্তুত এ সময় যোদ্ধাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অবস্থায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেছিল রাজা দাহির। একাধারে যুদ্ধের পর যুদ্ধ ও বিশ্রাম না করার কারণে প্রত্যেক যোদ্ধার শরীর ক্লান্তি ও অবসন্নতায় কাবু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের মনের শক্তিতে কোন ঘাটতি ছিল না। দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের দেহ ভেঙ্গেচুরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেও তাদের মনের আবেগ, উদ্দীপনা সেই প্রথম দিনের সিন্ধু অভিযানের মতোই উজ্জীবিত ছিল। মুলতান যুদ্ধের সূচনায় বিন কাসিমের এই আবেগপূর্ণ নির্দেশনা তাদের অচল ও অবসাদগ্রাস্ত দেহেও নতুন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করল।

ভোরবেলায় একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে কোন এক যোদ্ধা ফজরের আযান দিল। আজকের আযানে আবারো সেই উদ্দীপনা ও নতুন প্রাণময় দ্যোতনা ছড়িয়ে পড়ল মুসলিম শিবিরে। আযানের দ্যোতনা ইথারে ভাসতে ভাসতে মুলতান দুর্গের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে দুর্গের ভিতরেও ছড়িয়ে পড়ল। ক্লান্ত শ্রান্ত যোদ্ধারা রাতের আড়মোড়া ভেঙ্গে অযু এস্তেঞ্জা সেরে সবাই নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে এসে জড়ো হলো। সেনাপতি বিন কাসিমের নেতৃত্ব ও ইমামতিতে সবাই নামায আদায় করতে কাতারবদ্ধ হলো।

✪ ✪ ✪

ফজরের নামাযের পর দ্রুত পানাহারের পর্ব শেষ করে মুসলিম যোদ্ধারা অবরোধ আরোপের জন্যে প্রস্তুতি নিলো। সেনাপতি ও কমান্ডারগণ যখন নিজ নিজ যোদ্ধাদের নিয়ে দুর্গের দিকে রওয়ানা হলো, তখন শিবিরে অবস্থানরত নারী ও শিশুরা তাদের হাত নেড়ে আল্লাহ সহায় হোন, তোমরা কামিয়াব হও ইত্যাদি বলে দোয়া ও শুভ কামনায় বিদায় জানালো। এমন সময় পূর্বাকাশে সকালের সূর্য আলো বিকিরণ করতে শুরু করেছে।

মুসলিম যোদ্ধারা কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এক পাশের দুর্গফটক খুলে গেল। সাথে সাথে কিছু সংখ্যক সৈন্য দুর্গ থেকে দ্রুতবেগে বের হয়ে এলো। হিন্দু সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়েই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে কাতারবন্দি হয়ে গেল। আজকের এই যোদ্ধাদেরও কমান্ড দিচ্ছিল বজরা। এদিকে দুর্গপ্রাচীরের ওপর ছিল তীরন্দাজ, বল্লম ও বর্শাধারীদের মানব প্রাচীর। দুর্গপ্রচীরের উপরে দাঁড়ানো হিন্দুদের জোশ ও তাদের দুর্নিবার স্লোগান চিৎকার বলে দিচ্ছে, তারা পরাজয় বরণ করতে মোটেও প্রস্তুত নয়। অন্যান্য দুর্গের মতোই এই দুর্গপ্রাচীরে থেকে মুসলমানদের প্রতি নানা বিদ্রুপাত্মক কটাক্ষবান উচ্চারিত হচ্ছিল।

এদিকে মুসলিম যোদ্ধাদের একটি ইউনিট দূর দিয়ে দুর্গের পেছন দিকে গিয়ে অবরোধ আরোপের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। বিন কাসিম আগেই বলে দিয়েছিলেন, যথাসম্ভব আক্রমণাত্মক যুদ্ধ না করে আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করবে। শত্রু বাহিনী যাতে অগ্রসর হয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেই সুযোগ দিতে হবে। বিন কাসিম যথাসম্ভব তার সেনাদের শক্তিক্ষয় রোধ করতে চাচ্ছিলেন, সেই সাথে তিনি এই মোকাবেলাকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিলেন। এ জন্য দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সৈন্যদেরকে অবরোধ আরোপের নির্দেশ করেছিলেন। আর অগ্রগামী দুই কমান্ডারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুযোগ মতো আক্রমণ করতে এবং আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিতে।

এ দিন সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলল। মুসলিম সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই বজায় রাখল, সেই সাথে সুযোগ মতো আক্রমণও করল। অন্যান্য দুর্গের মতো এখানেও দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি যাওয়া ছিল সংকটজনক। ফলে তাদেরকে দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে লড়াই করতে হলো। শত্রু বাহিনী পুরোপুরি দুর্গের সুবিধা পাচ্ছিল। তাদেরকে পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলার কোনই অবকাশ ছিল না।

বেলা ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে বজরার সৈন্যরা একে একে সবাই দুর্গে ফিরে যেতে শুরু করল। বিন কাসিমের কয়েকজন জানবাজ যোদ্ধা তাদের তাড়া করে দুর্গফটক দিয়ে ভিতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুতি নিল কিন্তু বিন কাসিম তাদের নিবৃত করলেন। বিন কাসিম গোটা রণাঙ্গন ঘুরে ঘুরে শত্রুবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর সেনাদের ক্ষয়ক্ষতিও তিনি নিরূপন করলেন। সকল ঐতিহাসিকগণই বলেছেন, দ্বিতীয় দিন শত্রুবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো। তারা বহু লাশ ও আহত সৈন্যকে রণাঙ্গনে ফেলে দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল।

বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতি ও শত্রুবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে খুবই আশ্বস্ত হলেন। রাতের বেলায় সেনাপতি ও কমান্ডারদের ডেকে তিনি বললেন, যুদ্ধ কৌশল এমনটাই থাকবে। নাটকীয় কোন ঘটনা না ঘটলে এর তেমন ব্যত্যয় ঘটবে না। তোমরা শত্রু সেনাদের বোঝাতে চেষ্টা করবে, তোমরা ক্লান্ত, আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সামর্থ তোমাদের নেই। তাহলে শত্রুবাহিনী অগ্রগামী হয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে আর তোমরা তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করবে। আমরা ধীরে ধীরে ওদের জনবল নিঃশেষ করে দিতে চাই।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিমের এই নীতি মুলতান বাহিনীর কোমর ভেঙে দিল। প্রতিদিনই ওরা বিপুল সহযোদ্ধাকে নিহত ও আহত করে দুর্গে ফিরে যাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী দেখে দেখে শত্রু সেনাদের মধ্য থেকে দু'চারজন আহতকে তুলে আনতো। আর নিহতদের মৃতদেহগুলো বড় গর্তে পুঁতে ফেলতো। কারণ নয়তো এগুলো পচে-গলে পরিবেশ দুষণ ঘটাবে। রোগ ব্যাধি ছড়াবে। যা হবে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর।

দীর্ঘ দু'মাস পর্যন্ত চলল একই রীতির লড়াই। দু'মাস পর হিন্দু বাহিনী ঠিক এমন পর্যায়ে চলে গেল বিন কাসিম ওদের যে পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। দু'মাসে তাদের অর্ধেকের চেয়ে বেশি সৈন্য মারা পড়ল। এরপরও হিন্দু সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিম সৈন্য সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ। তাছাড়া শহরের সব অধিবাসীই যুদ্ধে শরীক ছিল। বিন কাসিম মুলতানকে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি হিসাবেই সাব্যস্ত করেছিলেন। শত্রু বাহিনীও বুঝতো, মুলতান দুর্গের পতন ঘটলে মুসলিম বাহিনীকে আর কোথাও ঠেকানো যাবে না। গোটা সিন্ধু অঞ্চল মুসলমানদের দখলে চলে যাবে। হিন্দুস্তানের দূরদরাজ পর্যন্ত মুসলমানদের পদানত হয়ে যাবে। এ জন্য বজরা ও কুরসিয়া মুলতান দুর্গ রক্ষার জন্য বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুতি নিল।

দু'মাসের মাথায় দুর্গের সৈন্যরা বাইরে এসে আক্রমণ করা বন্ধ করে দিল। বিন কাসিম দু'দিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে দুর্গ থেকে একটি প্রাণীও বাইরে এলো না। দু'দিন পর বিন কাসিম দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন। দ্রুত গতিতে বিন কাসিমের সৈন্যরা দুর্গ অবরোধ করে প্রতিটি ফটকের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিল।

বিন কাসিম আগেই খবর পেয়েছিলেন, মুলতান দুর্গের প্রাচীরের ওপরে শত্রু সেনারা বহু ছোট ছোট মিনজানিক স্থাপন করেছে। এগুলো থেকে ছোট ছোট পাথর অবিরাম বর্ষণ করা মোটেও কোন মুশকিলের ব্যাপার নয়।

মুসলিম সৈন্যদের অবরোধ আরোপ করতে দেখে দুর্গপ্রাচীর থেকে বিরামহীন পাথর বর্ষণ শুরু হলো। অবশ্য এসব পাথর বেশী বড় ছিল না বলে তেমন ক্ষয়ক্ষতি করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু পাথরের আঘাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য আরব সৈন্যরা তাদের অবস্থান একটু পিছিয়ে আনল।

শত্রুবাহিনীর পাথর নিক্ষেপের জবাবে বিন কাসিম তার বড় বড় মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করে শহরে হৈ চৈ ফেলে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি বেসামরিক লোকদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ও শহর ধ্বংসের আশঙ্কায় শত্রুদের আক্রমণের জবাব দেয়া থেকে নিবৃত্ত রইলেন। একেবারে নিরূপায় হওয়া ছাড়া তিনি মিনজানিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতেন।

অবরোধ আরোপের পর বিন কাসিম ঘোড়ায় চড়ে দুর্গপ্রাচীরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দুর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের কোথাও কোন দুর্বলতা তাঁর গোচরিভূত হচ্ছিল না। বিন কাসিমের তীরন্দাজ ইউনিট তীব্রগতিতে এগিয়ে দুর্গপ্রাচীরে অবস্থানরত শত্রু সেনাদের ওপর তীর বর্ষণ করে ফিরে আসতো। তাতে শত্রু সেনাদের অনেকেই আহত ও নিহত হতো বটে কিন্তু তাতে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ কোন প্রভাবিত হচ্ছিল না। এ অবস্থা চলল বেশ ক'দিন। হঠাৎ একদিন বিন কাসিমকে খবর দেয়া হলো, সৈন্যদের জন্য সংরক্ষিত আহার্য কাচামাল শেষ হয়ে গেছে। প্রয়োজন মতো খরচ করে বড়জোর আর তিন চার দিন চলবে। সেনাদের জন্য প্রয়োজনীয় আহার সামগ্রী আসবাবপত্র নিরূন, ব্রাহ্মণাবাদ ও উরুঢ়ে রয়ে গেছে। কিন্তু এগুলোর অবস্থান এতটাই দূরে যে, দু'এক দিনে সেখান থেকে আহার সামগ্রী এখানে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। যে গতিতে সেনাবাহিনী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় আসবাব ও আহার সামগ্রী স্থানান্তর সেভাবে অসম্ভব। কারণ সেই যুগে গরুর গাড়ী উট ও গাধার পিঠে করে ভারী মালপত্র পরিবহন করা হতো। নদী পথে নৌকা করে বহন করা হতো ভারী জিনিসপত্র। বস্তুত আহার সামগ্রী মুলতান থেকে দূরে ছিল বটে কিন্তু দীর্ঘ দিন মুলতানে অবস্থানের পরও বিন কাসিম কেন অতিরিক্ত আহার্য এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন না, এ ব্যাপারটি কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেননি। হতে পারে প্রতি দিনের যুদ্ধ ব্যস্ততার কারণে আহার ও রসদ সামগ্রী

আমদানীর ব্যাপারটিকে আমলে নিতে পারেননি বিন কাসিম। এছাড়া হতে পারে তিনি যে কোন সময় দুর্গ জয়ের আশাবাদী ছিলেন। অথবা তাঁর খাদ্য বিষয়ক কর্মকর্তারা সময় মতো তাঁকে খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাপারটি অবহিত করতে পারেনি। সামগ্রিক ব্যাপারটি হতে পারে অব্যাহত দীর্ঘ যুদ্ধের কারণে সবাই এতোটা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা আহার সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তেমনভাবে নজরে আনতে পারেনি।

অবশ্য কাঁচামাল এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। খবর শুনেই বিন কাসিম খাবারের পরিমাণ অর্ধেক করার নির্দেশ দিলেন। ফলে মুসলিম যোদ্ধারা পূর্ণ আহারের জায়গায় অর্ধেক খাবার খেতে শুরু করল। এমতাবস্থায় কয়েকদিন চলার পর ভারবহন করার জন্য মুসলিম শিবিরে যেসব গাধা ছিল কিছু সৈনিক কয়েকটি গাধা জবাই করে খেয়ে ফেলল।

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, দুর্গের বাইরের একটি ছোট খাল দুর্গপ্রাচীরের ভিতর দিয়ে দুর্গ ভেদ করে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। এই নালাটি সতত প্রবাহমান এবং দুর্গবাসীর খাবার পানির প্রধান উৎস। আহত এক হিন্দু সৈনিক মুসলমানদের হাতে বন্দি ছিল। এই বন্দির ক্ষত তখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। মুসলমান সৈন্য শিবিরে যখন খাবার সংকট দেখা দিল তখন অফিসার সিপাহী সবার জন্যেই খাবার বরাদ্দ হ্রাস করে দেয়া হলো। এমতাবস্থায় কয়েদীদেরকেও অর্ধেক খাবার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। বন্দিরা ভাবতে শুরু করল বন্দি হওয়ার কারণে তাদেরকে অর্ধেক খাবার দেয়া হচ্ছে। খাবার স্বল্পতায় কাতর হয়ে এই বন্দি এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যদের কাছে আবেদন নিবেদন করতে শুরু করল। মারাত্মক জখম এমনিতেই তাকে দুর্বল করে ফেলেছে। এর ওপর অর্ধেক খাবারের পরিবর্তে তাকে যেন পুরোপুরি খাবার দেয়া হয়। সৈন্যরা তাকে জানালো বিষয়টি এমন নয়, শিবিরে খাবার সংকট দেখা দিয়েছে, এ জন্য খাবার অর্ধেক করে দেয়া হচ্ছে।

এই আহত সৈনিক জখম ও খাবার স্বল্পতার যাতনায় মুসলিম সৈন্যদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে দিল।

'হায়, তোমরা খাবার স্বল্পতায় ভুগছো? আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। অমুক জায়গা দিয়ে দুর্গের ভিতরের একটি ছোট খাল প্রবাহিত হচ্ছে। শহরের সকল মানুষ এই খালের পানিই পান করে এবং এই পানি দিয়েই তারা পশুগুলোকে গোসল করায় পানি পান করায়। এই প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ থাকার কারণে দুর্গের ভিতরে কূয়া তেমন বেশী নেই। তোমরা যদি

এই পানি প্রবাহ বন্ধ করে দাও, তাহলে শহরের মানুষ পানির অভাব ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দুর্গের ফটক খুলে দেবে।

হায়, আমি তোমাদের একথা বলে বিরাট পাপ করে ফেলেছি। আমাদের সবাইকে মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে শপথ করানো হয়েছিল। আমরা যাতে শত্রুদের হাতে বন্দি হলেও দুর্গ ও সৈন্যদের ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ না করি। বিশেষ করে এই খালের কথা কোন অবস্থাতেই যাতে প্রকাশ না করা হয়। এ জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছিল। দেখো, আমি কতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের দিয়েছি, তা কয়েক দিনের মধ্যেই তোমরা বুঝতে পারবে। দয়া করে আমাকে তোমরা পেট ভরে খেতে দাও, আর আমার জখমের সঠিক চিকিৎসা দাও। জখমের যন্ত্রণা ও ক্ষুধার জ্বালায় আমি কি সর্বনাশই না করে ফেলেছি।

খালটি কোন জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, জায়গাটিও আহত হিন্দু বলে দিল। এই খালটি এই হিন্দুর বলার আগেই মুসলমানরা দেখেছে। কিন্তু এটিকে বেশী গুরুত্ব দেয়নি। কারণ খালটি একেতো খুব ছোট, তাছাড়া লতাপাতা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ঢাকা ছিল। এটি কোথা থেকে কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা বোঝার উপায় ছিল না।

আহত হিন্দু সৈনিক বলার পর তখনি বাঁধ দিয়ে খালের পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হলো।

✪ ✪ ✪

এর তিন-চার দিন পর যুদ্ধে আবার উত্তাপ দেখা দিল। কিছু দিন এমন ছিল যে, মুসলমান তীরন্দাজরা দুর্গপ্রাচীরের কাছে গিয়ে তীর চালালে দুর্গপ্রাচীরের হিন্দুরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে প্রতিরোধ করতো। কিন্তু এবার দুর্গপ্রাচীরের হিন্দুরাও আক্রমণের মাধ্যমে মুসলমানদের ঘায়েল করতে সচেষ্ট হলো। মুসলমানরা ছিল ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষিপ্ত। তারা চাচ্ছিল দ্রুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে প্রাণভরে পেটপুরে আহার করতে। অপরদিকে মুলতানের দুর্গবাসী পানির অভাবে পিপাসায় কাতর হয়ে উঠেছিল। তারাও চাচ্ছিল মুসলমানদের পরাজিত করে পানির প্রবাহ খুলে দিতে। এভাবে আরো দু'তিন দিন যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন বিপুল সংখ্যক সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালালো। মুসলিম সৈন্যরা দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে তাদেরকে ঘেরাও-এর মধ্যে

নিয়ে আসার চেষ্টা করল বটে কিন্তু সফল হলো না। শেষ পর্যন্ত হিন্দু সৈন্যরা বহু মৃতদেহ আর আহত সৈন্যকে রণাঙ্গনে ফেলে রেখেই দুর্গে ফিরে গেল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, খুব সাধারণ জখমে আহত হয়েও হিন্দু যোদ্ধারা রণাঙ্গন থেকে উঠে দুর্গে ফিরে যেতে আগ্রহবোধ করার চেয়ে মুসলমানদের হাতে নিজেদের সপে দিতে কুণ্ঠাবোধ করল না। মুসলমানরা ওদের বন্দি করার পর সর্বাগ্রে এরা তাদের কাছে যে জিনিসটির জন্য অনুরোধ জানাল তা হলো পানি। তাতে মুসলমানরা নিশ্চিত হলো, দুর্গভ্যন্তরে পানির স্বল্পতা মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। পানির তীব্র অভাব হিন্দুদের ঘোড়াগুলোর মধ্যেও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ওদের ঘোড়াগুলো দুর্গ থেকে বের হয়ে নেতিয়ে পড়ছিল নয়তো বেকাবু হয়ে উম্মুক্ত মাঠে ছুটে পালাতে চেষ্টা করত।

এভাবে আরো দু'তিন দিন চলল। দুর্গের সৈন্যরা বের হয়ে তীব্র আক্রমণ করতো আর আহত যোদ্ধাদের ফেলে রেখে চলে যেতো। আহতরা সর্বাগ্রে মুসলমানদের কাছে পানির জন্য অনুরোধ করত। আহতরা জানাচ্ছিল, দুর্গের ভিতরে পানির মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। পানির প্রবাহ বন্ধ। ভিতরে পর্যাপ্ত কূয়া নেই। যাও আছে তা দিয়ে প্রয়োজনের কিছুই হয় না। নতুন কুয়া খননের কাজ চলছে। কিন্তু তাতেও পানির দেখা মেলে খুব কম।

এদিকে বিন কাসিমের জন্য খাদ্য ঘাটতি বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তিনি দ্রুত সংবাদ বাহক পাঠালেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণাবাদ ও বেড়া থেকে চটজলদি আহার সামগ্রী মুলতান পৌঁছানোর ব্যাপারটি সহজসাধ্য ছিল না। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, ক্ষুধার তাড়নায় মুসলমান সৈন্যরা আগে অস্ত্র সমর্পণ করে না পিপাসায় কাতর হয়ে দুর্গবাসী ফটক খুলে দেয় এটি ছিল দেখার বিষয়। আপাতত দৃষ্টিতে সমাধানের পথ ছিল একটা সমঝোতার ভিত্তিতে দুর্গবাসী মুসলমানদের জন্য ফটক খুলে দিবে আর মুসলমানরা দুর্গবাসীর জন্যে পানির সরবরাহ খালের বাঁধ খুলে দেবে।

পরদিন প্রত্যুষেই দুর্গের সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলিম সৈন্যদের ওপর আঘাত হানল। বিন কাসিম ইতোমধ্যে জেনে নিয়েছিলেন দুর্গের সৈন্যরা পানির পিপাসায় কাতর। তিনি কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন, এখন উভয় বাহু থেকে ওদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক হামলা করবে। অর্ধাহারে এমনকি প্রায় অনাহারে মুসলিম যোদ্ধাদের অবস্থা ছিল শোচনীয় তবুও শেষ রক্ষা হিসাবে তারা প্রচণ্ড হামলা চালালো। মুসলমানরা আহার সংকটে ভুগছিল বটে। কিন্তু তাদের পানির কোন সংকট ছিল না। তাদের ঘোড়াগুলোও ছিল

তাজা ফুরফুরে। খোলা ময়দানে এগুলো ইচ্ছামতো চরে বেড়াতো এবং পর্যাপ্ত ঘাসপানি আহার করে তাজা-তাগড়া হয়ে উঠেছিল।

✪ ✪ ✪

এদিনের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক কমান্ডার আহত অবস্থায় মুসলমানদের হাতে বন্দি হলো। ওদের সৈন্যরা দিন শেষে দুর্গে ফিরে গেলেও বেশী আহত হওয়ায় ওর পক্ষে দ্রুত ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ওর পোশাক দেখে মুসলিম যোদ্ধারা ওকে কয়েদ করে নিয়ে এলো। এই বন্দি মুসলমানদের কাছে ছিল মূল্যবান হাতিয়ার। তাই তাঁবুতে নিয়ে এসে ওর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে ওষুধ দেয়া হলো। এরপর গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী ওর কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলেন। তিনি বন্দির কাছে জানতে চাইলেন, তোমাদের দুর্গের অবস্থা কি? তোমরা আর কত দিন প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারবে? দুর্গে আর কি পরিমাণ সৈন্য আছে? তোমাদের সামরিক আয়োজন কি পরিমাণ এখনো অবশিষ্ট আছে?

"হে আরব বন্ধু! আমি কোন সাধারণ সিপাহি হলে তোমাকে হয়তো অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে দিতাম। আমি মুলতানের সেনা বাহিনীর একজন কমান্ডার। তাছাড়া বংশে আমি একজন ব্রাহ্মণ। তুমি হয়তো জানো না, হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সবচেয়ে সম্মানিত জনগোষ্ঠী। ব্রাহ্মণ ছাড়া হিন্দুদের কেউ মন্দিরের পুরোহিত হতে পারে না। রাষ্ট্র ও ধর্মের কর্ণধার হওয়ার অধিকার ব্রাহ্মণদের জন্যেই সংরক্ষিত। এমতাবস্থায় তুমি এই আশা করতে পারো না যে, আমি জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্মের সাথে গাদ্দারী করে তোমাকে আমাদের দুর্বলতা ও আমাদের গোপন তথ্য বলে দেবো।

তুমি না বললেও তোমাদের অন্য কেউ ঠিকই বলবে, বললেন শা'বান ছাকাফী। তবে এরপর আর তুমি আমাদের কাছে কোন ধরনের সহমর্মিতা ও সৎ ব্যবহারের আশা করতে পারো না। কারণ আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। তোমাদের কারণে ইতোমধ্যে আমাদের বহু সহযোদ্ধা নিহত হয়েছে।

এই দেশ, এই দুর্গ আর ধর্মের জন্য আমি জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত, বলল বন্দি হিন্দু কমান্ডার। তোমরা আমাকে যা ইচ্ছা সেই শাস্তি দিতে পারো। সব শাস্তিই আমি মাথা পেতে মেনে নেবো এবং খুশী মনে জীবন ত্যাগ করব। তুমি কিন্তু আমার কথা শেষ করার সুযোগ দাওনি। আমরা

এমনিতেই খুব কষ্টে ছিলাম, এখন আরেক কষ্টের শিকার হলাম। আমাকে কিছু সময় একান্তে চিন্তা করার অবকাশ দাও।

ঠিক আছে, কি তোমার অসমাপ্ত কথা, আমাকে বলো, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে চিন্তা করার সুযোগ দেবো। বললেন, গোয়েন্দা প্রধান।

দুর্গে প্রচণ্ড পানি সংকট চলছে। পিপাসায় এখনো মৃত্যুর সংখ্যা বেশী না হলেও এই অবস্থা আর দুই তিন দিন অব্যাহত থাকলে মানুষ পানির অভাবে মরতে শুরু করবে বলল, হিন্দু কমান্ডার। পানি প্রবাহ তোমরা বন্ধ করে দিয়েছো। এটিই ছিল দুর্গবাসীর পানির একমাত্র উৎস। দুর্গের ভিতরে মাত্র কয়েকটি কূয়া সচল আছে, এগুলোর পানি সৈন্য ও যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা হওয়ার কারণে আমি তেমন পিপাসিত নই বটে কিন্তু পিপাসার যাতনায় যখন আমি দুইটি অবোধ শিশুকে মরতে দেখেছি, তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন ওদের হত্যা করেছি।

আমি তো জানতে পেরেছি, দুর্গের পানি সংকট দূর করতে কূপ খননের কাজ চলছে? বললেন শা'বান ছাকাফী।

সেই চেষ্টা অবশ্য চলছে। কিন্তু এখানকার মাটির অবস্থাই এমন যে, এখানে কূপ খনন করে পানি বের করা সহজ নয়। ব্যাপক চাহিদা মতো কূপ খনন করে পানি সরবরাহ করতে করতে বহু মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। আমি যে কোন মূল্যে এসব নিরীহ লোকদের প্রাণ বাঁচাতে চাই। আমি সেনা কর্মকর্তা হয়ে পানি পান করছি, আর দুর্গের শিশুরা পানির অভাবে মৃত্যু বরণ করছে, মায়েরা পানি পান করতে না পারায় তাদের কোলের শিশুকে বুকের দুধ পর্যন্ত খাওয়াতে পারছে না। এজন্য নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

"এমনই যদি অবস্থা হবে তারপরও তোমাদের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করছে না কেন? জানতে চাইলেন শা'বান ছাকাফী। সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করবে না। আমি একথা তোমাকে হলফ করেই বলতে পারি। তবে তোমাকে বলছি, গত রাতে কুরসিয়া এই দুর্গ থেকে চলে গেছে। সে যাওয়ার সময় তার আত্মীয় পরিবার সবাইকে নিয়ে গেছে।

কোন পথে গেছে কুরসিয়া? জানতে চাইলেন ছাকাফী।

সে হয়তো আগে থেকেই এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে। যে দিকে তোমাদের লোক কমছিল অথবা ফাঁকা ছিল

সেই জায়গা দিয়েই বেরিয়ে গেছে কুরসিয়া। তুমি জান কি-না জানি না। সেই কিন্তু দুর্গের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব কাঁদে নিয়েছিল। বন্দি কমান্ডার বলল।

বজরা কোথায়? সে তো এখনো দুর্গেই আছে? জানতে চাইলেন গোয়েন্দা প্রধান। 'বজরা' এখনো সৈন্যদেরকে তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। বলল বন্দি কমান্ডার। কিন্তু তোমরা তাকে ধরতে পারবে না। তোমরা দুর্গে প্রবেশ করলে সে ঠিকই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবে...। তোমরা আমার একটা কথা শোনো...। আমি জানি তোমরা দুর্গবাসীদের পানি প্রবাহ খুলে দেবে না। তা ঠিক! কিন্তু তুমি যদি ফিরে গিয়ে দুর্গের ফটক খুলে দিতে পার তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আমরা পানি প্রবাহ ছেড়ে দেবো।

আমি গিয়েও দুর্গফটক খুলে দিতে পারব না। বলল বন্দি কমান্ডার। তবে আমি তোমাদের দুর্গে প্রবেশের একটা পথ বলে দিতে পারি। আর এটা আমি করছি, আমার দুর্গ ও জাতি ধর্মের শিশুরা যাতে পানির অভাবে মৃত্যুবরণ না করে এজন্য। তোমরা পানি প্রবাহ ছেড়ে দিয়ে দুর্গে প্রবেশের রাস্তা করতে পারো। এজন্য তোমাদেরকে আগে পানি প্রবাহ খুলে দিতে হবে।

সত্যিই সেটি ছিল একটি নাটকীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা। বন্দি হিন্দু কমান্ডার দুর্গের নারী-শিশুদেরকে পিপাসার তাড়নায় মরতে দেখে আবেগ প্রবণ হয়ে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান সকাফীকে দুর্গপ্রাচীরের এমন একটি জায়গার কথা বলে দিল, যে জায়গাটি ছিল সবেচেয়ে দুর্বল। এই জায়গার দুর্গপ্রাচীরে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। জায়গাটি ছিল দুর্গের ভিতরে প্রবেশকারী নালার দিকে।

বিন কাসিমকে এ তথ্য জানানোর পর তিনি বড় মিনজানিকগুলো সেদিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সব বড় বড় মিনজানিক থেকে এক সাথে পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ভগ্ন দেয়ালে বিরাট ভাঙন দেখা দিল এবং ওপরের দিকে দেয়াল ভেঙ্গে গেল। কিন্তু এই ভাঙন দেয়ালের এতোটা ওপরে ছিল যে এত ওপর দিয়ে ঘোড়া দুর্গে প্রবেশ করতে পারত না। এবার নীচের দিকে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেয়ালের নীচের দিকেও ভাঙন শুরু করল এবং ওপরের দিকের ভাঙন আরো নীচের দিকে প্রলম্বিত হতে লাগল। তখন বিন কাসিম সৈন্যদের একটি অংশকে নির্দেশ দিলেন তোমরা পানি প্রবাহ ছেড়ে দাও।

দুর্গের পানি প্রবাহ ছেড়ে দেয়ার পর মানুষ যখন দেখলো নালা দিয়ে পানি দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে, তখন পিপাসার্ত সকল মানুষ পানি সংগ্রহের জন্য

ঝাপিয়ে পড়ল। যেসব সৈন্য দুর্গপ্রাচীরের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল পিপাসায় এরাও ছিল কাতর। পানি আসার খবর শুনে তারাও দুর্গপ্রাচীর ছেড়ে পানি সংগ্রহে লিপ্ত হলো। মোট কথা পানি আসার খবরে গোটা দুর্গ জুড়ে চরম হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল।

তখনো অনেকটা উঁচু রয়ে গিয়েছিল দেয়াল। মিনজানিকের আঘাতে তখনো দেয়ালকে সম্পূর্ণ ভেঙে মাটির সমান করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দুর্ধর্ষ ও অশ্বচালনায় পটু আরব অশ্বারোহী যোদ্ধারা ভগ্ন উঁচু দেয়ালের ওপর দিয়েই ঘোড়া ছুটাল। প্রশিক্ষিত ঘোড়াগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে দেয়াল টপকে দুর্গে প্রবেশ করতে শুরু করল। দুর্গের সশস্ত্র সৈন্যরা মুসলিম যোদ্ধাদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো। অবশ্য এর আগেই বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন দুর্গের কোন নারী-শিশু ও বেসামরিক লোককে আঘাত করবে না। কিন্তু কোন সামরিক সৈন্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন করবে না।

দুর্গের সৈন্যরা প্রতিরোধ চেষ্টা করলো বটে কিন্তু ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ মুসলিম যোদ্ধাদের মোকাবেলায় পিপাসায় কাতর হিন্দু সৈন্যরা দাঁড়াতেই পারল না। ইতিহাসগ্রন্থ চাচনামায় লেখা হয়েছে, সেদিন মুলতান দুর্গের অন্তত ছয় হাজার হিন্দু সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

প্রধান ফটক খুলে দিলে বিজয়ী বেশে বিন কাসিম দুর্গে প্রবেশ করেই ঘোষণা দিলেন, শহরে একথা প্রচার করে দাও, কোন সাধারণ বাসিন্দা যেন দুর্গ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা না করে এবং কেউ যেন কোন হিন্দু সৈন্যকে আশ্রয় না দেয় এবং সকল অধিবাসী যেন নিজ নিজ বাড়ীর গেট খোলা রাখে। সেই সাথে রাজপরিবারের কোন লোককে যেন শহরের কোন অধিবাসী নিজ বাড়ীতে আশ্রয় না দেয়। মুসলিম সৈন্যদের কেউ কারো বাড়িতে প্রবেশ করবে না। সবার সহায়-সম্পদ, মান সম্ভ্রমের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

স্থানীয় লোকদের দৌড়ঝাপ তবুও বন্ধ ছিল না। এর মধ্য দিয়েই মুসলিম শিবিরের সৈন্য ও অন্যান্যরা দুর্গে প্রবেশ করছিল। যে ফটক দিয়ে মুসলমানরা প্রবেশ করছিল ভয়ে আতঙ্কে দুর্গ ছেড়ে পালানোর জন্য অন্য ফটকের দিকে দৌড়াচ্ছিল হিন্দু অধিবাসীরা। অবস্থা দেখে মুসলমান সৈন্যরা দুর্গ ফটকগুলো বন্ধ করে দিল। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কিছু হিন্দু অধিবাসী শহর থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওদের মধ্যে বাজরা ও তার খান্দানের লোকজনও ছিল।

পিপাসায় কাতর মানুষ পানির জন্য যেসব আধারে পানি এনে জমা করা হচ্ছিল সেগুলোতে ঝাপিয়ে পড়ল। ঘর-সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারটির

চেয়েও তখন তাদের কাছে জীবন বাঁচানোটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্বেগ ছিল বিজয়ী বাহিনী তাদের ধন-সম্পদ লুট করবে এবং তাদের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু পানি সংগ্রহ করে ঘরে ফেরা মানুষ চরম বিস্ময়ে লক্ষ করল, দরজা খোলা থাকার পরও কোন মুসলিম সৈন্য তাদের কারো ঘরে প্রবেশ করেনি এবং কোন যুবতী তরুণীর প্রতি চোখ তুলেও তাকায়নি কোন বিজয়ী সৈনিক।

বিন কাসিমের বাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর বিন কাসিম শহরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের তলব করলেন এবং শহরের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য লোকদেরকে তাঁর কাছে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।

কিছুক্ষণ পর শহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিন কাসিম সকাশে এসে হাজির হলো। তিনি তাদেরকে সসম্মানে বসার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমাদের শহরে যে পরিবর্তন এসেছে তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। আমরা বিজয়ী বটে। কিন্তু আমরা তোমাদেরকে পরাজিত প্রজা মনে করি না। আমি নিজেকে তোমাদের বাদশা মনে করি না এবং তোমাদেরকে আমার প্রজা মনে করি না।

আমরা আপনার অনুগত প্রজা সম্মানিত সেনাপতি! দু'হাত প্রসারিত করে মাথা ঝুকিয়ে বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বলল এক অভিজাত ব্যবসায়ী। সে আরো বলল, আমরা সবসময়ই প্রজা হিসাবেই থেকেছি। আপনার একজন অনুগত প্রজা হিসাবে থাকব। আমরা আপনার আগমনকে একজন রাজার বিদায়ে আরেকজন রাজার আগমন হিসাবে দেখছি।

আমরা তোমাদেরকে একথাই বলতে এসেছি যা তোমাদের কেউ জানো না। বললেন বিন কাসিম। আমি তোমাদের যে কথা বলতে চাচ্ছি সেটি আমার ব্যক্তিগত কথা নয়, আমাদের ধর্মের নির্দেশ। আমাদের ধর্মে কেউ রাজা আর কেউ প্রজা হতে পারে না। আমাদের ধর্মের দৃষ্টিতে রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। আমরা আল্লাহর নির্দেশ মতো তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রতিনিধিত্ব করছি মাত্র। তোমরা নিজেদেরকে কখনো পরাধীন মনে করো না। তোমরা স্বাধীন মতো নিজেদের ধর্মকর্ম করতে পারবে। তোমরা তোমাদের মন্দিরের দরজা নিঃসংকোচে খুলে রাখতে পারবে, কোন মুসলমানকে তোমাদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না।

আপনি কি আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করবেন না? বিনীত কণ্ঠে জানতে চাইলো একজন অভিজাত হিন্দু।

না, আমরা কিছুতেই তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করব না, বললেন বিন কাসিম। আমাদের ধর্মই এমন সুন্দর তোমরা যখন নিজের চোখে আমাদের ধর্মের কার্যক্রম দেখবে, তখন তোমরাই এই ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। তোমরা শহরের সকল অধিবাসীদের জানিয়ে দাও, তারা যেন মন থেকে সব ধরনের ভয় আতঙ্ক দূর করে স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে জীবনযাপন করতে থাকে। তবে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দিও, আমাদের এই অবারিত সুযোগের অপব্যবহার করে কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের গাদ্দারি করে, কোন নাশকতা কিংবা দুষ্কৃতির চেষ্টা করে তবে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন আমি তোমাদের একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, আমরা এখন শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে একটা কর আদায় করবো। এ করকে আমরা জিযিয়া বলে থাকি। এটা এতো স্বল্প পরিমাণ হবে যে, শহরের যে কোন গরীব লোকের পক্ষেও তা আদায় করা কঠিন হবে না। জিযিয়া প্রাপ্তির পর শহরের সকল অধিবাসীর সার্বিক নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়বে এবং মানুষ হিসাবে আমাদের ধর্মের স্বীকৃত সব অধিকার তোমাদের দিতে আমরা বাধ্য থাকব।

ঠিক আছে, আপনি জিযিয়া ধার্য করে দিন, আমরা যথাশীঘ্র আপনার জিযিয়া আদায় করে দেবো। বলল শীর্ষস্থানীয় এক হিন্দু ব্যবসায়ী।

এই কর আমি নিজে আদায় করব না, আমি এ কাজের জন্য যাকে যাকে নিয়োগ দেবো, সে তা আদায় করবে। কিন্তু এই শহরের যারা বিত্তশালী এবং যারা বড় ব্যবসায়ী আমি তাদের কাছ থেকে কিছু অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে চাই। এই অতিরিক্ত পয়সা এ জন্য নিচ্ছি, এই দুর্গ জয় করতে আমাদেরকে খুব বেশী মূল্য দিতে হয়েছে এবং আমার শিবিরে আহতের সংখ্যা অনেক বেশী। এটাকে তোমরা জরিমানা বলো আর যুদ্ধ ব্যয় বলো, যাই বলো না কেন, পয়সাটা আমাকে দিতেই হবে। তবে এর পরিমাণ আমি নির্ধারণ করে দেবো না। তোমাদের বিত্তশালীরাই ঠিক করবে কি পরিমাণ দিতে পারবে তোমরা।

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে মুলতান দুর্গের সকল হিন্দু অধিবাসী জিযিয়া আদায় করে দিল এবং শহরের বিত্তশালীরা জিযিয়ার অতিরিক্ত টাকাও দিল। তাদের দেয়া অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ষাট হাজার দিরহাম। বিন কাসিম এই ষাট হাজার দিরহাম তাঁর

সকল সেনাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। ৯৫ হিজরী সনে মুলতান বিন কাসিমের শাসনাধীনে নত হলো।

✪✪✪

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বিন কাসিমের শাসনে মুলতানের অধিবাসীরা যেমন নিরাপত্তা, শান্তি ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছে, এর আগে মুলতানবাসী কখনো তা প্রত্যক্ষ করেনি। বিন কাসিমের প্রশাসনের পূর্ণ নিরাপত্তা ও প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ডে নিশ্চিন্ত হয়ে মুলতানের ব্যবসায়ী, কৃষক ও নানা পেশার লোকজন নিজ নিজ কাজ-কর্মে মনোনিবেশ করে। মুলতানের শাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিন কাসিম আরো সামনে অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার প্রতি মনোযোগ দিলেন। ইত্যবসরে তিনি রাজা কাকসা ও সিককার কাছ থেকে আদায়কৃত জিযিয়া এবং অন্যান্য জায়গার আদায়কৃত জিযিয়া একত্রিত করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

খলিফাকে দেয়া হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতিশ্রুতি বিন কাসিমকে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের কাছ থেকে এই শর্তে সিন্ধু অভিযানের অনুমতি নিয়েছিলেন, সিন্ধু অভিযানে খেলাফতের কোষাগার থেকে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে অভিযান শেষে তিনি এর দ্বিগুণ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেবেন। মুলতান অভিযানের পর কিছু দিন অবকাশ যাপনকালে বিন কাসিম হিসাব করছিলেন, এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কোষাগারে তিনি কী পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেছেন। তাঁর হিসাবমতে বাগদাদে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ তেমন ছিল না। তার ধারণা এ পর্যন্ত সিন্ধু অভিযানে বাগদাদের কোষাগার থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এর চেয়ে অনেক কম তিনি প্রেরণ করেছেন। এর অন্যতম কারণ হলো, শাসক হিসাবে বিন কাসিম ছিলেন উদারচিত্তের অধিকারী। তিনি যথাসম্ভব কম জিযিয়া ধার্য করতেন, যাতে তা আদায়ে মানুষের কষ্ট না হয়। তাছাড়া তিনি যদি জানতে পারতেন, যে কর তিনি ধার্য করেছেন তাও প্রজাদের দিতে কষ্ট হচ্ছে। কিংবা কোন কোন জনগোষ্ঠী তা দিতে সক্ষম নয়। তখন তিনি গোটা জিযিয়া মাফ করে দিতেন এবং তার ব্যাপারে আরেকটি কথাও বেশ প্রসিদ্ধ ছিল, তিনি পারত পক্ষে কারো ওপর জরিমানা ধার্য করতেন না।

যেসব দুর্গ তিনি জয় করেছেন, সেগুলোতে প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে তিনি যেসব দুর্গ জয় করেছেন, সেগুলোর শাসকদের

খাজানা ভাণ্ডার তিনি শূন্যই পেয়েছেন, কারণ প্রায় প্রত্যেক দুর্গের শাসকরাই নিজেদের সব ধনরত্ন নিয়ে পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী মুহূর্তে পালিয়ে গেছে।

আমরা আগেই জেনেছি, দাহিরে রাজধানী দখলের অনেক আগেই দাহিরের ছেলে ও তার ভাতিজা দাহিরের গচ্ছিত ধন-রত্ন নিয়ে পালিয়ে যায়। ওদের পালিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণই ছিল তাদের ধন-রত্ন যাতে মুসলমানরা কব্জা করতে না পারে। সর্বশেষ বিজিত দুর্গ মুলতানেও তাই ঘটলো। পরাজয় ঘনিয়ে আসতে দেখে বজরা ও তার রাজা কুরসিয়া পালানোর সময় ধনভাণ্ডার নিজেদের সাথে নিয়ে যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ লিখিতভাবে খলিফাকে অঙ্গীকার করেছিলেন। অঙ্গীকারের বিষয়টি বিন কাসিম জানতেন। তাই সিন্ধু এলাকার অধিকাংশ বিজয় হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিশ্রুত অর্থ অপূর্ণ থাকার বিষয়টি তাঁকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল।

বিন কাসিম ছিলেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী সেনাপতি। এই জিহাদে তাঁর কোন ব্যক্তিগত উচ্চাশা উচ্চাভিলাষ ছিল না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বিন কাসিম তাঁর জীবন ও যৌবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক বাসনা ও নিষ্ঠার কারণে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনেই তাকে প্রত্যাশিত সাহায্যে সফলকাম করেছেন। এই মুলতান দুর্গ জয়ের আগে যদি বাইরের পানির প্রবাহের ব্যাপারটি বিন কাসিম জ্ঞাত হতে না পারতেন তবে শেষ মুহূর্তে এসে মুলতান রণাঙ্গনে তাঁর বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হতো। এ পর্যায়ে এসেও খলিফাকে দেয়া প্রতিশ্রুত অর্থ সরবরাহ না করতে পারার জন্য তাঁর মধ্যে এই আশঙ্কা দেখা দিলো। কিন্তু জয়ের তাৎপর্য দূরে রেখে এটিকে অনর্থক ঝামেলা মনে করে যদি খলিফা তাঁর অগ্রাভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর বাহিনীর এই সীমাহীন কুরবানী তীরে এসেও তরি ডুবাবে।

এ চিন্তা-ভাবনায় আরো কিছুদিন চলে গেল। মুলতান শহরের পুনর্গঠন ও শাসন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে ঠিকঠাক হয়ে গেল। এক দিন বিকেলে আশ্বারোহণ করে বিন কাসিম শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হলেন। গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী তাঁর পাশাপাশি। তাদের পিছনে চারজন অশ্বারোহী নিরাপত্তারক্ষী। বিন কাসিম মুলতান শহর জয় করার পরদিনই বলেছিলেন, এখানে এমন একটি মসজিদ তৈরি করতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্ম যেটিকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মসজিদের জন্য জায়গাও নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং নির্মাণকাজের জন্য খননকাজও শুরু করে দিয়েছিল নির্মাণকারীরা।

শহরের প্রধান মন্দিরের কাছে পৌছলে তিনি দেখতে পেলেন, মন্দিরের প্রধান দুই পুরোহিত মন্দিরের বাইরে দাঁড়ানো। বিন কাসিমকে দেখে তারা উভয়েই দৌড়ে মন্দিরের ভিতরে চলে গেল। বিন কাসিম যখন মন্দিরের সম্মুখ পথ অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মন্দিরের শীর্ষ পুরোহিত বেরিয়ে এলো। এই পুরোহিত ছিল সম্মোহনী চেহারার অধিকারী। মন্দিরটি একটি টিলাসম উঁচু জায়গায় অবস্থিত। মন্দিরের মূল বেদীতে উঠতে দশ-পনেরোটি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। প্রধান পুরোহিত মন্দির থেকে বেরিয়ে এভাবে বেদীর সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামছিল। তার নামা দেখে মনে হচ্ছিল সে বিন কাসিমকে কিছু একটা বলতে আগ্রহী। পুরোহিতের এই মনোভাব দেখে বিন কাসিম তাঁর ঘোড়া থামালেন।

পুরোহিত ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে বিন কাসিমের ঘোড়ার সামনে এসে থামল এবং তার পাশে রেকাবীতে থাকা বিন কাসিমের পা ধরে তার মাথা বিন কাসিমের পায়ে ঠেকাল। পায়ে মাথা ঠেকাতে দেখে বিন কাসিম দ্রুত তাঁর পা সরিয়ে নিলেন। অতঃপর পুরোহিত দু'হাত ওপরে তুলে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। একজন দুভাষী সব সময়ই বিন কাসিমের সাথে থাকত। দুভাষী দ্রুত এগিয়ে এসে পুরোহিত ওপরের দিকে তাকিয়ে কি বললো তা জানালো। দুভাষী জানালো, পুরোহিত আপনার সাথে একান্তে জরুরি কথা বলতে চায়। বিন কাসিম একথা শুনে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতের সাথে সিঁড়ি ভেঙ্গে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে বৃদ্ধ পুরোহিতকে একটি সিঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে নিজে একধাপ নিচের সিঁড়িতে বসে পড়লেন। তাঁর ইশারায় দুভাষী তাঁর কাছে গিয়ে বসল এবং দুভাষীর মাধ্যমে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো।

✪ ✪ ✪

নিজ চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না। কে বিশ্বাস করবে একজন সাধারণ প্রজা ওপরে আর বাদশা তার নীচে বসতে পারে?

কেউ বিশ্বাস না করলেও মুসলমানরা বিশ্বাস করতে পারে, বললেন বিন কাসিম। তিনি পুরোহিতের উদ্দেশে বললেন, এসব হালকা স্তুতিবাক্য ছাড়া যে জরুরি কথা বলার জন্য আপনি আমাকে থামিয়েছেন সেই কথা বলাটাই কি ভালো হয় না? আমি আপনার বিস্ময় ও হতবাক হওয়ার জবাব দিয়ে দিচ্ছি। আমার নীচে বসাটা মোটেও বিস্ময়কর বিষয় নয়, কারণ আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমি আপনার নাতিপুতিদের বয়সের মানুষ।

বিন কাসিমের এ কথায় পুরোহিত হতচকিয়ে গেল। কিছুটা পিছিয়ে গেল সে।

'আমি আপনাকে একটি গোপন কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি যে কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছি, তা আপনার জন্য বড় ধরনের একটা পুরস্কার। বার্ধ্যক্যের কারণে আমি যদি অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা বলে ফেলি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন....। যে দিন আপনি বিজয়ী বেশে দুর্গে প্রবেশ করছিলেন সেদিন প্রথম আপনাকে আমি দেখি। আমি শুনেছিলাম, আরব সেনাপতি খুবই অল্প বয়স্ক। তাতে আমি মনে করেছিলাম, আপনার বয়স হয়তো ত্রিশ-পয়ত্রিশের মাঝামাঝি হবে। কিন্তু আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমি ভেবেছি, আরে! এতো বাচ্চা। এ বাচ্চা হয়তো কোন শাহজাদা হবে এবং রাজকুমারদের মতোই আনাড়ীপনা করবে। আমি মন্দিরের অন্যান্য পুরোহিতদের বলেছি, শহরের নাগরিকদের বলে দিয়ো, প্রত্যেকই যেন তাদের যুবতী ও কুমারী মেয়েদের লুকিয়ে রাখে নয়তো জীবন্ত পুঁতে ফেলে। আমি শহরের লোকজনকে এ পয়গামও দিয়েছি, সবাই যেন তাদের সোনারূপা মূল্যবান ধন সম্পদ মাটির নীচে লুকিয়ে ফেলে। আমি এ আশঙ্কাও করেছিলাম এই মন্দির হয়তো ধ্বংস করে দেয়া হবে। ধ্বংস না করলেও বন্ধ করে দেয়া হবে এবং আমাদেরকে আপনি পাইকারীহারে হত্যা করার জন্যে সৈন্যদের নির্দেশ দেবেন। নয়তো আমাদেরকে গোলামে পরিণত করে অপমানকর কোন শ্রমঘন কাজ করতে বাধ্য করবেন...।

এ বয়সে এসে এমন অপমানকর অপ্রত্যাশিত বিড়ম্বনার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায় ভীত ছিলাম আমি। এই ভয়ে শহরের অনুন্নত এলাকার একটি ভাঙ্গা ঝুপড়ী ঘরে আমি আশ্রয় নেই। নিজেকে লুকিয়ে ফেলি। আমার দেখা শোনা করার জন্য আমার এক ভক্ত সাথে ছিল। সে ঝুপড়ী থেকে বেরিয়ে শহরের দৈনন্দিন খবর সংগ্রহ করে আমাকে শোনাতো। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না আপনার সৈন্যদের শহরে প্রবেশের পর শহরের অবস্থা এমন শান্তিময় থাকবে। আমাকে যখন শোনানো হলো বিজয়ী বাহিনী শহরের কোন একটি ঘরও লুটপাট করেনি এবং কোন একজন তরুণী যুবতীও নিখোঁজ কিংবা ধর্ষণ-শ্লীলতাহানির শিকার হয়নি।

গতকাল আমি ঝুপড়ী ছেড়ে মন্দিরে চলে আসি। এসে দেখি মন্দির যেভাবে ছেড়ে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনই রয়ে গেছে। এসে দেখি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে নারীপুরুষ পূজারীরা মন্দিরে পূজা অর্চনা করছে, আর আলাপ

চারিতায় আপনার ভূয়সী প্রশংসা করছে। শহরের নাগরিকরা আপনার বিজয়কে আশির্বাদ হিসাবে দেখছে। আমাকে তাদের কথাবার্তা শুনে বিশ্বাস করতে হলো, আপনি আসলে মানুষরূপী একজন দেবতা। আপনি আমাকে আমার মন্দির ফিরিয়ে দিয়েছেন। মন্দিরই আমার জগৎ মন্দিরই আমার সবকিছু। গতরাতে আমি শহরের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে বলেছি আপনার সাথে আমি সাক্ষাত করতে চাই। সে আমাকে আশ্বাস দেয়, আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে মন্দিরের দুই পুরোহিত আমাকে খবর দেয়, আপনি এদিকে আসছেন। খবর শুনে আমি আপনার সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে এসেছি।

আপনি বলেছিলেন, আমার সাথে আপনি জরুরি কোন কথা বলতে চান; বললেন বিন কাসিম।

'হ্যাঁ। চতুর্দিকটা একবার দেখে নিয়ে বিন কাসিমের দিকে আরো ঝুঁকে ক্ষীণ আওয়াজে পুরোহিত বললেন, আপনি এই দুর্গের মানুষের প্রতি, আমার মন্দিরের প্রতি, যে সম্মান ও অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এ জন্য আমি আপনাকে এর প্রতিদান দিতে চাই। অনেক দিন আগের কথা। এই এলাকায় এক রাজা এসেছিল। সে ছিল কাশ্মীরের রাজা। তার নাম ছিল যশোবন্ত। সে তার রাজ ভাণ্ডারের সকল সোনাদানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। পণ্ডিত মহারাজ! নির্মোহ কণ্ঠে বললেন বিন কাসিম। এসব ধনরত্নের কাহিনী অনেক পুরনো। আপনি একজন বিজ্ঞলোক। আপনিও আমাকে সেই পুরনো দিনের গল্প শোনাচ্ছেন। বলুন তো, যে কাহিনী আপনার জন্মের আগে থেকে মানুষ মুখেমুখে শুনে আসছে, সেটি যে সত্যিই হবে একথা আপনি কিভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস করেন?

ধন ভাণ্ডারের প্রতি নিরাসক্তি বিন কাসিমের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই রণাঙ্গনের লোক এবং দুনিয়া বিমূখ মর্দে মুমিন। কিন্তু এ সময়টাতে তাঁর অর্থের খুব প্রয়োজন ছিল। অর্থাভাবে তিনি বেশ কিছুদিন যাবত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তাই বলে গচ্ছিত ধনভাণ্ডারের কাহিনী শুনে এই বুড়ো পুরোহিতের কথায় আসক্ত হবার পাত্র নন বিন কাসিম। কারণ পুরোহিতের এ কথায় প্রতারণা থাকতে পারে। কারণ লোকটি আগাগোড়া সম্মোহনী শক্তির অধিকারী। তার রন্ধ্রে বন্ধ্রে পৌত্তলিকতার অনুসরণ। সে যেকোন মূল্যে মুসলিম এই বিজয়ে প্রতিশোধের ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই বিন কাসিম তাকে পরখ করার জন্যে বললেন, পুরোনো দিনের এই পৌরনিক

কাহিনী সে কিভাবে বিশ্বাস করল। এই গল্প তো যুগযুগ ধরে মানুষের মুখেমুখে চলে আসছে?

'আমার কথা ঠিক নয়' আপনার এমন সংশয় প্রমাণ করে আপনি যথার্থই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী বললেন, পুরোহিত। কারণ মানুষ গচ্ছিত ধনভাণ্ডারের কথা শুনলেই তা অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অবশ্য আপনি বলতেই পারেন, হে বুড়ো পূজারী! তুমি যদি জেনেই থাকো, কেউ অমুক জায়গায় অঢেল ধনভাণ্ডার পুঁতে রেখে মরে গেছে, তাহলে তুমি তা উত্তোলন করনি কেন? এর জবাবে আমি বলবো, আমি একা মানুষ। এসব ধনরত্ন দিয়ে আমি কি করব! তাছাড়া দুনিয়ার ভোগ বিলাসের আকাঙ্ক্ষা আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি। আপনি বাদশা। বাদশাহী চালানোর জন্যে ধনভাণ্ডারের প্রয়োজন আছে।

আচ্ছা, কোথায় আপনার জানা ধনভাণ্ডার? বললেন বিন কাসিম। বলুনতো কাশ্মীরের রাজা এই ধনরত্ন মাটির নিচে পুঁতে ফেলল কেন?

এইতো কাছেই। আমি নিজে গিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দেবো...। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ। তিনি বেশীরভাগ সময় ধর্মসাধনায় ব্যয় করতেন। এটা এমন সময়ের ঘটনা যখন মুলতান ও কাশ্মীর একই শাসনাধীন ছিল এবং রাজা যশোবন্তই ছিলেন গোটা অঞ্চলের শাসক। অবশ্য কেন তিনি ধন-রত্ন পুঁতে রেখেছেন এ ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে তিনি এখানে এসে এই মন্দিরে ধর্ম সাধনায় বসেছিলেন।

আমার দাদা পরদাদাদের মধ্যে যিনি তখন এই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, তিনি ছিলেন মহাঋষি। তিনি রাজা যশোবন্তের সাথেই থাকতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রাজা যশোবন্ত মন্দিরের একটি গোপন কক্ষে সোনাদানা ভর্তি চল্লিশটি মটকি রাখেন। কয়েক মন ওজনের সোনার ইট ও তৈরি অলংকার সেগুলোতে ভর্তি করেন। সোনাদানা ভর্তি মটকিগুলোকে মাটির নিচে পুঁতে সেখানে তিনি সোনার তৈরি একটি মূর্তি বানিয়ে রাখেন, যাতে এর নীচে সোনা দানা আছে মানুষ এমনটি না ভাবতে পারে। জায়গাটির চারপাশে তিনি গাছগাছালি রোপন করেন।

আমার কাছে যশোবন্তের যে কাহিনী পৌঁছেছে তা হলো, তার বাবা ধন সম্পদ জড়ো করার প্রতি বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। যশোবন্তকেও সে এ শিক্ষাই দিয়েছিল। যশোবন্তের বাল্য কৈশোর যৌবন কেটেছে চরম বিলাসিতায়

ও আরাম আয়েশে। সে ছিল মা বাবার কাছে খুবই প্রিয়, সেই সাথে যশোবন্তও তার মা-বাবাকে অনেক ভালোবাসতো। হঠাৎ একদিন তার বাবা মারা গেল। এরপর অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেল মা। বাবার মৃত্যুতে সে জ্যোতিষী ও গণকদের বলল, যে তার বাবাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, পুরস্কার স্বরূপ তাকে বাবার ওজনের সমান সোনা দেবে। কিন্তু কেউই তার মৃত বাবাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারল না। এরপর তার মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল তখনো সে আগের মতোই সোনা দেয়ার ঘোষণা দিলো কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলো না। মাকেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারল না কেউ।

সৃষ্টিকর্তা যশোবন্তকে আরো একটা শিক্ষা দিলেন। এক সুন্দরী নর্তকীকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো যশোবন্ত। হঠাৎ একদিন এই নর্তকীও অসুস্থ হয়ে পড়ল। এবার যশোবন্ত ঘোষণা করল, যে তাঁর প্রিয় নর্তকীকে সুস্থ করে দেবে, সে চিকিৎসক ও নর্তকীর ওজনের সমান সোনা তাকে পুরস্কার দেবে। একথা শুনে বহু দূর দরাজ থেকে বহু বৈধ্য, সন্নাসী, কবিরাজ এসে চিকিৎসা করল। কিন্তু কারো চিকিৎসা ফলপ্রসূ হলো না। অবশেষে এই নর্তকীও মারা গেল।

প্রিয় নর্তকীর মৃতদেহ যখন চিতার আগুনে জালানোর জন্য কাঠখড়ির ওপর রাখা হলো। তখন যশোবন্ত শিশুদের মতো চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। এই অবস্থা দেখে আমার মতো বৃদ্ধ এক সন্নাসী যশোবন্তকে বুকে জড়িয়ে স্নেহে বলল, মহারাজের রাজভাণ্ডারের সমস্ত সোনাদানা দিয়ে দিলেও কোন মানুষকে এক নিঃশ্বাসের জন্যও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সোনা দিয়ে এক নিঃশ্বাসের আয়ুও বাড়ানো সম্ভব নয়। তুমি সোনা দিয়ে মানুষের আয়ু কিনতে চাও। দেখো, এই নতর্কীর রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তুমি পাগলের মতো হয়ে গেছো। চেয়ে দেখো এই রূপ জৌলুস সবই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। তোমার রাজভাণ্ডারের সমস্ত সোনাদানা এনেও যদি আগুনে ফেলে দাও, আগুন সব কিছুকেই পুড়িয়ে গলিয়ে দেবে। কিন্তু তোমার নতর্কীকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাই এসব ছেড়ে মনকে শান্ত করার জন্যে মন্দিরে চলো। মন্দিরে গিয়ে পূজা-অর্চনা করো। দেবীর পদতলে কপাল ঠেকাও, মনের সব দুঃখ চলে যাবে...।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যশোবন্ত মন্দিরে গিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করল। মন্দিরে থাকতে থাকতে তার মন থেকে পৃথিবীর রঙ্গরস ধনসম্পদের মায়া দূর হয়ে গেল। দিনমান সে পূজা-অর্চনায় মগ্ন হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে এখানে এসে সমস্ত সোনারূপা দাফন করে এর ওপর এই মন্দির তৈরি করল। আমি

মানি আপনি যে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করেন তিনি সর্বক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করেন। আপনি যেখানেই যান সেখানকার লোকজন আপনাকে পেয়ে খুশী হয়ে আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করে। কিন্তু তবুও আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, এই মন্দিরের সোনাদানা আপনি উঠিয়ে নিন।

আমি শুনেছি, মাটির নীচে পুঁতে রাখা সম্পদের সাথে দুর্ভাগ্য এবং নানা ধরনের অমঙ্গল জড়িয়ে থাকে। গচ্ছিত সম্পদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি যেসব গল্প কাহিনী শুনেছি, তার সবগুলোই এমন যারা গচ্ছিত ধন-সম্পদ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে তাদের সবারই দুঃখজনক পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। বললেন বিন কাসিম।

আমার বিশ্বাস, আপনি প্রাপ্ত এই সম্পদ আপনার ব্যক্তিগত আরাম আয়েশে খরচ করবেন না। আমি আপনাকে এই অনুরোধও করব, এই সম্পদ আপনি ব্যক্তিগতভাবে খরচ করবেন না। বলল পুরোহিত।

✪ ✪ ✪

ওপরে উল্লেখিত গুপ্তধনের কথা কোন কল্পকাহিনী নয়। বাস্তবেই এমন গুপ্তধনের কথা আলোচিত হয়েছে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ "ফতহুল বুলদান, তারিখে মাসুমী ও চাচনামায়। বিন কাসিম পুরোহিতের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে আদ্যোপ্রান্ত জানালেন।

'এটা একটা প্রতারণা হতে পারে ইবনে কাসিম' বললেন গোয়েন্দা প্রধান। এটা আপনাকে হত্যার একটা মায়াবী চক্রান্তও হতে পারে। সোনা থাকতেই পারে, কিন্তু কিছুতেই আপনি একাকী যাবেন না। অন্তত আরো পাঁচ ছয়জন সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বললেন গোয়েন্দা প্রধান।

না, তুমি ছাড়া আমার সাথে আর কেউ যাবে না। বললেন বিন কাসিম। তুমি কি এমন কাহিনীর কথা শোননি। কয়েকজন মিলে কোন গুপ্তধন উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরাই গুপ্তধনের মালিকানা কব্জা করতে গিয়ে খুনোখুনিতে মেতে উঠেছে! ধন সম্পদ মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। আমি চাচার কৃত ওয়াদা পূরণ করতে চাই শা'বান। পুরোহিতের এই গুপ্তধনের সন্ধানকে আমি আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করছি। শা'বান সাকফীর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বিন কাসিম বৃদ্ধ পুরোহিতকে জানালেন, তিন-চার দিন পর তিনি পুরোহিতের সাথে ওই মন্দিরে যাবেন।

পুরোহিতের সাথে কথা শেষ করে যেখানে মুলতানের প্রধান মসজিদ তৈরির জন্য সৈন্যরা খনন কাজ করছিল সেখানে গেলেন বিন কাসিম।

প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, খনন কাজ দেখতে গিয়ে বিন কাসিম কোদাল হাতে নিয়ে নিজেই খনন কাজে শরীক হলেন। কোদাল মারতে মারতে শরীর ঘেমে যখন তাঁর চোখে ঘাম ঝরে পড়ছিল এবং কোদাল চালাতে গিয়ে বারবার তাঁকে চোখ মুছতে হচ্ছিল তখন তিনি হাত থেকে কোদাল ছাড়লেন। খনন স্থান থেকে চার-পাঁচজন সৈন্য ও গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে সাথে নিয়ে মন্দিরে চলে এলেন। মন্দিরে এসে তিনি বৃদ্ধ পুরোহিতকে ডেকে বললেন, তিনি যেন এখনই তাদের সাথে মন্দিরে চলেন। শা'বান ছাকাফী এই পরিকল্পনা করেছিলেন যে, তিন চার দিন পরের কথা বলে পুরোহিতকে এক ধরনের অন্ধকারে রাখা হোক। এর কিছুক্ষণ পর আকস্মিক ভাবে তখনি পুরোহিতকে মন্দিরে যাওয়ার কথা বললে পুরোহিতের মনে কোন চক্রান্তের বিষবাষ্প থেকে থাকলেও তা আর বাস্তবায়নের আবকাশ থাকবে না।

✪ ✪ ✪

গুপ্তধনের মন্দিরের অবস্থান খুব বেশী দূরে ছিল না। সে সময়কার মুলতানের ভূপ্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উঁচু টিলা, খানা খন্দক আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল গোটা মুলতান। একটি নির্জনস্থানে ছিল মন্দির। বিন কাসিম যখন মুলতান জয় করেন তখন এ মন্দির ছিল পরিত্যক্ত। পূজাপাট তো দূরের কথা কোন জনমানুষ সেই মন্দিরের ধারে কাছেও যেতো না। লোকজন সেটিকে ভূত-পেত্নীর আবাসস্থল বলে মনে করতো। মানুষ বিশ্বাস করতো, পাপীদের আত্মাগুলোকে সেই মন্দিরে নিয়ে শাস্তি দেয়া হয়। মন্দিরের আশেপাশে কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ার দেখলে লোকেরা বলতো এগুলোই পাপীদের প্রেতাত্মা। এই বৃদ্ধ পুরোহিতের বাপদাদারা অনেকটা ইচ্ছা করেই এই মন্দির সম্পর্কে জনমনে ভীতিকর পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। যাতে ওখানকার গুপ্তধনের খবর কেউ জেনে না যায়। বিন কাসিম সেখানে পৌছে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। পুরোহিত কেন জানি অজ্ঞাত এক কারণে বিন কাসিমকে বলল, 'আপনি একাকী আমার সাথে চলুন!' মন্দিরের হাউজটি ছিল শুকনো। সেটিতে নামার জন্য সিঁড়ি ছিল। পুরোহিত আগে অ। সিঁড়ি ভেঙে নামছিল। তার পিছনে বিন কাসিম সিঁড়ি ভাঙছিলেন। তারা যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন অন্ধকার গাঢ়ো হচ্ছিল।

হঠাৎ পুরোহিত বাম দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার শুধু আওয়াজ শোনা গেল এদিকে। বিন কাসিম বাম দিকে মোড় নিলেন। এই সিঁড়িটি ছিল নীচের দিকে। এখানে এমন এক প্রকট দুর্গন্ধ ছিল যে, তীব্র গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। ঠিক সেই সময় ফড় ফড় শব্দ শুরু হলো। সেই সাথে চামচিকার উড়াউড়ির আওয়াজ। বিন কাসিমের মতো সাহসী লোকও এই আওয়াজে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন। 'বসে যান' বলল পুরোহিত। এটা একটা বড় চামচিকা। বিন কাসিম বসতেই চামচিকার দল তার মাথার ওপর দিয়ে বের হতে শুরু করল। নীরব নিথর এই জায়গা নিরাপদ ভেবে চামচিকারা দল বেঁধে এটিকেই আবাসস্থল বানিয়ে ফেলে। হঠাৎ দু'জন মানুষের আগমনে ভয় পেয়ে চামচিকাগুলো ভয়ে স্থান ছেড়ে পালানোর জন্য বিক্ষিপ্ত উড়াউড়ি শুরু করে দেয়। বিন কাসিম সিঁড়িতে বসে পড়ায় ওরা পথ পেয়ে পালাতে শুরু করে। এরপর পুরোহিত সিঁড়ি ভেঙ্গে আবারো নিচের দিকে যেতে লাগল। বিন কাসিম তার অনুসরণ করলেন। এক পর্যায়ে অন্ধকার এমন হলো যে, আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পুরোহিত বিন কাসিমের হাত ধরে তাকে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে নিয়ে গেল। হঠাৎ অন্ধকার গর্ত পথে কিছুটা আলোর আভা দেখা দিল। বিন কাসিম কোন মানুষের আবির্ভাব মনে করে তরবারী কোষমুক্ত করে ফেললেন। এক পর্যায়ে একটি কক্ষ পরিষ্কার দেখতে পেলেন বিন কাসিম। সেটি মৃদু আলোকিত। কক্ষটির একটি জানালা। তবে সেটি জালের মতো লোহার তারে আটকানো। কক্ষে একটি লোক দাঁড়ানো। অন্ধকারে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দেখেই বোঝা যায় সে আঘাতহানার জন্য প্রস্তুত।

বিন কাসিম চক্রান্তের চূড়ান্ত মনে করে বিদ্যুৎ গতিতে তরবারী কোষমুক্ত করে লোকটিকে আঘাতের জন্য এগিয়ে গেলেন কিন্তু আঘাতের আগেই পুরোহিত তাঁর বাহু ধরে ফেলল।

'থামুন আরব সেনাপিত' এটি কোন জ্যান্তলোক নয়। এটি একটি সোনার মূর্তি। যশোবন্ত এটিকে এখানে প্রহরী সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। এর নীচেই আছে সব লুকানো ধনরত্ন। এখন আপনি আপনার লোকদের ডেকে এই ধনরাজি নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এমন লোকদেরই এখানে আনুন। ধনসম্পদ দেখে যাদের ঈমান নষ্ট হয়ে না যায়। ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, সোনার সেই মূর্তির চোখ ছিল ইয়াকুত পাথরের তৈরি। এ পাথর আলো ছড়াতো।

✪✪✪

সে সময়কার মুসলমানদের ঈমান এতটুকু মজবুত ছিল সোনার ঝলক তাদের ঈমানে কোন ফাটল ধরাতে পারতো না। বিন কাসিম মন্দিরের বাইরে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী ও আরো চারজন নিরাপত্তারক্ষীকে দাঁড় করিয়ে এসেছিলেন। নিরাপত্তার স্বার্থে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তারাও পা টিপে টিপে বিন কাসিম ও পুরোহিতের পিছু পিছু অগ্রসর হচ্ছিল। বিন কাসিম বিলক্ষণ জানতেন, মন্দিরের এই অন্ধকার প্রকোষ্টে তিনি একা নন। তাঁর আরো পাঁচ সহযোদ্ধা আছে। তিনি একটু সময় নিয়ে হাতে তালি দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাঁচজন তাঁর কাছে চলে এলো। শা'বান ছাকাফীকে বিন কাসিম বললেন, এই মূর্তি সরিয়ে নীচ থেকে সোনাদানা উদ্ধার করতে হবে।

গোয়েন্দা প্রধান জানতেন, একাজে কারা যোগ্য এবং বিশ্বস্ত। তিনি তাদের ডেকে আনলেন। মন্দিরের ভিতরে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হলো। সেদিন সন্ধ্যার আগেই সকল গুপ্তধন মন্দিরের বাইরে মুক্ত জায়গায় উঠিয়ে আনা হলো। ফতহুল বুলদানে বর্ণিত হয়েছে, সেই মন্দিরের গোপন কুঠুরী থেকে যে সোনা উদ্ধার করা হয়েছিল এর মোট ওজন ছিল এক হাজার তিন মন।

পর দিনই বিন কাসিম হাজ্জাজের চিঠি পেলেন। এই চিঠিতে তিনি মুলতান জয়ের মোবারকবাদ দিয়ে লিখেছেন, খলিফাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করেছি। আমি হিসাব করে দেখেছি, তোমার বাহিনীর জন্য এ পর্যন্ত আমি ষাট হাজার দিরহাম খরচ করেছি। কিন্তু তুমি এ পর্যন্ত নগদ ও পণ্য মিলিয়ে যা পাঠিয়েছো, তা এক লাখ বিশ হাজার দিরহাম মূল্যমানের হবে।

সেই চিঠিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একথাও লিখলেন, প্রতিটি শহরে এমন শানদার মসজিদ তৈরির ব্যবস্থা করো, যে মসজিদ ভবিষ্যতের লোকদের কাছে সেখানে ইসলামের দাওয়াত বহণকারী ও ইসলাম প্রচারে আত্মত্যাগকারীদের স্মৃতিবহণ করবে। এখন থেকে জুমআর খুতবায় খলিফার নাম নিতে পারো এবং খলিফার নামে মুদ্রাও প্রচলন করতে পারো।

বিন কাসিম হাজ্জাজের কাছে যে এক লাখ বিশ হাজার দিরহাম পাঠিয়েছিলেন তাতে পুরোহিত নির্দেশিত মন্দিরের গুপ্তধনের সোনা রূপা মনিমুক্তা ছিল না। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের চিঠি পাওয়ার পর বিন কাসিম মন্দিরের লুকানো সোনা রূপার এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নৌকা করে ডাভেল বন্দর এবং সেখান থেকে জাহাজে করে ইরাক পাঠিয়ে দিলেন।

বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানে মোট কতো ব্যয় হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানে মোট ছয় কোটি দিরহাম ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বাগদাদ খেলাফতকে যা দেয়া হয়েছিল তার পরিমাণ বারোকোটি দিরহামের চেয়েও বেশি ছিল। উল্লেখিত অংকের দাবিদার ঐতিহাসিগণ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি চিঠিকে এর প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তাতে হাজ্জাজ লিখেছেন, আমরা হিন্দুদের মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি এবং এই অভিযানে আমাদের যা খরচ হয়েছে তাও উসূল করে নিয়েছি। বরং ছয় কোটি দিরহাম আরো অতিরিক্ত খেলাফতের ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি গাদ্দার রাজা দাহিরের কর্তিক মস্তক বাগদাদ খেলাফতের পদতলে নীত হয়েছে।

✪ ✪ ✪

বিন কাসিম দাউদ বিন নসর আম্মানীকে মুলতানের কেন্দ্রীয় শাসক এবং মুলতান রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য ছোট ছোট এলাকার জন্য ইকরামা বিন রায়হান শামী আহমদ বিন খুযাইমা মাদানীকে শাসক নিযুক্ত করলেন। মুলতান রাজ্য ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। এ জন্য গোটা এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য খুব চিন্তা ভাবনা করে প্রশানসিক কাঠামো বিন্যাস করলেন বিন কাসিম। বিন কাসিম মুলতান জয়ের পর পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিজের সাথে রাখলেন। আর অশ্বারোহী ও পদাতিক মিশ্রণে অন্যান্য এলাকার নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজন মতো সৈন্য মোতায়েন করলেন বিন কাসিম। বিন কাসিমের মুলতান জয়ের ফলে বর্তমানের গোটা পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কিছু অংশ ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে। মুলতান বিজয়ের পর গোটা এলাকার ছোট ছোট শাসকরা বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অনুগত্যের চুক্তি করে। এরপর বিন কাসিম মূল ভারতের দিকে মনোনিবেশ করেন। মুলতানের পর বিন কাসিমের সামনে মূল ভারতের মধ্যে প্রথম টার্গেট ছিল কন্নৌজ। সে সময় কন্নৌজ ছিল ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য।

একদিন বিন কাসিম তাঁর সেনা কর্মকর্তাদের ডেকে তাঁর আগামী গন্তব্যের কথা ব্যক্ত করলেন এবং অভিযানের কলাকৌশল নিয়ে কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের সাথে সলাপরামর্শ করলেন। সর্বসম্মত প্রস্তাব উঠল, কন্নৌজের

রাজাকে সর্বাগ্রে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বিন কাসিম সেনাপতি ও কমান্ডারদের ওপর দৃষ্টি ফেরালেন। হঠাৎ এক সেনাপতির ওপর তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল।

আবু হাকিম শায়বানী! আল্লাহর কসম! কন্নৌজ রাজার কাছে ইসলামের দাওয়াত ও আমাদের পয়গাম নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকেই আমার কাছে যথার্থ ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

ভালো হবে কি মন্দ হবে জানি না বিন কাসিম! তবে আমাকে দায়িত্ব দিলে দায়িত্ব পালন করেই আপনার ধারণার যথার্থতা প্রমাণ করব, বলল শায়বানী। ঠিক আছে, এ অভিযানের দায়িত্ব তোমাকেই দেয়া হলো। দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যাবে তোমার সাথে। এছাড়া থাকবে স্থানীয় পথ প্রদর্শক ও সহযোগী দল। রাস্তার অবস্থা ও প্রয়োজনীয় কি জিনিসের দরকার হবে এ ব্যাপারে তুমি খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাও।

যা যা লাগবে আমি সংগ্রহ করে নেব' সম্মানিত সেনাপতি! বলল আবু হাকিম শায়বানী। কন্নৌজের রাজাকে আমার কি বলতে হবে?

তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেবে। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত কাকে কোন ভাষায় দিতে হয় এ বিষয় তুমি ভালোই জানো। সে যদি ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায় তাহলে আমাদের অনুগত্য করে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার প্রস্তাব করবে এবং বলবে এমতাবস্থায় তাকে জিযিয়া দিতে হবে। তাকে জানাবে, ডাভেল থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত যেসব রাজা ইসলাম কবুল করেছে, আর কারা কারা ইসলাম গ্রহণ না করে বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া আদায় করছে। পক্ষান্তরে কোন কোন রাজা ও শাসকরা যুদ্ধ করে নিহত ও রাজ্য হারিয়ে দেশান্তরিত হয়েছে তাও অবহিত করবে।

সে যদি আমাদের প্রস্তাব না মেনে বরং আমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য যুদ্ধের আহ্বান করে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমি কি এই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার মোকাবেলা করবো? বললেন সেনাপতি আবু হাকিম শায়বানী।

না আবু হাকিম। প্রথমেই তুমি মোকাবেলায় যাবে না। এই বাহিনী নিয়ে তুমি উদয়পুর পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে একজন দূত সঙ্গে নিয়ে কন্নৌজ রাজার কাছে যাবে। সৈন্যরা উদয়পুরে অবস্থান করবে।

আবু হাকিম শায়বানী দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে উদয়পুর পৌছে সেখানে সৈন্যদের শিবির স্থাপন করলেন এবং একজন দূত ও কিছু সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে নিয়ে কন্নৌজ রাজার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।

✪✪✪

কন্নৌজের রাজা ছিলেন রায় হরিচন্দ্র। রায় হরিচন্দ্রের কাছে খবর পৌছাল এক আরব সেনাপতি মহারাজের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। তার সাথে এসেছে উদয়পুরের এক কর্মকর্তা। রায় হরিচন্দ্র খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে তার রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন।

আবু হাকিম শায়বানী রাজদরবারে প্রবেশ করে দেখলেন, কন্নৌজের রাজা অত্যন্ত উঁচু একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট। তার পিছনে অর্ধনগ্ন সুন্দরী তরুণী ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা দিয়ে বাতাস করছে। দু'জন চৌকিদার রাজার ডান ও বাম পাশে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়ানো। আবু হাকিমের সাথে রাজ দরবারে উদয়পুরের একজন কর্মকর্তা ও একজন দুভাষী ছিলেন।

হে আরব! আমি জানি তোমরা কেন এসেছ। তবুও আমি তোমার মুখেই শুনতে চাই। আবু হাকিমের উদ্দেশে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন রাজা। রাজা বললেন, বলো তোমরা কি বার্তা নিয়ে এসেছ।

আবু হাকিম শায়বানী রাজার দিকে তার লিখিত পয়গাম বাড়িয়ে দিলেন।

মনে হয় বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তোমরা এখানে এসেছ? বিগত দেড়হাজার বছর ধরে এ রাজ্য শাসন করছে আমার খান্দান। আজ পর্যন্ত এই জমিনে কোন বহিঃশত্রু পা রাখার দুঃসাহস করেনি। আর তোমরা আমাকে আমার বাপ-দাদার সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করার কথা বলার মতো ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ। আরো বলছ, আমরা তোমাদের ধর্ম গ্রহণ না করলে তোমাদেরকে জরিমানা দিতে।

সম্মানিত রাজা! সিন্দু রাজা দাহিরও আপনার মতোই কথা বলেছিল। বললেন আবু হাকিম। দাহিরও রাজ সিংহাসনে বসে এমন ভাষায়ই কথা বলতো। কিন্তু আজ দেখুন, কোথায় আজ দাহির। কোথায় আজ তার রাজত্ব!

এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীকে আমরা কখনো ক্ষমা করি না, কঠোর কণ্ঠে বলল রাজা রায় চন্দ্র। ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীকে আমরা এমন নির্মম ও নিষ্ঠুর শাস্তি দিই যে, সেই শাস্তি দর্শনকারী ও শ্রবণকারী ভয়ে কাঁপতে থাকে।

কিন্তু তুমি একজন দূত। দুভাষী সাথে নিয়ে এসেছ। তুমি ফিরে গিয়ে সেনাপতিকে বলো, সাহস থাকলে সে যেন সৈন্য নিয়ে আসে। আমরা তার পয়গামের জবাব তরবারী দিয়েই দিতে চাই।

রাজার কথা শুনে আবু হাকিম শায়বানী মুলতান ফিরে এসে কন্নৌজের রাজার জবাবের কথা জানালেন। তিনি বিন কাসিমকে আরো জানালেন, রাজা তার সাথে কথা বলার সময় অত্যন্ত অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেখিয়েছে।

বিন কাসিম আবু হাকিমের বক্তব্য শোনার পর সেনাবাহিনীকে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।... তবে বলেদিলেন, এবারের প্রস্তুতি যেন মুলতান অভিযানের মতো না হয়। আমরা সেখানে পৌছার পর যেন কোন ধরনের রসদ ঘাটতির মুখোমুখি না হতে হয়। তোমাদের মনে রাখতে হবে কন্নৌজের সেনাবাহিনী পূর্ণউদ্যোমে থাকবে। আল্লাহর শোকর রণক্লান্ত ও সংখ্যায় অপ্রতুল হওয়ার পরও তিনি প্রতিটি যুদ্ধে আমাদের মদদ করেছেন। অবশ্য আমাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের ওপরই ভরসা রাখতে হবে। কিন্তু তোমরা বিলক্ষণ জানো, আল্লাহ সেই মুসলমানদেরই সাহায্য করেন, সামর্থের সবটুকু প্রস্তুতি যখন মুসলমানরা সম্পন্ন করে।

হিন্দুস্তানের শাসক ও সৈন্যরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও হস্তিবাহিনী নিয়ে খুব গর্ব করে। রায় হরি চন্দ্রের কাছে হয়তো সে খবর পৌছেছে, দাহির আমাদেরকে তার বিশাল হস্তিবাহিনীর ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু দাহিরের হস্তি বাহিনীর ওপর যখন মুজাহিদদের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, তখন নিজ সৈন্যদেরকেই জঙ্গি হাতির পদতলে পিষ্ট হতে হলো। দেখবে কন্নৌজ রাজ্যের অহংকার তার হাতিরাই ধূলায় মিশিয়ে দেবে।

শুরু হয়ে গেল কন্নৌজ অভিযানের প্রস্তুতি। রণক্লান্ত মুসলিম যোদ্ধাদেরকে বিশ্রামের জন্য আরো কয়েকদিন অবকাশ যাপনে রাখা জরুরি ছিল, সেই সাথে মুলতান যুদ্ধে আহতদের সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যেও দরকার ছিল আরো কিছুদিন। ফলে সপ্তাহ খানিক অভিযান বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন বিন কাসিম।

✪✪✪

দুই তিনবার বাগদাদ থেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দূত এলো। বিন কাসিম আগেই নিরাপত্তা রক্ষীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাগদাদ থেকে যখনই কোন পয়গামবাহী আসবে তাকে না আটকিয়ে সাথে সাথে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এক পর্যায়ে এটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল, হাজ্জাজের যে কোন দূত এসে সরাসরি বিন কাসিমের কাছে চলে যেত। সে দিনও হাজ্জাজের পয়গামবাহী সরাসরি এসে বিন কাসিমের তাঁবুর সামনে ঘোড়া থেকে নেমে অনুমতি নিয়ে সালাম দিয়ে বিন কাসিমের তাঁবুতে প্রবেশ করল। বিন কাসিম আনন্দচিত্তে বসা থেকে উঠে পয়গাম দেখার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিন কাসিম মনে করেছিলেন, তিনি যেসব সোনাদানা হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে এবং তা হাতে পেয়ে হাজ্জাজ তাকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন।

কিন্তু বিন কাসিম উচ্ছ্বাসে এগিয়ে এলেও পয়গামবাহী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল, কারণ তার কাছে লিখিত কোন পায়গাম ছিল না। আগন্তুকের চেহারায় গাঢ় ক্লান্তির ছাপতো ছিলই তার চেয়ে বেশী ছিল বিষন্নতা।

আল্লাহর কসম! এমন কোন ব্যাপার কি ঘটেছে, যা তুমি বলতে দ্বিধা করছো?

জী হ্যাঁ, সিন্ধুর শাসক! বলতেই আগন্তুকের কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে এলো এবং তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো।

বলো কি খবর এনেছ? আমাকে বিজয়ের আনন্দে দুঃখ দাও...। দেরী করো না? কঠোর কণ্ঠে বললেন বিন কাসিম।

আমীরে বসরা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইন্তেকাল করেছেন, বলেই সংবাদবাহক হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল।

ইন্নালিল্লাহ্! বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে বিন কাসিমও হাজ্জাজের ইন্তেকালের খবর শুনে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে দ্বাররক্ষীকে ডেকে বললেন "সবাইকে ডাকো।"

দ্বাররক্ষী জানতো সবাই বলতে কাকে কাকে ডাকতে হবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই সকল সেনাপতি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিন কাসিমের উপদেষ্টাবৃন্দ তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করল।

আমার মাথার ওপরে সবচেয়ে জরুরি ছায়াদানকারী ব্যক্তিটি আজ আর নেই। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইন্তেকাল করেছেন।

ধরা গলায় বললেন বিন কাসিম। সৌম্য ক্লান্তিময় বিন কাসিমের চেহারা মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো কালো হয়ে গেল। হাজ্জাজের ইন্তেকাল শুধু সিন্ধু অভিযানের অগ্রাভিযানই থামিয়ে দিল না, প্রকারান্তরে হাজ্জাজের ইন্তেকালের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল বিন কাসিমের ভারত অভিযানের যবনিকা।

বিষন্ন কণ্ঠে বিন কাসিম সেনাধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে বললেন, এখন আর আমরা কন্নৌজ অভিযান শুরু করব না। আশা করি খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক আমাদের সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। আমরা তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। বরং তিনি যা খরচ করেছিলেন তার চেয়ে দ্বিগুণ রাজকোষে জমা করেছি। তাছাড়া বিশাল এক রাজত্ব মুসলিম সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আশা করি তিনি আমাদের সংকল্পের সামনে কোন প্রাচীর সৃষ্টি করবেন না। তবুও আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। কারণ এখন আর দ্বিতীয় কোন হাজ্জাজের উদ্ভব হবে না, যিনি খলিফার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে রাজত্বের বিলাসিতা থেকে নিবৃত্ত রাখবেন এবং আমাদেরকে পদে পদে উৎসাহিত উজ্জীবিত ও দিক নির্দেশনা দেবেন। এখন আর আগের অবস্থা নেই। হতে পারে, আমরা শত্রুদের মোকাবেলায় লিপ্ত আর এমন অবস্থায় বাগদাদ থেকে নির্দেশ এসে গেল– থেমে যাও, সিন্ধুর জন্য নতুন আমীর নিযুক্ত হয়েছেন।

আমাদের পক্ষে নির্বিকার বসে থাকাও ঠিক হবে না। বললো এক সেনাপতি। এমনটি দেখলে শত্রুরা আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে। ওরা ভাবতে পারে আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। অথবা ক্লান্ত হয়ে গেছি কিংবা কোন কারণে আমাদের পক্ষে আর অভিযান করা সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় আমরা যদি শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি করি, তাহলে সৈন্যরা লড়াইয়ের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে, আমাদেরকে কোন না কোন দিকে অভিযান পরিচালনা করতেই হবে বলল আরেক সেনাধ্যক্ষ।

বিন কাসিম দেখলেন, সেনাধ্যক্ষদের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কন্নৌজ অভিযান মুলতবি রেখে অন্যান্য কার্যক্রম তিনি অব্যাহত রাখলেন। যেসব হিন্দু শাসক বিনা যুদ্ধে বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, আজ আর সেসব শহর নগরের অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতি সেগুলো বদলে ফেলেছে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষ হয়েছে স্থানান্তরিত। কালের বিবর্তনে সেই সময়ের নগর জনপদের নামচিহ্নও বদলে গেছে।

বিন কাসিমের বিজয় অভিযানে বর্তমান ভারতের কিছু অংশও মুসলিম সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি রাজ্যের নাম ছিল খীরাজ। খীরাজ শহরের নাম শুধু বিন কাসিমের ভারত অভিযানের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। বর্তমানে এই জায়গাটি কোথায় কি নামে পরিচিত তা উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইতিহাস শুধু এতটুকু বলেছে, খীরাজ অভিযানে বিন কাসিম নিজে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

খীরাজের রাজা ছিল দুবড়া। দুবড়া বিন কাসিমকে মোকাবেলা করার জন্য সৈন্যদেরকে দুর্গের বাইরে নিয়ে এসেছিল এবং নিজে ছিল সৈন্যদের অগ্রভাগে। রাজা দুবড়া এতোটাই দুঃসাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যে, সে তার সৈন্যদের সারি থেকে এগিয়ে মুসলিম সৈন্যদের সারিতে হামলা করছিল। তার তরবারীর সামনে কোন মুসলিম যোদ্ধাই দাঁড়াতে পারছিল না। যেই তার মুখোমুখি হচ্ছিল তার তরবারী তাকে ধরাশায়ী করছিল। এক পর্যায়ে সে বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। রাজা দুবড়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বিন কাসিম তার দিকে এগিয়ে গেলেন কিন্তু বিন কাসিমের একান্ত নিরাপত্তা রক্ষীরা নিজেদের জীবনের চেয়ে তরুণ বিন কাসিমের জীবনকে মূল্যবান মনে করে। চারজন এগিয়ে গিয়ে রাজা দুবড়াকে ঘিরে ফেলে। রাজা দুবড়ারও নিরাপত্তা বলয় ছিল। দুবড়ার নিরাপত্তা রক্ষীরা বিন কাসিমের নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর হামলে পড়ল। রাজা দুবড়ার সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেও বিন কাসিমের নিরাপত্তা রক্ষীরা রাজা দুবড়াকে বেষ্টনীর মধ্যে আটকে রাখতে চাচ্ছিল। কিন্তু বহু সংখ্যকের আক্রমণে বিন কাসিমের তিন জন নিরাপত্তারক্ষীই প্রতিপক্ষের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে চতুর্থ নিরাপত্তারক্ষী মুসলিম যোদ্ধা রাজা দুবড়ার ওপর এমন তীব্র আঘাত হানে যে, রাজার পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। মুসলিম যোদ্ধার আঘাতে রাজা দুবড়া ঘোড়া থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল। নিজেকে শামলে নিয়ে রাজা যখন উঠতে চেষ্টা করছিল ঠিক এমন সময় তারই এক নিরাপত্তারক্ষীর ঘোড়া আহত রাজার উপরে উঠে গেল। আঘাতের কারণেই রাজার মৃত্যু হতো কিন্তু তাড়া খাওয়া ঘোড়ার এক পা পড়ল রাজার বুকে, আর তাতে মুহূর্তের মধ্যেই রাজার দেহ নিথর হয়ে গেল।

রাজার মৃত্যুতে খীরাজের সৈন্যরা হতোউদ্যম হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল। রাজাকে সাঙ্গ করে মুসলিম যোদ্ধারা এমন তীব্র আক্রমণ করল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই ময়দান ফাঁকা হয়ে গেল।

মোকাবেলার চেষ্টা ত্যাগ করে নেতৃত্ব শূন্য সৈন্যদের কিছু অংশ দুর্গে আশ্রয় নিল আর অধিকাংশই আহত-নিহত ও চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। বিজয়ী বেশে বিন কাসিম খীরাজ দুর্গে প্রবেশ করলেন। খীরাজ বিজয়ের ফলে বিশাল অঞ্চল বিন কাসিমের অধিকারে অন্তর্ভুক্ত হলো।

✪✪✪

৯৬ হিজরী সনের জুমাদিউসসানী। হঠাৎ এক দিন বাগদাদের খলিফার পক্ষ থেকে এক দূত বিন কাসিমের কাছে জরুরি বার্তা নিয়ে এলো। খলিফা লিখেছেন, 'সেনাবাহিনী যে অবস্থানে আছে সেখানেই রাখো, আর কোন দিকে অভিযান করো না।'

পয়গাম শুনে বিন কাসিম বার্তা বাহককে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পারো? ওখানকার পরিস্থিতি কি? কেন এমন নির্দেশ দেয়া হলো?

সেই যুগে সেনাবাহিনীর চৌকস মেধাবী কর্মকর্তাদেরই সাধারণত বার্তাবাহক বা দূতের দায়িত্ব দেয়া হতো। এই দূতও ছিল তেমনই একজন সেনা কর্মকর্তা ও বুদ্ধিদীপ্ত চৌকস ব্যক্তি।

বিন কাসিমের প্রশ্নের জবাবে দূত বলল, সম্মানিত আমীরে সিন্ধু! হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বেঁচে থাকার সময় যে অবস্থা ছিল বর্তমানে বাগদাদের সেই অবস্থা নেই। খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক মারাত্মক অসুস্থ। এই অসুখ থেকে মনে হয় না খলিফা আর সুস্থ হবেন। খেলাফতের স্থলাভিষিক্ত কে হবে এ নিয়ে এখনই টানা হেঁচড়া শুরু হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বনি উমাইয়ার শাসক গোষ্ঠী মসনদের আত্মকলহে খুন খারাবী করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার বড় ছেলে খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিককে তার স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন ওয়ালীদের পর তার ছোট ভাই স্থলাভিষিক্ত হবে। কিন্তু খলিফা ওয়ালীদ তার বড় ছেলে আব্দুল আযীযকে তার স্থলাভিষিক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

বিন কাসিম! আপনার ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার মনে দারুণ শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। আপনার চাচা হাজ্জাজ ছিলেন খলিফা ওয়ালীদের সমর্থক। তিনি বাগদাদের প্রভাব ও প্রতাপশালীদেরকে আয়ত্তে রেখেছিলেন। তিনি বাগদাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একথাও বলছিলেন, তারা যেন খলিফার অবর্তমানে আব্দুল আযীযকেই খলিফা হিসাবে মেনে নেয়। সুলায়মানের খলিফা হওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করে। একথা বলার কারণে হাজ্জাজ ও

সুলায়মানের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন সুলায়মানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে হাজ্জাজের মতো পরাক্রমশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিল না। সুলায়মান তখন থেকেই হাজ্জাজকে জানের দুশমন মনে করতো। এখন হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেছেন, সুলায়মান মাথা উঠানোর সুযোগ পেয়েছে। সুলায়মানের ভবিষ্যত সংকল্প খুবই ভয়ানক...। খলিফা ওয়ালীদ দূরদর্শী লোক। তিনি বিছানায় পড়ে থেকেও দূরবর্তী সকল শাসক ও সেনাপতিদের নির্দেশ পাঠিয়েছেন প্রত্যেকেই যেন সেনাবাহিনীকে নতুন অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত রাখে। নয়তো বিপদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি হয়তো বুঝতে পারছেন, তার জীবন আর বেশী দিন নেই। তিনি হয়তো এই আশঙ্কায় আপনার কাছেও এই পয়গাম পাঠিয়েছেন। এমন না হয়ে যায় আপনি সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুলায়মান নির্দেশ পাঠালো লড়াই বন্ধ কর।' তার অর্থ হলো পিছু হটে এসো। পরাজয় স্বীকার করে নাও। আমীরে সিন্ধ! পশ্চিম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে কোন মুসিবত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

শৈশব থেকে যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা সেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, প্রিয় অভিভাবক আপন চাচা ও পথনির্দেশক হাজ্জাজের মৃত্যু শোক তখনো ভুলতে পারেননি বিন কাসিম। এরই মধ্যে খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের শয্যাশায়ী ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ বিন কাসিমকে উদ্বেগাকুল করে ফেলল। খেলাফতকে ঘিরে উত্তরাধিকারীদের আত্মকলহের খবর বিন কাসিমকে আরো বেশী পেরেশান করে তুলল। সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের কাছ থেকে ভালো কিছু পাওয়ার আশা ছিল না। কারণ সেই কৈশর থেকেই বিন কাসিমের প্রতি সুলায়মান ছিল হিংসা ও বিদ্বেষে শত্রু ভাবাপন্ন।

তুমি ঠিকই বলেছ। পশ্চিমাকাশে অন্ধকার ঘনিভূত হচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যতও না জানি অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রহম করুন।

✪ ✪ ✪

হাজ্জাজের মৃত্যু ও খলিফার অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে দূত ফিরে যাওয়ার কয়েক দিন পরই নতুন এক সংবাদ বাহক খবর নিয়ে এলো, খলিফা ওয়ালীদ

ইন্তেকাল করেছেন। খেলাফতের মসনদে আসীন হয়েছেন সুলায়মান।... এবং নতুন খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে বিশ্বস্ততা ও নির্দেশ পালনের লিখিত অঙ্গীকার নামা দেয়ার জন্য আপনার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিন কাসিম শঙ্কা ও চাপের পাহাড় মাথায় নিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অঙ্গীকারনামা লিখে দিলেন। তিনি সেনাধ্যক্ষ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ডেকে তাঁর অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর দেওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন।

বিন কাসিমের সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর চেয়ে দিগুণের চেয়েও বয়সে প্রবীণ। তারা বাগদাদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি যতটুকু জানতেন ততটুকু বিন কাসিমের জানা ছিল না। বিন কাসিম ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সামরিক জ্ঞানে দক্ষ এবং যুদ্ধবিদ্যা ও সেনা পরিচালনায় পারদর্শী। ধন-সম্পদ, বিষয় সম্পত্তি ও রাজনৈতিক মারপ্যাচের কুটিল চালের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। কোন মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থে জীবন বিসর্জন দেয়, জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে জাতির উন্নত শীর অবদমিত করে, মানুষের এই হীন দিকটি বিন কাসিমের কাছে উম্মুক্ত ছিল না। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি ক্ষমতার মোহ ও মসনদের চক্রান্ত তাকে কেমন গ্যাড়াকলে আটকে ফেলেছে। ফলে খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে যতোটা না বিন কাসিম উদ্বিগ্ন হলেন এর চেয়ে বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লেন তার অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ ও কর্মকর্তাবৃন্দ। যে সেনারা সর্বক্ষণ অগ্রাভিযানের চিন্তায় বিভোর থাকতো, কোন বাধা বিপত্তিই যাদের বিন্দুমাত্র হতোদ্যম করতে পারতো না, সুলায়মানের খেলাফতের মসনদে আরোহণে তারা সবাই কেমন যেনো ঝিমিয়ে পড়ল। রাজ্যের ক্লান্তি অবসাদ আড়ষ্টতা যেন তাদের গ্রাস করল। আকুতোভয় বীর যোদ্ধাদের সব আবেগ উদ্দীপনা উচ্ছাস যেন হাওয়ায় বিলীন হয়ে গেল।

কোন অভিযান ছাড়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলো। একদিন বিলাল বিন হিশাম নামের এক ব্যক্তি দামেশক থেকে সিন্ধুতে এলেন। দীর্ঘ বিরতিহীন সফরের ক্লান্তি তার চোখে মুখে। তাছাড়া রাজ্যের বিষন্নতা তার চেহারায়। বিন কাসিম তখন খীরাজ রাজ্যের এক জায়গায় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শা'বান ছাকাফীর সাথে কথা বলছিলেন। আগন্তুক বিলাল বিন হিশাম তাঁদের পাশে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। প্রথমে তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিম ও পরে শা'বান ছাকাফীর সাথে কোলাকুলি

করলেন। কোলাকুলী করা অবস্থাতেই বিলাল হুহু করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বিন কাসিমের কক্ষে নিয়ে বসালেন।

বিন কাসিম! আপনি যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে চান তাহলে স্বাধীন খেলাফতের ঘোষণা দিন, দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠে বললেন বিলাল বিন হিশাম। যে বিশাল এলাকা আপনি জয় করেছেন, আপনি নিজেকে এটির স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করুন। আর যতোক্ষণ সুলায়মান বাগদাদের খলিফা থাকবে ততো দিন খেলাফতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখুন।

হয়েছে কি, তুমি এসব কেন বলছো? ওখানকার অবস্থা কি তা বলো? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

হয়েছে কি, না বলে বলুন কি হয়নি সেখানে? বললেন বিলাল। বাগদাদে এখন চলছে সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের তরবারীর শাসন। মরহুম খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক ও হাজ্জাজের সহযোগী ও সমর্থকদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের অধিকাংশ নিহত হয়েছে। উচ্চ পদে যারা আসীন ছিলেন তাদের সবাইকে পদচ্যুত করা হয়েছে। তাদের নামে এমন লজ্জাকর অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তাদের পক্ষে সমাজে মুখ দেখানোর উপায় নেই। যে কারো প্রতি একবার ইঙ্গিত করে যদি কেউ বলে দেয় এই লোকটি হাজ্জাজের সহযোগী কিংবা সমর্থক ছিল ব্যস, তার কোন প্রমাণের দরকার নেই। সুলায়মান তাকে হত্যা করাচ্ছে। ইবনে কাসিম সুলায়মান এতোটাই বেপরোয়া ও অপরিনামদর্শী বিনাসী তৎপরতায় মেতে উঠেছে যে, চীন বিজয়ী কুতাইবা বিন মুসলিম এবং স্পেন বিজয়ী মূসা বিন নুসায়েরকে ডেকে এনে গ্রেফতার করে তাদের পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। তাদের পরিবার পরিজনকে পথের ভিখারীতে পরিণত করেছে। শুনেছি, ক্ষণজন্মা এই দুই বিজয়ী সেনাপতিকে সে নির্মম শাস্তি দিয়ে হত্যা করবে।

অবশ্য পরবর্তীতে তাই ঘটেছিল। স্পেন বিজয়ী মূসা বিন নুসায়েরকে সুলায়মান পঙ্গু বানিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং মক্কায় আগত হজ্জব্রত পালনকারীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করতে সে বাধ্য করেছিল।

বাগদাদ সালতানাতের অধীনস্ত সকল আঞ্চলিক আমীর তথা শাসকদের পদচ্যুত করেছে সুলায়মান, বললেন বিলাল বিন হিশাম।

ইয়াযিদ বিন মাহলাবকে বানিয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় শাসক। আপনি হয়তো জানেন, ইয়াযিদ বিন মাহলাব আপনার খান্দানের ঘোরতর দুশমন। হাজ্জাজের প্রতি ছিল তার প্রাণনাশী শত্রুতা। ইয়াজিদ বিন মাহলাব এক

খারেজী সালেহ্ বিন আব্দুর রহমানকে খীরাজের শাসক নিযুক্ত করেছে। সেও আপনার খান্দানের আরেক শত্রু। এরা আমার সামনেই বলেছে, বনী সাকীফকে আমরা ধুলায় মিশিয়ে দেবো...। বিন কাসিম! কোন ছাকাফীকে এরা বেঁচে থাকতে দেবে না। আপনি একজন ছাকাফীর কৃতী সন্তান! আপনাকে বরখাস্তের পয়গাম ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। আপনার হয়তো জানা আছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী খারেজী হওয়ার কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সালেহ্ বিন আব্দুর রহমানের ভাইকে হত্যা করিয়ে ছিলেন। সালেহ্ এখন প্রকাশ্যে বলছে, সে তার ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেবে গোটা বনী সাকীফের ওপর। বিন কাসিম! আপনি হবেন এই শত্রুতার প্রথম শিকার। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, বরখাস্তের আগেই আপনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিন।

'হ্যাঁ, বিন কাসিম! সমুদ্র তীর থেকে সুরাট পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা সকল সৈন্য আপনার সাথে থাকবে। এদেশের হিন্দুরা পর্যন্ত আপনার আনুগত্য করেছে এবং আপনার প্রতি বিশ্বস্ত, আপনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিন, বললেন বিন কাসিমের গোয়েন্দা প্রধান দূরদর্শী সেনানায়ক শা'বান ছাকাফী।

'না, শাবান ছাকাফী! আমি যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করি, তাহলে আমার মতো যেসব জায়গায় সেনাধ্যক্ষরা শাসকের দায়িত্বে রয়েছে তারা সবাই স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। ফলে ইসলামী সালতানাত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমি এমনটি হতে দিতে পারি না।' বললেন বিন কাসিম।

বিন কাসিম একথা বলার আগেই অন্যান্য সেনা কর্মকর্তারাও সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। একে একে তাদের সবাই বিন কাসিমকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু বিন কাসিম কারো কথায় সায় দিলেন না। তিনি বারবার বলছিলেন, খেলাফত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের খেলা নয়, এটি রাসূল সা.-এর পবিত্র আমানত। আমি রাসূল সা.-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করতে পারি না।

সকল সহযোদ্ধারা আবেদন নিবেদন করেও বিন কাসিমকে স্বাধীন সিন্ধু শাসক হিসাবে ঘোষণা করাতে পারলেন না। মুসলিম সালতানাতের ঐক্য অটুট রাখতে যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন বিন কাসিম।

আর এদিকে বাগদাদ ও দামেস্কে সুলায়মানের নির্দেশে তার বিরোধিতা কারীদের রক্ত ফুরাত বইতে শুরু করল। বনী সাকীফের সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রথমে সুলায়মান বরখাস্ত করল এবং হত্যা করতে শুরু করল। কোন ছাকাফী নারীও সুলায়মানের নৃশংসতা থেকে রেহাই পেল না। অতঃপর একদিন বিন কাসিমের বরখাস্তের পয়গাম এসে গেল। পয়গামে বিন কাসিমকে বরখাস্ত করে ইয়াযিদ বিন কাবশাকে সিন্ধু অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করা হলো।

কি অভিযোগে বিন কাসিমকে সুলায়মান বরখাস্ত করল ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই। আসলে কোন অভিযোগের প্রয়োজনই ছিল না। কারণ বিন কাসিমের প্রতি সুলায়মানের ছিল গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ। ব্যক্তিগত ব্যর্থতা ও কাপুরুষতার জ্বালা মেটানোর জন্য অনুপম সাফল্য ও বিজয়ের অধিকারী বিন কাসিমকে নিঃশেষ করে তাঁর কীর্তিকে ম্লান করার হীন চেষ্টা চরিতার্থ করলেন সুলায়মান।

সুলায়মানের নিযুক্ত নতুন সিন্ধু শাসক ইয়াজিদ বিন কাবশা সিন্ধুতে পদার্পন করল। সাথে নিয়ে এলো পূর্বাঞ্চলীয় শাসক ইয়াজিদ বিন মাহলাবের ভাই মুআবিয়া বিন মাহলাবকে। ইয়াজিদ এসেই হুকুম করল– "বিন কাসিম! মুআবিয়া বিন মাহলাব তোমাকে গ্রেফতার করে দামেস্ক নিয়ে যাবে। একাজের জন্যই খলিফা তাকে আমার সাথে পাঠিয়েছেন।'

কোন কথা না বলে স্বেচ্ছায় নিজেকে গ্রেফতারের জন্য পেশ করলেন বিন কাসিম। সিন্ধু বিজয়ী, পৌত্তলিক ভারতে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলনকারী, অসংখ্য মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা, লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত নিপীড়িত মূর্তিপূজার অন্ধকারে থাকা ভারতবাসীকে সত্য সুন্দর তৌহিদের পথ নির্দেশকারী ইতিহাসের ক্ষণজন্মা কিশোর সেনানী অধোবদনে হাতকড়া পরানোর জন্যে দু'হাত প্রসারিত করে দিলেন। তাঁর শরীরের পরিধেয় কাপড় খুলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের কাপড় পরিয়ে দেয়া হলো। হাত-পায়ে বাধা হলো ডান্ডা বেড়ি।

আফসোস, হিংসুটে সুলায়মান একবারও ভাবল না, সে শুধু একজন বিন কাসিমকে হাতকড়া পরিয়ে বন্দি করছে না, ইসলামের বিজয় অভিযান ও সম্প্রসারণকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। প্রাণ প্রিয় সেনানায়কের এই করুণ পরিণতি তাঁর সহযোদ্ধারা মর্মজ্বালা নিয়ে দেখছিলেন, তাদের সবার দু'চোখ গড়িয়ে বুক ভেসে যাচ্ছিল অনুতাপ, দুঃখ আর যন্ত্রণায়। সিন্ধুর আকাশ সে দিন

প্রত্যক্ষ করছিল ইতিহাসের নির্মমতা। বন্দীত্ববরণ করে সিন্ধু বিজয়ী বিন কাসিম সহযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলেছিলেন একটি আরবী পংক্তি। "আফসোস! ওরা আমাকে ধ্বংস করে দিল, এরা কতো জোয়ানকে ধ্বংস করেছে যারা রণাঙ্গনে বীর ছিল, সীমান্তের ছিল অতন্ত্র প্রহরী।"

বিন কাসিমকে বন্দী করে বাগদাদ নিয়ে গেলে সুলায়মান তার মুখোমুখি হলো না। সুলায়মানের শিখণ্ডি খীরাজের নবনিযুক্ত শাসক খারেজী সালেহ বিন আব্দুর রহমান সৈন্যদের নির্দেশ দিলো, ওকে ওয়াসতা বন্দিশালায় বন্দি করে রাখো, যেখানে হাজ্জাজের খান্দান ও তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে বন্ধি করে রাখা হয়েছে। বন্ধিশালার দরজায় দাঁড়িয়ে বিন কাসিম বললেন—'তোমরা আমাকে জেলখানায় বন্দি করে এবং আমার হাতে পায়ে জিঞ্জির দিয়ে আমাকে বেকার করে দিয়েছো বটে কিন্তু আমার সেই সম্মান ও সাফল্যকে ম্লান করতে পারবে না। আমি ছিলাম সেই বিন কাসিম, যাকে দেখলে সুলায়মানের মতো কাপুরুষ যোদ্ধাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত, আর আমি ইসলামের শত্রুদের শুধু হত্যাই করিনি তাদের জন্য ছিলাম জীবন্ত ত্রাস।'

বিন কাসিম আফসোস করে সর্বশেষ বলেন, হে সময়! বড় দুঃখ হয়; তুই মর্যাদাবানদের প্রতি খুবই অবিশ্বস্ত।

অতঃপর জেলখানায় বিন কাসিমকে একের পর এক শাস্তি দেয়া শুরু হলো। সীমাহীন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় বিন কাসিম নীরবে সব যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে লাগলেন। সুলায়মান প্রতি দিনই বিন কাসিমদের মৃত্যু সংবাদ শোনার জন্য উদগ্রীব থাকতো। অবশেষে একদিন বিন কাসিমকে হত্যার ইঙ্গিত দিলো সুলায়মান। সুলায়মানের ইঙ্গিতে সালেহ বিন আব্দুর রহমান জেলখানাতেই বিন কাসিমকে আকীল গোত্রের হাতে তুলে দিলো। আকীল গোত্রের লোকেরা দলবেধে বিন কাসিমকে পেটাতে শুরু করল। বহুজনের প্রহারে বিন কাসিম সম্বিত হারিয়ে জীবন্ত লাশে পরিণত হলেন। প্রহারের ধকল সহ্য করতে না পেরে একদিন মৃত্যু আলীঙ্গন করলেন বিন কাসিম। তখন তাঁর বয়সমাত্র বাইশ বছর।

যে বীর ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতেন, সেই বীর সেনানী নির্মমতার শিকার হয়ে স্বজাতির গাদ্দারদের হাতে নিহত হলেন। বিপন্ন বিন কাসিমের লাশ দেখে সেকালের কবি হামজা বিন রিয়াজ কাব্য করে বলেছিলেন–

"সে তো দীপ্ত পৌরুষ, লৌহমানব, প্রসারিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ছিল। সতেরো বছর বয়সে সৈন্য পরিচালনা করেছে। সে তো ছিল জন্মগত স্বভাবজাত সেনাপতি।"

অন্য এক কবি বলেছিলেন–

"সতেরো বছর বয়সে সে ছিল রণাঙ্গনের সেনানী
তাঁর বয়সের ছেলেরা খেলে ফিরে সারা দিন।"

ভারতের জমিনে চমকে দিয়েছিল যে সিতারা সে হঠাৎ নিভে গেল। সে দিন থেকেই ইসলামের ইতিহাসে শুরু হলো ক্ষমতার সংঘাত আর ভোগবাদীদের রাজত্বের খেলা। প্রতিপক্ষকে হত্যা ও নিঃশেষ করে দেয়ার জঘন্য রাজনৈতিক রীতি। এখনো মুসলিম দুনিয়া ক্ষমতালিপ্সু ভোগবাদী রাজন্যবর্গের কব্জা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যার ফলে ইসলামের আলোক মশাল বিভা হারিয়ে অন্ধকারে চাপা পড়ে আর্তনাদ করছে। আর অপেক্ষা করছে এমন একজন ঈমানদীপ্ত ত্রাণকর্তার, যে সকল অন্যায় অন্ধকার দু'পায়ে ঠেলে ইসলামের আলো পুনর্বার দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দেবে।

✪✪✪

সমাপ্ত

সিন্ধু উপকূলের নৌডাকাতরা আরবদের সর্বস্ব লুটে নিল। নারী শিশুসহ বন্দি করল সবাইকে।
নির্যাতিতা এক আরব কন্যার আর্তনাদ ও উদ্ধারের আবেদন নিয়ে হাজ্জাজের কাছে রওয়ানা হলো এক অভিযাত্রী। লুটেরাদের ধৃষ্টতায় আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে ওঠলেন জাত্যভিমানী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। শপথ নিলেন তিনি। যে করেই হোক নিরপরাধ মুসলিম নারী, শিশু ও অমুসলিম পর্যটকদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচারের জন্যে রাজা দাহিরকে উচিত শিক্ষা দেবেন।
এক স্বজাতি কন্যার সম্ভ্রম রক্ষা আর নির্যাতিতদের উদ্ধারে হাজ্জাজের সহযোগী হলো বসরা বাগদাদ তথা ইরাকের হাজার হাজার যুবক, কিন্তু বাধ সাধলেন আয়েশী খলিফা। অথৈ সাগর, বিস্তর দূরত্ব, দুর্গম অচেনা, অজানা পথ আর খলিফা ওয়ালিদ বিন মালিকের বিরোধিতা সত্ত্বেও অত্যাচারী সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে শুরু হলো লোমহর্ষক অভিযান...।
কিন্তু অপরিচিত সিন্ধু উপকূল ও ভারতের বিশাল শক্তির কাছে পরপর ব্যর্থ হলো দু'টি অভিযান। শাহাদাত বরণ করলেন সেনাপতিসহ শতশত মুজাহিদ।
অবশেষে মাত্র সতের বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অপরাজেয় সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে পাঠালেন হাজ্জাজ। বিপুল শক্তির অধিকারী সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে এক কিশোর সেনাপতি...।
নির্ভীক চিত্তে ও দৃঢ়পদে, বিজয়ের কঠিন সংকল্প নিয়ে শুরু হলো বিন কাসিমের ভারত অভিযান...কিন্তু কিভাবে? আসুন! এই শ্বাসরুদ্ধকর উপাখ্যানের ভিতরে প্রবেশ করি...।

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

design: shaj ■ 01911031184